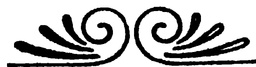
REGISTERED No. C. 192.



OR

THE AGRICULTURIST.



ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

বৈশাখ, ১৩২৪।



কলিকাতা ; ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট শ্রীরাম প্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৮শ খণ্ড। | বৈশাখ, ১৩২৪ সাল। | ১ম সংখ্যা।

বাঙলার কয়েকটি প্রধান ধান

অঘানি—অগ্রহায়ণ মাসে পাকে বলিয়া ইহার নাম অঘানি। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ইহার চাষ আরম্ভ হয়। অঘানি ধানের চাষ বাঙলার সর্ব্বত্র হয়। ত্রিহুত জেলায় প্রায় ৩৩ রকম অঘানি ধান আছে। পাটনা জেলাতে প্রধানতঃ অঘানি ধানের আবাদ হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে প্রায় ৪৬ রকম অঘানি ধান আছে। পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরেও অঘানি ধান আছে। বাখরগঞ্জ বরিশালেও অঘানি ধানের আবাদ অধিক। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি পড়িলেই ধান বোনা হয়; কোথাও বা ঐ সময় তলা ফেলিয়া আষাঢ় মাসে ধান রোয়া হয়। রোয়া অঘানি কিম্বা বোনা অঘানি ঠিক এক সময়েই পাকে।

ভাদুই—ইহা একজাতীয় ধানের নাম, ইহাও প্রকার ভেদে সংখ্যায় অনেকগুলি। এই ধান সাধারণতঃ ৬০ দিনে পাকে। চম্পারণ জেলায় ইহা বৈশাখ মাসে উঁচু জমিতে বোনা হয়। সাহাবাদে আষাঢ় শ্রাবণে, গয়ায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে, ত্রিহুতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ইহার চাষ আরম্ভ হয়। কোথাও কোথাও আউস ধানকেই ভাদুই ধান বলা হয় এবং আউসের সহিত ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। শরৎকালে (ভাদ্র আশ্বিনে) ফসল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদুই ধান্ত হইয়াছে। এই সময় উৎপন্ন দাউল কলাই প্রভৃতি শস্যকেও ভাদুই ফসল বলে।

আশ্বিনি—অঘানি যেমন ধানের নাম আছে তেমনি আশ্বিনি নামেও ধান আছে। বালেশ্বর জেলায় ইহার জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বীজ বোনা হয় আশ্বিন কার্ত্তিকে ধান পাকে। চাউল বেশ শাদা, স্বাস্থ্যকর এবং নিতান্ত মোটা নহে। বাখরগঞ্জেও এই নামের ধান আছে। সিলেটে এই নামে একজাতীয় লম্বা ডাঁটা ধানের জলা জমিতে

আবাদ হয়। ১৫ ফিট পর্য্যন্ত গভীর জলেও এই ধান জন্মায়; জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানের ডাঁটা বাড়িতে থাকে।

আশ্বিনা—ইহা পুরী জেলার ধান। সরস উচ্চ জমিতে ইহার আবাদ হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বপন কার্য্য শেষ হয়, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ধান পাকে। এই নামে রঙ্গপুরে এক প্রকার রোপা ধান আছে। মৈমনসিংহে ঐ নামের আমন ধান আছে।

বারমেসে ধান—পুরী যাইবার পথে, পুরীধামের সন্নিকটে লক্ষ্মীজলা নামে একটি জলা আছে, তথায় বারমাস ধান চাষ হয়। একটি ক্ষেতে দেখিবে যে সবেমাত্র ধানের চারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতেছে, পাশের [illegible] শীষ বাহির হইতেছে, কিয়দ্দূরে ধান পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, অন্য [illegible] পাকিয়া কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে। ইহা ধানের গুণ কিম্বা জলার গুণ তাহা বলা কঠিন অথবা এখানে বীজ, ক্ষেত্র এবং চাষের নিপুণতা এই কয়টিই একাধারে মিলিয়াছে। বর্ষার সময় জলায় জল বাড়ে তখন ধান রোপণের ব্যবস্থা করিতে হয়, অন্য সময় বোনাই ব্যবস্থা—এই ধানের চাল খুব মিহিও নহে কিম্বা মোটাও নহে। ভাত নরম ও সুস্বাদু হয়। লক্ষ্মী-জলা সত্য সত্যই লক্ষ্মীর লীলা ক্ষেত্র।

বাদসা ভোগ—ডুমরাঁও পরীক্ষা ক্ষেত্রে ইহার বহুবার চাষ হইয়াছে। বাঙলার অনেক স্থানে ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে ইহার চাষ সমধিক। ফলন ক্ষেত্র বিশেষে বিঘায় ৬/ মণ হইতে ১০/ মণ। নিতান্ত বিল জমিতে ইহার চাষ হয় না। গোড়ায় অধিক জল থাকিলে দানা মোটা হয়। ইহার চাউল ছোট, মিহি ও সুগন্ধযুক্ত। হুগলী, বর্দ্ধমান, কটক, বালেশ্বর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি অনেক জেলায় ইহার চাষ হইতেছে।

বাম্বা—ইহা পাটনা অঞ্চলের এক প্রকার অষাঢ়ি ধান। ধান বুনিতে হয়। নদীয়া জেলায় কিন্তু ইহার আমনের মত চাষ হয়। ফরিদপুরে বিল জমিতে ইহার আবাদ আছে এবং তথায় ইহার খড় খুব লম্বা হয়।

বেগুণ বিচি—বেগুণ বিচির মত ছোট ও সরু চাউল হয়। ২৪ পরগণায় ইহার চাষ আছে এবং বাঙলায় একাধিক জেলায় ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নামে দিনাজপুরে একটি মোটা ধান আছে। ইহার ধান পাকিতে দীর্ঘ সময় লাগে। বগুড়া ও নদীয়ায় বেগুণ-বিচিও মোটা ধান। ফরিদপুরে বেগুণ বিচি নামে আউস ধান আছে।

বাঁকুই—ইহা মেদিনীপুরের রোপা ধান। ফরিদপুরে ঐ নামে আউস আছে। হুগলী জেলায় আমতার সন্নিকটে বাঁকুই নামে জলিধান আছে। বিল জমিতে ইহার আবাদ হয়। ধান পাটনাইয়ের মত।

বালাম—বাঙলার ইহা একটি বিখ্যাত আমন ধান। বাঙলার নানা স্থানে ইহার চাষ হয় তন্মধ্যে পূর্ব্ব বঙ্গেই অধিক। পৌষ মাসের মধ্যেই ইহার নূতন চাউল বাজারে আমদানী হয়। দানা মিহি, ভাত নরম হয়। চারা তৈয়ারি করিয়া লইয়া ক্ষেতে রোপণ করিতে হয়, খুব নাবাল জমি অপেক্ষা মাঝকিত্তা জমিতে ইহার আবাদ ভাল হয়। বিঘা প্রতি ফলন ৬/ মণ হইতে ৮/ মণ। পুর্ণিয়া জেলায় ইহা অঘানি ধান। ধান রোপণ করিতে হয়। অগ্রহায়ণের প্রথমেই ধান কাটা হয়। নোয়াখালিতে এই নামে আউস ধান আছে। উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত নিরস জমিতে বৈশাখে ইহার বুনানি হয়। ত্রিপুরাতে বালাম আমনের চাষ অধিক।

বেনাফুলী—২৪ পরগণার আমন ধান।

বেনাফুল—হুগলী জেলার ধান।

বাঁকচুর—ইহার চাষ ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমানে অধিক। গোড়ায় ৩ হাত জল থাকিলেও ভাল হয় এবং গাছ তিন ভাগ জলে নিমজ্জিত থাকিলে ফলন সুবিধা মত হয়

বাও বা বাওয়া ধান—আসাম ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের ধান। জলপাইগুড়িতে বুনান [illegible] হয়। গাছ বড় হয়। শিবসাগরেও ইহার চাষ আছে। জল অধিক হইলে ইহার গাছও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায়। সাধারণতঃ ১০।১২ ফিট জলে ইহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে ৩০ ফিট জলের উপরেও এই ধান গাছ মাথা তুলিয়া থাকে।

বিরাণি—উড়িষ্যা দেশের ধান। উচ্চ সরস জমিতে ইহার বুনানি হয়। পুরীতে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে চাষ আরম্ভ হয় এবং কার্ত্তিকে ধান কাটা শেষ হয়। কটকে ও বাঙলায় আউস বা ভাদুই ধানের মত ইহার চাষ হয়।

বোকা—ইহা আসাম দেশের আমন ধান। ইহার চাউল সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয় না। চাউল কিছুক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলেই নরম ভাতের মত হয়। হুগলী জেলাতে ইহার চাষ আছে।

বুন্দা—ইহা দিনাজপুরের এক প্রকার রোপা ধান। রাজসাহীতে ঐ নামে বমাণ

আমন আছে। তথায় বিল জমিতে ইহার চাষ হয়। গাছ খুব বড় হইয়া থাকে। সিলেটেও ইহারর চাষ আছে। বিল জমিতে ছিটাইয়া দিলেই ধান জন্মে, অন্য কিছু বিশেষ চাষ কারকিতের আবশ্যক হয় না। এই কারণে ইহাকে বুনা বা বুনো (Wild) ধান বলে।

চাঁপা—দার্জ্জিলিঙে এই নামে আউস ধান আছে। ২৪ পরগনায় চাঁপা নামে আমন ধানের চাষ হয়। প্রথম বৃষ্টিপাত হইলেই নিম্নতর জমিতে ইহার বুনানি করিয়া চাষ আরম্ভ হয়। ইহা বালেশ্বরের এক প্রকার নয়ালি (আউস) ধান। উচু জমিতে বোনা হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ধান পাকে। চাউল মোটা কিন্তু স্বাস্থ্যপ্রদ। কটকেও ইহার চাষ আছে।

চণ্ডা—রঙ্গপুরের আমন ধান। বিল জমিতে বা নদীর চরে ইহার চাষ হয়। চৈত্র মাস হইতে ক্রমান্বয়ে বুনানি আরম্ভ হয় এবং আগে পিছে হিসাবে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ধান কাটা শেষ হয়। ইহার গাছ বড় হয় এবং জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাছ বাড়িতে থাকে।

ছত্রভোগ—চেঙ্গা নামে পূর্ব্ববঙ্গে রঙ্গপুর, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর অঞ্চলে লম্বা ডাঁটা কয়েক প্রকার ধান আছে।

ছোটনা আমন—ইহা এক জাতীয় আমন। ফরিদপুরে ইহার চাষ অধিক। প্রকার ভেদে ইহা প্রায় ১৩ রকম। নিম্ন জলা জমিতে ইহার চাষ হয়। চৈত্র হইতে ইহার বুনানি শুরু হয়। অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ইহার ধান কাটা শেষ হয়।

চিনিসাগর, চিনিশক্কর, চিনিশর্কর—বাখরগঞ্জ, ঢাকা, দিনাজপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। চাউল মিহি ও সুস্বাদু। প্রায়ই ইহা হইতে আতপ চাউল তৈয়ারি হয়।

দালকচু—দার্জ্জিলিঙের হৈমন্তিক ধান। যশহর, বগুড়া, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ আসামে ইহার চাষ আছে। নিম্ন জমিতে চাষ হয় গাছ বড় হয়।

ধলি—২৪ পরগণার ধান। ধান শাদা হয় বলিয়া ইহার নাম ধলি হইয়াছে।

ধুলিয়া—মেদিনীপুর জেলার আমন ধান। ইহা বপন করিয়া চাষ হয় সিলেটে, বালেশ্বরে ইহার চাষ আছে

দুধকাজ—ফরিদপুরের ধান। খুব শাদা বলিয়া এই নাম হইয়াছে। চাউল

উৎকৃষ্ট ও শাদা। পুর্ণিয়া জেলায় এই নামে মোটা অঘানি ধান আছে। ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহে ঐ নামে আমন ধান আছে। ত্রিহুতে ইহা অঘানি ধান। পাটনায় ইহা মোটা অঘানি। দ্বারবঙ্গে ইহার চাষ আছে।

দুধকলমা—ইহা ফরিদপুরে লম্বা ডাঁটা বিল ধান। দিনাজপুরে ঐ নামে আউস ধান আছে। যশহরে, রঙ্গপুরে, নোয়াখালিতে সাধারণ আমন ধানের মত ইহার চাষ হয়। বাখরগঞ্জে ইহার বিল জমিতে আবাদ হয়। তখন ইহার গাছ বড় হয়।

দুর্গাভোগ—মেদিনীপুরে ইহার আউস ধান, কিন্তু ২৪ পরগণায় ইহার আমন ধানের মত নিচু জমিতে বপন করিয়া চাষ হয়। আবার সুন্দরবনে ইহার আউসের মত চাষ করা হয়। কটকে ইহা বোনা ধান।

গজলগরিয়া—রঙপুরের ইহা রোপা ধান। বগুড়াতেও ইহার চাষ আছে। এই ধানে ভাল খৈ প্রস্তুত হয়।

গোবিন্দভোগ—বীরভূমের রোপা আমন। ঢাকা, ত্রিপুরা ও যশোহরে ইহার চাষ আছে।

গোপালভোগ—মুর্শিদাবাদে ইহার আউসের মত চাষ হয়, বর্দ্ধমানে কিন্তু হৈমন্তিক ধানের মত ইহার আবাদ হইয়া থাকে। ২৪ পরগণা, সুন্দর বন বিভাগ, নোয়াখালিতে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। চাউল সরু, শাদা। ফলন ২৪ পরগণা ও সুন্দরবন বিভাগে ৬৲ মণ হইতে ৯৲ মণ। ইহাতে আতপ চাউল প্রস্তুত হইতে পারে। দিনাজপুর মৈমনসিংহে এই নামের ধান আছে। কটকেও মাঝকিতা জমিতে ইহার আবাদ হয়।

হরিশঙ্কর—ইহা উড়িষ্যার বোরো জাতীয় ধান। চাউল মোটা হয়, প্রায় গরীব লোকে খাইয়া থাকে। নিম্ন জমিতে আবাদ হয়; গোড়ায় ২।৩ হাত জল থাকা আবশ্যক। ইহা রঙপুরেরও একটি রোপা ধান।

হাতিশাল—ইহা বাঙলার এক প্রকার মোটা ধান। কটক ও রাজসাহী ক্ষেত্রে ইহার পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা হইয়াছে। চাউল লম্বা, খুব মোটা নহে, রঙ কিঞ্চিৎ কাল। ফলন প্রতি বিঘা ৮৲ মণ হইতে ১০৲ মণ।

জোঙ্গা—ইহা মুঙ্গেরের হৈমন্তিক, ধান এবং ভাগলপুরেরও রোপা ধান কিন্তু সাঁওতাল পরগণায় আউসের মত চাষ হয়।

কালাজিরা—বাঁকুড়া জেলার আমন ধান। বীরভূম, মেদিনীপুর, কটক প্রভৃতি স্থানে ইহার আবাদ আছে। ধান কাল, খর্ব্বাকৃতি। চাউল খুব মিহি নহে।

কালামাণিক—ইহা মৈমনসিংহের আউস ধান। বৈশাখ মাসে উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত নিরস জমিতে ইহার আবাদ হয় কিন্তু নোয়াখালিতে ইহার আবাদ আমনের মত। বাখরগঞ্জে ইহার বিল জমিতে চাষ। গাছ খুব বড় হয়, ডাটা লম্বা হয়। ইহার ফলন অধিক।

কালিজিরা—এই জাতীয় ধানের ঢাকা, মৈমনসিংহ এবং কাছাড়ে চাষ আছে। ইহা রোপা ধানের মধ্যে পরিগণিত। ত্রিপুরা, সাঁওতাল পরগণায় ইহার আবাদ হইয়া থাকে।

কমলভোগ—ইহা বাঙলার একটি প্রধান ধান। ইহাকে পাটনাই জাতীয় ধান্য বলিলেও বলা যায়। চট্টগ্রাম ও ২৪ পরগণায় ইহার চাষ অধিক। ইহার চাউল লম্বা, খুব মোটা নহে। চাউলে সুগন্ধ আছে।

কামিনী বা কামিনী সরু—২৪ পরগণার ধান। চাউল মিহি—নিম্ন জমিতে জন্মে। হাওড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই ধান জন্মিতেছে।

কামোদ—ইহা বোম্বাই প্রদেশের ধান। বাঙলা দেশেও ইহার চাষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। হাজারিবাগ ও কটকেও ইহার চাষ হইতেছে। দানা মাঝারি রকম লম্বা ও সরু।

এলাইচ (Cardamoms)

মশালা সম্বন্ধে আলোচনা কালে আমরা এলাইচ, লবঙ্গ ইহাদের নামোল্লেখ করিয়াছি। মশালার মধ্যে ইহারা সর্ব্বত্র সুপরিচিত পানের মশালাতে, রন্ধনের মশালাতে এবং গরম মশালাতে ইহাদের সর্ব্বদাই ব্যবহার হইয়া থাকে। আমরা আপাততঃ এলাইচ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব।

এলাইচ দুই প্রকার—ছোট, বড়। পৃথিবীর অনেকানেক স্থানে এলাইচ জন্মিয়া থাকে যথা জাভা, সুমাত্রা, সিংহল, মাদাগাস্কর এবং পশ্চিম অফ্রিকা, ভারতবর্ষ, পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারত মহাসাগরের দ্বীপ পুঞ্জ সমূহে এলাইচ জন্মিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে দক্ষিণাত্য অঞ্চলে বন বিভাগে এলাইচ প্রচুর জন্মিয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট হইতে ঐ সব জঙ্গল এলাইচের জন্য বৎসর বৎসর বিলি হয়। ভারতবাসীগণ পুরাকাল হইতে ইহা তাহাদের খাদ্য, তৈল প্রভৃতিতে মশালারূপে, ও দেবার্চ্চনার্থ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে ক্রমশঃ মন্দ সুঘ্রাণের জন্য ও ঔষধার্থে ইহারা ব্যবহার বাড়িতে লাগিল। ওলন্দাজগণ যখন সিংহল দখল করিয়াছিল তখন তাহারা ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে নানা স্থানে এলাইচ রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধুনা পৃথিবীময় এলাইচের ব্যবহার হইতেছে। ছোট এলাইচ বড় এলাইচ অপেক্ষা অধিক দামী। পশ্চিম দক্ষিণ ভারতে ইহা প্রধাণতঃ উৎপন্ন হয়। মহীশুর, কাসাড়া ত্রিবাঙ্কুর মাদুরা প্রদেশের উর্ব্বর আর্দ্র বন ভূমিতে ও পর্ব্বত গাত্রে প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে বনে জঙ্গলে স্বভাবতঃ জন্মায় ও ইহার আবাদও যথেষ্ট আছে। বড় এলাইচও সম ধর্ম্মালম্বী মৃত্তিকায় ও আর্দ্র জলহাওয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বড় এলাইচ ভারতে এবং জাভা, মরিসস্ প্রভৃতি দ্বীপে জন্মিতেছে। হিমালয়ের যে ভাগ খুব আর্দ্র তথায় বড় এলাইচের অনেক আবাদ আছে। দার্জ্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি ও আসাম প্রদেশে বড় এলাইচের অনেক ক্ষেত্র আছে। সমতলভূমী হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০০০ ফিট উচ্চ পর্ব্বত ভূমিতে পর্য্যন্ত উভয় প্রকার এলাইচের গাছই জন্মিতে দেখা যায়। তেজস্কর কাদা দোঁয়াস মাটিই স্বভাবতঃ এলাই চাষের উপযোগী। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান, ছায়া বৃক্ষস্থানে, আর্দ্র জল হাওয়াতে ইহারা সহজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বনভূমির জঙ্গল ইতস্ততঃ পরিষ্কার করিয়া, ঘন ছয়া নিবারণের জন্য কতিপয় বড় বৃক্ষ কাটিয়া দিয়া এলাইচের চাষ করা চলিতে পারে। এলাইচ হরিদ্রার মত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, এবং হরিদ্রার মত ইহা কন্দজ। কন্দদেশ হইতে চারা বহির্গত হইয়া ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। ইহাদের গাছগুলি ৪ হইতে ৮ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। কাণ্ড হইতে পত্রবেষ্টনি ভেদ করিয়া যে সকল শাখা নির্গত হয় তাহাতে পুষ্প গুচ্ছ থাকে এবং ঐ গুলি ফল প্রসব করে।

ভূমিকর্ষণ করিয়া ৮ হইতে ১০ ফিট অন্তর অন্তর কন্দসমেত এক একটি চারা রোপণ করিলে ২।৩ বৎসরে তাহা হইতে তেউড় (চারা) বাহির হইয়া সমুদয় ক্ষেতটি ব্যাপিয়া ফেলে। তিন বৎসরে সাধারণতঃ এলাইচ গাছ সম্পূর্ণ ফলবান হয়। চারা রোপণের পর হইতে এতাবতকাল ক্ষেতের আগাছা কুগাছা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং গাছ ঘন হইলে পাতলা করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয়।

বীজ হইতে চারা তৈয়ারি করা যায়। হাপরে (বীজতালায়) বীজ অঙ্কুরিত করিয়া লইয়া চারা গুলি ৮ ইঞ্চ কিম্বা ১০ইঞ্চ বড় হইলে ক্ষেতে রোপণ করিতে হয়। বীজ হইতে চারা করা অপেক্ষা তেউড় তুলিয়া লইয়া স্থানান্তরে বসান অপেক্ষাকৃত সহজ।

চৈত্র মাসের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত গাছে ফুল ধরে। পুষ্প সম্বলিত শাখাগুলি পত্র আবরণ দ্বারা বাঁধিয়া দিলে ফুল অধিক ফুটে এবং ফলগুলি বেশ সুপুষ্ট হয়, অধিক রৌদ্র বাতাস লাগিয়া খারাপ হইয়া যাইতে পায় না। ফল গুলি সুপক্ক হইয়া হরিদ্রাভ হইলেই তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। অধিক পাকিলে ফল ফাটিয়া যায়। ফলগুলি সাধারণতঃ ঝুড়িতে পাতা বিছাইয়া তদুপরি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। সমশিতল জায়গায় অল্প অল্প রৌদ্রে ফল শুকাইয়া লইলেই ভাল। অধিক রৌদ্র লাগিলে কিম্বা শিশির বা বৃষ্টি পাইলে ফলের রঙ খারাপ হইয়া যায়। সূর্য্যশুষ্ক এলাইচই উৎকৃষ্ট। ইহা বাজারে গ্রীন কার্ডমম্ বলিয়া আদরে বিক্রীত হয়। ইহার রঙ সবুজাভ হরিদ্রা। বৃষ্টি বাদলের দিন আগুনের উত্তাপে শুকাইতে হয়। ইহাতে রঙ কাল হয়। তখন আবার তাহাদিগকে রিটার জলে ধৌত করিবার আবশ্যক হয়।

ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ উভয়ের পাইট এক। বড় এলাইচের গাছ অপেক্ষাকৃত বড়, পাতাগুলিও দীর্ঘায়তন ও স্থূল। ফলগুলিও অধিক মাংশল। ফলগুলি ছোট এলাইচ অপেক্ষা ভালমত ঘষিয়া মাজিয়া বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করিতে হয়।

এলাইচের গাছ ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত সজীব ও সতেজ থাকে এবং ফলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিতে থাকে। প্রতি বৎসর কিন্তু শুষ্ক গাছ তুলিয়া শুষ্ক পাতা খসাইয়া এবং গোড়ায় গোড়ায় শুষ্ক পাঁকমাটি চূর্ণ দিতে পারিলে ফসল সমভাবে পাওয়া যায়।

শুষ্ক বায়ুমণ্ডলে ইহার গাছ হয় বটে কিন্তু ফল হয় না, যদিও বা কখন হয় তাহা পুষ্ট হয় না। কিন্তু যেখানে পানের চাষ আছে তথায় ইহা উৎপাদন করা যাইতে পারে। পানের বরজের ভিতর পানের ক্ষেতের চারিদিকে অথবা বরজ বাঁধিয়া লইয়া পানের পরিবর্ত্তে এলাইচের চাষ করিলে এলাইচ জন্মান যায়। সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ত্ববিদ্ মলিসন সাহেব এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন।

মহিশুরের এলাচ অপেক্ষা মালবারের এলাইচ বড়। কিন্তু মহীশুরের এলাইচ অধিকতর সুঘ্রাণ এবং দরে বিক্রয় হয়।

মহিশুরে এক একরে ১৪ সের ছোট এলাইচ উৎপন্ন হয়। এক সের ছোট এলাইচের মূল্য পাইকারী ১৲ টাকার কম নহে। বড় এলাইচের ফলন ইহা অপেক্ষা প্রায় চারিগুণ অধিক কিন্তু তেমনি আবার দামেও তদপেক্ষা অনেক কম।

এলাইচ যে কেবল সুগন্ধি মশালা তাহা নহে। ইহাতে শরীরের পুষ্টি সাধনও হওয়া সম্ভব। ইহাতে শতকরা ৩ ভাগ শ্বেতসার ও ৩ ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ আছে। বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে পটাস ক্ষার ও মাঙ্গানিস পাওয়া যায়। অতএব ইহাতে অনুমান হয় এই যে, পটাস প্রধান সার ইহার বড় ফলপ্রদ এবং ম্যাঙ্গানিজযুক্ত মাটি ইহার উপযুক্ত। পাহাড়ীয় সারবান মৃত্তিকায় ইহার বৃদ্ধি সমধিক।

ছোট এলাইচের শাস্ত্রীয় নাম Elettaria Cardamomum, বড় এলাইচের নাম Amomum Sabulatum.

আয়ুর্ব্বেদে বলে যে মূত্রকৃচ্ছরোগে এলাইচ পরম উপকারী। দ্রাক্ষারস বা আমলারস বা কোন প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় আসবের সহিত ছোট এলাইচ চূর্ণ সেবনে রোগের উপশম হয়। ছোট এলাইচ চূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ সমপরিমাণ ঘৃতের সহিত সেবনের বিধিও দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ও বড় উভয় এলাইচই অম্লহারক, পাচক, উষ্ণতা বর্দ্ধক ও দুর্গন্ধাপহারক। এলাইচের আরক মিশ্রিত করিয়া বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে কখন পেট ফাঁপা কিম্বা পেট কামড়ান প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় না।

সীম, বরবটি

সীম, বরবটি, (Phaseolus) শিম্বি জাতীয় ও লতানিয়া শুটিধারী ওষধী অনেক প্রকারের আছে। হালিমুগ, (Green mungs), ভূঙ্গা বা উরিদ অথবা বাঙলা দেশে যাহাকে বিরিমুগ বলে তাহাও এই জাতির অন্তর্গত। বিরিমুগের শাস্ত্রীয় নাম Phuseolus aconitifolious. ইহার গাছ লতানিয়া, খুব বড় হয় না, ১॥০ ও ২ ফিট মাত্র বড় হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত নিরস এবং বেলে দোঁয়াস জমিতে জন্মিতে পারে। গ্রীষ্মকালে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ইহার চাষ আরম্ভ হয় আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে শস্য গোলাজাত হয়। পাঞ্জাবে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ সর্ব্বত্রই ইহার চাষ আছে। বিহারে পাটনা ও পুর্ণিয়া জেলায়ও ইহার চাষ দৃষ্ট হয়। ইহার বিশেষ কষ্টসাধ্য চাষ নহে। জমি চষিয়া ঘাষাদি তৃণ শূন্য করিয়া বীজ ছড়াইতে পারিলেই শস্য জন্মায়। জমিতে পাঁক মাটি ও ছাই মিশ্রিত গোময় সার ছড়াইয়া লইতে পারিলে পূর্ণ মাত্রায় ফসলের আশা করা যায়।

শোথরোগে এই কলাই সিদ্ধ ঔষধ ও পথ্যের কার্য্য করে। ইহার শুঁটি কাঁচা অবস্থায় তরকারি রাঁধিয়া খাওয়া যায় এবং শুকাইলে বীজ ছাড়াইয়া দাউল তৈয়ারি করিয়া লোকে ব্যবহার করে। মুগও এই জাতীয় শস্তের অন্তর্গত। বরবটি, উরিদ, মুগ, মাশ কলাই সকলগুলির বীজের আকৃতি একই রকম এবং চাষও একই ধরণের। বরবটির গাছ বড় হয় সুতরাং উহাদের পালায় তুলিয়া দিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। সোণা মুগের বীজের আকৃতি কতকটা গোল এবং রঙ হরিদ্রাভ। কৃষ্ণনগর, নদীয়া ভিন্ন অন্যত্র সোণামুগ ভাল জন্মায় না কিন্তু অন্য কলাই ভারতের সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। বেলে দোঁয়াস মাটিই ইহার আবাদের উপযোগী। একর প্রতি ফলন ৮৲ মণ হইতে ১০৲ মণ বীজ, গাছেরও পাতার ভুসী যাহা গবাদির খুব প্রিয় খাদ্য তাহা একরে ২৷০ মণ পাওয়া যায়। একর প্রতি চাষে খরচ ১২৲ টাকা এবং খরচ বাদে মুনফা ২৲ কিম্বা ৩৲ টাকার অধিক হয় না।

উরিদ মানুষ যেরূপে খায়, সকল প্রকার মুগও লোকে সেই প্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকে। সোণামুগ মানুষে ভিজাইয়া কাঁচা বা দাউল করিয়া খাইয়া থাকে এবং সিদ্ধ করিয়া আস্ত তরকারি রাঁধিয়া খাইবার প্রথাও এদেশে প্রচলিত। ইহা মানুষের বেশ পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক ও স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য। ইহাতে শ্বেতসার শতকরা ৫৫·৮ এবং ডিম্বলাল ২২·৭, তৈল ২·২ ভাগ বিদ্যমান আছে।

কলাইয়ের খোসাভুসীগুলি গবাদির খাদ্য এবং ইহাদের গাছ, পাতাও শুকাইয়া গরুকে খাইতে দেওয়া হয়। গবাদিকে মাশ ও অন্য মুগকলাই বা বরবটি সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে তাহাদের বিশেষ পুষ্টি হয় এবং গাভীর দুধ বাড়ে। পাতার ও শিকড়ের ভেষজ গুণ আছে।

ফরাস বীন ইহাও শিম্বীজাতীয় শস্য। গাছগুলি উরিদের মত ১॥ ও ২ ফিট মাত্র বড়। শুঁটিগুলি উরিদ অপেক্ষা কিছু অধিক লম্বা। কাঁচা অবস্থায় তরকারি রাঁধিয়া খাইতে ভাল। ইহা দুই প্রকারের আছে,—

১। খর্ব্বাকৃতি গাছ। ইহা মাঠে ছড়াইয়া চাষ করা হয়।

২। লতানিয়া লম্বা গাছ। ইহা সারিবদ্ধ রোপণ করিয়া পালায় তুলিয়া দিতে হয়।

ইহাদের চাষের প্রাণালী পরে দেওয়া গেল।

বিলাতী ব্রড্ বীন্

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ।

মৃত্তিকা—অল্পাধিক কঠিন দোয়াঁস মাটি। হাল্‌কা মাটি উপযুক্তরূপ সার সংযুক্ত হইলে ব্রড বীনের উপযোগী হয়।



ফরাস বীন (লতানিয়া)

সার—সার পুরাতন গোবর-সার মৃত্তিকার সহিত বিশেষরূপে মিশ্রিত করিয়া ধ্যাবৎ করিতে হইবে। গোবর সারের সহিত কিছু হাড়ের গুঁড়া ও ছাই মিশাইলে ভাল হয়।

বপন প্রণালী—প্রস্থে দুই ফুট, গভীর তিন ইঞ্চি, আবশ্যকানুযায়ী লম্বা নালা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেক সারি ৫ ফুট অন্তর থাকিবে। নালার মধ্যস্থল এক ফুট অন্তর দুই বা তিন ইঞ্চি গভীর দুইটা লাইন কাটিয়া তাহাতে ছয় ইঞ্চি পৃথক এক একটা ব্রড বীনের বীজ বসাইয়া প্রায় তিন ইঞ্চি মাটি চাপা দিতে হয়।

জলসিঞ্চন ও অবশিষ্ট কার্য্য—গাছগুলি এক ফুট দীর্ঘ হইলে দুই নালার মধ্যস্থিত উচ্চ জমি হইতে কোদালি দ্বারা মাটি কাটিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। এইরূপে গাছের মূলদেশে (যাহা পূর্ব্বে নিম্ন ছিল) পার্শ্বস্থিত জমি অপেক্ষা উচ্চ করিয়া লইতে হইবে এবং এক্ষণে ঐ উচ্চ জমি নালায় পরিণত হওয়ায় এই নালা দিয়া গাছে জল দিবার পূর্ব্বমত সুবিধা রহিল। পূর্ব্বে যেরূপ নির্ম্মিত নালা (যাহাতে বীজ বপন করা হইয়াছিল) দিয়া জল সিঞ্চন করা হইত এক্ষণে এই নূতন নালায় সেই কার্য্য হইবে। জল সিঞ্চনের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

বিশেষ কার্য্য—গাছগুলি তিন ফুট দীর্ঘ হইলে অথবা রীতিমত ফুল ধরিলে শাখার অগ্রভাগ (ডগা) ছিঁড়িয়া দিতে হইবে। নচেৎ সীম ধরিবে না। অন্য বিলাতী সীম গাছের অগ্রভাগ ছিন্ন করিতে হয় না।

বীজের পরিমাণ—প্রতি একরে ৪॥০ সের হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত।

দেশী মাখন সীম—বপণের সময় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়। আমাদের এই দেশী মাখন সীমও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাকে ইংরাজিতে Butter Bean or Sword Bean বলে। ইহার গাছ খুব বড় হয় ও অনেকদুর লতাইয়া যায় সুতরাং ইহা খুব ফাঁক করিয়া বপন করা শ্রেয়ঃ। ১২টি গাছ জন্মাইতে পারিলে এক বিঘা জমি জুড়িয়া যায়। শ্রাবণ ভাদ্রে ইহার ফুল ফল হয়। সীমের মধ্যে এত বড় সীম কোনটী নহে। ইহার এক একটা সীম ১২ হইতে ১৪ ইঞ্চ লম্বা এবং ১॥ হইতে ২ ইঞ্চ চওড়া হয়। আকৃতি সেকালের ঈষৎ বক্র তরবারির মত। তাই নাম হইয়াছে সোর্ডবীন (সোর্ড=তরবারি) বীজগুলি বড় শাদা কিম্বা লাল বড়।

সর্ব্বপ্রকার সীম কচি অবস্থায় তরকারি রাঁধিয়া খাইতে ভাল। বরবটী ও সীম বীজের ব্যাসম (চূর্ণ) ভারতে একটি খাদ্যোপকরণ। মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত ও নানা প্রকারে ইহার ব্যবহার হয়।

দেশী সীম

বপনের সময়—আষাঢ়, শ্রাবণ।

আমাদের দেশী সীমগুলি, P. Acomtifolious জাতীয় সীম। ইহার লতা খুব দীর্ঘ হয়। উদ্যানের পার্শ্বে ইহার মাচা করিয়া তাহাতে বা বাগানের বেড়াতে কিম্বা পালা পুতিয়া উঠাইয়া দিতে হয়। সীম দেশী অনেক প্রকার, তন্মধ্যে আল্‌তাপাটী, পাথুরে শাদা, বাঘনোখা, গাংদাড়া, ঘৃতকাঞ্চন, কামরাঙ্গা এই গুলি প্রধান ও খাইতে ভাল। দোয়াঁশ মাটী কিম্বা শুষ্ক পাক মাটীতে সীমের গাছ ভাল হয়।

সার—পুরাতন গোবর সার ইহার প্রধান সার।

বপন প্রণালী—বীজগুলিকে পূর্ব্ব রাত্রে ভিজাইয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এক একটি মাদার ৩।৪টি বীজ বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি অর্দ্ধ সের কিম্বা তিন পোয়া বীজ লাগে।

অন্যান্য কার্য্য—সমস্ত সীমের চাষ কারকিত প্রায় একই প্রকারের। নালা কাটিয়া তাহাতে সারি বদ্ধ বীজ বপন করা, গাছ বড় হইলে গোড়ায় মাটি টানিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য সমান।

বপন কার্য্য দুই রকমে সম্পন্ন হয়,—

১। সমস্ত ক্ষেত জুড়িয়া

২। ক্ষেতের চারি ধারে

ফরাসী বুস বীন



ফরাসী বুস বীন

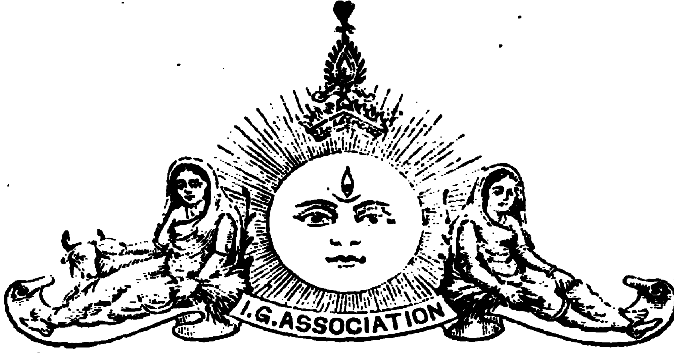
বপনের সময়—কোন কোন মুগের মত জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার চাষ করা যায় এবং আষাঢ় শ্রাবণেও ফরাসী সীমের চাষ করিয়া কোন জমিতে ভাল ফসল হইতে দেখা গিয়াছে। আশ্বিন কার্ত্তিকে মটরের সহিতও ইহার চাষ হয়।

নবিয়া বরবটী—বরবটি শাদা ও সবুজ শুটি ও নবিয়া এই কয় রকমের দৃষ্ট হয়। ইহাদের চাষ সাধারণতঃ সীমের মত। ইহাদের বীজ হইতেও উত্তম দাউল প্রস্তুত হয় এবং তাহা খাইতে সুস্বাদ। বরবটির বীজ চূর্ণ বা ব্যাসম নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।

দুই প্রকারে বরবটি বা দেশী সীমের আবাদ করা যায়।

খর্ব্বাকৃতি সীম কিম্বা মুগাদির চাষ সমস্ত ক্ষেত জুড়িয়া ভিন্ন হয় না। চাষ কারকিং মুগ কলাইয়ের মত সমস্ত। ইহার শুঁটি কাঁচা তরকারি রাঁধিয়া খাওয়া হয়। মুগের মত ইহার দাউলও হইতে পারে। মুগের কাঁচা শুঁটিরও তরকারি হইতে পারে।

কেবলমাত্র সীম বরবটির চাষে তাদৃশ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই বটে কিন্তু আলু, মুলা, শালগমের সহিত ক্ষেতের ধারে ইহাদের চাষ হইতে পারে। যে গুলির সারাটা ক্ষেত জুড়িয়া চাষ হইবে যেমন সোণা মুগ, কৃষ্ণ মুগ, ফরাসী সীম প্রভৃতির আউসে ধানের পর পাল্‌টি চাষ করা যায়, অর্থাৎ আউস ধান কাটিয়া কলাই এবং কলাইয়ের পর আউস ধান এই প্রকারে চাষ করা যায়। কলাই চাষের সময় জমিতে সার দেওয়া আবশ্যক কিন্তু শিম্বিজাতীয় শস্য চাষে জমি স্বভাবতঃ উর্ব্বর হইয়া উঠে এবং সেই জমিতে বিনা সারে বা অতি অল্প সারে পর্য্যাপ্ত ধান্যাদি ফসল জন্মিতে পারে।



বৈশাখ ১৩২৪ সাল।

বর্ষারম্ভ।

দেখিতে দেখিতে আর একটি বর্ষ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। বিগত প্রায় তিন বৎসর কাল জগতের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় যুগ বলিয়া পরিগণিত হইবে। যে সমরাগ্নি সপ্ত সমুদ্র ও তিনটি মহাদেশ ব্যাপিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে এবং যাহাতে লক্ষ লক্ষ মানব ও কোটি কোটি মুদ্রা আহুতি স্বরূপ প্রদত্ত হইতেছে, তাহার প্রভাব সর্ব্ব স্থানে এবং জীবনের সর্ব্ব প্রকার কার্য্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমাদের দেশ বহু দূরবর্ত্তী হইলেও আমাদিগের আহার্য্য ও পরিধেয় সামগ্রীতে, বাণিজ্য ব্যবসায়ে এবং এমন কি কতকটা সামাজিক বিষয়েও এই মহা যুদ্ধের ছায়া নিপতিত হইয়াছে।

সকলেই অবগত আছেন যে ভারত কৃষি প্রধান দেশ। আমরা আমাদিগের ক্ষেত্রজ দ্রব্যাদির বিনিময়েই অধিকাংশ বিদেশীয় পণ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদিগের ক্রেতাগণ অনেকেই এখন সংগ্রামে লিপ্ত; তাঁহাদিগের আর এ সময় পূর্ব্বতন হিসাবে ক্রয় করিবার অবসর অথবা সামর্থ্য নাই। অন্যদিকে আমরা প্রস্তুতীকৃত দ্রব্যাদির অন্য পরমুখাপেক্ষী। বহু পরিমাণ ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্যের আমদানি বন্ধ হইয়া গেলেও তৎ সমুদয় দেশে প্রস্তুত হইতেছে না। এক বিদেশীয়ের পরিবর্ত্তে অন্য বিদেশীয় বণিক তাঁহার পণ্যভার লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইংলণ্ড ও জর্ম্মনির পরিবর্ত্তে আমেরিকা ও জাপান আসিয়াছে। দ্রব্যাদি সুলভ হইতে মহার্ঘ হইতেছে— উৎকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্ট হইতেছে। কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই সমরের প্রভাব বুঝিতে পারিতেছেন এবং সকলেই ভাবিতেছেন যে আর কতদিনে এই বিশ্ব বিপ্লব উৎপাদক আহবের অবসান হইবে।

আমাদিগের দেশে প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই অন্যতম, যথা—ধান্য, গোধুম, তুলা, ইক্ষু, পাট, তৈল বীজ ও তামাক। বাজারের অবস্থা আশাপ্রদ না হওয়াতে বিগত বৎসর গোধুম চাষের জমি প্রায় ২০ লক্ষ একর, তুলা ৬৫ লক্ষ একর, এবং তৈল বীজ প্রায় শতকরা ½ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ধান্যের জমিতে বিশেষ কিছু ইতর বিশেষ নাই। পাটের জমি বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে কিন্তু তাহা এখনও হয় নাই। তামাকেরও অবস্থা তদ্রূপ। কেবল ইক্ষু চাষের জমিই কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ অবশ্য আমদানির স্বল্পতা এবং চিনির দরের মহার্ঘতা। আমরা যে কয়েকটি ফসলের উল্লেখ করিয়াছি ইক্ষু ও তামাক বাদে অপর সমস্তগুলির বহির্ব্বাণিজ্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বহির্ব্বাণিজ্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যেমন কয়েকটি ফসলের চাষ কমিয়া গিয়াছে সেইরূপ আর ২।১টি বৃদ্ধিও পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীলের উল্লেখ করিতে পারা যায়। ১৯১৪-১৫ সালে নীলের জমি প্রায় দেড় লক্ষ একর ছিল; এক্ষনে উহা ছয় লক্ষ একরে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ তিন বৎসরে চারিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জর্ম্মনির কৃত্রিম নীলের আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়া স্বভাবজ নীলের যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হইবে কি না সন্দেহ। নীলকরগণ যাহাতে বর্ত্তমান বাজার রাখিতে পারেন তজ্জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিতেছেন এবং সরকারও সাহায্য করিতেছেন। ফল কিরূপ হইবে তাহা অবশ্য এখন বলা যায় না।

প্রধান ফসল সমূহের উৎপাদনের অবস্থাত গেল এইরূপ। এক্ষনে উহাদের উন্নতিকল্পে চেষ্টার বিষয় আলোচনা করা যাউক। ভারতীয় কৃষি বিভাগের ১৯১৫-১৬ সালের বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই যে পূর্ব্বোক্ত সকল ফসলেরই উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিতে সরকার বিস্মৃত হন নাই। প্রকাশ যে গোধূমের 'পুষা নং ১২' ও নং ৪' নামক জাতি অনেক স্থলেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১২ নং গেধুমের চাযে বিঘা প্রতি ৩৲ টাকার অধিক লাভ হয় এবং ৪ নং অতি শীঘ্র পরিপক্ক হয় বলিয়া বারিপাতের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহা বাঞ্ছনীয় ফসল। ধান্য সম্বন্ধে এইরূপ দুই একটি নবোদ্ভুত জাতি পরিক্ষীত হইতেছে বটে কিন্তু তাহাদিগের উৎকর্ষতা এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। অপরাপর ফসলাদি বিষয়ে সাধারণতঃ এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে বিশুদ্ধ জাতি চাষ অথবা সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা কিম্বা উভয়বিধ উপায়ে উৎপাদনের হার ও উৎকর্ষতা সাধনের চেষ্টা হইতেছে। কতকগুলির পরীক্ষা এখনও প্রাথমিক অবস্থায়; কতকগুলি তদপেক্ষা অগ্রসর এবং অন্য কতকগুলি পরীক্ষা লব্ধ সিদ্ধান্ত অনেকটা নির্ভরযোগ্য হইলেও উহাদের ফল সীমাবদ্ধ। সুতরাং উন্নতির চেষ্টা অনেক হইলেও আর্থিক হিসাবে এখনও কোন উপকার দর্শে নাই। কৃষি অথবা যে কোন কার্য্যের পক্ষে অল্প পরিক্ষীত সত্যের ন্যায় অনিষ্টকারী ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। এইরূপ সত্যের প্রচারেই প্রকৃত সত্যের উপর জন সাধারনের আস্থা চলিয়া যায় এবং বহু শ্রমলব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য

সমূহকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। আমরা সেই জন্ত দেখিয়া সুখী হইলাম যে কৃষি বিভাগের কর্ত্তাগণ এই বিষয় সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। বিবরণীর ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে—It is an accepted policy of the Agricultural Departments in all provinces that no demonstrations should be undertaken until the merits of any improvement to any particular locality are proved beyond doubt by experimental work. Far-reaching result may be expected when the golden rule, "no demonstration befor experiment," adhered to and we take the opportunity of again repeating this warning in order that the temptation to start off with the showy work of demonstration may not lead to the neglect of the rather less noticeable but absolutely essential work of thorough previous experiment without which no form of demonstration can hope to be convincing." অর্থাৎ—যতক্ষণ না পরীক্ষা দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত হইবে যে কেবল উন্নত প্রথা কোন বিশেষ স্থানের পক্ষে উপযুক্ত, ততক্ষণ তাহা প্রদর্শন করা হইবে না—ইহাই সকল কৃষি-বিভাগের কার্য্যের ধারা। পরীক্ষার পূর্ব্বে আদৌ প্রদর্শন নয়' এই প্রকৃষ্ট নিয়ম দৃঢ়রূপে পরিলক্ষিত হইলে অনেক দূরস্পর্শী ফল ফলিতে পারে। এ স্থলে আমাদিগের পুনরায় এ বিষয়ে সতর্ক করাইয়া দিবার কারণ এই যে কেহ অধিক চাকচিক্যময় প্রদর্শন কার্য্যের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্বল্প দৃষ্টি আকর্ষক কিন্তু অধিক গুরুতর পরীক্ষা কার্য্যে অবহেলা না করেন। যশঃ-লোলুপ নবীন কর্ম্মচারীগণের পক্ষে ইহাপেক্ষা আর অধিকতর জ্ঞানের কথা কিছুই হইতে পারে না।

কৃষিজ্ঞান প্রচার দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে কৃষি-শিক্ষা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় এই যে এ সম্বন্ধে এতাবৎ বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। সমস্ত ভারতে পুষা কলেজ ব্যতীত আর মোটে ছয়টি কলেজ আছে, যথা কইমবাটোর, কানপুর, ল্যায়ালপুর, নাগপুর, সবর ও পুনা। শেষের চারিটি উচ্চ কৃষির জন্ম। অন্ত কৃষি কলেজ সমূহে সম্প্রতি দুই প্রকার অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে। ১মটি মুখ্যতঃ জমীদার সন্তানগণের নিমিত্ত; কিন্তু ইহা কৃষি বিভাগের সহকারী কর্ম্মচারীগণের পক্ষেও উপযুক্ত; ইহাতে সাধারণ হিসাবে উচ্চ শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় এবং কৃষি সম্বন্ধে জটিল বিষয়াদির অধ্যয়ন ইহাতে আবশ্যক হয় না। ২য় শ্রেণীর অধ্যাপনা প্রধানতঃ কৃষি বিভাগের অপেক্ষাকৃত উচ্চ কর্ম্মচারীবর্গের জন্ম অভিপ্রেত।

বলা বাহুল্য যে ১মটিতে অল্প সময় আবশ্যক হয় এবং শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এইরূপ অধ্যাপনার ব্যবস্থা হওয়ার পর কৃষি কলেজ সমূহে অধিক সংখ্যক ছাত্র হইতেছে। কিন্তু সাধারণ কৃষি শিক্ষার জন্ত আমরা কৃষি স্কুলের পক্ষপাতী। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ হইতে চান তাঁহারা উচ্চ কলেজে যান, কিন্তু অধিকাংশ কৃষি শিক্ষার্থীর যাহা আবশ্যক

নাই। কৃষি বিজ্ঞানের মূলতত্ব সমূহ ও আনুসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় যদি তাঁহারা উত্তম রূপে শিক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। তাহার পর ক্ষেত্রে কাজ করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ফল হইতে তাঁহারা যে জ্ঞান অর্জ্জন করিবেন তাহাতেই কৃষির অনেক উন্নতি সাধিত হইবে। এইরূপ শিক্ষাই দেশে বহুল পরিমাণে আবশ্যক এবং যত দিন না ইহা হয় ততদিন কৃষিজ্ঞান প্রচার কার্য্য সম্যকরূপে সাধিত হইবে না।

প্রচলিত ফসল সমূহের উৎপাদন লইয়াই কৃষি নহে। মৃত্তিকার উন্নতি সাধন, নূতন ফসল প্রবর্ত্তণ, সার সংস্থান, পশু পালন প্রভৃতি বিষয়ও কৃষির অন্তর্গত। এই সমুদয় বিষয়ে বিগত বৎসর কিছু কিছু উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের নানা স্থানের মৃত্তিকা পরিক্ষীত হইয়া তাহাদের দোষগুণ ক্রমশঃ নির্দ্ধারিত হইতেছে। কিন্তু মৃত্তিকা সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কার্য্য—পতিত ভূমির উদ্ধার। পঞ্জাবের কয়েক স্থানে ক্ষারাধিক্যের জন্য বিস্তৃত প্রান্তররাজি অনুর্ব্বর পড়িয়া রহিয়াছে। উহাদিগকে কর্ষণোপযোগী করিতে পারিলে ধনাগমের যে নব পন্থা উদ্ঘাটিত হয় তাহা সকলেই বুঝেন। পঞ্জাবের কৃষি বিভাগ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে গভীর কর্ষণ, ধৌত করণ ও পয়ঃ প্রণালী স্থাপন দ্বারা বিঘাপ্রতি ছয় টনের কিঞ্চিদূর্দ্ধ ব্যয়ে জমিতে চাষ করিতে পারা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এইরূপ বিশেষ প্রথায় প্রস্তুত জমিতে বিঘা প্রতি ১২ মণ গোধুম ফলিয়াছে। ফল আশাপ্রদ বলিতে হইবে। নূতন ফসল প্রবর্ত্তনের মধ্যে দেখা যায় যে শর্করা উৎপাদক বীটের চাষ কাশ্মীরে সহজে হইতে পারে এবং এই দেশোৎপন্ন বীজ হইতে আবার পঞ্চনদ ও সীমান্ত প্রদেশেও উত্তম বীট জন্মিতে পারে। আর একটি সুসংবাদ এই যে আরব্য দেশীয় খেজুর পঞ্জাবে উত্তমরূপে জন্মিতেছে। আরব্য দেশীয় ও স্থানীয় খেজুরের মধ্যে যে কত তফাত তাহা পাঠকেরা এই কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে স্থলে এক্ষণে দেশীয় খেজুর হইতে ব্যবসায়ীগণ বৎসরে মোটে ১৭½ লক্ষ টাকা পাইতেছেন, সেই স্থলে নব প্রবর্ত্তিত খেজুর ৭০ লক্ষ টাকা পাইবেন।

সার উৎপাদন সম্বন্ধে দুইটি পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। সোরা একটি মূল্যবান সার। এ পর্য্যন্ত নুনিয়াগণ ইহা কতকগুলি বিশেষ স্থানে সংগ্রহ করিত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে মৃত্তিকায় চূণের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে এবং জমির গঠন উপযোগী হইলে শনের ফসল জমিতে প্রোথিত করিয়া কৃত্তিম উপায়ে সোরা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। শন অনেকটা কৈশিক আকর্ষণের সহায়তা করে এবং সোরাকে মৃত্তিকার উপরিভাগে আনিয়া দেয়। এইরূপ কৃত্রিম সোরার আরও একটি গুণ এই যে ইহাতে সাধারণ লবনের মিশ্রণ কম থাকে ও তজ্জন্য অধিকতর বিশুদ্ধ সোরা পাওয়া যায়। Water hyacinth নামক এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ বঙ্গ ও ব্রহ্ম দেশের অনেক নদী খাল বিল পূরণ করিয়া ফেলিতেছে এবং স্থানে স্থানে ইহার জন্য নৌরাস্তা বন্ধ হইয়া যাইতেছে।

এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে গলিত অথবা শুষ্ক অবস্থায় সাধারণ ক্ষেত্রজ সারের দ্বিগুণ সোরাজান ও চারিগুণ পটাশ ইহাতে বর্ত্তমান আছে। ইহা ভস্ম করিলে শতকরা ৪৫ ভাগ পটাশ ক্লোরাইড ও ৪ ভাগ ফস্‌ফরিক এসিড্ পাওয়া যায়। সুতরাং বলিতে হইবে না যে ইহা মূল্যবান সার এবং সময়ে হয়ত ইহা পটাশ উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান হইতে পারে।

পশুজনন ও পশু পালন কৃষির একটি প্রধানতম বিভাগ। বিগত বৎসরের অন্যান্য শুভ কার্য্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে চারিটি পশুজনন ক্ষেত্র সংস্থাপন অন্যতম। এইগুলি নিম্নবারি দোয়াব উপনিবেশে খোলা হইয়াছে এবং মণ্টরগোমরি ও হিসার গাভীর নির্ব্বাচন ও উৎকর্ষ সাধন প্রতিপাদন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য।

এতদ্ভিন্ন খেড়ী ও মথুরায় মাধুরী কুঞ্জে দেশীয় গাভী ও বিলাতী ষণ্ডের (Short horn and Ayrshin bulls) সঙ্কর উৎপাদনের কার্য্যও চলিতেছে। পঞ্চনদে ও যুক্ত প্রদেশে দেশীয় মেষের উন্নতি এবং মেরিনো মেষ প্রবর্ত্তন করিয়া পশম ও মাংসের উৎকর্ষ সাধন কার্য্যও ক্রমশঃ অধিক প্রসার লাভ করিতেছে।

মূলভাবে বিগত বৎসরে আমাদিগের কৃষি জগতে এই গুলিই বিশেষ বর্ণনীয় ঘটনা। আমরা বিশেষ কিছু অগ্রসর হই নাই কিন্তু রাস্তা অনেক পরিমাণে পরিষ্কৃত করিয়াছি এবং আশাও আছে যে ভবিষ্যতে আমাদিগের অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সত্বর হইবে।

এই অবসরে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অপরাপর বৎসরের ন্যায় গত বৎসরেও ভারতীয় কৃষি সমিতি কৃষিজ্ঞান বিস্তার, উৎকৃষ্ট বীজ, গাছ, সার, যন্ত্রাদি সরবরাহ এবং কৃষি পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। কৃষিজ্ঞান বিস্তারে সমিতির প্রধান সহায় "কৃষক"। গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও লেখকবর্গের অনুকম্পায় "কৃষক" তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য যথাসম্ভব সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু বঙ্গের ন্যায় কৃষি বহুল দেশে এইরূপে পত্রিকার যেরূপ সমাদর হওয়া উচিত সেরূপ এখনও হয় নাই। প্রত্যেক কৃষি উৎসাহী ব্যক্তি পত্রিকাখানি যেন অন্ততঃ একবার পাঠ করেন ইহাই আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা। এতদ্দেশে সুলভে জ্ঞান প্রচার না করিতে পারিলে জ্ঞানের প্রচার হওয়া অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যে আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক সুলভ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু বিগত বৎসর বহু বিস্তৃত প্রচার আশায় করিয়া একখানা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। এই গ্রন্থাবলীর দুইখানি পুস্তিকা, 'প্রাথমিক কৃষি-শিক্ষা' ও 'মশলার দ্রব্যাদি' প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কাগজ প্রভৃতির দুর্ম্মূল্যতার জন্য বাধ্য হইয়া এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। উপযুক্ত সময়ে আবার আমরা ইহা প্রকাশে যত্নবান হইব কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা মুখে জনসাধারণের যতটা আগ্রহ দেখিতে পাই কার্য্যে তাহা দেখিতে পাই না।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গত বৎসরও আমাদিগকে অনেকগুলি প্রশ্ন ও পত্রের উত্তর দিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি 'কৃষকে' স্থান পাইয়াছে। এইরূপ অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি যে বাড়িয়া উঠিতেছে ইহাও একটা সুখের বিষয়।

গত বৎসর বিলাতী বীজের কাট্‌তি তেমন হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ অবশ্য আমদানির স্বল্পতা। পক্ষান্তরে দেশীয় বীজ ও বৃক্ষাদি বরং কিছু অধিক পরিমাণে কাটৃতি হইয়াছে। কিন্তু বাহারী গাছ পালার স্বল্প বিক্রয়ে যুদ্ধের প্রভাব কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ইতর বিশেষ নাই; তবে বিলাতী যন্ত্রাদির বিক্রয় যে বর্ত্তমান অবস্থায় কমিয়া যাইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

আমাদিগের গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব্ব আরব্ধ দেশীয় সব্জী বীজও ফল বৃক্ষ সম্বন্ধীয় পরীক্ষাদি ব্যতিরেকে আলুর পরীক্ষাও হইয়াছিল। বীজ আমাদিগের পূর্ব্ব বৎসরের ফসল হইতে বিৰ্বাচন করিয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু এবার তাহা হইতে ফসল ভাল হয় নাই। কিন্তু পাহাড়ী আলু বীজ হইতে বিঘা প্রতি ৭০/ মণ আলু জন্মিয়াছে। ইহা প্রকৃত কারণ কি তাহা এখনও অনুসন্ধানাধীন আছে। ফল বৃক্ষ সম্বন্ধে পরীক্ষাদির ফল আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব। দেশীয় সব্জী সমূহের উৎকর্ষ সাধনের জন্য আমরা অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং আমাদিগের ক্ষুদ্র চেষ্টায় লাউ, শসা, ভুট্টা, বেগুণ প্রভৃতি কয়েকটি ফসলের উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ হইতেছে। কিন্তু বীজ প্রজনন যে সামান্য কার্য্য নহে, বহু অর্থব্যয়, অকাতর পরিশ্রম এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী অধ্যবসায় সাপেক্ষ তাহা সকলের বুঝা উচিত। আপাততঃ যুদ্ধের জন্য বিদেশীয় বীজ ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য হইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধ অবসানেও যে অল্প দিনের মধ্যে বিশেষ সুলভ হইবে তাহা আশা করা যায় না। কি দেশী, কি বিলাতী উভয় প্রকার সব্জীর বীজ দেশেই উৎপাদিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার জন্য এ পর্য্যন্ত কেহই চেষ্টা করিতেছেন না। সরকারী কৃষি ক্ষেত্র সমূহে ক্ষেত্রজ ফসল সমূহের বীজের উৎকর্ষের জন্য অল্প বিস্তর চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু উদ্যানজাত ফসলে একেবারেই উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। বলা বাহুল্য যে ইহার ফলে আমাদিগের শাক সব্জী সমস্তই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। এখনও যদি দেশের ধনীগণ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে নিজেরাও লাভবান হইবেন এবং দেশেরও মহৎ উপকার করিবেন। আশা করি শীঘ্রই এ বিষয়ে জনসাধারণের মনযোগে আকৃষ্ট হইবে।

কৃত্রিম পাট—বর্ত্তমান মহাসমরে কতকগুলি স্বভাবজ দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ায় জর্ম্মণী তৎসমুদয়ের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন। তন্মধ্যে কৃত্রিম পাট একটা ইহার নাম টেক্‌ষ্টি-লোজ (textilose) এবং ইহা হইতে চটের থলের ন্যায় থলে প্রস্তুত হইয়াছে। কিছু দিবস পূর্ব্বে বেসরকারী চেষ্টায় এইরূপ ২।৩টি

থলিয়া কলিকাতায় আমদানি হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে ইহার গঠন সুন্দর এবং দেড় মাসকাল জলে ভিজাইয়া রাখিলেও ইহা পচিয়া যায় না। অবশ্য ইহার প্রস্তুত প্রণালী কিছুমাত্র জানা নাই। তবে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে ভারত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষার্থ এইরূপ কয়েকটি থলিয়ার নমুনার জন্য বিলাতী গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

নূতন সবুজ সার—পালনপুরের মিঃ আমলোক রায় এগ্রিকল্‌চারল জারনল্ অব ইণ্ডিয়ায় লিখিতেছেন যে 'মাটুকি' নামক সোলা জাতীয় এক প্রকার গাছ (Aeschynomene indica L.) উত্তম হরিৎ সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা বনে জঙ্গলে ও ধান্যক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে; অতি সত্বরেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ঝাড়াল হইলে অন্যান্য আগাছার উচ্ছেদ সাধন করে এবং বৃষ্টির জলে জমির যে সারাংশ ধুইয়া যায় ইহার দ্বারা তাহার সদ্ব্যবহার হইতে পারে। জ্যৈষ্ঠের শেষে বীজ বপন করিলে ভাদ্রের প্রথমেই ফুল হয় এবং সেই সময়েই ইহা জমিতে প্রথিত করিতে পারা যায়। চা চাষে এই সবুজ সার ব্যবহারে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে।

সুরা সার—শ্রমশিল্পে নানা প্রকার যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত জন্য সুরাসারের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। নানা প্রকার উপাদান হইতে সুরাসার প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে। মহুয়া ফুল যে অচিরে সুরাসারের একটি প্রধান উপকরণরূপে পরিগনিত হইবে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকায় উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে মার্কিন দেশীয় একটি কৃষি পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে কতকগুলি কৃষিজাত ফসলও সুরাসার উৎপাদনের উপযোগী। ২৮ সের ভুট্টায় প্রায় আধ মণ সুরাসার হয়। সেইরূপ ৫ সের গুড়ে ২ সের, ২৭ সের লাল আলুতে ৫ সের এবং গোল আলুতেও ঐ অনুপাতে সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে। সিমুল আলুকেও এই শ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায়। এইরূপে প্রস্তুত সুরাসার পেট্রোলের সমকক্ষ না হইলেও কিয়ৎ পরিমাণ বেনজোল সংযোগে উহা পেট্রোলের ন্যায় কার্য্য করে। আলোক, ইন্ধন ও তৈল ইঞ্জিন প্রভৃতির জন্য এই প্রকার সুরাসার বিশেষ উপযোগী। সাধারণ কেরোসিনের তুলনায় আলোকের জন্য সুরাসার দ্বিগুণ জ্যোতিশালী; কেরোসিন অপেক্ষা ইহার তাপজনক গুণ কিছু কম হইলেও ইহা সহজে দাহ্যমান নয় বলিয়া ইহার ব্যবহারের প্রসার হওয়া সম্ভব।

নারিকেলের সার—ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশই নারিকেল উৎপাদন হিসাবে ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এ স্থলে নারিকেলের উৎকর্ষ সাধন কল্পে অনেক চেষ্টা হইতেছে। তন্মধ্যে একটি নব উদ্ভাবিত সার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, গাছ প্রতি যদি ৫ সের যে কোন প্রকার খৈল, ১০ সের শুষ্ক ভস্ম, ১ সের হাড়ের গুঁড়া এবং অর্দ্ধ সের লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে ফলন অনেক বাড়িয়া যায়। বস্তুতঃ দশটি গাছে পূর্ব্বে যেখানে মোটে ৪৪টি নারিকেল হইয়াছিল সার প্রয়োগে সে স্থলে ৯১৯টি নারিকেল জন্মিয়াছে। কইম্বাটোর পরীক্ষা ক্ষেত্রেও এই সারে উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত খৈল, নারিকেলের হইলেই ভাল হয়; অভাবে অপর কোন খৈল হইলেও ক্ষতি নাই।

কৃষি বিভাগের ব্যয়—১৯১৫-১৬ সালে ভারতীয় কৃষি বিভাগের জন্য মোট ৪,৬৩,৪১৮৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। উক্ত বৎসরেই প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগ সমূহের জন্য সরকার ৪৫,৩২,৮৪৪৲ টাকা ব্যয় করেন। সুতরাং ভারতে কৃষির উন্নতি কল্পে অর্দ্ধ কোটিরও কিছু উপর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। লোক সংখ্যার হিসাবে, জলবায়ু ও মৃত্তিকার তারতম্য বিবেচনায় ইহা যে অধিক তাহা বলিতে পারা যায় না।

সমবায় সমিতি—সমবায় সমিতি সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নতি দ্বারা দেশের অনেক উপকার সাধিত হইবে তাহা সকলেই আশা করিয়া থাকেন। কৃষি কার্য্যের জন্য অর্থ দান ব্যতীত এই সমিতিগুলি অপরাপর কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। তন্মধ্যে ইহাদের দ্বারা উৎকৃষ্ট বীজের প্রসার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ঢাকা অঞ্চলে মিঃ হেক্টরের নির্ব্বাচিত ধান্য বীজ বহুল প্রচারের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে গোধুম ও তুলা ও মধ্য প্রদেশে তুলা ও ধান্য বীজ সরবরাহের কার্য্য কয়েকটি সমিতি দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। ক্ষেত্রাদিতে সেচন জল যোগাইবার জন্য সমবেত উদ্যম একটি নূতন পন্থা—পূর্ব্ববঙ্গে মেলাড় নামক স্থানে এইরূপ একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্বাদির জীবন বীমা সমিতিও আজ কাল বিরল নহে। তবে যত দিন পর্য্যন্ত গো মড়ক প্রভৃতি নিবারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হয় তত দিন পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর সমিতি বিশেষ লাভবান হইতে পারিবেন না। সার সরবরাহের সমিতি প্রত্যেক প্রদেশেই দুই চারিটি হইয়াছে; কৃষি-যন্ত্রাদির সমিতি অপেক্ষাকৃত কম হইলেও বাজারের অবস্থা সুবিধাজনক হইলে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি আশা করিতে পারা যায়। দুগ্ধ উৎপাদন ও বিক্রয়ের সমিতিগুলি বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশের স্থানে স্থানে উত্তমরূপে কার্য্য চালাইতেছে। পশু সকলের জন্য রায়পুর

জেলায় দুইটি সমিতির সংস্থাপনা সুলক্ষণ বলিতে হইবে। ফলতঃ এই সমুদয় সমিতির ফলে আর কিছু হউক আর না হউক সাধারণ লোকে যে পরিমিত ব্যয়ীতা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমরা ইহাদের উন্নতি আকাঙ্খা করি।

কলের লাঙ্গল—আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের পক্ষে যে কলের লাঙ্গল অনুপযোগী তাহা বহুদিন পূর্ব্বে জানা গিয়াছে। কিন্তু বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশে, আসাম এবং পুষার বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র সমূহে কলের লাঙ্গল ব্যবহৃত হইতেছে। গুজরাট প্রদেশে ৩৬০০ বিঘা জমি কলের লাঙ্গলে চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে বিঘা প্রতি খরচ প্রায় ৫॥০ টাকা পড়ে। এই হিসাবে যে সকল স্থানে মজুর দুষ্প্রাপ্য ও পশ্বাদির অভাব সেরূপ স্থানে কলের লাঙ্গলে চাষই প্রশস্ত। কিন্তু সঠিক অঙ্কাদি সংগ্রহ করিতে হইলে আরও অধিক পরিমাণে পরীক্ষা আবশ্যক।

পত্রাদি

বোম্বাই আম—

শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, দেওপুর মৈমনসিং।

প্রশ্ন—সঠিক আপুজ ও আলফান্সো আমের কলম কলিকাতায় পাওয়া যায় কি না? আলফান্সো ও আপুজ একই আম কি না? পূর্ব্ববঙ্গে পিয়ারাফুলি আম প্রচুর ফলিবে কি না?

উত্তর—আলফান্সো ও আপুজ এক আম নহে। উভয় আমের আকৃতি প্রায় সমান—বোঁটার দিকে গোল তলদেশ কিঞ্চিৎ লম্বাকৃতি। বোম্বাই, ভুতো বোম্বাই ইহাদেরও আকৃতি প্রায় তাহাদের অনুরূপ, কিছু প্রভেদ আছে। ইহারা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক লম্বা। আপুজ, আলফান্সো উভয়েরই রঙ কাল। পাকিলে মাথার দিক হরিদ্রাভ হয়। আলফান্সো অপেক্ষা আপুজের রঙ অধিক গাঢ়। আপুজের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহার খোসা নিতান্ত পাতলা। পাকিলে ইহার শাঁস হইতে খোসা সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। খোসা ছাড়াইতে গেলে ছোট ছোট টুকরা হইয়া যায়।

আলফান্সো ও আপুজের সঠিক কলম কলিকাতায় পাওয়া যায়। আপনি এগ্রি-হার্টিকলচুরাল বাগান, বোটানিক বাগান কিম্বা ভারতীয় কৃষিসমিতি বাগানে অনুসন্ধান করিবেন। পুর্ব্বোক্ত দুই জায়গার ইহাদের দাম অধিক, ভারতীয় কৃষিসমিতির বাগানে দাম কিছু কম।

পিয়ারাফুলী আম পুর্ব্ববঙ্গে না ফলিবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। যেখানে বোম্বাই আম ফলিবে তথায় পিয়ারাফুলিও ফলিবে। তবে ইহা স্থির যে, জলবসা বা রসা জমিতে কোন আমের ফলন সুবিধাজনক হয় না।

প্রশ্ন—ভাল আমের মধ্যে কোন্‌টি প্রতি বৎসর ফলে এবং প্রচুর ফলে?

উত্তর—দুইটি আম যথা সুরত বোম্বাই ও পিয়ারাফুলি ইহারা প্রায় প্রতি বৎসর ফলে এবং ফলনও প্রচুর পরিমাণে হয়। কিন্তু নিতান্ত আর্দ্র জল হাওয়ায় ইহাদের ফলনেরও ব্যতিক্রম ঘটে।

লিচু সরস ও সুমিষ্ট—

শ্রী——ঐ

প্রশ্ন—লিচুর মধ্যে কোন্‌টি অধিক সরস ও সুমিষ্ট, কোন্‌টির অধিক ফলন?

উত্তর—খুব সরস লিচুর নাম করিতে হইলে দেশী গোলা লিচুর নাম করিতে হয়। সমুদয় লিচু অপেক্ষা ইহাতে রসের মাত্রা অধিক কিন্তু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট নহে। ইহার আস্বাদ অম্ল মধুর। বোম্বাই, মজঃফরপুর, পাথুরে বোম্বাই, গ্রীণ লিচু ইহারা সকলেই মিষ্ট লিচু। ইহাদের মধ্যে মজঃফরপুর ও পাথুরে বোম্বাই একটু অধিক নিরস, খাইতে কচ্‌কচে।

স্থানের ও আবহাওয়ার গুণে ফলনের ইতর বিশেষ হয়। বাঙলা দেশে লিচুর ফলন মন্দ হয় না তবে সব বৎসর সমান ফলে না। দেশী ও দেশী গোলা লিচুর ফলন সর্ব্বাধিক ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ফল সম্বন্ধে আর যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহার উত্তর ফলকর প্রভৃতি গ্রন্থে এবং ভারতীয় কৃষি সমিতির বিবরণ যুক্ত তালিকা পুস্তকে পাইবেন।

রাজা কলা—

প্রশ্ন—ইহা কোন জাতীয় কলা, আস্বাদ কি প্রকার?

উত্তর—ইহা মর্ত্তমান জাতীয় কলা আস্বাদ মর্ত্তমানের মত। ইহা সিঙ্গাপুরের কলা

চাঁপা কলার একটু টক রস অধিক, মর্ত্তমানেও টক রস আছে কিন্তু চাঁপা অপেক্ষা কম। কাঁটালি জাতীয় কলায় টক রস আদৌ নাই।

তরল সারে হাড়ের গুড়া—

শ্রীযুত জি, ডবলিউ ম্যাকেঞ্জি, পাকসি।

প্রশ্ন—গোলাপ গাছ কিম্বা সব্জী ক্ষেতে দিবার জন্য এক গ্যালন বা পাঁচ সের জলের সহিত কি পরিমাণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ?

উত্তর—এক গ্যালন বা পাঁচ সের এক বালতি জলে এক পাউণ্ড বা আধ সের হাড়ের গুড়া মিশাইলেই চলিবে। তরল সারের জন্য বোন সুপার ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য এবং কেবল মাত্র হাড়ের গুড়া বা বোন সুপার না দিয়া তাহাতে এক সের আন্দাজ গোময় মিশ্রিত করিলে উহা বিশেষ ফলপ্রদ হয়। গোমূত্র দিতে পারিলে আরও ভাল হয়। হাড় গোময় ও গোমুত্রের সহিত মিশিলে শীঘ্র গলিত হয়।

ইক্ষু ক্ষেত নাইট্রেট অব লাইম—

শ্রীযুত মহম্মদ সোলেমন, বান্দিগড়,
পোঃ বসন্তনগর, দিনাজপুর।

প্রশ্ন—বিঘা প্রতি কি পরিমাণ নাইট্রেট অব লাইম সার দিতে হইবে এবং কেবল মাত্র এই সার দিলেই আকের ফসল পর্য্যাপ্ত হইবে কি না ?

উত্তর—ইহা চূণ ও নাইট্রোজেন প্রধান সার। কেবল মাত্র এই সার প্রয়োগে সম্পূর্ণ ফসলের আশা করা যায় না। ইহার সহিত পটাস ও হাড় সার মিশাইলে তবে পূর্ণ মাত্রায় কাজ হইবে। পটাসের জন্য পাঁক মাটি কিম্বা ছাই ছড়াইতে হইবে: বিঘা প্রতি ১ মণ হাড়ের গুড়া, ৩০০ শত ঝুড়ি পাঁক মাটি এবং দশ সের নাইট্রেট অব লাইম্ প্রদান করিলে সম্পূর্ণ সার প্রয়োগ করা হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

রবি শস্য কলাই মটরে সার—

শ্রী ঐ ঐ

উত্তর—কলাই মটরের পক্ষে পটাস প্রধান সার উপযোগী। আমাদের দেশের চাষীগণ সাধারণতঃ জমিতে পাঁক মাটি ছড়াইয়া লইয়া শস্য বপনের সময় কিছু গোময় প্রদান করে। গোময় নাইট্রোজেন প্রধান সার। ইহাতে ফস্ফরিকাম্ল সারও আছে। বিঘা প্রতি ২০০ শত ঝুড়ি পাঁক মাটি ও ১০০ শত ঝুড়ি গোময় সার প্রদান করিয়া রবি খন্দ কলাই, মটর, মুগ, মুসুরের চাষ করিলে সম্পূর্ণ ফসল প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয় না।

ইক্ষু হইতে রস, গুড়, চিনি, মিশ্রি—

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস, তাড়গাঁও

মহারাজগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর—ইক্ষু বা খেঁজুর রস হইতে গুড় চিনি, মিশ্রি প্রস্তুতের প্রণালী নিত্য গোপাল বাবুর শর্করা বিজ্ঞানে বর্ণিত আছে। কৃষকেও গত পূর্ব্ববর্ষে ইহার সবিস্তার আলোচনা আছে এই কারণে আমরা ইহার পুনরালোচনা নিরর্থক বলিয়া মনে করি।

কাঁচা ঘোড়ার নাদ—

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় মিত্র, মশাট পোঃ।

প্রশ্ন—আলু খুসিবার সময় অর্থাৎ আলুর আইল বা দাড়া বাঁধিয়া দিবার সময় কাঁচা ঘোড়া নাদ দেওয়া যাইতে পারে কি না?

উত্তর—কাঁচা ঘোড়ার নাদ সব্জী বা গাছে কাঁচা অবস্থায় কোন সময় দেওয়া চলে না। যদি দেওয়া একান্ত আবশ্যক হয় তবে তরল করিয়া কেবল দেওয়া চলিতে পারে। ঘোঁড়া বা গরুর নাদ এক বৎসর পচাইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত খৈল মিশাইয়া আলুর গাছের গোড়ায় গোড়ায় দিয়া তার পর জল সেচন পূর্ব্বক ভাটি টানিয়া দিলে কাজ হয়। গোময় ও খৈল উভয়েরই জমির তেজ বৃদ্ধি করা গুণ আছে অধিকন্তু এতদুভয় সার মাটি বেশ ফাঁপাইয়া তুলে এবং আলুগুলিকে সহজে বাড়িতে দেয়।

কৈম্বাটুর কৃষি-কলেজ—এখানে নিম্ন শ্রেণীতে ২টি ক্লাস আছে তাহাতে প্রথমিক কৃষিতত্বগুলি শিখান হয়। এই দুই ক্লাসে পাঠ সমাপ্ত করিয়া উচ্চ দুই ক্লাসে পড়িতে হয়।

নিম্ন শ্রেণীতে পাঠ কালে ছাত্রগণকে অবসরক্রমে কামারের ও ছুতোরের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। সকল শ্রেণীর অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ছাত্রগণকে পরীক্ষা করা হয় ও পারদর্শী ছাত্রগণকে উপাধি দেওয়া হয়।

সকল ছাত্রকেই বিদ্যা মন্দিরে বাস করিয়া কলেজের অধ্যয়ন কার্য্য সমাপন করিতে হয় এবং তাহাদিগকে সময় মত নানা স্থানে লইয়া গিয়া বিবিধ কৃষি প্রথা সম্বন্ধে দেখিবার অবসর দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ ছাত্রগণকে কৃষি-রসায়নের তত্ত্বসমূহ স্থূলতঃ শিক্ষা দেওয়া হয়। তৎপরে ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি বিজ্ঞান, উদ্ভিদতত্ব, উদ্যানতত্ব, কীটতত্ব, ছাত্রক তত্ব প্রভৃতি কৃষি কর্ম্মে আবশ্যকীয় ও আনুসঙ্গিক বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করা হয়।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

বৰ্দ্ধমান ক্ষেত্রে পরীক্ষা—ধান ও পাট—ধানে সার—

(ক) ধান্য—জটাকল্‌মা, কার্ত্তিকশাল, বাসমতি ও বাদসাভোগ ধান্যের মধ্যে জটাকমলার ফলনই অধিক।

(খ) গোময় সারের সহিত বিঘাপ্রতি ।৩ সের সোরা প্রয়োগে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।

(গ) পাট—চারি প্রকারের পাট লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল। ফলে লম্বাগুটির শাদা পাট সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

গোময় ও গোমূত্র সংরক্ষণ—আলোচ্য বৎসরে এই কৃষিক্ষেত্রে সংরক্ষিত সার প্রয়োগে সাদা জমি অপেক্ষা ৬৲ টাকা বেশী লাভ হইয়াছে।

গোল আলু—প্রেসিডেন্সি বিভাগে গোল আলুর চাষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। দার্জ্জিলিং আলুর ফলন, ঠিকৃরি ও আমরাঝাটি অপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে; সাটন কোম্পানীর বিলাতি আলু (যাহা প্রথম বৎসর দার্জ্জিলিঙে আবাদ করা হইয়াছিল) এই বিভাগের পাঁচটি স্থানে রোপণ করা হইয়াছিল। ২৪ পরগণায় জামালপুরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বিঘাপ্রতি ৭৫/ মণ ফলন পাইয়াছেন। ইহাও দেখা গিয়াছে যে এই আলু শীঘ্র পচে না।

আক—খাগড়ি আকের চাষই এই বিভাগের সর্ব্বত্র প্রচলিত, তাহার কারণ খাগড়ি আক শৃগাল প্রভৃতি বন্য জন্তুতে নষ্ট করিতে পারে না ও ইহা বিনা সেঁচে জন্মান যাইতে পারে। সামসাড়া, গেণ্ডারী, টানা প্রভৃতি মোটা আক খুব অল্প লোকেই উৎপন্ন করিত। সম্প্রতি ইহার অধিক প্রচলনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ২৪ পরগণার জামালপুর গ্রামে বিঘাপ্রতি ২৫/ মণ ও বহরমপুরে বিঘাপ্রতি ২২/ মণ গুড় পাওয়া গিয়াছে।

ধানে সার—চিলি দেশীয় সোরা ও সুপারফস্‌ফেট আউস ধান ও পাটের জমিতে প্রয়োগ করিয়া খুব ভাল ফলই পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার সন্তোষজনক ফল দেখিয়া অনেক কৃষকই ইহা ব্যবহার করিতেছে।

ইহা প্রয়োগ করিয়া জামালপুরে জিতেন্দ্র বাবু বিঘাপ্রতি ১০/১ সের আউস ধান পাইয়াছেন; বিনা সারে সাধারণভাবে আউসের চাষ করিয়া বিঘা প্রতি মোট ৫/১ সের পাওয়া গিয়াছে। আউস ধান, আমন ধান ও পাটের জমিতে রেড়ির খৈল প্রয়োগ করিয়াও সুফল পাওয়া গিয়াছে; ধৈঞ্চা সবুজ সারের উপকারিতা প্রদর্শনের ফলে অনেক কৃষকই এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছে।

জামালপুর, রাজীবপুর ও মুতীগ্রামে হাড়ের গুড়া প্রয়োগ করিয়া খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

জোয়ারের রসে গুড়—বৰ্দ্ধমান জেলার বালীডাঙ্গা গ্রামের শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সাহা আমাদের প্ররোচনায় মিঠা জোয়ারের রস হইতে গুড় তৈয়ার করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতে লবণের ভাগ বেশী বলিয়া মনে হয়। গত দুই বৎসর যাবত বৃষ্টির অভাবে ঘাস বিচালির যেরূপ অনাটন হইয়াছে তাহাতে জোয়ারের চাষের দিকে এ বিভাগের অনেক লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

ধানের ফলন—হেক্টর সাহেব মহাশয়ের ইন্দ্রশালী ধান্য (রোয়া আমন) পূর্ব্ববঙ্গে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে কৃষকেরা যে ধান্য উৎপাদন করে তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল। ইহার ফলন কৃষকদিগের ধান্য অপেক্ষা প্রতি একরে ১০৲ মণ বেশী হয়।

পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত গবর্ণমেণ্ট ফার্মে (ঢাকা, রাজসাহী ও রংপুর ফার্ম) এই ধান্যের খুব বেশী ফলন হইয়াছে। ৭০০৲ মণ ধান্য আগামী বৎসরে বুনিবার জন্য বিতরণ করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে এবারই অধিকাংশ কৃষকগণ উক্ত প্রকার বীজের (ইকনমিক বোটানিষ্ট মহাশয়ের ও কৃষকদের) তারতম্য বুঝিতে পারিবে।

রোয়া ধান্যের পরীক্ষায় ইন্দ্রশালী ধান্য ফলনে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, ইহার ফলন বিঘাপ্রতি ১৪৲ মণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে আলু—পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষ অনেকদূর অগ্রসর হইযাছে। প্রায় ৭ হাজার মণের অধিক আলু বিতরণ করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন জিলায় আলুর ফলন অনেক বেশী হইয়াছে, এমন কি সেজন্য আলুই প্রধান খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিতেছে।

পাট—এই ফার্মে পাটের সমুদয় পরীক্ষা তন্তুতত্ত্ববিদ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে হইতেছে। তিনি বিঘা প্রতি ২৲৭ সের পটাস সার প্রয়োগে ১১৲ মণ পাট পাইয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষিত কাকিয়া বোম্বাই নামক পাট কৃষকদিগের মধ্যে অতি সহজে বিস্তার পাইতেছে।

ফাইবার এক্সপার্ট মহাশয়ের সাহায্যে পাটের উপর দুই প্রকার নূতন রকমের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথমটী সবুজ সার পাটের পক্ষে কি প্রকার উপকারী তাহা স্থির করা। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন রকমের প্রস্তুত সার এবং কচুরী (Water Hyacinth) পাটের পক্ষেই বা কি প্রকার উপকারী তাহা স্থির করা। দেখা যাইতেছে যে শেষোক্ত সার পাটের পক্ষে অপেক্ষাকৃত উপকারী হইতে পারে।

বুড়ির হাট তামাকের ফার্ম—বঙ্গদেশে যত প্রকার তামাক উৎপন্ন হয় তাহার পরীক্ষা হইতেছে। প্রায় ৩০ প্রকার তামাক সংগ্রহ করা হইয়াছে। আগামী বৎসর ইহার খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হইবে এবং পরস্পরের গুণাগুণ স্থির করা হইবে। তামাকের আবাদ যেন এ বিভাগের পক্ষে একটী নূতন জিনিষ। ক্রমে দামোদর নদের উভয়তটস্থ ভূমিতে তামাকের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। উচ্চ ভূমিতে অরহরও বেশ জন্মিতেছে।

সুমাত্রা তামাক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই তামাক হইতে যে উৎকৃষ্ট চুরট তৈয়ারী হয় এবং তাহা বাজারে বিক্রি করা যাইতে পারে কি না ইহাই সরকার বাহাদুরের প্রধান লক্ষ্য। এই বৎসর ৪ বিঘা জমিতে সুমাত্রা তামাকের আবাদ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ১২৲ মণ তামাক পাওয়া যাইবে।

দেশী তামাক—এই বৎসর দেশী তামাকের উন্নতির নিমিত্ত এই প্রদেশের বিভিন্ন জিলায় ৩৪ রকম তামাকের আবাদ করা হইয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমস্ত জিলা হইতে রংপুর তামাকের ফলন ও তলব বেশী তাই ইহার মূল্য অধিক। পাবনা জিলার তামাকের আয়তন ক্ষুদ্র।

এই প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলাতেই অল্পাধিক পরিমাণে তামাকের আবাদ হইয়া থাকে কিন্তু মাটী, আবহাওয়া ও আবাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় সকল রকম মাটিতে কি জাতীয় তামাক কিরূপে চাষ করিলে ভাল হয় ও তাহা বিক্রয় করিবার কি সুবিধা আছে এই সমস্ত লক্ষ্য রাখিয়া উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার করিলে এ দেশের তামাকের উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে হামাকু তামাকের আবাদ ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাইতেছে, এই তামাক পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানেই ভাল জন্মিতে পারে অথচ রংপুর ও কুচবিহার হইতে ইহার রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে। এই বৎসর এই ফার্মে হামাকুরও পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহা বেশ জন্মে ও তলব অধিক। আজকাল কুচবিহারের অন্তর্গত দিন হাটায় একপ্রকার হামাকু তামাকের অধিক আদর দেখা যায়। এই তামাক দোয়াঁস মাটিতে ও দোয়াঁস আঁঠাল মাটিতে ভাল জন্মে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগে রোপণ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এই বৎসর ইহার দর প্রতিমণ ১০৲ হইতে ২০৲ টাকা এবং দেশী তামাকের দর ৮৲ হইতে ২৫৲ টাকা।

রংপুরের ভাল তামাকের অধিকাংশই ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে এবং ইহার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই তামাকের আরও উন্নতি করিবার জন্য তামাকক্ষেত হইতে বাছাই করিয়া উৎকৃষ্ট আদর্শ তামাকের বীজ রাখা হইয়াছে। ক্রমাগত ৪।৫ বৎসর এইরূপ বাছাই করিয়া একই রকমের ভাল তামাকের ক্ষেত জন্মাইতে পারা যায় কি

না, এবং উহাতে অধিক ফলন ও মূল্য অধিক পাওয়া যাইবে কি না তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই বৎসর ১৬ বিঘা জমিতে দেশী তামাকের আবাদে প্রায় ৮০/ মণ তামাক পাওয়া যাইবে। ইহার মূল্য ১,২০০—১,৩০০৲ টাকা।

তামাক আবাদ করিবার জন্য বর্ষাকালে জমিতে সবুজ সার দেওয়া হয়। পরে গোবর বিঘাপ্রতি ৭০।৮০/ মণ ও খৈল ৩/ মণ দিয়া জল সেচন করিয়া উৎকৃষ্ট দেশী তামাক উৎপন্ন করা গিয়াছে। দেশী ও সুমাত্রা তামাকে বিশেষ সার প্রয়োগে কিরূপ ফল হয় তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ২/ বিঘা করিয়া জমিতে পটাসিয়াম সালফেট ও সোরা সার দেওয়া হইয়াছিল। তামাক গাদীতে আছে ওজন করিলে ফলন দেখা যাইবে। সুমাত্রা তামাক শুকাইতে বিশেষ প্রকারের ঘরের আবশ্যক, একারণ এইরূপ ঘর তৈয়ার না করিয়া এই তামাকের আবাদ করা যায় না। একজন কৃষক এই বৎসর প্রায় আধমণ সুমাত্রা তামাকের চাষ করিয়া ২২৲ টাকা দরে রংপুর কৃষিসমিতির নিকট বিক্রয় করিয়াছে।

কৃষি যন্ত্র—তামাকের ক্ষেতে কাজ করিবার জন্য প্লানেট জুনিয়ার হো অতি উত্তম। রংপুর জিলায় এইজন্য একপ্রকার হাত লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। ইহা অপেক্ষা এই "হো" ৩।৪ গুণ অধিক কাজ করে। স্প্রিংটুথ হ্যারোদ্বারা এই কামে একখানা দেশী লাঙ্গল হইতে ৪ গুণ কাজ পাওয়া গিয়াছে। এক জোড়া বলদেই ইহা চালাইতে পারে।

সাবোর কৃষি-কলেজ—অনেকেই হয়ত জানেন না যে Sibpur Engineering College এর সংশ্লিষ্ট-কৃষি শ্রেণী উঠাইয়া গত ১৯১০ সনে গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সাবোরে একটী কৃষি কলেজ স্থাপিত করিয়াছেন। এই কলেজ পূর্ব্বে বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছিল। এখন যদিও বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের ছাত্রেরা ইহাতেই অধ্যয়ন করিতে পারে। ছাত্রেরা যাহাতে হাতে হেতেড়ে কাজ করিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে ও স্থানীয় সমস্ত ফসলের জমি প্রস্তুত হইতে, ফসল রোপণ, উঠান পর্য্যন্ত উহার যাবতীয় পাইট দেখিতে পারে সেই জন্য কলেজের সংলগ্ন প্রায় ৫০০ শত বিঘা আয়তনের একটী বৃহৎ কৃষি আদর্শ ক্ষেত্র আছে। এই আদর্শ ক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি আছে এবং তাহাতে তাহাদিগকে সময় উপযোগী সমস্ত ফসলের চাষ আবাদ নিজের হাতে করিতে হয় ও ফলাফলের জন্য তাহারাই দায়ী থাকে। ইহা ব্যতীত কৃষিতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব ও রসায়নতত্ত্ব শিক্ষা করিবার জন্য পৃথক পৃথক গবেষণা গৃহ আছে। প্রত্যেক বিষয়েই ব্যবহারিক শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

কলেজে দুইটী বিভাগ খোলা হইয়াছে (1) Diploma Course (2) Short

Course. অর্থাৎ উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী। উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্ত করিলে উপাধি লাভ হয়।

সাধারণতঃ Matriculation পাশ করিলে Diploma Course এ পড়িতে পারা যায়। ৩ বৎসরের অধ্যয়নের পর শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিলে L. Ag. Degree পাওয়া যায়। এই বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা সরকারী কৃষি বিভাগে বা কোর্ট অব ওয়ার্ডে চাকুরী পাইতে পারে।

কৃষকেরা ও অল্প শিক্ষিত গৃহস্থেরা যাহাতে মোটামুটি উন্নত কৃষি প্রণালীর কার্য্যাবলী শিখিতে পারে তাহাদের জন্য নিম্ন শ্রেণী খোলা হইয়াছে। এই শ্রেণীতে ৬ মাস বা ১ বৎসরও পড়িতে পারা যায়। ফার্ম্মে যে সকল কৃষি কার্য্য বা পরীক্ষা করা হয় তাহাদিগকে মুখে মুখে বুঝাইয়া দেওয়া হয় ও তাহাদের জন্য সময় উপযোগী ব্যবহারিক শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকে। ইহা ব্যতীত ফসলের রোগ, পোকার আক্রমণ প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় ও পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে শিবপুর কলেজের উত্তীর্ণ ১ম ও ২য় ছাত্রকে Executive Service দেওয়া হইত। অধিকাংশ ছাত্র এই দুইটী চাকুরীর লোভেই আসিত; উন্নত কৃষি প্রণালী অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করার দিকে কাহারও তেমন মনোযোগ ছিল না। এই কারণে সাবোর কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে সরকার বাহাদুর এই নিয়ম করেন যে কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদের চকুরীর জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন রূপেই দায়ী থাকিবেন না এবং সরকারী কৃষি বিভাগ ছাড়া অন্য কোন বিভাগে তাহাদের চাকুরীর অধিকার থাকিবে না। যাহাদের জমি জমা আছে তাহাদের পুত্রেরা উন্নত প্রণালীর কৃষি কার্য্য শিখিয়া স্বাধীন-ভাবে যাহাতে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে ও জমিদারের পুত্রগণ কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া প্রজাদের মধ্যে যাহাতে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য বিস্তার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা জন্যই সাবোর কলেজের সৃষ্টি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ছাত্রই এই উদ্দেশ্য লইয়া কলেজে আসিতেছে না এবং সকলেই চাকুরীর আশায় আসিতেছে। সরকার বাহাদুর কোন প্রকার চাকুরি দিবার জন্য দায়ী না থাকায় সাবোরের ছাত্র সংখ্যা অতি অল্প হইয়া আসিয়াছে।

১৯১৪ সনে ১ম ১০টী ছাত্র উত্তীর্ণ হয়

১৯১৫ ,, ,,

১৯১৬ ,, ,,

ইহাদের মধ্যে অনেকেই সরকারী কৃষি বিভাগে কার্য্য করিতেছে, এবং যতদূর জানা গিয়াছে এ পর্য্যন্ত কেহই নিজেদের কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করে নাই। সরকার বাহাদুর প্রথম যে উদ্দেশ্য লইয়া কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় অধুনা কলেজের শিক্ষার নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কলেজের

ছাত্রদের থাকিবার জন্য একটী বৃহৎ ছাত্রনিবাস আছে। কলেজের একজন অধ্যাপক উহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আহারের সুব্যবস্থার জন্য একজন ম্যানেজার ও পীড়িত ছাত্রদের জন্য থাকিবার স্থান ও হাঁসপাতাল ও একজন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন।

কলেজে পড়িতে হইলে মে মাসের মধ্যে আবেদন করিতে হয়। কোন বিষয় জানিতে হইলে এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে সকল বিষয় জানিতে পারা যায় Principal, Agricultural College, Sabour, E. I. Railway, Loop Line (Bhagalpur).

বাগানের মাসিক কার্য্য

জ্যৈষ্ঠ মাস

কৃষিক্ষেত্র—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ,—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতিমধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে লাউ, কুমড়া, ঢেড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মুলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ারি করিতে হইবে।

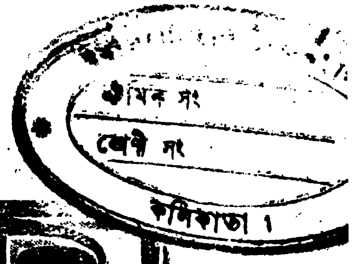
ফুলবাগিচা—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্বে কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।



ছোট এলাইচ গাছ Cardamom (Ilettaria Cardamomum)
গাছের ডাঁটা, পাতা, ফুল, ফল সমস্তই দেখান হইয়াছে।
(বৈশাখ সংখ্যায় এলাইচ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দেখুন)



কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৮শ খণ্ড। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ সাল। | ২য় সংখ্যা।

বাঙলার কয়েকটি প্রধান ধান

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কানাই বাঁশী—আমন ধান; রঙ্গপুর দিনাজপুর এবং কুচবিহারে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। রঙপুরে চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বীজ বোনা হয় এবং ক্রমান্বয়ে ভাদ্রের শেষ পর্য্যন্ত রোপণ কার্য্য শেষ হয়। নাবী ধান মাঘ মাস পর্য্যন্ত ক্ষেতে থাকে। দিনাজপুরে সাধারণ নিয়মে আষাঢ় শ্রাবণে চাষ হয়।

কনকচুর—বাঙলার প্রায় সকল জেলাতেই ইহার চাষ হয়। ইহা একটি হৈমন্তিক ধান্য এবং স্বাভাবিক নিয়মে বর্ষাকালে বীজ বপন ও ধান্য রোপণ কার্য্য হইয়া থাকে এবং হেমন্তে ধান কাটা হয়। এই ধানের ফলন মাঝারি রকম। ইহার একটি বিশেষ গুণ এই যে ইহাতে খৈ প্রস্তুত হয়।

মেদিনীপুর জেলায় ইহা রোপা ধান নহে। তথায় ইহার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বুনানি হয় এবং পৌষ মাসে ধান কাটা হয়।

ধান খুব মিহি না হইলেও নিতান্ত মোটা নহে এবং ইহার চাষের জন্য অধিক জলের আবশ্যক নাই। ইহাতে খৈ হয় বলিয়া এই ধান দরে বিক্রয় হয় এবং ইহার চাষে কখন লোকসান হয় না।

কাঁটারাঙ্গী—২৪ পরগণার একটি আমন ধান; নিম্নভূমিতে জন্মায়। গোড়ায় ছাই ফিট জল থাকে। শ্রাবণে ভাদ্রে রোপণ ও পৌষ মাসে ধান কাটা হইয়া থাকে। সুন্দর বন অঞ্চলে ইহার চাষ অধিক। ধান মোটা ও রঙ লাল।

কার্ত্তিক শাইল—কুচবিহার, রঙ্গপুর ও যশোহরে ইহার আবাদ হয়। ইহা হৈমন্তিক ও রোপা ধান। যশোহরেও ইহার চাষ আছে।

কার্ত্তিকা ও কার্ত্তিকী—এই নামে পাটনায় হৈমন্তিক বুনন ধান ও মুর্শিদাবাদে আউস ধান আছে। কার্ত্তিক মাসে ধান পাকে বলিয়া ইহার নাম কার্ত্তিকা বা কার্ত্তিকী ধান হইয়াছে।

কাশ্মিরী (বাসমতী)—ইহার চাউল গোটা, লম্বা হয়। রঙ বেশ শাদা, দানা সুপুষ্ট হয়। কাশ্মির প্রদেশেই জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বাঙলার বাসমতীর জন্ম এই কাশ্মিরী ধানের বংশে। বাঙলায় আসিয়া ইহা খর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাশী ফুল—বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে আমন ধানের মত ইহার চাষ হয়। ইহা রোপা ধান। মানভূমে এই নামে আউস, আমন দুই প্রকার ধান আছে। তথায় আউস ধান উচ্চ ভূমিতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বুনা হয়। আমনের জন্য নিম্ন জমি আবশ্যক কিন্তু অধিক জলযুক্ত জমির আবশ্যক নাই।

কাটারি ভোগ—মিহি হৈমন্তিক ধান। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, কুচবিহার, বর্দ্ধমান সর্ব্বত্রই ইহা চাষ ও পরীক্ষা হইয়াছে। বাঙলার সর্ব্বত্র পরীক্ষার ফল প্রায় একই রূপ। খুব নিম্ন জমিতে ইহার আবাদ ভাল হয়। গাছের গোড়ায় সামান্য জল থাকিলেই চলে। বিঘা প্রতি ফলন ৫ হইতে ৬ মণের অধিক হয় না। দিনাজপুরের কাটারিভোগ ও ভাগলপুরের কাটারিভোগ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ভাগলপুরের কাটারিভোগে নাইট্রোজেন অধিক পরিমাণে আছে।

কয়া—এই নামে বর্দ্ধমানে একপ্রকার আউস ধান আছে। ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনের প্রথমেই ধান কাটা হয়। বাঁকুড়াতে ইহা রোপা হৈমন্তিক।

কেকোয়া—ইহা আসামের ধান। শিব সাগরের জলা জমিতে জন্মে। বর্ষার জল যেমন যেমন বাড়িতে থাকে ধানের গাছও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। ৩০ ফিট পর্য্যন্ত জলেও ইহার গাছ বাঁচিয়া থাকে ও ফসল হয়। নওগাঁও ও কামরূপে ইহার আবাদ আছে এই সকল স্থানে ইহা ৩।৪ হইতে ৮।১০ ফিট জলে জন্মিতে দেখা যায়। কামরূপে ইহাকে বাও ধান বলে। গোয়ালপাড়াতে ইহার আউসের মত চাষ হয়।

কেলেস্—বাঁকুড়ার আউস ধান। ২৪ পরগণাতেও ইহার চাষ আছে।

কেলেবোগড়া—ইহা নদীয়ায় আউস।

কৈলে রায়—মুর্শিদাবাদের আউস ধান।

খড়িজু—নদীয়া জেলায় আমন ধান। দিনাজপুরেও ইহার চাষ আছে। ইহা ফরিদপুরের এক প্রকার ছোটনা আমন ধান।

খেজুরিয়া—কটক অঞ্চলের জলা জমির এক প্রকার বুনন ধান। ৬।৭ ফিট জলে গাছ ঠিক থাকে। ধান মোটা। ইহা বোরো ধানের জাতি বলিয়া বোধ হয়। চাউল মোট, সস্তা, কিন্তু দুষ্পাচ্য। গরীব গৃহস্থ ভিন্ন ধনী লোকে ইহার চাউল ব্যবহার করে না।

লক্ষ্মীবিলাস—২৪ পরগণার আমন ধান। বাখরগঞ্জেও আমনের মত আবাদ হয়। এখানে চাষ আশু আরম্ভ হয়। বৈশাখেই বীজ বপন করা হয় এবং জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ়ের মধ্যেই রোপণ কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। হাজারিবাগে ইহা ঝারাণ ধান নামে খ্যাত। আমনের সময় ও আমনের মত চাষ হয়। এই নামে ২৪ পরগণায় আউস ধান আছে।

লক্ষ্মীকাজল—লম্বা ডাঁটা ফরিদপুরের ধান। ১৮ ফিট পর্য্যন্ত জলে জন্মিতে পারে এবং জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া থাকে। যশোহরে ইহার চাষ আছে কিন্তু গাছ এত বড় হয় না।

লতা শালি—ইহা বর্দ্ধমানের ধান। লক্ষ্মীপুর আসামে এই নামের ধান আছে। হৈমন্তিক ধানের মত ইহার আবাদ হয়।

লেপা—ইহা মুর্শিদাবাদের একটি আউস ধান। ফরিদপুরে ইহা লম্বা ডাঁটা জলি ধান ও বরাণ আমন ধান। প্রথমটি বিল জমিতে চাষ হয়, দ্বিতীয়টিও নিম্ন ধরণের জলা জমিতে বুনানি করিয়া চাষ হয়। বাখরগঞ্জেও ইহা জলি ধান। ধান ফলিলে ক্ষেতটি লেপিয়া যায় বলিয়া ইহার নাম "লেপা" হইয়াছে—

লোহাগড়া—বাখরগঞ্জের ইহা আমন ধান।

মধু মালতী—ইহা নোয়াখালি ও মৈমনসিংহের আমন ধান। বর্দ্ধমানে ইহার আউসের মত চাষ হয়। কটকে ইহা বিল আমন ধান। এখানে ধান অপেক্ষাকৃত অধিক মোটা হয়। ত্রিপুরা পার্ব্বত্য অঞ্চলেও ইহার চাষ আছে।

মধুশালি—রঙ্গপুরে ইহার রোপা আমন, ফরিদপুরে ইহা ছোটনা আমন এবং মৈমনসিংহে সাধারণ আমনের মত ইহার চাষ হয়।

মাগুরি—রঙ্গপুরে ইহার জলি ধানের মত বিল জমিতে চাষ। জলবৃদ্ধির সহিত ইহার গাছ বাড়ে। আসামে ইহা হালি ধান নামে খ্যাত। শিবসাগরে ইহা শালি ধান। ধান খুব মিহি।

মহিশকান্দি—ফরিদপুরে ইহা জলি ও বরাণ ধান। যশোহরে ও বাখরগঞ্জে ইহার সাধারণ আমনের মত চাষ হয়।

মালভোগ—ফরিদপুরে ছোটনা আমনের মত বিল জমিতে বীজ ছড়াইয়া ইহায় চাষ করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে ধান পাকে। বর্ষার আধিক্য হইলেই চাষ ভাল হয়। আসামে গোয়ালপাড়া, লক্ষ্মীপুর শিবসাগরে ইহার আমনের মত চাষ হয়। গাছের গোড়া ২ ফিট পর্য্যন্ত জল থাকিলে ফসল ভাল হয়। আসামে এই জাতীয় আউস ধান আছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র, চম্পারণে ও ত্রিহুত প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার চাষ আছে। ঐ সকল স্থানে ধান অপেক্ষাকৃত অধিক মিহি হয়।

মর্দ্দরাজ—ইহা পাটনাই জাতীর ধান। চাউল খুব মিহি না হইলেও মোটা নহে। আমনের মত ইহার চাষ হয়। পাটনাই,—রামশাল পাটনাই অপেক্ষা ইহার ফলন কিঞ্চিদধিক। গাছের গোড়ার ১ ফুট জল থাকিলে ফলন ভাল হয়। অন্য পাটনাই গুলির ফলন বিঘাপ্রতি ৬।৮ মণ ধরিলে ইহার ফলন ৮।১০ মণ পর্য্যন্ত আশা করা যায়।

মেগী, মেঘী—এই নামে মেদিনীপুরে, নদীয়ার ও সাওতাল পরগণায় আমন ধান আছে। মেগী রাঙ্গী ২৪ পরগণায় মোটা ধান। গোড়ায় ৪।৫ ফিট জল থাকা চাই।

মুক্তহার—যশহর, মুর্শীদাবাদ, বাকুড়া জেলায় ইহার আমনের মত চাষ হয়। ফরিদপুরের ইহা বড়ান ধান। নদীয়ায় এই নামে আউস আমন দুইই আছে। পাবনায় কেবল মাত্র মুক্তহার আউসেরই চাষ হয়। ২৪ পরগণায় এই নামে আমন আছে। ধান গুলি আকৃতি ও রঙে মুক্তার মত বলিয়া ইহার নাম মুক্তাহার হইয়াছে।

মুরলী—আসাম, কাছার সিলেট, জৈয়ন্তপর্ব্বত অঞ্চলের আমন ধান। ৩॥০ মাসে ধান পাকে।

নাগরা—ইহার বিষয় পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা হুগলী জেলার একটি প্রধান আমন ধান। ২৪ পরগণায়ও ইহার চাষ হইতেছে। চাউল খুব মোটা বা মিহি নহে, মাঝারি রকমের। ভাত নরম হয়। বিঘা প্রতি ফলন ৮ হইতে ১০ মণ। সাঁওতাল পরগণায় নাগরা আউস আছে। আউসের মত চাষে ফলন ৪।৫ মণের অধিক হয় না।

নলডোক, নলকলমা—ইহারা বাখরগঞ্জ ও ২৪ পরগণার মোটা ধান। গাছের গোড়ায় জল না থাকিলে ধান ফুলে না। আমনের মত ইহাদের চাষ করিতে হয়। তেজস্কর জমি হইতে বিঘাতে ১০ মণেরও অধিক ফলে।

নেকেরা—শিবসাগরের ইহা এক প্রকার লহি ধান। জল জমিতে ইহার

বুনানি করিয়া চাষ হয়। গাছের গোড়ায় ২ ফিট জল থাকা আবশ্যক। লক্ষ্মীপুরে ইহার আউসের মত চাষ হয়।

লক্ষ্মী—দার্জিলিঙ, গোয়ালপাড়া, শিবসাগর প্রভৃতি জেলায় ও কুচবিহার ইহার আউসের মত চাষ হয়।

সোনা—ইহা বাঙলার আমন ধান। ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বীরভূম মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় নিম্ন জমিতে ইহার আবাদ আছে। ধান মোটা। নদীয়ার ইহা আউস ধান।

ওড়া ও উড়ি—ওড়া নামে এক প্রকার আমন ধান আছে। মুর্শিদাবাদ ইহার চাষ হয়। উড়ি ধান কিন্তু বুনো ধান। ইহা জলল মহলে আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে। ঢাকায় এই ধান দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে ওড়া উড়ি দুইই যে কোন বুনো ধানের নাম দিয়া থাকে।

গোলাপের চাষ

কত রকমের ফুল, বাগান ও বন সর্ব্বদাই আলো করিয়া রহিয়াছে। গোলাপ ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচার করিয়া তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন কিন্তু গোলাপের সৌন্দর্য্যে এমন একটা মাধুর্য্য আছে যাহাতে সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে। উপরন্তু মনে হয় যে গোলাপের প্রতি এই যে টান ইহা কতকটা মানুষের খেয়াল প্রসূত।

গোলাপের চটক বেশীভাগ গোলাপের রঙে, এমন বিবিত্র রঙের সমাবেশ, রঙে রঙে এমন মধুর মিলন অন্য কোন ফুলে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাপের গন্ধও অতুলনীয় ও তবে সকল গোলাপের নয়। এমন গোলাপ আছে যাহার স্নিগ্ধ মধুর মনমাতান গন্ধে মানুষের প্রাণ আকুল হইয়া উঠে।

এই গোলাপ সম্বন্ধে আমরা আজ কিঞ্চিৎ আলচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি কারণ, ফুলের মধ্যে ইহা একটা খুব বড় রকম আদর পাইয়াছে, সৌখিন লোকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। সৌখিন লোকের সুখের জিনিষ যোগাইতে পারিলে পয়সা পাওয়া যায়। আবার গোলাপের গন্ধ সার বাজারে দামে বিক্রয় হয় এবং উহা একটা ভাল ব্যবসায়ের জিনিষ। গোলাপ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত আলোচনার এ সময় নহে এবং তাহাতে বিশেষ লাভও নাই, সংক্ষেপে এই ফুলের কিছু পরিচয় দিব।

এক জাতীয় গোলাপ আছে যাহাদের গাছ খুব বড় হয় এবং শাখা প্রশাখা অত্যন্ত কাঁটাযুক্ত। সাঙ্কর্য্য দ্বারা এখন এক জাতীয় গোলাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে হাইব্রিড টী গোলাপ বলে। ইহার গাছ ছোট হয়, গাছ ভঁরা ফুল হয়, প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া ফুল ফুটে, গাছে কাঁটা কম, কোন কোন গাছে আদৌ নাই। অনেক প্রকারের হাইব্রিডটী গোলাপের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ যেন এখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে ক্রমশঃ ফুটাইয়া তুলিতেছে।

বর্ত্তমান কালের কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর গোলাপ—হাইব্রিড পার্পেচুয়াল (Hybrid Perpetual)—কয়েক প্রকার গোলাপের সাঙ্কর্য্যে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। এই শ্রেণীর অনেক গোলাপ আছে। ইহার গাছ বড় হয়। শাখা গুলি সরল সোজা হইয়া উর্দ্ধমুখে বর্দ্ধিত হয়। প্রায় সকল শাখাই মূল দেশ হইতে উত্থিত হয়, ইহার প্রশাখা খুব কম। এই শ্রেণীর গোলাপ শীতাতপ সহ, তেজাল, সাতিশয় বাড়ন্ত গাছগুলি ৫।৬ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই শ্রেণীর কিছু কম বাড়ন্ত গাছও আছে এবং ইহাদের বর্ণ অধিকাংশেরই লাল। গোলাপের তালিকায় ইহাদিগকে মধ্যমাকৃতি (Moderate) বলিয়া অভিহিত করা হয়। বোরবোঁ, হাইব্রিড চয়না ডামাস্ক পার্পেচুয়াল গোলাপের সাঙ্কর্য্য ইহার উৎপত্তি।

হাইব্রিড বোরবোঁ—ইহা ফরাসি গোলাপ। প্রভেন্সের (Provence with oBurbon) সহিত বোরবোঁর মিলনে ইহার উৎপত্তি। ইহার গাছ বেশ ঝাড়াল হয়

চীনা গোলাপ কিম্বা বাঙলা গোলাপ—ইহা প্রায় জয়যন্টি শ্রেণীয় (Roseu Gygantea or Rosa India) গোলাপের মত। ইহা বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। রাশি রাশি ফুল হয়। বাগানের বেড়াতে লাগাইলে বাগানের শোভা হয়। ইহার কাঁদি কাঁদি ফুল ফুটে। বেড়া বেশ চিরস্থায়ী ও কাঁটাযুক্ত হয়।

লতানিয়া বা লতানিয়া পার্পেচুয়াল (Climbing Roses)—ইহার গাছ লতাইয়া উঠে। গাছ উদ্যানের ফটকের উপর কেয়ারিতে, দেওয়ালের গায়ে বেড়ার উপর অথবা মাচানের উপর জন্মান যায়। ফুল লাল, হলদে, শাদা অনেক রকমের আছে।

এণ্টনি ডচার, সুইট ব্রয়ার প্রভৃতি গোলাপ ইহাদিগকে যদিও লতানিয়া গোলাপ বলা যায় না কারণ ইহারা লতাইয়া তারের জালের বা বাঁশের মাচার উপর উঠিতে পারে না। এই ধরণের গোলাপগুলি মাটির টবে জন্মাইবার উপযুক্ত। অধিক লতানিয়া গোলাপ মাটির টব বা গামলায় জন্মান যায় না। যে গুলি গামলায় জন্মিবে তাহাদের উচ্চতা ৫ ফিটের অধিক হইলে তাহাদের লইয়া বিড়ম্বনায় পড়িতে হয়। ছাঁটিয়া কাটিয়া সংযত করিতে পারিলে মাটির গামলায় এবম্প্রকার গোলাপ গুলি পুষ্পিত হইলে বিশিষ্ট শোভা ধারণ করে। লতানিয়া গোলাপগুলি মাটিতে জন্মাইয়া কেয়ারির উপর লতাইয়া পুষ্প ধারণ করিলে অবশ্য আরও অধিক শোভা হয়।

মস্‌রোজ বা প্রভেন্স রোজ (Provence Rose--Rosa Centiflera) ইহারা ফরাসী দেশের গোলাপ। ইহার বেশ মনোহর গন্ধ। গোলাপী ও সাদা এই শ্রেণীর এই দুইটি রঙই প্রধান। মস্ ও প্রভেন্স এই দুই জাতীয় গোলাপেরই একই গাছে বিভিন্ন বর্ণের ফুল ফুটিয়া থাকে। নানা ফুলের ডালে জোড় বাঁধিয়া অনেক রকমের মস্ ও প্রভেন্স গোলাপের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। প্রভেন্স অপেক্ষা মস্ উৎকৃষ্ট জাতীয়। ইহাদিগকে ক্যাবেজ (Cabbage) রোজও বলে।

সুগন্ধী গোলাপ—সুগন্ধ যুক্ত গোলাপের নাম করিতে হইলে প্রধানতঃ মস্ক (Musk and Damsk) ও ডামাস্ক গোলাপের উল্লেখ করিতে হয়। এই দুই শ্রেণীর গোলাপ হইতে গন্ধসার আতর ও গোলাপ জল প্রস্তুত হয়। ইহাদের ফুলে তৈল ভাগ সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় ইহাদের গাছ গুলি দেখিতে তাদৃশ সুন্দর নহে। গাছে কাঁটা অত্যন্ত অধিক ডামাস্ক অপেক্ষা মস্ক গোলাপে আরও অধিক। বাঙলা দেশে ইহাদিগকে চৈতী (চৈত্র) গোলাপ বলে। ফাল্গুণ মাস হইতে ইহাদের ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ফুল প্রদান করে। বসরাই গোলাপ মস্ক জাতীয় গোলাপ।

টী রোজ—ইহাদের ফুলে মৃদুমন্দ চায়ের গন্ধ পাওয়া যায়; তাই ইহাদিগকে টী রোজ, বা চা গন্ধী গোলাপ (Tea Rose, Tea Scented) বলে। ইহাদের গাছগুলি বেশ ঝাড়াল হয়। শাখা পল্লব, পাতা ও ফুল সবই কোমল; পাতার উপর পৃষ্ঠ চা পাতার মত চিক্কণ। ইহার সহিত অন্য অনেক গোলাপের মিশ্রণে হাইব্রিড টী জাতীয় গোলাপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই শ্রেণীতে অনেক গোলাপ আছে। নয়সেটও প্রায় টীয়ের সম শ্রেণীর গোলাপ তবে প্রভেদের মধ্যে এই ইহার শাখা প্রশাখাগুলি কিঞ্চিৎ অধিক লম্বা ধরণের। ইহার লতিকা স্বভাব হেতু ইহাদিগকে মাচন বা জাফরিতে তুলিয়া দিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায় এবং ইহা মনোমত প্রসারিত হইয়া পড়িলে সুন্দর শ্রীধারণ করে।

টী কিম্বা নয়সেট গোলাপ ঘাষ মাটের মাঝে মাঝে স্তবকে স্তবকে জন্মাইলে ঘাষ মাঠের বড়ই সুন্দর শোভা হয়। টী গোলাপ গামলায় জন্মাইবার বিশেষ উপযোগী আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম তাহা হইতে গোলাপের নিম্ন লিখিত কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ করা যায়।

১। হাইব্রিড পার্পেচুয়াল বা ষ্টাণ্ডার্ড গোলাপ—যাহা থামের ধারে ধারে জন্মাইয়া থামের মত সোজা করিয়া উঠাইয়া শাখাগ্রভাগ ইতস্ততঃ বাঁকাইয়া দেওয়া যায়।

২। মধ্যমাকৃতি গোলাপ (Dwarf and moderate Roses) ইহা হাইব্রিড পার্পেচুয়াল শ্রেণীভুক্ত কিন্তু কিছু খর্ব্বাকৃতি এবং উদ্যানের মাঝে মাঝে জন্মাইবার উপযুক্ত।

৩। লতানিয়া গোলাপ, সুইট ব্রায়ার ও ডচার জাতীয় গোলাপ।

৪। সুগন্ধী গোলাপ—Damask, Musk আতর, গোলাপজল প্রভৃতি গন্ধসার প্রস্তুতের উপযোগী গোলাপ।

৫। মস্ বা প্রভেন্স রোজ ইহাদেরও গন্ধ অতি মনোহর।

৬। টী ও নয়সেট রোজ।

৭। চীনা বা বাঙলা গোলাপ।

৮। জয়ঘণ্ট। Rose gygantia or Roseu Indica—ইহার ডাল কাটিয়া বসাইলে গাছ হয়। ইহার গাছ খুব তেজাল ও বৃদ্ধিশীল। ইহার কটিং (Cutting) হইতে গাছ তৈয়ারি করিয়া লইয়া অন্ত গাছের সহিত জোড় কলম করা হয়।

গোলাপের চাষ কারকিৎ।

গোলাপের স্থান নির্দ্দেশ—উপযুক্ত ক্ষেত্রে গোলাপ চাষ করা কর্ত্তব্য। পাহাড়ের সন্নিকটে যদি গোলাপের ক্ষেত্র রচিত হয় এবং তুষার পাতের আশঙ্কা থাকে তবে এমন স্থান বাছিয়া লইতে হইবে যেন সে স্থানে প্রবল শীতল বাতাস প্রবাহের অব্যাহত গতি রুদ্ধ থাকে। আবার সমতল ভূমি ভাগেও গোলাপ গাছগুলিকে প্রচণ্ড উষ্ণ বাতাস প্রবাহ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। যে দিক হইতে উষ্ণ বাতাস আসা সম্ভব, সেই দিকে হয়, অরণ্য অথবা মৃত্তিকাস্তূপ বা অন্ত কিছু ব্যবধান থাকিলে ভাল হয়।

বড় সহরের সান্নিধ্য গোলাপের পক্ষে ভাল নহে সহরের দূষিত বায়ু ও কয়লার ধোঁয়া গোলাপের বৃদ্ধি অনুকূল নহে। খুব রোদ্ পিঠে জায়গায় গোলাপ ক্ষেত রচনা করা কর্ত্তব্য। ক্ষেতটি দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব্ব অভিমুখে ক্রমনিম্ন হইলে ভাল হয়। প্রাতঃকালের সম্পূর্ণ সূর্য্যরশ্মি পূর্ণ মাত্রায় গোলাপ ক্ষেতের উপর পড়া চাই। গোলাপ ক্ষেতের নিকটে কোন গাছ থাকিবে না। গোলাপ ক্ষেতের ভিতর গাছের শিকড় যাইলে বা তাহার ডাল পালায় ছায়া পড়িলে ক্ষতি হয়। গোলাপের বৃদ্ধি পক্ষে আবাধে রৌদ্র বাতাসের আবশ্যক।

অনেক সময় কিন্তু সহর বা সহরের নিকট গোলাপ বাগান করা আবশ্যক হইয়া উঠে। প্রতিকূল অবস্থায় গোলাপ জন্মাইতে হইলে খুব ভাল গোলাপ জন্মাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। এই সকল স্থানে খুব বৃদ্ধিশীল, তেজাল ও দৃঢ় জাতীয় গোলাপ বসানই সুপরামর্শ।

গোলাপের উপযুক্ত মাটী—পাহাড়ের উচ্চর মাটিতে গোলাপ বেশ সতেজে জন্মে বটে কিন্তু তাই বলিয়া সাতিশয় কঠিন মৃত্তিকা ইহার উপযোগী নহে। অনেক গোলাপের পক্ষে কর্দ্দমাক্ত মাটি (৭০ হইতে ৮০ ভাগ) বেশ উপযোগী।

অপেক্ষাকৃত কোমল দেহ বিশিষ্ট গোলাপের কাদা দোয়াঁশ মাটিই (৫০।৬০ ভাগ কর্দ্দম) আবশ্যক।

টী, চায়না ও হাইব্রিড টী গোলাপগুলি দোয়াঁশ মাটিতে এবং অপেক্ষাকৃত গরম আবহাওয়ায় উত্তমরূপ জন্মায়।

কর্দ্দমাক্ত মাটিতে গোলাপ বসাইবার পূর্ব্বে বেলেমাটি, পাতাসার কিম্বা কাঠের ছাই মিশাইয়া লইলে মাটির কঠিনত্ব নষ্ট হয়।

বেশ খোলা জায়গায়, যেখানে রোদ বাতাস অবাধে পায় কর্দ্দমাক্ত মাটিতে গোলাপ চাষ করিলে কতকগুলি গোলাপ পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

জলবসা জায়গায় গোলাপ জন্মিবে না গোলাপ ক্ষেত উচ্চ ভূমিতে স্থাপিত হওয়া এবং তাহার যথোপযুক্ত পয়নালা থাকা আবশ্যক। ক্ষেতে চারি পাশে গভীর নালা কাটিতে হয়। নালাগুলি আবশ্যকমত ৩ হইতে ৬ ফিট পর্য্যন্ত গভীর করা হইয়া থাকে। ক্ষেতটি সুপ্রশস্থ হইলে ক্ষেতের মাঝে মাঝেও নালা কাটিয়া দিতে হয়। যতদুর গাছের শিকড় যাইবে ততদুর পর্য্যন্ত মাটি সরস থাকিবে অথচ মাটি জলবসা হইবে না ইহাই গোলাপ চাষের প্রধান লক্ষ্য। আমরা জমি কোদাল দ্বারা কোপাইয়া মাটি গুঁড়াইয়া জমির রস রক্ষা করি এবং জমির অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিবার জন্য নালা কাটি।

মাটির পাইট—গোলাপ ক্ষেতের গভীর কর্ষণ আবশ্যক। তিন ফিট মাটি খোঁড়া না হইলে গোলাপ চাষ হয় না। মাটি কোপাইয়া চাপ উল্‌টাইয়া রাখিয়া দিলে রৌদ্র বাতাসে তাহা সারবান হয়। ৩ ফিট গভীর নালা কাটিয়া তাহা আবার সার, গোবর ও মাটি দিয়া পুরাইয়া তাহার মাঝে মাঝে গোলাপ চারা বসাইলে গাছ সতেজ বৃদ্ধি হয়।

গোলাপের সার—গোময় গোলাপের পক্ষে সাধারণতঃ ভাল সার। অভাবে অশ্ব ও শুকর মল ব্যবহার করা যায়। বর্ষার পূর্ব্বে ক্ষেত চষিয়া খুঁড়িয়া ক্ষেতে নালা কাটিয়া এবং তাহাতে গোবর সার দিয়া রাখিতে হয়। বর্ষার জলে মাটিসিক্ত হইয়া দুরস্ত হইয়া থাকে ও মাটি বসিয়া ঠিক হইয়া যায়। বর্ষাশেষে কার্ত্তিক মাসে চারা বসাইতে হয়। চারা বসাইবার আর একটি সময় মাঘ মাস (January)। এই সময় চারা বসাইতে হইলে বর্ষা শেষে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হয়।

পরবর্ত্তী কারকিৎ—দুই লাইন গাছের মধ্যস্থলে জমি কোপাইয়া মেরামত করিয়া রাখিতে হয়। গাছের গোড়া খুঁড়িবার সময় পাঁচ অঙ্গুলি বিশিষ্ট কাঁটা ব্যবহার করা উচিত, কারণ কোদাল বা খোন্তা দ্বারা খুঁড়িতে বা খুসিতে গেলে

সুতরাং ছোট শিকড় ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। কোপান নিড়ানর প্রধান উদ্দেশ্য আগাছা দমন রাখা, মাটিতে রোদ বাতাস লাগান ও জল সঞ্চয়ের সুবিধা করা।

সার দিয়া গাছ বসাইলেও প্রতি বৎসর পুনরায় সার দিবার আবশ্যক হয়। শরত-কালে বা শীতকালে কারকিত মেরামত ও সার দিবার উপযুক্ত সময়। পশু মলমূত্র ও ছাই, কুটী মাটি প্রভৃতি গোয়ালের আবর্জ্জনা বেশ ভাল সার। গাছের গোড়ায় সার দিয়া ফর্ক দ্বারা খুসিয়া সার মাটিতে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়।

মৃত্তিকা কঠিন কর্দ্দমাক্ত হইলে মাটির সহিত গুড়া চূণ, পোড়া মাটি কিম্বা মোটা বালি মিশাইলে ভাল কাজ হয়। কাঁকর মাটি বা বালি মাটিতে গোলাপ হয় না।

গাছ বসাইবার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মাটির অবস্থা বুঝিয়া কোন প্রকার গোলাপ বসান হইবে তাহা স্থির করিতে হইবে। ঘাস মাঠের মাঝে মাঝে একটি বেড বা কেয়ারি রচনা করিয়া তাহাতে তেজস্কর মধ্যমাকৃতি, প্রচুর ফুল প্রদানকারী গাছ নির্ব্বাচন করিয়া বসাইতে হয়। খুব দীর্ঘ শীর্ষ ষ্টাণ্ডার্ড গোলাপ ছাড়া টী, চায়না, মধ্যমাকৃতি গোলাপগুলি বেলে দোয়াঁস মৃত্তিকা যুক্ত কেয়ারিতে বেশ সাজাইয়া বসান যায়।

জমিতে "যো" হইলে তবে চারা বসান চলে। চারা বসাইয়া মাটি ভালমতে চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। লতানিয়া জাতীয় গোলাপ ১০ ফিট ব্যবধানে, ষ্টাণ্ডার্ড গোলাপ ৪ ফিট ব্যবধানে, হাইব্রিড টী ও মস্ রোজ ৩ ফিট ব্যবধানে, বটন রোজ জাতীয় ক্ষুদ্র গোলাপ ১॥ ফিট অন্তর বসান উচিত। ১ ফুট চৌকা গর্ত্ত খুঁড়িয়া জোড় পর্য্যন্ত মাটি ঢাকা পড়ে এরূপ ভাবে গভীর গর্ত্তে গোলাপ বসাইতে হইবে। হাপর হইতে দ্বিবিধ উপায়ে চারা উঠান যায়, ১ম শিকড় হইতে মাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং মাটি সমেত। মাটি বিমুক্ত শিকড় বসাইবার সময় কিছু কিছু ছাঁটিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। মাটি সমেত চারা উঠাইলে উঠাইবার সময়ই স্বভাবতই ঐ কার্য্য সাধিত হয়। চারা তুলিবার কালে কোন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত বা কোন স্থানে থেঁতো হইয়া গেলে তাহা কাটিয়া বাদ দিতে হয় বা শিকড় অগ্রভাগ ছিঁড়িয়া তাহা আহত স্থানের উপর হইতে কাটিয়া ফেলিতে হয়।

চারা বসাইবার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিতে হইলে আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত যে সময় চারার বৃদ্ধির সময় সে সময় উহাদিগকে হাপর হইতে উঠান উচিত নহে। গোলাপ গাছের বৃদ্ধির সময় নভেম্বর হইতে জানুয়ারি মাস। এই হেতু এই সময়ের আগে বা পিছে অর্থাৎ অক্টোবর বা ফেব্রুয়ারি মাসে চারা বসানই ভাল। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ নিয়ম পালন করা চলে না। গোলাপ চারা নভেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া মার্চ মাস পর্য্যন্ত বসান হইয়া থাকে। চারা বসাইবার সময় গোড়ায় কিঞ্চিৎ হাড়ের গুঁড়া দিয়া বসাইলে উপকার দর্শে। প্রত্যেক চারায় ১০ তোলা আন্দাজ হাড়ের গুঁড়াই যথেষ্ট।

ঘাস মাঠে এক একটা গোলাপ পৃথক পৃথক রোপন করা যায়। লম্বা চওড়া ১॥ ফুট ও আবশ্যক মত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া চারা বসাইতে হইবে। বসাইবার সময় গোয়ালের সার ও কিছু হাড়ের গুঁড়া দিয়া চারা বসাইতে হয়। বড় জাতীয় ষ্টাণ্ডার্ড গোলাপের জন্য ২×২ ফিট গর্ত্ত আবশ্যক।

বৃষ্টি বাদলের দিনে বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে গাছ বসান উচিত নহে। চারা গুলি হাপর হইতে তুলিয়া এক দিন বা অন্ততঃ একবেলা অন্ধকার ঘরে রাখিয়া শুল টানিয়া গেলে তবে গর্ত্তে বসাইতে হয়। চারা দূর হইতে আনা হইলে অন্ততঃ এক দিন চারাগুলিকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ঘরের মধ্যে গোড়াগুলিকে থলে বা মাদুর চাপা দিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সকালে গাছ না বসাইয়া বৈকালে বসান ভাল কারণ রাত্রে ঠাণ্ডা পাইয়া গাছগুলি কতকটা ধাতস্থ হয়।

গাছ ছাঁটা—গাছ ছাঁটার উদ্দেশ্যটা বুঝিয়া রাখিলে ছাঁটিবার পদ্ধতি শিখিতে অধিকক্ষণ সময় যায় না। গাছ এমন করিয়া ছাঁটিতে হইবে যাহাতে অধিক ফুল হয়, গাছ তেজস্কর হয় এবং গাছের আকৃতি মনোমত ও সুন্দর হয়। প্রথম, মৃত, রুগ্ন, ঘণ, ও অকেজো ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। রুগ্ন ডালগুলি গাঁইটের মাথা হইতে কাটিয়া অপসারিত করিতে হইবে। ২য়, তেজস্কর ডালও ছাঁটিয়া ছোট করা কখন কখন আবশ্যক।

প্রত্যেক রকম গোলাপ ছাটিবার এক একটি বিশেষ নিয়ম আছে এমন প্রত্যেক গাছের পক্ষে ছাঁটিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। সব সময় এক নিয়মে কাজ করিলে চলে না সর্ব্বদা উদ্দেশ্যে লক্ষ রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

গাছ বসাইবার পর প্রথম বৎসর গাছ গুলি খুব অধিক পরিমাণে ছাঁটিতে হয়। মাটির উপর ৩।৪ ইঞ্চি কাণ্ড রাখিলে ছাঁটিয়া ফেলা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এমন কি বৃহৎদণ্ড বিশিষ্ট গোলাপ যথা ষ্টাণ্ডার্ড ও লতানিয়া গোলাপ প্রভৃতি তাহাদের দৃঢ় শাখা ১ ফুট পর্য্যন্ত রাখিয়া ছাঁটিতে হইবে। শরতকালে গোলাপ বসাইয়া বসন্ত কালে ছাঁটিতে হয়।

উদ্যানে গাছ গুলির শোভা বর্দ্ধনার্থ ছাঁটিবার এই কয়টি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়।

১। মরা রুগ্নডাল গাঁইটের মাথা হইতে কাটিয়া ফেলা।

২। গাছ খর্ব্বাকৃতি করিবার আবশ্যক হইলে শাখার যে চোখগুলি সুপষ্ট বাহির হইয়াছে তাহা উপর হইতে ডাল অগ্রভাগ কাটিয়া বাদ দেওয়া।

৩। চেতী গোলাপগুলি খুব অধিক ছাঁটার আবশ্যক নাই। ঘন ডাল কাটিয়া একটু পাতলা করা গাছের সৌষ্ঠব বিধানার্থ আঁকা বাঁকা ডালগুলি কাটিয়া বাদ দেওয়া।

৪। ঘন ডাল পাতলা করা, রুগ্ন ও অকেজো ডাল বাদ দেওয়া হইলে প্রত্যেক ডালের ৫।৬ টা চোক রাখিয়া অগ্রভাগগুলি ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়। প্রদর্শনীর জন্য ছাঁটিতে হইলে ডালে ২।৩টির অধিক চোক রাখা উচিত নহে। এবং গাছের অধিক ডালপালা বাদ দেওয়া আবশ্যক হয়।

পটল



কুমড়া, আলু বেগুণের মত ইহা আমাদের দেশের একটি শ্রেষ্ঠ তরকারী। ইহা খুব সুখাদ্য। আমরা ভাজিয়া এবং ঝোলে, ঝালে, ডাল্লায় সকল রকম ব্যঞ্জনে পটোল ব্যবহার করি। মাছ মাংসের পুর দিয়া আমরা পটোলের এক প্রকার ব্যঞ্জন তৈয়ারি করিতে পারি তাহাকে রন্ধনশাস্ত্রে দোলমা বলে। ইহা রাজভোগ্য ব্যঞ্জন।

পটলের জলীয়ভাগ শতকরা ৯২ ভাগ হইলেও ইহাতে শরীর পোষণোপযোগী সার পদার্থ আছে। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহাতে প্রোটিড্ ৬, শ্বেতসার ও শর্করা ৪·০ তৈল ০·৩ ভাগ আছে। আয়ুর্ব্বেদে ইহার অনেক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা পাচক, হৃদ্য, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কাশী, রক্তদোষ, জ্বর ও ক্রমি নাশক। পটোলের মূল অতিশয় বিরেচক। বাত শ্লেষ্মা ও পিত্ত নাশক।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পটোল জন্মে। হাল্কা বেলে দোঁয়াশ মাটিতে পটোল চাষ ভাল হয়। সার—পগারের মাটি, চূণ ও ছাই মিশ্রিত গোয়ালের আবর্জ্জনা সার, পলিমাটি

কিম্বা বোন সুপার। ইহার যে কোন একটি পর্য্যাপ্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে পটলের ফলন বাড়ে। বিঘা প্রতি ৩০০ ঝোড়া পাঁক মাটি এবং ১ মণ শরিষার খৈল ছড়াইলে সর্ব্বোচ্চ ফলন হয়। পটলের আবাদ প্রণালী সম্বন্ধে অতঃপর সবিস্তারে আলোচনা আছে।

পটলের পাতার প্রত্যেক গ্রন্থী হইতে শিকড় বাহির হয়। ঐ সকল শিকড়ের অধিকাংশ আবার মৃত্তিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া গাছের বৃদ্ধি শাধন করে। এই জন্য ক্ষেতের প্রত্যেক পটিতে মূল খুব ঘণ বসান কর্ত্তব্য নহে। গাছ অত্যন্ত ঘণ জন্মিলে লতার উপর লতা চাপা পড়িয়া হাজিয়া যায়।

পটল ক্ষেতে কুটি দেওয়া—ইহার একটা প্রধান উদ্দেশ্য আছে। পটলের লতাগুলি মাটির উপর থাকিলে তাতে তাহারা জখম হইয়া পড়ে, কুটির উপর থাকিলে তত তাত লাগে না। পটল ফলিবার সময় বৃষ্টিকালে তাহাতে যদি কাদার ছিটা লাগে তাহা হইলে ছোট অবস্থায়ই লাল হইয়া যায়। ভালরূপ কুটি বিছান থাকিলে এ দোষ ঘটিতে পায় না। নদী চরে সুবিস্তৃত ক্ষেতে পটল চাষ করিলে কুটী বিছাইবার সুযোগ পাওয়া যায় না। তথায় পটল লতার এত বহুল বৃদ্ধি হয় যে প্রথম স্তরটি দামের মত মৃত্তিকা আচ্ছাদন করে তাহার উপর যে লতা গজাইয়া উঠে তাহাতে ফল ভাল হয়।

পটল জলদি ফলাইবার কৌশল—বর্ষার শেষ হইলেই কার্ত্তিক মাসেই পটল ক্ষেতে চষিয়া খুঁড়িয়া অতিরিক্ত মূল ফেলিয়া নূতন মাটি ও সার দিয়া ঠিক করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে অতি সত্বর পটল ফলিতে আরম্ভ হয়। জলাভাব হইলে জল সেক আবশ্যক। এই সময় কার্ত্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের প্রথমে পটল ফলাইতে পারিলে পটল এক টাকায় ⁄১ এক সের বিক্রয় হয়। বাঁশ কিম্বা কঞ্চির অনতি উচ্চ মাচায় পটল ফলাইলে বার মাস পটল পাওয়া যায়। সৌখীন লোকে আশ্বিনের মহা পূজার সময় পটল মিলিলে ২৲।২৷৷০ টাকা সের দরে কিনিয়া থাকেন। নদীর চরে জমিতে রস থাকে। তথায় তদ্বির করিলে অনায়াসে কার্ত্তিক মাসে সুবিস্তৃত ক্ষেতে পটল ফলান যায়।

যে জমিতে পটল চাষ হইবে তাহার চারি ধারে পগার কাটিলে মন্দ হয় না, কারণ জলের ধোয়াটে জমির সারাংশ যাহা কিছু উহাতে সঞ্চিত হইবে, উপযুক্ত সময়ে সেই পগারের সার মাটী তুলিয়া জমিতে ছড়াইলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইবে। নদীর চরে পটল ভাল হয়। বেলে দোঁয়াস মাটিতে একবৎসর অন্তর শুকনা পাঁকমাটি ছড়াইলে ফলন ভাল হয়। একই ক্ষেত্রে ৪ বৎসরের অধিক পটল ভাল জন্মায় না।

অনাচ্ছ খোলা ও সম্পূর্ণ রৌদ্র বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই পটল চাষ ভাল হয়। পটল গাছ বা পাতাকে পল্‌তা বলে। গাছ ও পাতা তিক্ত কিন্তু ফল সুমিষ্ট।

জমির সহিত সার মাটি উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। গোল আলুর ন্যায় পটলের ক্ষেতের জমিকে গভীর ভাবে কর্ষণ ও মাটী ধুলিবৎ করিতে হইবে। আশ্বিন হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে মৃত্তিকা সরস থাকিতে থাকিতে পটলের গেঁড় বা মূল রোপণ করিতে হয়। পটল গাছ অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে কিন্তু নিতান্ত নীরস ও শুষ্ক স্থানে ভাল হয় না। আবার অতি বৃষ্টিতে শীঘ্র মরিয়া যায়।

মূল রোপণ প্রণালী—পটলের স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় দুই প্রকার লতা হয়। উভয় জাতীয় লতাতে ফুল ফুটিতে দেখা যায় কিন্তু পুং জাতীয় লতায় ফল হয় না। দুই তিন বৎসরে পুরাতন মোটা মূল পুতিলে গাছ তেজস্কর হইয়া দাঁড়াইয়া যায়, পটল জন্মায় না, অতএব এক বৎসরের নূতন লতায় সরু সরু ছোট ছোট মূল বাছিয়া লইয়া ক্ষেত্রে পুতিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে যখন কেহ পুরাতন পঠলক্ষেত কর্ষণ করিতে থাকে, তখনই উক্ত রূপ সরু সরু স্ত্রী জাতীয় লতার ছোট ছোট মূল বাছিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। পরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ছয় ফিট অন্তর এক একটী ছোট ছোট মাদা প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক মাদায় চারি ফিট অন্তর দুই তিনটী হিসাবে মূল রোপণ করিয়া তাহার উপরে অল্প অল্প খড় কুটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়, ইহাতে অধিক রৌদ্রের উত্তাপে মূল বা গেঁড়ের মাথা গুলি শুকাইয়া যায় না। দীর্ঘ প্রস্থে রীতিমত জল নিকাশী পয়োনালী থাকা উচিত, কারণ জল বসিলে পটলের মূল পচিয়া যায়। মাদাগুলি সমতল জমি হইতে অন্ততঃ এক ফুট উচ্চ হওয়া উচিত।

ক্ষেত্রের পাট—কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ মাসের মধ্যে মূলগুলি নূতন ক্ষেত্রে নূতন শিকড় ফেলিয়া গাছগুলি কিঞ্চিৎ লতাইয়া না উঠিলে, ক্ষেতের মৃত্তিকা নাড়া চাড়া করিতে গেলে মূলের গাত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড়গুলি নাড়া পাইয়া অনেক গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অতএব কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া শীতকালে বারিপাত হইলে হাল্‌কা কোদালী দ্বারা মধ্যে মধ্যে কোপাইয়া ক্ষেত হইতে তৃণাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে মূলগুলিকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া আবশ্যক। গাছগুলি কিঞ্চিৎ বড় হইলে মাদা গুলিতে বাঁশ ইত্যাদির পুরাতন পাতা বিছাইয়া দিয়া দিয়া তদুপরি নাড়া খড় অথবা যে স্থানে যাহা সুপ্রাপ্য এরূপ তৃণাদি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে, ইহাতে অনেকগুলি লাভ আছে। প্রথম (১) গাছের গোড়া ঠাণ্ডা থাকে, (২) মাদায় ঘাস প্রায় জন্মায় না, (৩) গাছের আঁকড়াগুলি ঐ সমস্ত তৃণাদি অবলম্বন করিয়া লতাইয়া যাইবার সুবিধা পায়, (৪) বর্ষাকালে লতাগুলি মৃত্তিকা লিপ্ত হইয়া নষ্ট হইতে পারে না, (৫) কেয়ারীর জল সহজে নিকাশ হইয়া যায় অথচ মৃত্তিকা সরস থাকে

এবং তৃণ পত্রাদি পচিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। বঙ্গদেশে কোন কোন স্থানে জল সেচনের প্রথা প্রচলিত নাই, কিন্তু আজকাল অনাবৃষ্টি ও অসময়ে বৃষ্টি হেতু যেরূপ ঋতু বিপর্য্যয় ঘটিতেছে তাহাতে কলবল বা কুপ খননের দ্বারা জল সেচনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব পৌষ মাঘ মাসের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে দুই একবার চৌকা গুলিতে জল সেচন করিতে হইবে। ইহাতে শীঘ্রই গাছগুলি লতাইয়া ফল ধরিতে আরম্ভ করিবে। কৃষকের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, জলদি ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলে, বাজারে চড়া দরে বিক্রয় করিয়া, তাহারা উপরন্তু খরচা বাদে বেশ দু পয়সা লাভ করিতে পারে।

তিন চারি বৎসরের অধিক এক স্থানে পটল ভাল হয় না। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে, অন্য কোন নূতন ক্ষেত প্রস্তুত করিতে হয়। প্রতি বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে রীতিমত চাষ দিয়া পুরাতন লতা পাতা, পরিষ্কার করতঃ তৈল শস্য সারষা, রাই, শোরগুজা ইত্যাদি ষাণ্মাসিক একটী ফসল উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উক্ত ফসল অন্তে ক্ষেতে পুনরায় কিঞ্চিৎ পুরাতন পাঁক মাটী ছড়াইয়া ক্ষেতের শক্তি বৃদ্ধি করিলেই চলে।

বাঙ্গালা দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানা জাতীয় পটল জন্মিতে দেখা যায়। তাহার মধ্যে কাজলী, ধানি, মাকড়া ও পাটনাই পটলই উৎকৃষ্ট। পটলের জালি জন্মাইবার তারিখ হইতে ৫ দিন মধ্যে খাইবার উপযুক্ত হয় সুতরাং ৪।৫ দিন অন্তর ক্ষেত্র হইতে পটল তোলা উচিত নতুবা পাকিয়া যায়। অনেকে কিন্তু সখ করিয়া পাকা পটল খাইয়া থাকে। ক্ষেত্র হইতে পটল তুলিবারও একটী নিয়ম আছে, ক্ষেত্রের এক দিক হইতে ক্রমাগত সারিবদ্ধ প্রত্যেক মাদার গাছ হইতে পটল তুলিতে আরম্ভ করিয়া জমির শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত, তাহাতে কোন মাদা বাদ যায় না সুতরাং পটল তুলিতে বাদ পড়িয়া পাকিবার সম্ভাবনা থাকে না, নতুবা বিপর্য্যস্ত ভাবে পটল তুলিলে সকল গাছ হইতে পটল তুলিতে ভুল হইয়া যায়।

পটলের জন্য জমির অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্বোক্ত সার ব্যতীত খৈল সার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এক বিঘা জমিতে পটল চাষের জন্য পোনের সেরের অধিক মূলের আবশ্যক হয় না। মূল যত সরু হইবে তত কম মূল আবশ্যক হয়। স্ত্রী জাতীয় লতার মূলই রোপণ করিতে হয় কিন্তু তাহার সহিত পুংজাতীয় লতার মূলও কিছু পরিমাণ থাকা আবশ্যক; কারণ স্ত্রী পুষ্প ও পুং পুষ্প এই দুইয়ে সঙ্কর না হইলে পটল ভালরূপ জন্মিবে না। এইরূপ হইতে না পাইলে অনেক সময় পটলের ছনিগুলি বোঁটা হইতে খসিয়া পড়িয়া শুকাইয়া যায়।

এক বিঘা জমিতে পটল চাষের খরচঃ—

৪ বার লাঙ্গল দেওয়া	...	...	২॥০	টাকা।
মূল রোপণ ও মাদা প্রস্তুত	...	...	৩৲	,,
কোপান ও মাটি দেওয়া	...	...	৩৲	,,
জল সেচন	...	...	৩৲	,,
২ বার নিড়ানি	...	...	২॥০	,,
মূল খরিদ	...	...	৩৲	,,
জমির খাজনা	...	...	৩৲	,,
			২০৲	

এক বিঘা জমিতে পটল খুব কম ফলিলেও ২৫ মণ পটলের কম প্রায়ই হয় না এবং প্রতি বিঘায় ৫০ মণ পর্য্যন্ত পটল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পটল প্রায়ই ১॥০ টাকা মণের কম বিক্রয় হয় না এবং প্রথম যখন পটল উঠে তখন সহর নগরে বার আনা, এক টাকা সের বিক্রয় হয়। বাজারে নূতন জিনিষ অথচ আমদানী কম বলিয়া এত দর হয়, কিন্তু প্রচুর আমদানী হইতে আরম্ভ হইলেও বহুদিন ধরিয়া কলিকাতার বাজারে আট কিম্বা দশ পয়সা সের দর থাকে। এতদবস্থায় এক বিঘা পটল চাষ হইতে খরচ বাদে ৫০৲ কিম্বা ৬০ টাকা লাভ হওয়া কোনক্রমে বিচিত্র নহে।

ভারতীয় কৃষি-সমিতির গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে একবার একটি পনর কাঠা পরিমাণ জমিতে পটল করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে ৬০৲ টাকা মুনফা হইয়াছিল। ঐ জমির মৃত্তিকা দোয়াঁস, জমিটি বহুদিন পতিত ছিল সুতরাং গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থে সারবান, তার উপর পুষ্করিণীর পাঁক মাটি ছড়ান হইয়াছিল। পটল চাষের পূর্ব্বে ইহাতে বেগুন প্রচুর ফলিয়াছিল। বেগুন চাষ বর্ণনার সময় তাহার হিসাব দেওয়া যাইবে। এই দুইটি চাষ তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছিল।

পটল চাষের নূতন প্রণালী—বাঁশের কঞ্চির আড়াই বা তিন হাত উচ্চ এবং যথেচ্ছাভাবে লম্বা করিয়া 'ফেন্‌সিং' অর্থাৎ ঝাঁপের বেড়া প্রস্তুত করতঃ ক্ষেত্রের দীর্ঘ প্রস্থ ভাবে উভয়ের মধ্যে ৭ হাত ব্যবধান রাখিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে, যত সারি হইতে, পারে, বসাইয়া দিয়া তাহাদের মধ্যে মধ্যে একটি একটি 'পোষ্ট' অর্থাৎ খুঁটী পুতিয়া শক্ত করিয়া বেড়াগুলি বাঁধিয়া দিতে হয় এবং ঐ বেড়ার ধারে পূর্ব্বোক্ত ৫।৬ ফিট অন্তর মাদা করিয়া, যথারীতি গাছ লাগাইয়া বেড়ার দুই ধার হইতে পটল লতা উঠাইয়া দিলে, বার মাসই প্রায় সমান ভাবে পটল পাওয়া যায়। অধিকন্তু দুইটি বেড়ার অন্তর্গত তলস্থ ক্ষেত্রে মুখীকচু এবং ওল রোপণ করিয়া, কার্ত্তিক মাস মধ্যে, আরও দুইটা ভাল ফসল পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত পগারের সন্নিকট চারিপার্শ্বে বেড়ার

উপর, শাঁক-আলু, ঝুপী আলু, বরবটীর গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা কোন কোন স্থানে, বেড়া ও বরোজের উপর পটল গাছ উঠাইয়া দিয়া চতুরতার সহিত বারমাষ ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এ প্রণালী উচ্চ ও নিম্ন উভয় প্রকারের জমিতেই খাটিতে পারে। বিশেষতঃ নিম্ন ধরণের জমির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যে জমিতে বর্ষায় জল জমে তথায় এই প্রকারে পটল চাষের সুবিধা হয় না কিম্বা যাঁহারা ব্যবসায়ের জন্য এককালে আট দশ বিঘা জমিতে পটল চাষ করিবেন, তাঁহাদের এই প্রথায় চাষের সুবিধা হয় না। খুচরা চাষীগণের পক্ষে অথবা ঘর খরচের জন্য চাষের পক্ষে এরূপ মিশ্র চাষই লাভজনক।

পটল গাছের সঙ্গে আরও একটী স্থায়ী তরকারির গাছ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহার নাম ঘৃত কাঁকরোল। ঘৃত কাঁকরোল রন্ধন করিলে প্রকৃতই ঘৃতের ন্যায় গলিয়া যায়। এই গাছ পূর্ব্বাঞ্চলেই অধিক দেখা যায়। ঘৃত কাঁকরোলও পটলের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে বারমাস জন্মায়। ইহার গাত্রে ছোট ছোট নরম কাঁটা আছে। মূলে গাছ হয়, বীজেতে গাছ জন্মে না। এক স্থানে অনেক দিন জীবিত থাকিয়া ফল দান করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশের এক বিঘা জমিতে ২৫ হইতে ৪০ মণ পটল জন্মিয়া থাকে। নদীর চরে ফলন কিছু অধিক হয়। আমাদের গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বিঘা প্রতি ৫০ মণেরও অধিক পটল ফলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একটা বাগান তুলিয়া দিয়া পটলের ক্ষেত্র রচনা করা হইয়াছিল—জমি হাল্‌কা দোঁয়াস, তার উপর পাতা পচা সার পাইয়া আরও হাল্‌কা হইয়াছিল—পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক ব্যতীত অন্য কোন সার ব্যবহার করা হয় নাই।

পটল নূতন উঠিলেই খুব দরে বিক্রয় হয়, এমন কি এক টাকা পাঁচসিকা পর্য্যন্ত দর উঠে। যিনি যত শীঘ্র আমদানি করিতে পারেন, তিনি তত অধিক দর পান, কিন্তু এ দর অতি অল্প দিনের জন্য। গড়ে পটলের মণ দেড় টাকা কিম্বা এক টাকা বার আনা ধরিলেও পটল চাষে সুচাষীর ৪০৲ হইতে ৬০৲ টাকা খরচ বাদে লাভ হওয়া অসম্ভব নহে।



জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ সাল।

কৃষি ও শিল্পে বিজ্ঞানের প্রভাব

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও এমন কি আমাদের দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ব্যাপারে উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যে কতদূর আবশ্যক তাহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকতররূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যে সমুদয় জাতি বিজ্ঞান চর্চ্চায় এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য সমুহ ব্যবহারে প্রয়োগ করিতে উদাসীন ছিলেন বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ তাঁহাদিগের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছে। ইংলণ্ড আজকাল বিজ্ঞান অবহেলায় বিষময়ফল অতি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে বিলাতের অন্যতম বৈজ্ঞানিক পত্র 'Nature'এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে। ইংলণ্ডে একটি বিজ্ঞান সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে রাজ সরকার ও বিজ্ঞানের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে তৎসম্বন্ধে এই বিজ্ঞান সঙ্ঘ কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা, শ্রম শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রায় ২২০ জন প্রতিনিধি এই মন্তব্যে সাক্ষর করিয়াছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিজ্ঞানের সহিত রাজ সরকারের সম্বন্ধ একটি গুরুতর বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজ দেশে এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আমাদিগের শাসক সম্প্রদায় কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতুহল হইতে পারে। আমরা সেই জন্য এস্থলে মন্তব্যগুলির সারাংশ সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

স্থূলতঃ বিজ্ঞান সঙ্ঘ বলেন যে :—

(১) বিগত শতাব্দীর সভ্যজগতের এত ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান কারণই নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাদিতে বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রয়োগ।

(২) ইংরাজের মৌলিক গবেষণার শক্তি যদিও অন্যান্য জাতির সমকক্ষ এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণের কার্য্য দ্বারা যদিও তাহা প্রমাণিত হয় তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে এই শক্তি কোন ইংরাজ শিল্পের উন্নতিকল্পে এ পর্য্যন্ত নিযুক্ত হয় নাই।

(৩) জাতীয় উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে যেরূপ সহযোগীতা থাকা আবশ্যক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যেরূপ সুবিধা প্রদত্ত হওয়া প্রয়োজনীয়, রাজ সরকার সে সমুদয় সম্পাদন করিতে একেবারেই অবহেলা করিয়াছেন।

(৪) বর্ত্তমান জীবন যাত্রার অবস্থায় বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক প্রথা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার মুল ভিত্তি হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

(৫) সামান্য প্রাইমারি স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত শিক্ষাকার্য্যের ভার যাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত তাঁহারা বিজ্ঞানের অর্থ এবং প্রভাব অতি সামান্য মাত্রায়ই বুঝিয়া থাকেন। জীবন যাত্রায় লোকে যে সম্পূর্ণভাবে সজ্জিত হয় না ইহাই তাহার অন্যতম কারণ।

এই সমুদয় প্রত্যবায় নিরাকরণের জন্য বিজ্ঞান সঙ্ঘ একটি জাতীয় Statutory Board of Science and Industryর প্রতিষ্ঠান অনুমোদন করেন। সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকগণ এবং প্রভুত অভিজ্ঞতাশালী ব্যবসায়ীগণ উহার সদস্য হইবেন এবং নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধনই বোর্ডের অন্যতম কার্য্য হইবে :—

(১) বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মধ্যে সহযোগীতা স্থাপন।

(২) বিভিন্ন শিল্প নির্ম্মাতাগণের ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার সমুহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন।

(৩) রয়েল সোসাইটির, কেমিকেল সোসাইটির ও অপরাপর শিক্ষা ও ব্যবসায় বিষয়ক সভার যে সমুদয় যৌথ বৈজ্ঞানিক সমিতি আছে, তাহাদের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করণ ও পরিচালনার ভার গ্রহণ।

(৪) স্বভাবজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভারগ্রহণ এবং শিল্পও ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদ বিতরণ।

(৫) শিল্প ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ ; শিল্প বিষয়ক গুরুতর সমস্যাদির যথাসম্ভব সমাধানের ব্যবস্থা।

(৬) কতিপয় অবৈতনিক পরামর্শ দাতা সমিতি নিয়োগ। এইরূপ সমিতিতে সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণ থাকিবেন ও তাঁহাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবেন।

(৭) শিল্প প্রস্তুত কার্য্যে ও অন্যান্য দেশের সহিত ব্যবসার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রয়োগ।

(৮) সমস্ত জাতীয় শিল্প ও শিক্ষার এরূপভাবে গঠনের ব্যবস্থা করা যে কোন জাতীর বিপদের সময় অত্যল্প আয়াসেই উহাদের পূর্ণ সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে।

(৯) গবেষনায় উৎসাহ দান, যে স্থলে আবশ্যক বোধ হইবে সেরূপ স্থলে স্বভাবজ দ্রব্যের অনুরূপ কৃত্রিম দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান।

প্রধানতঃ এই কয়েকটি বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘের বিশেষ লক্ষ পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষা পদ্ধতি এই কয়েকটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলে ভবিষ্যতে শিল্প বানিজ্য বিষয়ক উন্নতি যে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

আমাদের দেশেও একটি Board of Scientific Advice আছে। ইহার সদস্যগণ বৎসরে একবার সম্মিলিত হন এবং বিগত বৎসরের কার্য্যাদি আলোচনা করেন ও তৎপর বৎসরের কার্য্যাদির ব্যবস্থা করেন। প্রধাণতঃ তিনটি কারণের জন্য এই বোর্ড দ্বারা দেশের তাদৃশ কোন উপকার হয় না—১ম, বোর্ডের দ্বারা যে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে অধিকাংশ স্থলেই তৎসমুদয়ের সহিত শিল্প নির্ম্মাতা ও ব্যবসায়ীগণের অতি সামান্যই সম্বন্ধ আছে। সুতরাং উহাদের আলোচনা আপাততঃ ফলদায়ী নহে, ২য়তঃ বোর্ডের সদস্যগণের মধ্যে ব্যবসায়ী সমাজের অভিজ্ঞ প্রতিনিধি না থাকায় তাঁহারা সাধারণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন না, ৩য়তঃ বোর্ডের অর্থ সাচ্ছল্য না থাকায় তাঁহারা কোন বিশেষ তথ্যের অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ এই বোর্ডটি আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের অপরাপর বিভাগের ন্যায় একটি বিভাগ হইয়া আছে মাত্র।

বর্ত্তমান কঠিন জীবণ সংগ্রামের দিনে—যখন সকল জাতিই আপনাপন ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—বিলাতের প্রস্তাবিত বোর্ডের ন্যায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ ও লোক বল প্রাপ্ত বোর্ড না হইলে কোন উন্নতি সমাধিত হইতে পারে না। আশা ছিল যে Industrial Commissionএর ফলে এইরূপ একটা ব্যবস্থা হইবে, কিন্তু তাহাও স্থগিত হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর পত্নী প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদেশের গ্রাম্য শিল্পাদির উন্নতি কল্পে সমিতিরও আজ কাল বড় একটা সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। দেশীয় শ্রম শিল্পাদি বিষয়ক সভা সমিতির মধ্যে Indian Industrial Association মৃত কল্প এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের সমিতির কার্য্যও নিতান্ত সীমাবদ্ধ। অন্য দিকে বর্ত্তমান মহাসমর অন্তে জীবনের সর্ব্ববিধ কার্য্যে প্রতিদ্বন্দীতা যে ঘোরতররূপে বাড়িয়া উঠিবে তৎসম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করেন না। কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দীতায় সফল কাম হইবার ব্যবস্থাও কিছু হইতেছে না। ইহাপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে। আমাদিগের উচিত যে আমরা এই সময় হইতেই বহু বিস্তৃত ভাবে বিজ্ঞান প্রচার আরম্ভ করি, দেশের আবাল বৃদ্ধকে বুঝাইয়া দিই- যে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা দীক্ষায় বাণিজ্য ব্যবসায়ে এমন কি সকল রকমেও বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কত এবং কিরূপে তাহার প্রভাবে জর্ম্মানিও জাপান জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিলাতে যে ভাবে বোর্ড স্থাপিত হইবার প্রস্তাবনা

হইতেছে সাধারণ শিক্ষার অভাবে এবং শিল্পের দৈন্যে এতদ্দেশে ঠিক সেইরূপ হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির নিশ্চয় যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও সর্ব্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রবর্ত্তণের জন্য একটা দেশব্যাপী সমবেত চেষ্টার এখন একটি লগ্ন আসিয়াছে যাহা বহিয়া গেলে আমাদিগকে পশ্চাতেই সরিয়া যাইতে হইবে এবং সমস্ত জাতীয় উন্নতির আশা কেবল স্বপ্ন মাত্রেই পরিণত হইবে।

জর্ম্মণীতে কৃষির উন্নতি

বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমর যে শুধু গোলাগুলি ও অস্ত্র শস্ত্রের যুদ্ধ নহে, ইহা যে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি সমূহের আপেক্ষিক বুদ্ধিমত্তা, মনুষ্যবল ও খাদ্য সংস্থান শক্তিরও অগ্নি পরীক্ষা তাহা সকলেই বুঝিয়াছেন। বস্তুতঃ জর্ম্মণী যদি তাঁহার বিশাল রণবাহিণী ও দেশস্থ জনগণের যথেষ্ট খাদ্য সংস্থান না করিতে পারিতেন তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বে সমরের অবসান হইত। চতুর্দ্দিকে শত্রু বেষ্টিত হইয়া এবং অন্য দেশ হইতে খাদ্য দ্রব্যের আমদানি হইতে বঞ্চিত হইয়া জর্ম্মাণী কিরূপে লোকজনকে আহার্য্য যোগাইতেছেন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিলাতে কৃষি বোর্ডের সভাপতি লর্ড মেলবোর্ণ অনেক চেষ্টা করেন; তাহার ফলে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে জর্ম্মণ কৃষির উন্নতিই এই রহস্যের মূল। এই বিষয়ে সাধারণকে বুঝাইবার জন্য সভাপতির অনুরোধের বোর্ডের সদস্য মিঃ মিডলটন একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই পুস্তিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে বিগত ৩০ হইতে ৪০ বৎসরে জর্ম্মাণ কৃষিকার্য্যে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইংরাজ কৃষকের উদ্দেশ্য ছিল জমি হইতে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে, খাদ্য উৎপাদন করা। যত দিন সেই আদর্শে কার্য্য হইত ততদিন পর্য্যন্ত ইংরাজ কৃষক, কৃষক কুলের অগ্রগণ্য ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বৃটিশ রাজ্য স্বয়ং খাদ্য উৎপাদন না করিয়া অন্যান্য দেশ হইতে তাহা আমদানি করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশে খাদ্য শস্য আর প্রধান ফসলরূপে পরিগণিত না হইয়া অন্যান্য ফসল ও পশুজননই কৃষির অন্যতম কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। চাষের হিসাবে এই সকল ফসলের চাষ উৎকৃষ্ট, পশ্বাদির জাতিও ভাল কিন্তু দেশ মধ্যে অন্নাভাব ইহাতে নিবারিত হয় না। সুতরাং এক আদর্শ পরিবর্ত্তনের ক্রমেই ইংরাজ কৃষক প্রথম শ্রেণী অধিকার করিয়াও কার্য্যতঃ বর্ত্তমান জাতীয় বিপদের সময় খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছেন। খাদ্যও উৎপাদন হিসাবে ইংলণ্ড ও জর্ম্মণীতে

যে কত তারতম্য তাহা মিডল্‌টন সাহেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্ন লিখিত কয়েকটি তথ্য হইতে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক ৩০০ বিঘা কর্ষিত জমিতে*—

(১) ইংরাজ কৃষক ৪৫ হইতে ৫০ ব্যক্তির আহার্য্য সংস্থান করে, সেই স্থলে জর্ম্মণ কৃষক৭০ হইতে ৭৫ জনের আহার্য্য উৎপাদন করে।

(২) ইংরাজ কৃষক ১৫ টন (১ টন=২৭½ মণ) গোধুম প্রভৃতি শস্য উৎপাদন করে, জর্ম্মণ কৃষকের উৎপাদনের হার ৩৩ টন।

(৩) আলুর উৎপাদনের হার বিলাতে ১১ টন, জর্ম্মণীতে ৫৫ টন।

(৪) মাংস উৎপাদনের মাত্রা বিলাতে ৪ টন, জর্ম্মণীতে ৪½ টন।

(৫) দুগ্ধ বিলাতে ১৭½ টন, জর্ম্মাণীতে ২৮ টন।

(৬) বিলাতের কৃষক প্রায় শর্করা উৎপাদন করে না, পক্ষান্তরে জর্ম্মণ কৃষক ২¾ টন শর্করা উৎপাদন করে।

বিগত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে জর্ম্মণিতে চাষের জমি তেমন কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই এবং কৃষক সংখ্যাও প্রায় সমান আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত তালিকায় যে অসাধারণ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জমি ও লোকের আধিক্য জনিত নহে। ইহার স্থলে কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রবর্ত্তন। সর্ব্ব স্থলে সমভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রযুক্ত হওয়ায় ফসল গুণে ও পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সুলক্ষণযুক্ত পশুপালের সৃষ্টি হইয়াছে ফসল ও পশ্বাদির মধ্যে রোগজনিত ক্ষয়ের মাত্রা কমিয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের প্রথার উন্নতি সাধিত হইয়া জনসাধারণ অধিক পারিমাণে ধন সঞ্চয়ে সমর্থ হইতেছে।

এই সমুদয় কৃষি সম্পদের প্রধান ভিত্তি অবশ্য শিক্ষা। জর্ম্মণীর ন্যায় কার্য্যকরী বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা বিরল। ইহার ফলেই এবং মৌলিক গবেষণাগার সমূহের সাহায্যেই জর্ম্মণী প্রভূত পরিমাণে কৃত্রিম সারের উৎপাদন করিয়া ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন; উপযুক্ত স্থান কাল ও পাত্র হিসাবে সার প্রয়োগে একই পরিমাণ জমি হইতে অন্য দেশ অপেক্ষা দ্বিগুণ ত্রিগুণ ফসল উৎপাদন করিতেছেন। জর্ম্মণীর কৃষি প্রসারের আরও উৎকর্ষতা এই বলিলেই যথেষ্ট প্রমাণ হইবে যে স্বভাবতঃ জর্ম্মণীর জল বায়ু ও মৃত্তিকা ফসল উৎপাদনের পক্ষে ইংলণ্ড হইতে অপকৃষ্ট।

কিন্তু বিগত ৪৫ বৎসরে জর্ম্মণী যে কৃষিকার্য্যে ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার আরও কতকগুলি কারণ আছে। ইংলণ্ডে অনেক জমিতে কেবল

* ১০০ একর বা ৩০০ বিঘা জমিতে কেবলমাত্র গধুম বা আলু চাষ হয় নাই। পশু খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল শস্য উৎপাদন হইয়াছিল এবং এই সংশ্রবে গোশালা ও মৎস্যের চাষ ছিল। ইহা Mixed Grass Furming বা মিশ্র চাষাবাদের একটি দৃষ্টান্ত।

মাত্র ঘাস উৎপাদিত হয়; প্রায় ⅓ অংশ কর্ষিত ভূমি ঘাস দ্বারা অধিকৃত, জর্ম্মণিতে ঘাসের জমির অনুপাত ⅙। জর্ম্মণীর জমির চাষী অধিকাংশ স্থলেই ভূস্বামীগণ, তাঁহারা নিজেরাই কৃষক; পক্ষান্তরে বিলাতের চাষীরা কেবল প্রজা মাত্র। অনেক পরিমাণে স্ত্রীলোকেরা কৃষিকার্য্যে সাহার্য্য করে বলিয়া জর্ম্মণিতে মজুরী কম পড়ে।

এতদ্ভিন্ন জর্ম্মণিতে কৃষি কার্য্যের উপর রাজার যথেষ্ট দৃষ্টি আছে। অনুকুল শুল্ক নীতি অবলম্বন করিয়া, সমবায় সমিতি সমূহের পৃষ্ঠপোষক হইয়া এবং কৃষি ঋণের সুব্যবস্থা করিয়া রাজা সর্ব্বতোভাবে কৃষির উন্নতির সহায়তা করিতেছেন এবং সেই জন্য প্রজারাও উত্তরোত্তর অধিকতর শস্য উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে। আবার উৎপাদিত ফসল যাহাতে উচিত মূল্যে বিক্রয় হয় তাহারও সম্যক ব্যবস্থা আছে। যতই ক্ষুদ্র কৃষক হউক না কেন সে সমবায় ও ঋণ দান সমিতি প্রভৃতির সাহায্যে মহার্ঘতম বাজারে তাহার পণ্য বিক্রয় করিতে পারে।

এই সমস্ত বিষয় বুঝিয়া বিলাতের কৃষি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ জনসাধারণকে বলিতেছেন যে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে সেই পুরাতন খাদ্য উৎপাদন আদর্শে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত। কিন্তু এখন সমাজ যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তণ বড় সহজ সাধ্য হইবে না। অন্য দিকে বর্ত্তমান মহাসমর ইংলণ্ডবাসীগণকে বিশদরূপে দেখাইয়া দিয়াছে যে খাদ্য উৎপাদন ভিন্ন দেশ রক্ষার উপায় নাই। এক্ষণে তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে জর্ম্মাণির কৃষি-নীতি হইতে জানিবার বিষয় অনেক আছে; তদপেক্ষা অধিক অধ্যয়ন যোগ্য সেই সুমহৎ বিশাল রাজ্য পরিচালন তন্ত্র যাহার বলে জর্ম্মণি অধুনা অরাতি বেষ্টিত হইয়াও স্বীয় দেশ মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্য উৎপাদন করিতেছেন। এই বিস্ময়কর রাজ্য তন্ত্রের তিনটি অংশ, শাসন বিষয়ক, শিক্ষা বিষয়ক এবং বাণিজ্য বিষয়ক। শাসনের ফলে জর্ম্মণির প্রজাবৃন্দ এরূপ সুগঠিত হইয়াছে যে তাহারা কর্ত্তৃপক্ষগণের উপদেশ সর্ব্বোতোভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকে। শিক্ষার বিষয় অধিক বলা বাহুল্য, কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানে জর্ম্মণের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিশ্ব বিখ্যাত। আর বাণিজ্য বিষয়ে এমন কি সর্ব্ববিষয়ে জর্ম্মণি এরূপ নিয়ম ও শৃঙ্খলার অবতারণা করিয়াছেন যে কি কৃষক, কি দালাল, কি মহাজন কেহই ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না অথচ কেহ কাহারও নিকট অত্যধিক পরিমাণে মুনাফা লইতে পারিবেন না। এই সমুদয় সময়োচিত ব্যবস্থার ফলে জর্ম্মণি আজকাল প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং শত্রু হইলেও তাঁহার নিকট শিক্ষণীয় বস্তু যে অনেক আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

"কৃষি সম্পদ" ও টাইফা—আমাদিগের সহযোগী বিগত বৎসরের "মাঘ ও ফাল্গুন" সংখ্যায় হোগ্‌লা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে কয়েকটি ভ্রম প্রমাদ সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

প্রথমতঃ লেখক কোন্ উদ্ভিদবেত্তার মতে Typha genus কে Graminae বর্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এতদিন ত ইহা Typhaceæ বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর টাইফার প্রথম উল্লিখিত জাতি T. Augustifolia নহে, T. Angustifolia (আঙ্গুষ্টিফোলিয়া)। রক্সবর্গের Flora Indica vi 567 দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ইহার বর্ত্তমান নাম T. Angustata (আঙ্গুষ্টাটা) Chaub & Bory হইয়াছে। হুকারের Flora of British India vi 489 এ তাহা দ্রষ্টব্য। আবার T. Minor and T. angustata দুইটি স্বতন্ত্র species কিম্বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষে একটি আর একটির রূপান্তর তৎসম্বন্ধেও মতভেদ আছে। টাইফার জর্ম্মনিতে ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখি নাই। মার্কিণের সাধারণ কাগজাদি হইতে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিতে যাওয়া যে সকল সময় নিরাপদ নহে তাহা অনেক ভুক্তভোগী অবগত আছেন। হোগলা "ভারতবর্ষের নানা স্থানেও যে অতি সুলভ তাহা সম্ভবতঃ কেহই অবগত নহেন" এরূপ অনুমান করার কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ যে সকল স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হোগলা জন্মিয়া থাকে সে সকল স্থানের লোক হোগলার নানাপ্রকার সদ্ব্যবহার করে। এমন কি হোগলা তন্তুও অজ্ঞাত দ্রব্য নহে; তবে অবশ্য তাহাকে পাটের প্রতিযোগীরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস এতদ্দেশে কখনও হয় নাই। যাহা হউক প্রবন্ধটিতে সাধারণের জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় আছে, কিন্তু এরূপ প্রবন্ধ যাহাতে উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র বিষয়ক ভ্রমশূন্য হয় তদ্বিষয়ে লেখক ও সম্পাদক উভয়েরই সতর্ক থাকা আবশ্যক।

পত্রাদি

মাছের পোনা—

শ্রীভূতনাথ সেপাই, কল্যানপুর, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন—গভর্ণমেণ্ট মৎস্য বিভাগ হইতে মাছের পোনা সাধারণকে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দাম ২৲ টাকা হাজার, অগ্রাম ১৲ টাকা জমা দিতে হইবে। পোনা কলিকাতা হইতে পাওয়া যাইবে। আমি দুই একটি পুষ্করিণী আবাদ করিতে চাই। মাছের পোনা ঐ স্থান হইতে লওয়া কি কর্ত্তব্য?

উত্তর—সবে মাত্র এই বৎসর সরকারী মৎস্য বিভাগ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ফলাফল কি দাঁড়াইবে বলা কঠিন। মাছের পোনার জন্য পুকুর আবাদ হইতে পায় না

এমন কোন দিন হয় নাই। বিস্তর পোনা ও ডিম দামোদর ও গঙ্গা হইতে পাওয়া যায়। কলিকাতার জেলিয়াগণ ইহার খুব ফাণাও ব্যবসা করে। তাহারা মাছ চেনে, ডিম চেনে। কোন্ পোনা বা ডিমে কিরূপ কাজ হইবে বলিয়া দিতে পারে। পোনা বা ডিম ভারে ভারে দূরে পৌছিয়া দিবার ব্যবস্থা করে। সরকারী মৎস্য বিভাগ এ কার্য্যের আর বিশেষ কি সুবিধা করিবেন আমরা বুঝিতেছি না এবং তাঁহাদের দান কম কিম্বা অধিক তাহাও বিবেচ্য এবং তাহারা কি ভাবিয়া এ কার্য্যে হাত দিয়াছেন তাহা আমরা ঠিক জ্ঞাত নহি। বাঙলায় মাছের অভাব হইয়াছে। কারণ মাছের পোনার অভাব নহে কিম্বা তাহা দুষ্প্রাপ্যও নহে, অভাব ঘটিয়াছে নদী, খাল, বিলের হীনাবস্থা হেতু; অনেক খাল বিল মজিয়া গিয়াছে, অনেকগুলি শুকাইয়াছে, নদীর জল কমিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট জলাশয় গুলির সংস্কার করুণ তাহাতে ফল দুইটি ১ম, স্বাস্থ্যোন্নতি, ২য় মাছবৃদ্ধি। একটু বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য এত কথা বলার আবশ্যক হইল। জলাশয়গুলির সংস্কার জন্য সরকারী সাহায্য প্রার্থী হওয়া আবশ্যক, মাছের পোনার অভাব নাই এবং তাহার জন্য রাজ সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

কাঁঠালের কলম—

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত, মালদা

প্রশ্ন—আপনারা কাঁঠাল গাছের কলম করিতেছেন। উপায় কি বলিয়া দিলে সকলেই চেষ্টা করিতে পারে। ইহা দ্বারা বিশেষ লাভ কি হইবে তাহাও জানিতে চাই।

উত্তর—আমের চারার সহিত যেমন আমাদের জোড় কলম হয় আমরা তেমনি কাঁঠাল বীজের চারার সহিত কাঁঠাল গাছের ডালে যোড় বাঁধিয়া কলম করা হইতেছে। পরীক্ষা ৩ বৎসর যাবৎ চলিতেছে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ফল এখনও বুঝা যাইতেছে না। ৩।৪ বৎসর না হইলে কাঁঠাল গাছের কাণ্ড শক্ত হয় না এবং ফুল হইলেও কাঁটালের মত বৃহৎ ফল ধারণের ক্ষমতা জন্মে না। বীজ নির্ব্বাচন ভাল হইলে এবং বীজের গাছের রিতিমত তদ্বির করিলে ৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ৫ বৎসরে কাঁঠাল গাছের ফল হইতে দেখা গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তেজস্কর জমি হইলে ৩।৪ বৎসরে ফল হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এত কচি গাছে অধিক ফল হয় না অথবা হইলেও রাখা উচিত নহে। কাঁটাল, আম, লিচু যে কোন ফল গাছে ৬ বৎসরের কমে উল্লেখযোগ্য ফল ধারণের মত আয়তন হয় না। এই সকল গাছ যত আয়তনে বাড়ে তত অধিক ফল প্রশব করে। ছোট গাছে ফল হইলে দেখিতে ও পরিচয় দিতে ভাল এইমাত্র। সুতরাং এই দিক দিয়া কাঁঠালের কলম করিবার কোন বিশেষ লাভ নাই। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে বীজের চারার গাছের ফল মাতৃ বৃক্ষের অনুরূপ হয় না, কলম করিলে সঠিক ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। বীজ হইতে সঠিক গাছ উৎপন্ন করিতে পারিলে কলম করা অপেক্ষা লাভ আছে।

চিনা বাদাম বসাইবার সময়—

শ্রীতারিণী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামপুর হাট, বীরভুম।

উত্তর—বর্ষার সময় আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র এই কয়মাস বাদ দিয়া সকল সময়েই মাট বাদামের চাষ করা যায়; কিন্তু আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে একবার এবং মাঘ ফাল্গুনে আর একবার এই সময়ই প্রশস্থ। কিন্তু জমি সরস না হইলে মাঘ ফাল্গুনের চাষে সুবিধা হয় না।

ধান ক্ষেতে সবুজ সার—

ডাঃ মিশ্র, পোঃ সাম্‌টা, বেঙ্গল।

১। প্রশ্ন—হৈমন্তিক ধানের ক্ষেতে কোন সময় সবুজ সার প্রয়োগ করিতে হয়।

উত্তর—হৈমন্তিক বা আমন ধানের চাষের জন্য বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে তলা (চারা উৎপাদনের জন্য বীজ বপন করার নাম সাধারণ গ্রাম্য ভাষায় তলা ফেলা বলে) ফেলিতে হয়। চারা তৈয়ারি হইলে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সেই চারা, যাহাকে বীজ বপন বলে ক্ষেতে রোপন করা হয়। সুতরাং আষাঢ় শ্রাবণের মধ্যে ক্ষেতে শণ ধঞ্চে বা পাটের চারা গুলি ১॥ হাত বা ২ হাত লম্বা হইলে তবেত চাষিবার উপযুক্ত হয়। সুতরাং বীজ তলায় ধানের তলা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে শণ ধঞ্চে প্রভৃতি বীজ বুনিতে হইবে।

২। উক্ত সার সম্বন্ধে আপনার অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য আপনি শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরি প্রণীত কৃষি রসায়ন পুস্তক দেখুন।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

——:*:——

ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা।

১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে ভারতবর্ষে ৫ বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তাহার ফলে ১০ লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়।

১৮২৬ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে ২ বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে ৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়।

১৮৫১ হইতে ১৮৭৫ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে ৬বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে ৫০ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

ইহার পর ১৮৭৬—৭৮ খৃষ্টাব্দে ১ কোটী, ১৩ লক্ষ, ২০ হাজার লোকের জীবন নষ্ট হয়।

৩ বৎসর ১,১৩,২০,০০০ লোকের মৃত্যু হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের হৃদয় কম্পিত হয়। সুতরাং দুর্ভিক্ষ দমনের উপায় উদ্ভাবন করা শ্রেয় মনে করেন।

দুর্ভিক্ষের কারণ নির্দ্ধারণ এবং পুনরাক্রমণ নিবারণ মানসে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৮ সালে দুর্ভিক্ষ কমিসন বসাইয়াছিলেন। কমিশনরগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কৃষি-বিভাগ স্থাপন করিতে গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেন। তাঁহারা স্পষ্ট বলেন যে কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী ভারতবর্ষীয় লোকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত হইবে। ইহার ফলে ভারতবর্ষীয় কয়েকজন শিক্ষিত যুবককে কৃষিশিক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক কৃষিবিভাগসমূহ স্থাপিত হয়। প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগের কর্ত্তা একজন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তাঁহার পদের নাম কৃষি-ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর। তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ সেন তৎপরে স্বর্গীয় সখায়েৎ হোসেন, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। তৎকালে কৃষি-বিভাগ বঙ্গদেশে ৫০ বা ৬০ হাজারের অধিক টাকা খরচ হইত না। সহকারীগণ কৃষি উন্নতিকল্পে অতি যৎসামান্য টাকা পাইতেন। তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আর কোন নিম্নস্থ কর্ম্মচারী ছিল না।

সুতরাং প্রজাদের মধ্যে কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানে তাঁহারা বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা শিবপুর ও বর্দ্ধমানে সামান্য রকমের কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া কিছু কিছু কৃষিতত্ত্বানুসন্ধান করিতেন।

কৃষি-কমিশন স্থাপনের পর ১৮৮৪ সালে ৭॥০ লক্ষ, ১৮৮৮—৮৯ সালে ১৫ লক্ষ, ১৮৯১ সালে ৪ লক্ষ ২০ হাজার, ১৮৯২ সালে ১২ লক্ষ, ১৮৯৫ সালে ১২ লক্ষ, ১৮৯৬ সালে ১৮ লক্ষ, ১৮৯৭ সালে ২৬॥ লক্ষ, ১৮৯৯—১৯০০ সালে ২৫ লক্ষ, ১৯০১ সালে ৭॥ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। লর্ড কর্জ্জন এই ভীষণ মৃত্যুসংবাদে চমকিত হন।

তিনি কৃষির উন্নতিকল্পে অনেকটা মনোযোগী হন। আশা করা গিয়াছিল যে এইবার কৃষি উন্নতির যথেষ্ট ব্যবস্থা হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষিবিভাগে "ইম্পিরিয়াল" নামক উচ্চ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। বলাবাহুল্য যে ভারতবাসীর ইহাতে স্থান হইল না। কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিলেন যে ভারতবাসীগণ শাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষম। ইম্পিরিয়াল কর্ম্মচারীগণ এই ১২ বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বিশেষ কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালী সহকারীগণ যে দুই একটী পরীক্ষালব্ধ ফল প্রকাশ করিয়াছিলেন এখনও আমরা তাহাই শুনি। প্রজাদের মধ্যে এই ফল প্রচারের যথেষ্ট ব্যবস্থা এখনও হইতেছে না। পরন্তু ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ প্রজাদের সহিত মিশিতে পারেন না। এদেশের কৃষকদের ভাষা, তাহাদের সংস্কার, তাহাদের কৃষিজ্ঞান কত এই সব প্রয়োজনীয় বিষয়ও তাঁহারা জানেন না। এমতাবস্থায় প্রজাদের কৃষি উন্নতিকল্পে ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ কোন ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অন্যপক্ষে তাহারা তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন কাজ করাও লজ্জাজনক বলিয়া মনে করেন। বলা বাহুল্য যে এই সব কারণে তাঁহাদের সহিত দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের সদ্ভাব হয় না প্রজাদিগের উন্নতি করিতে হইলে বাস্তবিক দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের উপর সম্পূর্ণ ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সার্ভিস কমিশনের মেম্বরগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে কৃষিবিভাগ সমূহ দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের হস্তেই দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যে অবিলম্বে শতকরা ৫০ জন দেশীয় লোকদিগকে উচ্চ পদে উন্নীত বা নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে বহুসংখ্যক বহুদর্শী কর্ম্মচারী কৃষিবিভাগে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগকে ডেপুটী ডাইরেক্টরের কায দিলে তাঁহারা সুচারুরূপে কৃষিবিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।—ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের মতামত গ্রহণ করিতেছেন। যদি কমিশনের অনুরোধ উপেক্ষা করা হয় তবে ভারতবাসীদিগের ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। সত্যপ্রিয় পুনা কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ম্যান্, সার্ভিস্ কমিশনে সাক্ষীদিবার সময়ে বলিয়াছিলেন যে কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারিগণ প্রজাদের সহিত আপনার লোকের মত হইয়া না মিশিতে পারিলে কৃষিবিভাগ দ্বারা কোন উপকারই হইবে না। এই কাজের জন্য বিদেশী ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ম্যান্ সাহেব মহৎ ও সাধু ব্যক্তি। তাহা না হইলে এমন স্পষ্ট কথা আমরা শুনিতে পাইতাম না। অন্যান্য ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ সাক্ষী দিয়াছিলেন যে ভারতবাসীরা কখনও শাসন করিবার ক্ষমতা রাখে না সুতরাং ইম্পিরিয়াল নামক উচ্চপদ ইংরেজের

জন্যই রাখিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট কমিশনের অনুরোধ কতটা রক্ষা করেন জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। আমরা শুনিতেছি যে "ইম্পিরিয়ালের" ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ, যাহাতে ভারতীয়গণ তাঁহাদের পদ না পাইতে পারে তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। সকল বিভাগেই "ইম্পিরিয়াল", "প্রভিন্সিয়াল" ও "সাবর্ডিনেট" নামক কর্ম্মচারীর শ্রেণী বিভাগ করাতে উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের মাথা বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের এই জাতিভেদ দূর না হইলে দেশের মঙ্গল হইবে না।

সঞ্জীবনী।

পোকার উপদ্রব

ধানের শুক্‌না রোগ—২৪ পরগণা হুগলী, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে ধানে এক প্রকার রোগ দেখা যায়। ধান গাছগুলি অকস্মাৎ শুখাইয়া যায়। কারণ এখনও নির্ণয় হয় নাই। ঐ সব ধান পরীক্ষা করিয়া উহাতে কোন পোকা আক্রমণ কিম্বা উদ্ভিদাণু রোগের লক্ষণ দেখা যায় নাই। গভর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগ হইতে ইহার অনুসন্ধান করা হইতেছে।

পাটে ঘোঁড়া পোকা—বর্ত্তমান বর্ষেও হুগলী, হাওড়া ২৪ পরগণায় পাটে ঘোঁড়া পোকা লাগিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। চাষীগণ পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে বোধ হয় এত ক্ষতি করিতে পারিত না।

মটর সীমে পোকা—এবার ২৪ পরগণায় মটর সীমের ফলন বেশ ভাল রকমই হইয়াছে। কিন্তু শেষ সময়ে দুই চারি দিন মেঘ বৃষ্টি হওয়ায় নাবী ফসলের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছে।

আমরা চাষীগণকে ঘোঁড়া পোকার ও মটর সীমের পোকার জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। "ফসলের পোকা" নামক পুস্তকে ইহার বিশেষ বর্ণনা আছে। ফসলে শত্রুর হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে তাহাদের বিষয় বিশেষ খোঁজ রাখা আবশ্যক।

আমের ভোঁ পোকার প্রতিকার—আমের ভোঁ পোকা নিবারণের জন্য শীতকালে গাছের ছালে কেরোসিন্ তৈল মাখান এবং গোড়ার চারিদিকের মাটি কোপাইয়া উলট পালট্ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ পরীক্ষা ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। ২।৩ বৎসরের পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে এরূপ করিলে আমে ভোঁ পোকার সংখ্যা ক্রমেই কমে। অতএব আশা করা যায় ৫।৭ বৎসর এরূপ করিতে পারিলে ঐ সব গাছ হইতে পোকা নির্ম্মূল করা যাইতে পারে। আম ফুরাইলে আমের পোকা, হয় মাটীতে না হয় গাছের ছালে বসিয়া ৮।৯ মাস কাটায় এবং আমের দিনে ছোট আমের উপর ডিম পাড়ে কাজেই শীতকালে গাছের ছালে কেরোসিন্ মাখাইলে এবং চারিদিকে মাটী কোপাইয়া উলট্ পালট্ করিলে অনেক পোকা মরিবার কথা। ঢাকা সরকারী কৃষিক্ষেত্রের আমের ভোঁ পোকাসম্বন্ধে যাহা দেখা গিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় সকল গাছের আমেই এই পোকা দেখা যাইত কিন্তু আজকাল

অধিকাংশ গাছের আমেই পোকা হয় না। কৃষিক্ষেত্র হওয়ার পর হইতেই বাগানগুলি পরিষ্কার করা হইতেছে এবং ঐ জমিতে মধ্যে মধ্যে লাঙ্গল দেওয়া হয়। অতএব ইহাই পোকা কমিবার কারণ বলিয়া মনে হয়। এক কাজ করিলেও পোকা কমান যাইতে পারে। আম কাঁচা থাকিতেই (অর্থাৎ পোকা ছিদ্র করিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই পাড়িয়া খাইবে। আম কাটিলে ভিতরে যে সাদা কীড়া ও পুত্তলি পাওয়া যাইবে তাহা নষ্ট করিবে। এরূপ করিলে অগামী বৎসর পোকা হইবার বেশী সম্ভাবনা থাকিবে না।

খাদ্যের মুল্য বৃদ্ধি সুতরাং অপচয় নিবারণ আবশ্যক—খাদ্যের দাম দুই তিন গুণ বাড়িয়াছে অথচ লোকের আয় কমিতেছে। মজুরদের দৈনিক মজুরী সেই হিসাবে বাড়ে নাই। তাই তাহাদের এত দুরবস্থা। ধান চালের মুল্য বাড়িবার একটি প্রধান কারণ নির্দ্দেশিত হয়, সেটি এই—দেশ হইতে অত্যধিক শস্য রপ্তানি। খাবার দ্রব্যগুলি আমাদের দেশ হইতে যায়, আর তার পরিবর্ত্তে আমরা খোস পোষাকের দ্রব্য বাহির হইতে ক্রয় করি। তাতে ত লোকের প্রাণ বাঁচে না, তাই অনাহারে এত লোক মারা যায়।

সংসারের খরচ কমান ব্যতীত উপায় নাই—এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। সেটি আমাদের রান্না বাড়া ও খাওয়া দাওয়ার বিলিব্যবস্থার কথা। খাদ্যের মালমসলা হইতেও খাদ্যের পাক ও খাইবার ব্যবস্থা বেশী আবশ্যক। গুরুপাক দ্রব্যও রাঁধিবার ও খাইবার গুণে সহজে হজম হইয়া যায়। আবার অতি উত্তম সামগ্রীও রাঁধিবার ও খাইবার দোষে হজমের ব্যাঘাত করে। এই সম্বন্ধে এই দুটি কথা জানা উচিত। প্রথম যত অল্প খাওয়া যায় ও ধীরে সুস্থে চিবাইয়া খাওয়া যায় তত শীঘ্র খাদ্য হজম হয়। খাদ্য দ্রব্য শুকনা শুকনা খাইলে সহজে হজম হয় আহারের সহিত বেশী তরল পাতলা জিনিষ খাইলে বা জল পান করিলে হজম হইতে দেরী লাগে ও উৎপাত হয়। প্রাণিজ খাদ্য যথা—মাছ মাংস ডিম দুধ ইত্যাদি—রাঁধিতে হইলে—অল্প আঁচে রাঁধাই ভাল, বেশী ফুটিতে দেওয়া উচিত নয়। উদ্ভিজ্জ খাদ্য যথা চাল ডাল তরিতরকারীগুলি অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুটাইলে তবে সুসিদ্ধ ও সুপাচ্য হয়। প্রথম উক্ত খাদ্যগুলি যথা মাছ মাংস ডিম দুধ ইত্যাদি—খুব সহজে ও অতি শীঘ্রই হজম হয়। বাড়িবার বয়সে এইগুলির বড়ই আবশ্যক ও উপকারিতা। ইহাতে দেহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয় ও শরীর বেশ বাড়ে। মধ্য জীবনেও এগুলির বড় আবশ্যক। বৃদ্ধ বয়সে এগুলি তত উপযোগী নয়।

আমরা অর্দ্ধেকেরও কম খরচে সংসার চালাইতে পারি। আমাদের প্রধান খাদ্য চাল—তা খোসা ছাড়াইয়া তৈয়ারী করিতে, কুটিয়া সাফ করিতে ও সিদ্ধ করিয়া ফেন ফেলিয়া আহার করিতে আমরা তার অর্দ্ধেক সারাংশ ফেলিয়া দিই। জলে সিদ্ধ করিয়া খোসা ছাড়াইতে অষ্টম অংশ সার চলিয়া যায়। পরে কুটিয়া খুদগুলি ফেলিয়া দিলে সারের আর চতুর্থাংশ চলিয়া যায়। এইগুলিই চালের সর্ব্বাপেক্ষা সারাংশ। পরে ভাত রাধিয়া ফেনটি ফেলিয়া দিলে আর অষ্টম অংশ সার চলিয়া যায়। এই মোটে অর্দ্ধেক সারাংস হইল। ঘরে ঘরে প্রতিদিন প্রতি বেলা দরিদ্র জাতির এমন অপচয়ের কথা শুনিলেও গা শিহরিয়া উঠে। বিজ্ঞানের প্রভাবে আজকাল সভ্য জগতে এরূপ অপচয় বারণ হইয়াছে। হোটেলে হাঁসপাতালে ও সে দেশের ঘরে ঘরে তাঁহারা এমন এমন বৈজ্ঞানিক প্রথায় আজকাল রাধেন যে কোনও ব্যবহার্য্য অংশই সংসারের নষ্ট হয়

না। চালগুলি না ফুটাইয়া গরম করিয়া খোসা ছাড়ান হয় ও তাদের কুটিয়া পরিষ্কার করা হয় না, ও রাঁধিবার সময় হয় বাষ্প সংযোগে রাঁধা হয়, বা জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ফেনটি অন্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশান হয়। এইরূপে এক কণাও নষ্ট হয় না।

কাঠ কয়লার অপচয়—তা ছাড়া কাঠ কয়লা অপচয়ের কথার ত উল্লেখ আবশ্যক নাই। যে কয়লা গৃহস্থের ঘরে নিত্য খরচ হয় তার চার ভাগের এক ভাগে গৃহস্থের দৈনিক রান্না চলে। আমাদের পুরাণ প্রথাদুষ্ট ঘরে পদে পদে অপচয়। কয়লা ধরাইবার সময় যে রাশিকৃত ধোঁয়া উড়িয়া যায় সেগুলি সব অপচয় হয়। ওই কয়লার অণুগুলি হইতে ও গরম ধোঁয়া হইতে জমাইয়া কত উত্তাপ পাওয়া যায়। ভাল ভাল কল কারখানার এইরূপে তাপ বাঁচাইয়া কত কত কয়লার খরচ কমায়। তাইতেই ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে তাদের এত প্রাধান্য। যে অনবরত অপচয় করে তাকে রসাতলে যাইতেই হইবে। যার যে বিষয়ে দৃষ্টি আছে তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের ঘরে চিরকাল ধরিয়া এই অপচয় হইয়া আসিতেছে। অথচ বাহিরের লোকের উদাহরণ দেখিয়া শিক্ষিত চিরাভ্যস্ত প্রথা বদলান বারণ ছিল। এইরূপে দুই চোখ বন্ধ করিয়া আমরা এই বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। আমাদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ এরূপ অবস্থায় অন্য কে বারণ করিতে পারে ?

ডাঃ শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা শীতের শসা, লাউ; বিলাতী বেগুন পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জল্‌দি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আলা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যূঁই বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন—ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়; কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানা প্রকার লেবু গাছের কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এই প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বা মোথা (শীষ) বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াইবার এই সময়, কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত, এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ, যথা শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তর মত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্রে—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড়ই ব্যস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণ বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয় কিন্তু সেখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এখন সব্জী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। ফলের বাগানের আগাছা কুগাছাগুলি উপড়াইয়া তুলিয়া দিলে ভাল হয়। আগাছাগুলির বীজ পাকিয়া মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাদের বিনাশ করিতে পারিলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপিচারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কক্কোম্ব, কেপ গাঁদা, গোলাপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৮শ খণ্ড। | আষাঢ়, ১৩২৪ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

বাঙলার কয়েকটি প্রধান ধান

——:*:——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাবণশালি—এক প্রকার আমন ধান। মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানে ইহার চাষ হয়। শালি* জমি ইহার আবাদের পক্ষে উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ফেলা হয়, আষাঢ় শ্রাবণে রোপণ করা হয় এবং পৌষ মাসে ধান কাটা হয়।

উড়িষ্যা অঞ্চলে রাবণ নামে এক প্রকার লম্বা ডাঁটা ধান আছে, যাহা ৫।৬ হাত জলে জন্মিতে পারে। ধান মোটা। বুনানী করিয়া ইহার চাষ হয়। বিল জমিই ইহার চাষের উপযুক্ত। বৈশাখ হইতে ইহার বপন কার্য্য আরম্ভ হয় এবং আষাঢ় পর্য্যন্ত চলিতে থাকে এবং অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ধান কাটা সমাপ্ত হয়। রাবণ নামে কটকে মোটা বোরো ধান আছে। বিল জমিতে ৫।৬ হাত জলে জন্মিতে পারে। চাউল মোটা ও দুষ্পাচ্য।

রাঁধুনী পাগল—ইহার চাউল হইতে রন্ধনকালে সুগন্ধ বাহির হয় এবং রাঁধুনীকে গন্ধে মাতাইয়া তোলে। ইহা আমন জাতীয় ধান। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমানে ইহার চাষ হয়। ২৪ পরগণায়ও ইহার চাষ হইতেছে। এই সকল স্থানে শালি জমিতে ইহার আবাদ হয় এবং ইহার চাষ কারকিং রোয়া ধানের মত করা হয়।

* শালি জমি—যাহাতে বর্ষাকালে জল জমে এবং কেবল ধান ভিন্ন অন্য কিছু ফসল জন্মে না। সুনাজমি যাহাতে আউশ ধান ও অন্যান্য ফসল জন্মিতে পারে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমি।

মেদিনীপুরে কিন্তু ইহার বুনন হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বোনা হয়, অগ্রহায়ণ পৌষে ধান কাটা হয়। বালেশ্বরেও ঐ নামে ধান আছে এবং তাহা বাঙলার রাঁধুনী পাগলের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়।

রাই মুখী—মৈমনসিংহের আমন ধান। ইহার প্রধানতঃ বুনানী হয় কখন বা রোপণ করা হইয়া থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বুনন হয়। ইহা উচ্চ ধরণের অপেক্ষাকৃত নিরস জমিতে ভালরূপে জন্মিয়া থাকে।

রাজভোগ—ইহা বাখরগঞ্জের ধান, রঙপুরে ইহার চাষ আছে। ইহা রোপা ধান। ২৪ পরগণায়ও রাজভোগ ধান আছে। এখানে ইহার বুনন হয় এবং এতদুভয় ধানের আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু কিছু পার্থক্যও দৃষ্ট হয়।

রাজিপাল—ইহাও বাখরগঞ্জ, মৈমনসিংহের আমন ধান। বুনন করিয়া চাষ হয়। বগুড়া ও পাবনাতেও ইহার আবাদ আছে, সর্ব্বত্রই বুনন হয়।

রামশাল—ইহা আমন ধান, বুনন করিয়া ইহার চাষ হয়। কোথাও বা রোপা ধানের মত ইহার আবাদ হইয়া থাকে—যেমন সাহাবাদে হয়। বাঙলাদেশে, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণায় ইহার চাষ আছে। ২৪ পরগণায় ইহাকে পাটনাই শ্রেণীর মধ্যে ফেলা হয়। পাটনাইয়ের মত ইহার চাউল হয়, অপেক্ষাকৃত একটু মোটা। রোপার মত আবাদ করিলে ধান কিছু মিহি হয়। সতেজ জমি হইলে ২৪ পরগণায় বিঘাতে ৮ মণ, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় ১০ মন পর্য্যন্ত ফলে।

রাঙ্গি—ইহা ২৪ পরগণার একটি মোটা ধান। মুর্শিদাবাদ, বাখরগঞ্জ, ভাগলপুর ইহার রোপণ ধানের মত আবাদ হয়। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহার বুনন হয়। ধানের রঙ লাল বলিয়া ইহার রাঙ্গি নাম হইয়াছে।

রূপশাল—মেদিনীপুরের ইহা রোপা ধান। ২৪ পরগণায় সুন্দরবন বিভাগে ইহার আবাদ হইতেছে। ইহাও পাটনাই শ্রেণীভুক্ত।

শাইল—সিলেট, কাছাড়ে এই নামে আমন ধান আছে। নদীয়া ও নোয়াখালিতে ইহার আউসের মত আবাদ হয়। রাজসাহী, জলপাইগুড়িতে আমনের মত চাষ হয়। দিনাজপুরে ইহা ভাদুই ধান। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে সাধারণতঃ হৈমন্তিক যে কোন ধানকে শাইল বা শালি ধান বলে।

সমুদ্রবালি—ইহা বিহারের মিহি ধান। ডুমরাঁও, কটক, শিবপুর গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে ইহার বহুবার পরীক্ষা হইয়াছে। চাউল খুব মিহি হয়। ফলন বিঘা প্রতি ৪ কিম্বা ৫ মণের অধিক হয় না। বীরভূমে ইহার আবাদ সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

সমুদ্রফেনা—ফরিদপুরের বুনন ধান। নিম্নজমিতে ইহার চাষ হয়। ধান মোটা। বগুড়াতে আউসের মত ইহার আবাদ হয়।

ষাটী বা ষষ্টী—৬০ দিনে পাকে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। বাঙলা ও ভাগলপুরে ইহার আউসের মত চাষ হয়। ধান মোটা। সারণ চম্পারণে এবং কাণপুর প্রভৃতি স্থানে ইহার ভাদুই ফসলের সঙ্গে আবাদ হয়।

সীতাভোগ—হাজারিবাগে ইহার চাষ সমধিক। লোহার ডগায় ইহার দোন জমিতে আবাদ হয়। ঐ সকল স্থান হইতে ইহা বাঙলায় আসিয়াছে। তথায় বিল জমিতে চাষ হয়। গাছ খুব লম্বা হয়। বাখরগঞ্জে ঐ নামে ছোট গাছ হয় এবং সাধারণ শালি জমিতে জন্মায় এমন ধান আছে। প্রথমটি মোটা, শেষোক্তটি অপেক্ষাকৃত মিহি।

সিঁদুর কৌটা—রঙপুর ও দিনাজপুরের আমন ধান। ইহা রোপণ করা হয়। দার্জ্জিলিঙ তরাই প্রদেশে ইহার চাষ আছে। তথায় ইহার ধান অধিক মোটা হয় এবং সেখানে ইহার বুনন হইয়া থাকে। দিনাজপুরে জলাজমিতে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। অনেকে বলে যে প্রকৃত সিঁদুর কৌটা ধান ফরিদপুরেই জন্মিয়া থাকে।

সোনামুখী—ইহা চট্টগ্রাম, ঢাকা মুর্শিদাবাদের ধান। নোয়াখালিতেও ইহার চাষ আছে।

সুরী ধান—চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই নামের ধান আছে।

সূর্য্যমণী—যশোহর ও নদীয়া জেলায় জন্মায়।

সুর্ম্মো ও সূর্য্য জটে—এই দুইটি মালদহের ধান। গোড়ায় খুব কম জল থাকিলে জন্মিয়া থাকে। ইহার খুব জলদি বুনন হয় এবং কার্ত্তিক মাসেই ধান কাটা চলে।

সুধাভোগ—বর্দ্ধমানের ধান; চাউল খুব মিহি। ফলন বিঘা প্রতি ৫ মণের অধিক নহে। অল্পজলে হয়। এখান হইতে বোম্বাই প্রদেশ ও কটকে ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কটক গভর্ণমেণ্ট কৃষি ক্ষেত্রে ইহার বারম্বার পরীক্ষা হইয়াছে।

সুখদাস—কখন কখন এই নামের মিহি চাউল কলিকাতার বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কাশ্মিরের ধান। ইহা হইতে শাদা সরু চাউল উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবে ইহার চাষ অধিক। পাটনাতেও ইহার চাষ বিস্তার হইয়াছে। এখানে ইহার রোপা ধানের মত চাষ হইয়া থাকে।

সুন্দরশাল—ইহা মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার আমন ধান। ইহা বোনা

ধান। ২৪ পরগণায় স্থন্দরবন বিভাগে নিম্ন জমিতে ইহার আবাদ হয়। ধানের ফলন জমি ভাল হইলে বিঘা প্রতি ১০ মণেরও অধিক হইয়া থাকে। এই ধান ৪।৫ ফিট জলেও জন্মিতে পারে।

সূর্য্যমণী ও সূর্য্যমুখী—নদীয়া ও বাখরগঞ্জের আউস ধান। বগুড়াতে আমনের মত চাষ করা হয়। ইহার বুনন ভিন্ন রোপণ হয় না। পূর্ণিয়া জেলার ইহা অঘানি ধান। তথায় ইহার রোপণ হয়। পূর্ণিয়ার সূর্য্যমুখী ও সূর্য্যমণী ধান খুব মিহি। শ্যামলাল, শ্যামরাজ, শ্যামরাস, রঙপুরে এই ধানগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি সবই রোপা ধান।

শ্যামরথ—কুচবিহারের রোপা ধান। শ্যামরাস ধানের চাষ কুচবিহারেও দেখিতে পাওয়া যায়।

গোলাপের চাষ

শ্রীশশী ভূষণ মুখোপাধ্যায় (Garden Supdt. I. G. A.) লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা গোলাপ গাছ ছাঁটিবার কথা বলিতে ছিলাম। লতানিয়া গোলাপ গাছ ছাঁটার বিশেষত্ব আছে। লতা গোলাপ কখন গোড়া ঘেঁসিয়া ছাটিবার আবশ্যক হয় না; ইহার মরা বা আধমরা ডাল গুলি যত্ন পূর্ব্বক বাদ দিতে হয় মাত্র এবং প্রতি বৎসরই কতকগুলি পুরাতন ডাল কাটিয়া না ফেলিলে গাছে ফুল অধিক হয় না। প্রতি বৎসরই গোলাপ গাছের নূতন শাখা নির্গত হয়। সরু পুরাতন ডাল হইতে ভাল সতেজ ডাল নির্গত হয় না এবং রোগা ডালের ফুল বড় ভাল ও অধিক হয় না; এই কারণে সতেজ শাখা নির্গমনের স্থবিধার জন্য কতিপয় রোগা পুরাতন ডাল ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়। লতা গোলাপ ছাঁটিয়া ছোট করিবার বা মনোমত আকৃতি করিবার আবশ্যক হইলে চৈত্র বৈশাখে ছাঁটিতে হইবে নতুবা সাধারণতঃ ছাঁটিবার সময় ভাদ্র, আশ্বিন, অন্য গোলাপের ন্যায় কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না।

লতা কিম্বা লতা জাতীয় গোলাপ ছাঁটিয়া অধিক ডাল বাদ দিলে গাছের ফুলের সংখ্যা কম হয়। লতা জাতীয় গোলাপের সতেজ পুরাতন ডাল হইতে যে সকল প্রশাখা নির্গত হয় তাহাতেই ফুল অধিক ও ভাল হয়। Tea Rambler, Crimson Rambler ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

যাহারা গোলাপ লইয়া অধিক নাড়া চাড়া করেন তাঁহারা গোলাপ গাছ ছাটার আর একটা এই বিশেষ সন্ধান বলিয়া দেন যে, যে গোলাপগুলির বৃদ্ধি কম তাহাদিগকে অধিক ছাটিবার আবশ্যক হয়। যে সকল গোলাপের বৃদ্ধি বেশী এবং যাহাদের সতেজ ডাল পালা নির্গত হয়, তাহাদিগকে কিছু কম ছাটিলে চলে। অত্যন্ত বৃদ্ধি শীল গোলাপ গুলিকে আরও কম ছাটিবার আবশ্যক হয়। লতা জাতীয় গোলাপ গুলিকে ও টী ও নয়সেটের সাঙ্কর্য্যে উৎপন্ন গোলাপ সকলকে অতি বৃদ্ধি শীল গোলাপের শ্রেণীতে ফেলা যায়।

গোলাপ গাছ ছাটিবার সাধারণতঃ একটা সঙ্কেত মনে রাখা ভাল। যদি দেখা যায় যে অধিক ডাল নির্গত হইয়া ডালে ডাল জড়াইয়া যাইবে তবে কতক গুলিকে কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। গোলাপ গাছটি ঝোপ বাঁধিয়া না যায় এবং বিশেষত মধ্যস্থলটি ফাঁকা থাকিয়া রৌদ্র বাতাস প্রবেশের পথ পরিষ্কার থাকে ইহাই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

গোলাপ ছাঁটিবার সময়—গাছ ছাটার সাধারণ নিয়ম, ফুল ফল হইয়া যাইবার পর গাছ গুলির ফলন্ত ডাল গুলি কাটিয়া ফেলা। গোলাপ সম্বন্ধেও সে নিয়ম খাটে। Dwarf, Standard, Hybrid Perpetual, Hybrid Tea গোলাপ গুলি এক দফা চৈত্র মাসে ছাঁটিতে হয়। Tea, Noisettes, chinces গোলাপগুলি বৈশাখ মাসে এবং লতা জাতীয় গোলাপগুলি ফুল শেষ হইয়া যাইবার পরই ছাঁটিতে হয়। ফলতঃ শীতশেষে, গ্রীষ্ম আরম্ভে ফুলের মরস্থম ফুরাইলেই গোলাপ গাছ গুলিকে একবার ছাঁটিয়া কাটিয়া ঠিক করিয়া দিতে হয়। পরে বর্ষা শেষে মাটি কিয়ৎ পরিমাণে শুকাইয়া আসিলে গোলাপ গুলিকে পুনরায় ছাঁটিতে হয়। সমতল প্রদেশে যেখানে অতি বৃষ্টি হয় যেমন বাঙলা দেশের এই সময় গোড়া খুঁড়িয়া গোড়ায় রৌদ্র বাতাস খাওয়াইয়া মাটি যতদূর সম্ভব শুকাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বাঙলা দেশে কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বে গোলাপ গাছের ডাল ছাঁটা বা গোড়া খোলা চলে না। গোড়া খোঁড়ার পর বৃষ্টি হইলে অনেক কাজ পিছাইয়া যায় এবং কত কাজ পুনরায় করিতে হয়।

অনেক সময় গোলাপ গাছ দুইবার ছাঁটা হয় না। পার্ব্বত্য শীত প্রধান স্থানে ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ মাসে এবং সমতল স্থানে আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে গোলাপ গাছ ছাঁটার ব্যবস্থা প্রচলিত।

রসা কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে গোলাপ চাস করিতে হইলে গোলাপের গোড়া না খুঁড়িলে চলে না কিন্তু নিরস ভূমিতে গোড়া খুঁড়িলে গাছ খারাপ হইবার সম্ভাবনা। তথায় ফর্ক দ্বারা গোড়ার মাটি আল্‌গা করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

গোলাপ গাছ ছাঁটার সাধারণ নিয়ম মাত্র বলা হইল। দেশ, আবহাওয়ার অবস্থা বুঝিয়া নিয়মের কিছু কিছু ইতর বিশেষ করিয়া লইতে হয়।

গোলাপ গাছ ছাঁটা যন্ত্র—মোটা ধার অস্ত্র দ্বারা গোলাপ গাছ ছাঁটা চলে না। এই কার্য্যের জন্য তীক্ষ্ণ ধার ডাল ছাঁটা ছুরিকা, ডাল ছাঁটা কাঁচি এবং মিহি দাঁতযুক্ত করাত আবশ্যক। ডালগুলি পরিষ্কার করিয়া কাটিতে (Clean cut) হয়; কোন অংশ চিরিয়া, ছিঁড়িয়া বা থেঁতো হইয়া না যায়।

জল সিঞ্চন—গোলাপ ক্ষেতে প্রচুর জল সেচনের আবশ্যক। মাটি সরস না থাকিলে গোলাপ গাছ ভাল থাকে না। ফুলের মরসুমে ঘন ঘন এবং অন্য সময় প্রয়োজন মত জল সেচন করিতে হয়। প্রত্যেক বার জল সেচনের পর মাটির 'যো' হইলে গাছগুলির গোড়া খুঁড়িয়া 'যো' বাঁধিয়া দিলে অধিক কাল মাটির রস রক্ষা করা যায়।

এই প্রস্তাবনায় গোলাপ ছাঁটিবার আরও একটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। গোলাপ গাছ কেন যেকোন গাছ খুব বাড়িয়া উঠিলে বা তাহাতে ফুল ফল না হইলে গাছের ডাল ও শিকড় ছাঁটিয়া তেজ কমাইয়া লইয়া আসিতে হয়। গাছের আয়তনের বৃদ্ধি কমাইতে না পারিলে তাহাদের পুষ্পোদ্গমের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে না। বৃক্ষ লতার অত্যধিক তেজ বৃদ্ধি হওয়াকে ষাঁড়াইয়া যাওয়া বলে। গোলাপ গাছ প্রায়ই ষাঁড়াইয়া যাইতে দেখা যায়।

গোলাপ ষাঁড়াইয়া উঠিলে না ছাঁটীয়াও তাহাদিগকে পুষ্পিত করা যায়। গাছের ডালগুলি নমিত করিয়া ভূমি সংলগ্ন করিয়া বাঁধিয়া দিলে ডালগুলির প্রত্যেক গাঁইট হইতে প্রশাখা নির্গত হইয়া উর্দ্ধ মুখে উঠে এবং তাহা হইতে প্রায়ই পুষ্পোদ্গম হয়।

অফুলন্ত গোলাপ গাছের পুষ্পোদ্গম করিবার দ্বিতীয় উপায় তাহাদের গোড়া খুঁড়িয়া গোড়ার মাটি শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক হইলে কতকগুলি শিকড় কাটিয়া ছাঁটিয়া লওয়া এবং শাখা প্রশাখাগুলি অল্পাধিক ছাঁটিয়া দেওয়া। ইহাতে নূতন প্রশাখা বাহির হইয়া তাহাতে ফুল ফুটিবার সম্ভাবনা।

কাঁচির মুখে ফুল—গোলাপ গাছে ইচ্ছামত ফুল ফুটান যায়। ছাঁটিবার গুণে সময় অসময়ে ফুল ফুটিয়া থাকে। দুর্গোৎসবের সময় প্রচুর ফুলের আবশ্যক। গন্ধরাজ, স্থলপদ্ম, সেফালিকা, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুল বর্ষাশেষে, শরতের প্রকালেই ফুরাইয়া আসে, গোলাপ ত পাওয়া কঠিন। মহাপূজা কিন্তু শরতের শেষভাগে হয়। এই সময় ফুল প্রাচুর্য্য রাখিতে পারিলে বড়ই সুবিধা হয় এবং তাহাতে উদ্যান পালকগণের প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা। বড় দিনের সময়ও গোলাপ ফুলের টান পড়ে। দেখা গিয়াছে যে সময় ফুল আবশ্যক তাহার অন্ততঃ ৫০।৬০ দিন পূর্ব্বে গোলাপ ছাঁটিয়া দিলে ঠিক সময়ে ফুল পাওয়া যায়। ফুল পাইবার অধিক সময় ব্যবধান না থাকিলে গোলাপের ডাল গোড়া ঘেঁসিয়া অধিক পরিমাণে ছাঁটিলে চলিবে না। গাছের শাখাগুলি অগ্রভাগ ছাঁটিয়া রাখিতে হয়। ফুল পাইবার ৮।১০ দিন পূর্ব্বে যদি মুকুল দেখা দেয় তবে

কতকগুলি মুকুল কাটিয়া দিয়া পুষ্পোদ্গম কিয়ৎ পরিমাণে স্থাপিত করিতে হয়। স্থল-পদ্মের গাছেও খুব বেশী রকম ছাঁটার আবশ্যক হয়। বর্ষা শেষ হইতে না হইতেই ইহাদের পুষ্পোদ্গম হয়। পূজা আসিতে না আসিতেই ফুল ফোটা বন্ধ হয়। যথা সময়ে ফুল পাইবার ১ মাস পূর্ব্বে তাহাদের ডাল ছাঁটিয়া দিয়া পুষ্পোদ্গম স্থগিত রাখিতে পারিলে যথাকালে ফুল পাওয়া যাইতে পারে। গোলাপ গাছের কেবল শিকড় ছাঁটিলে চলিবে না। শীতে ফুল ফুটাইতে হইলে গোড়া খুঁড়িয়া শিকড় অনাবৃত করিয়া সার দিয়া নানা তদ্বির করিতে হয়। সময় মত জল সিঞ্চনও সময় মত ফুল পাইবার এক বিশিষ্ট ব্যবস্থা। শরতকালে ফুল ফুটাইবার জন্য জল সিঞ্চনের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না।

শীতকালে গোলাপের ফুল বড় ও খুব রঙদার হয়। বর্ষাকালে গোলাপের গোড়া অাঁটিয়া যায় বলিয়া ফুল বড় হইতে পায় না। গোলাপ ফুল বড়, উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট করিতে হইলে তাহাতে রকমওয়ারি সার দিতে হয়। বর্ষাকালে সার প্রয়োগ করিলেও তাহার পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। মাটি অত্যধিক জলসিক্ত হইয়া সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী অবস্থায় থাকে না। পাহাড়িয়া স্থানের মাটিতে গোলাপের রঙ স্বভাবতঃ ভাল হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোলাপের প্রকৃতি বুঝিয়া তাহাদিগকে স্তম্ভাকারে, তোরণাকারে গম্বুজ প্রাকার, ছত্রাকার কিম্বা মালাকারে, দেওয়ালের গায়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। লতানিয়া গোলাপগুলিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া বাড়াইয়া লইয়া দ্বিতলের বারান্দায় বা উচ্চ স্তম্ভের উপর নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই সকল কার্য্যে বা ছাঁটিয়া কাটিয়া ফুল ফুটাইতে মালীর গুণপনা সূচিত হয়।

বড় উৎকৃষ্ট গোলাপ—ডাল ছাঁটিয়া যেমন গাছে অধিক ও উৎকৃষ্ট ফুল উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করা যায় তেমনি বড় ফুল ফুটাইতে হইলে গাছের অনেক মুকুল কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। কখন কুঁড়ি সমেত ডালের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। এইরূপ ডাল ছাঁটাকে Topping বলে। আগে পিছে ফুল ফুটাইবার আবশ্যক হইলে এই প্রণালীতে শাখাগ্র ছাঁটারও প্রয়োজন হয়।

মধ্যমাকৃতি বা টী গোলাপ টবে জন্মাইয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া তাহাদিগকে মনোমত আকারে দাঁড় করান যায় এবং গাছগুলির প্রত্যেক ডালে ডালে ফুল ফুটান যায়। এই প্রকার গোলাপ ফুলের টব প্রদর্শনীতে দেখান হইয়া থাকে। গোলাপ ফুল কাটিয়া তাহা কাঁচের ফুলদানিতে রক্ষা করিয়াও প্রদর্শিত করা হয়। প্রদর্শনীতে দেখাইবার মত গোলাপ উৎপন্ন করাতে নিপুণতা আছে এবং যে সকল মালী কাঁচির মুখে ফুল ফুটাইতে পারে তাহাদেরই সেই নিপুণতা থাকা সম্ভব।

যুদ্ধে আলু

মেদিনীপুর কৃষি-সমিতির সদস্য শ্রীশীতল দাস রায় লিখিত।

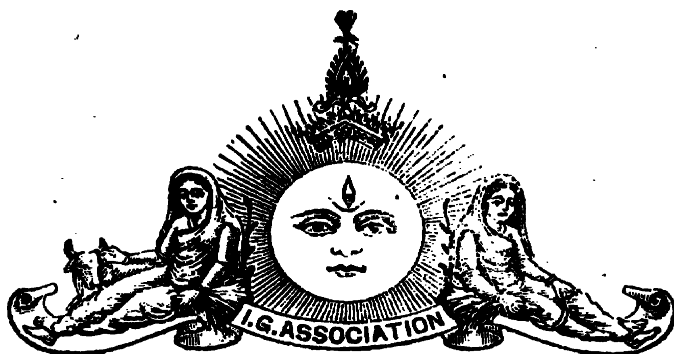
সংবাদপত্র পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে আলু রপ্তানি লইয়া ইংলণ্ডের সহিত হলণ্ডের মন কষাকষি চলিতেছে। হলণ্ড হইতে প্রতিবর্ষে যে আলু রপ্তানি হয় তাহার এইরূপ শর্ত্ত আছে যে সেই রপ্তানি আলুর অর্দ্ধেক পরিমাণ ইংলণ্ডে ও অর্দ্ধেক পরিমাণ জর্ম্মনিতে পাঠাইতে হইবে। বিগত ১৯১৬ সালের রপ্তানি আলুর মধ্যে ১১ হাজার টন আলু ইংলণ্ডে কম্ পাঠান হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড এই দাবি করিতেছে যে সমস্ত রপ্তানি যোগ্য আলু এবারে ইংলণ্ডেই পাঠাইতে হইবে। জর্ম্মনিতে আদৌ পাঠাইতে পারিবেন না, কিন্তু হলণ্ড রাজসরকার এই কথায় কর্ণপাত না করায় উভয় রাজ্যের মধ্যে মনান্তর হইবারও সূত্রপাত হইয়াছে। ইহার ভিতরে যে কেবল খাদ্য সমস্যাই বর্ত্তমান আছে তাহা নয়, প্রেষ্টিজ বা মান মর্য্যাদা রক্ষা লইয়াও কথা আছে। সুতরাং এই সামান্য আলু লইয়া যে বিবাদের সূত্রপাত তাহার পরিণাম যে কোথায় থামিবে তাহা এক্ষণে বলা যায় না। কিন্তু ইহার ফলাফল লইয়া আমাদের আলোচনা করিবার কিছু মাত্র আবশ্যক নাই। আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে যে আমাদের রাজার দেশের লোকের যে এই আলুর জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয় তাহা তাঁহাদের নিজেরি খাস জমিদারী ভারতবর্ষ তথা এই বাঙ্গলা হইতে দূরীভূত হইতে পারে কিনা? ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই আলু যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে, আর এই মহাদেশের বিভিন্নস্থানে জলবায়ু ও আবহাওয়ারগুণে প্রায় বারমাসই আলু জন্মে। আলুও আবার বিভিন্ন প্রকারের আছে। বিলাত হইতেও বীজ আনাইয়া এদেশে চাষ হইতেছে সুতরাং বিলাতের লোকের পছন্দমত ও আহারোপযোগী আলুও যে এতদ্দেশে যথেষ্ট ও সহজে পাওয়া যায় তাহারও কোন সন্দেহ নাই। এরূপস্থলে সেই সমস্ত আলু বিলাতে রপ্তানি করিয়া বিলাতবাসীগণের খাদ্যাভাব নিবারণ করিবার পক্ষে রাজসরকার কেন মনযোগী হইতেছেন না? ইংরাজ সওদাগরগণের মঙ্গল বিধান জন্য তাহাদের আব্দারে পাট সম্বন্ধে সরকার যেরূপ তত্ত্বতল্লাশ ও অনুসন্ধান লইয়া থাকেন, আলু চাষ বিষয়ে ঐরূপ অনুসন্ধান লইলে জানিতে পারিবেন যে দেশে আলুর চাষও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং সরকার হইতে উৎসাহ, পরামর্শ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইলে চাষের উন্নতিসহ ফসলও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। খাদ্যরূপে আলু ভারতবাসীর নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ নয়। শুনিয়াছি অনেক দুস্থ ইংরাজ ও সাধারণতঃ আইরিষগণ অধিকাংশ দিন কেবল আলু খাইয়াই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ভারতবাসী ইহা কেবল অন্ন বা রুটীর তরকারীরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সকল স্থানে আবার বারমাসই আলু পাওয়া যায় না এবং অনেকেই বারমাস আলু খাইতে ভালবাসে না এবং

কাহারও কাহারও সহ্যও হয় না, এতদ্দেশে গোল বা বিলাতী আলু ব্যতীত আর ৫।৩ রকমের আলু জন্মিয়া থাকে যথা—লাল আলু, সাদা মিঠে আলু, শকরকন্দ আলু, চুবড়ী আলু ও খাম আলু। এই সমস্ত আলুও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জন্মিয়া থাকে এবং ইতর সাধারণের অতি প্রীতিপ্রদ আদরের খাদ্য। এই সমস্ত আলু সহজে ও সস্তায় পায় বলিয়া সাধারণ গৃহস্থের ঘরে গোল আলুর ব্যবহার খুব কম হয়। সুতরাং অধিক পরিমাণে আলু রপ্তানি হইয়া যাইলেও দেশের লোক তজ্জন্য কিছুমাত্র অভাব অনুভব করিবে না। ইক্ষুচাষ অপেক্ষা আলু চাষে লাভ অধিক হয় এবং খরচ ও পরিশ্রম কম হয়। এতদ্দেশে ১ বিঘা জমিতে ২০ মনের অধিক গুড় হয় না যাহার মূল্য ১২০৲ টাকা, কিন্তু ঐ পরিমাণ জমিতে ৮০ মণ আলু জন্মায়—যাহার মূল্য ১৬০৲ টাকার কম নয়। আবার ইক্ষুকে সারাবৎসর ধরিয়া জমিতে রাখিয়া পাইট ও তদ্বির করিতে হয় ও ইক্ষু মাড়াই করিবার সময় কত অধিক কষ্ট ও যন্ত্রণা পাইতে হয়। আলুর সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই করিতে হয় না। কার্ত্তিকমাসে আলু বপন করিলে ফাল্গুন মাসে ফসল ঘরে উঠিবে। আবার পাট অপেক্ষাও ইহা অধিক সুবিধাজনক। পাটের দ্বারা দেশে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়া বৃদ্ধি হয়। আলু চাষে সেরূপ কোন আশঙ্কা নাই। যেদিক দিয়াই দেখা যাউক আলু একটী মঙ্গলকর ফসল ও দেশে ধনাগমের মহা উপায় স্বরূপ। বাঙ্গলার যে যে স্থানে পূর্ব্বে আলু জন্মাইত না সেই সেই স্থানে আলু চাষ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা সরকারি কৃষি বিভাগ হইতে হইতেছে। ইহা শুভ সংবাদ বটে, কিন্তু যে সমস্ত স্থানে বহুদিনাবধি আলু জন্মিতেছে সেই সমস্ত স্থানে চাষীদিগকে কৃষি বিভাগ উৎকৃষ্ট বীজ ও সার যোগাইয়া উৎকৃষ্ট প্রণালীতে চাষ করিবার পক্ষে কোন উপায় অবলম্বন বা সাহায্য করিতেছেন না ; ইহা অতীব দুঃখের কথা বলিতে হইবে। সম্প্রতি কৃষি বৈঠকে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সমগ্র বাঙ্গলায় একটী উচ্চাঙ্গের কৃষি কলেজ ও প্রতি জেলায় একটী কৃষি শিক্ষা বিষয়ক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে। সঙ্কল্প উত্তম বটে। ভবিষ্যতে উক্তরূপ বিদ্যালয় হইতে যে শুভ ফল উৎপন্ন হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সহিত যদি প্রতি মহকুমায় একটী করিয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া নিরন্তর চাষীদিগকে সার, বীজও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হাতে কলমে চাষ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয় তাহাতে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনাপেক্ষা বহু অধিক উপকার করা হইবে। কৃষিকলেজ, বিদ্যালয় বা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতে যদি বিলম্ব হয় তবে আপাততঃ যাহাতে কৃষকগণ, ধান্য, আলু, যব, গম, ইক্ষু প্রভৃতি শস্যের সুপুষ্ট, সুনির্ব্বাচিত ও উৎকৃষ্ট বীজ ও আবশ্যকীয় সার যথা, খইল, হাড়চূর্ণ, সোরা ইত্যাদি তাহাদের বাটীর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে খরিদ করিতে পায় তাহার উপায় সর্ব্বাগ্রে করা দরকার। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রতি মহকুমার সদরে যদি সরকার হইতে জনৈক কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীর অধীনে একটা বীজাগার খোলা হয় তাহা হইলে কৃষকগণ অতি সহজেই তাহাদের আবশ্যকমত বীজ ও

সার সংগ্রহ করিতে পারে, সরকার আমাদের এই প্রার্থনাটীতে কর্ণপাত করিবেন কি ? সুনির্ব্বাচিত বীজ ও সময়মত জমিতে পর্য্যাপ্ত সার প্রদানের অভাবে এতদ্দেশস্থ চাষীগণ প্রতি বিঘায় ৮০ মণ আলু জন্মাইতে পারিতেছে না। বাজারে যেরূপ মন্দ বীজ পায় তাহা লইয়াই আলু রোপন করিতে তাহারা বাধ্য হয়, এবং অর্থাভাবে যথাসময়ে যথা পরিমাণে খইলও দিতে পারে না। সেইজন্য বিঘা প্রতি ৪০ হইতে ৬০ মণের অধিক আলু উৎপন্ন করিতে পারে না। উপরোক্ত দুইটী অভাব যদি তাহাদের দূর করিতে পারা যায় তাহা হইলে প্রতি বিঘায় যে ৮০ মণ বা তদূর্দ্ধ আলু জন্মাইবে তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। সরকার নিজ হইতে বা সমবায় সমিতি স্থাপন দ্বারা এবিষয়ে অবহিত হইলে দেশের লোকের অভাব মিটাইয়াও এত প্রচুর আলু মজুত থাকিবে যে তজ্জন্য আর বিলাতবাসীদিগকে হলণ্ডের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। সরকার এখন হইতে চেষ্টা করিলে তবে আগামী কার্ত্তিকমাসে আলু রোপণের সময় কৃষকগণ সেই চেষ্টার ফল পাইতে পারিবে। এই মহাপ্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের সময় বিলাতের বুভুক্ষু নরনারীর মুখে খাদ্য সংস্থান করিয়া দিতে পারিলে আমাদের অর্থ সামর্থ হইবেই অধিকন্তু চিত্তপ্রসাদও লাভ হইবে।

সন্থ্য সীম—শিম্বি জাতীয় উদ্ভিদ বলিয়া ইহারা শিকড়ের গ্রন্থিতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে এবং এই হিসাবে ইহা শণ ধঞ্চের মত সবুজ সার। গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষায় জানা যায় যে অন্যান্য সবুজ সার অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে ভাল। ইহার বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড ।০ আনা। বীজের ভাল মন্দ আছে। পরিমাণে অধিক লইলে ১৫৲ টাকা মণ দরে পাওয়া যাইতে পারে।

বীজ পাইবার ঠিকানা ম্যানেজার ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন্ (ভারতীয় কৃষি সমিতি) ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



আষাঢ় ১৩২৪ সাল।

বারিহীন চাষ

ভারতের অনেক স্থলেই বিশেষতঃ পঞ্জাব, রাজপুতানা, যুক্ত ও মধ্যপ্রদেশে এরূপ অনেক বহুবিস্তৃত প্রান্তর রহিয়াছে যে সকল স্থলে আদৌ চাষ হয় না। উহাদের মধ্যে কতকগুলিতে সোরা প্রভৃতি রাসায়ণিক লবণ ফুটিয়া চাষের অনুপযুক্ত করিয়া দিয়াছে; আবার কতকগুলি কেবল জল অভাবেই অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে। যতই দেশে জনসাখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ততই এই প্রকার জমির আবাদ বৈজ্ঞানিক কৃষির একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে আমাদের কৃষি-বিষয়ক অভিজ্ঞগণ এতদ্বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ভারত সরকারের মুখ্য কৃষি পত্রে * বারিহীন চাষ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে প্রচলিত প্রথাদি উক্ত প্রবন্ধে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। এতদ্দেশের পক্ষে উহাদের উপযোগীতা কতদূর তাহাই আমাদের এস্থলে আলোচ্য বিষয়।

ইহা প্রথমেই বলা আবশ্যক যে বারিহীন চাষ বলিতে একবারে জলের সহায়তা ব্যতীত চাষ বুঝায় না। কারণ কোন না কোন প্রকারে জল অথবা জলীয় বাষ্প ব্যতীত উদ্ভিদ আহার গ্রহণ করিতে পারে না। তবে বারিহীন চষের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে যথাসম্ভব অল্প পরিমাণ জল দ্বারা চাষ করা এবং মৃত্তিকাস্থিত জলের সংস্থান ও সম্পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহার করা। বলা বাহুল্য যে সকল মৃত্তিকাতেই অল্প বিস্তর পরিমাণ জল স্বভাবতঃই সঞ্চিত থাকে।

* Agricultaral Jornal of India Vol. XI, pp III, July 1916 Dry Farming and its possibilities in India by C. V. Save B. Ag. (Bomb) M. Sc. (Wiscon),

বারিপ্রপাত ও সংস্থানের অভাবে অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের পরিমাণ জগতে সামান্য নহে। আমেরিকার কোন কৃষি পণ্ডিত * হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে পৃথিবীর ভূভাগের মধ্যে শত করা ২৫ ভাগে ১০ ইঞ্চির কম বারি পাত হয় এবং ৩০ ভাগে ১০।২০ ইঞ্চি বারিপাত হয়। সুতরাং পৃথিবীর সিকি ভাগ জমিতে বারিহীন চাষ অত্যাবশ্যক এবং এক তৃতীয়াংশ জমিতে বারিহীন চাষের প্রথা অবলম্বিত হইলে অধিক আয় হইতে পারে। বহু পুরাকাল হইতেই মানব এ প্রণালীর চাষের অনুশীলন করিয়া আসিতেছিল এবং পুরাতত্ত্ববিৎগণের মতে চীন, মিশর, মেশোপোটেমিয়া, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশের লুপ্ত সভ্যতার কীর্ত্তিসমূহের মধ্যে বারিহীন চাষের অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ধারাবাহিক কৃষি ইতিহাসের অভাবে বহুযুগের অভিজ্ঞতা কালসাগরে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশেই এতদ্বিষয়ে অগ্রণী। নব অভ্যুদয়শালী আমেরিকা অপরাপর কার্য্যের ন্যায় বারিহীন চাষের সমস্যা সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই রসি পর্ব্বতমাল ও মিশেরি মিসিসিপি নদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমতল ভাগে ও রকি ও সিয়ারা নেভাডা অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রান্তর সমূহে বারিহীন চাষের প্রণালী উদ্ভাবন অধ্যয়ন ও উন্নতি সাধনের জন্য অনেক ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল স্থানে প্রথম প্রথম সুফল না দর্শাইলেও আজ কাল দিগন্তব্যাপী গোধূম, ভুট্টা প্রভৃতির ক্ষেত্র দেখিলে দর্শক সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে মানব অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের বলে সকল প্রাকৃতিক বাধাই অতিক্রম করিতে পারে।

বারিহীন চাষের অন্তর্নিহিত মূল সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমেই হিসাব করিয়া দেখা আবশ্যক যে কি পরিমান শুষ্ক ফসল উৎপাদন করিতে কি পরিমাণ জল আবশ্যক হয়। আমেরিকায় অনেক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে এক সের সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক ফসল উৎপাদন করিতে প্রায় ১৮ মণ জলের দরকার। এতদ্দেশে বারিহীন চাষে যে গোধূম উৎপাদিত হয় তাহার ফলন বিঘা প্রতি শস্য ও খড় সমেত প্রায় ৫ মণ। সুতরাং এই পরিমান ফসলের জন্য ৩৬০০ মণ জল চাই। অন্যদিকে বারিপাতের হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১ বিঘাতে যদি ১ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় তাহা হইলে ৯৭০ মণ জল হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে ১ বিঘা গোধূম তৈয়ারী করিতে ৪ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত প্রয়োজনীয়। সাধারণ বারিপাতের অনুপাতে ইহা সামান্যই, কিন্তু সময়মত ইহাও পাওয়া যায় না।

আবার ইহাও একটি নির্দ্ধারিত সত্য যে ফসলে জমির সমস্ত জল গ্রহণ করিতে পারে না। যে পরিমান জল কৈশিক আকর্ষণ দ্বারা সহজে উপরে উঠিতে পারে সেই পরিমাণ জলই উদ্ভিদের মূল দ্বারা সোষিত হয়। বিশেষ বিশেষ জমির হিসাবে এইরূপ

* Dry Farming by J. A. Widtsoe.

সহজ লভ্য (avalilable) জলের একটা বিশেষ অনুপাত আছে। কিন্তু জমির মোট জল ধারণ শক্তি ও ফসলের মোট জল গ্রহণ শক্তি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া স্থূলতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে মৃত্তিকাস্থিত জলের গড়ে প্রায় শত করা সাত ভাগ জল ফসলে পাইয়া থাকে। এক ফুট গভীর ১ বিঘা জমিতে প্রায় ১৪৩২৭ মণ মাটি থাকে। উহাতে জলের মাত্রা প্রায় ৯৯৬ মণ হইবে। আমাদের ফসল জলের পূর্ব্বপ্রদত্ত অনুপাত হিসাবে এক বিঘা জমিতে গোধূম ফসল প্রস্তুত করিতে হইলে কোন কাদা দোঁয়াস মাটিতে ৪ ফুট গভীর চাষ দিতে হইবে।

বাঙলার কৃষক

বাঙলার কৃষকের আজ এত দুর্দ্দশা কেন? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়—ভদ্রসমাজ ও ভূস্বামীগণ তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছেন বলিয়া তাহারা এত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভদ্রসমাজ নানা কারণে বিকার দশা প্রাপ্ত। শিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণ এক দিন ভাবিয়াছিল বাঙলাকে বিলাতে পরিণত করা সম্ভব এবং সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সেই অসাধ্য সাধন চেষ্টায় তাহাদের সমস্ত শক্তি, অদম্য উৎসাহ ও উদ্যমে নিয়োগ করিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া এখন তাহাদের সেই চিন্তা স্রোতে কতকটা ভাঁটার টান ধরিয়াছে, তাহাদের নিজের আদর্শ বাঙলার কোন্ কোণে কোথায় নষ্ট প্রায় হইয়া পড়িয়া আছে; এখন তাহারা অন্য উপায় অন্বেষণ করিতেছে। নিজ আদর্শে লক্ষ্য স্থির করিবার তাদৃশ উগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া না উঠিলেও তাহারা যেন পথ ভ্রষ্ট, লক্ষ্য ভ্রষ্টের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের শান্তি নাই—তাহাদের যা ছিল তাহা যাইতে বসিয়াছে, যাহা চাহিয়াছিল তাহা পাইল না।

বাঙলার ঘরে ধান ছিল, গোশালায় গরু ছিল, জলাশয়গুলি মৎস্যপূর্ণ ছিল, গোচারণের মাঠ ছিল শস্য শ্যামলা ক্ষেত্র ছিল, সুনীল আকাশতলে সবুজ গাছের নীচে তৃণাচ্ছাদিত ঘর দুয়ার ছিল, প্রতি ঘরে ঘরে শান্তি, সুখ, স্বাস্থ্য বিরাজ করিত। কৃষক অকাতরে পরিশ্রম করিয়া ক্ষেতভরা ফসল গাছ ভরা ফল উৎপাদন করিত। আবার ক্ষেত খামারের কাজের আসর [illegible]লেই তাহারা চিরাচরিত অভ্যাসে স্বভাব সুলভ কৌশলে কতই পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিত। পণ্য উৎপাদনে ইতর ভদ্র একযোগে কার্য্য করিত এবং সেই কুটীরজাত পণ্য বিশ্বের হাটে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত।

ভারতীয় পণ্যের পৃথিবী জুড়িয়া আদর ছিল। ধনী সমাজ, ভদ্রসমাজ, কৃষক সমাজ কেমন একযোগে, একই উদ্দেশ্যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কার্য্য করিত। এখন সে চাষা নাই, এখন গৃহস্থের সে গৃহস্থালী নাই, এখন গৃহ ধর্ম্মের সেই কর্ম্ম বিভাগ নাই। বাঙলার গৃহগুলি যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। পল্লির সে স্বাস্থ্য নাই চাষার দেহে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই, গোচারণের মাঠ নাই, জলাশয়গুলি হাজিয়া, মজিয়া শুকাইয়া গিয়াছে, মন্দিরে দেবতা আছে কিন্তু তাহার পূজা হয় না, চণ্ডীমণ্ডপ ভগ্নপ্রায়, তথায় আর মায়ের আগমন হয় না, আটচালায় আর পল্লীবালকেরা গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করে না, ভদ্রসমাজ, ধনী সমাজ পল্লীবাসে বিতরাগ, কুটীর শিল্প উপেক্ষিত হইয়াছে, বড় বড় কলকারখানায় অনুরাগ জন্মিয়াছে।

আমাদের ভুলে আমরা এই বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। আমরা বিদেশী সভ্যতার মোহে অন্ধ হইয়াছি। আমরা আমাদের আদর্শ হারাইয়াছি অন্য একটি আদর্শকে তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছি এবং তাহাকেই মহৎ হইতে মহত্তর বলিয়া মনে করিতেছি, ফলে আমাদের পল্লী সমাজ দীন হীন, দুর্দ্দশা প্রাপ্ত। সহরে কল কারখানা চলিতেছে তাহাতে মজুরের অস্থি, মজ্জা, মাংস পিষ্ট হইতেছে, ক্লিষ্ট দেহ মনকে উৎসাহিত করিবার জন্য মাদকতার প্রসার হইতেছে, বহুতর অন্যায় অসঙ্গত অনাবশ্যক অভাব জুটাইয়া আপনাদিগকে বিব্রত করিতেছে, পারিবারিক সুখ সচ্ছন্দতা নষ্ট হইতেছে ফলে কল কারখানায় ধনীর ধন বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু যাহারা কল চালাইতেছে তাহাদের ঘরের চালে খড় নাই উদরে অন্ন নাই, পরিধেয় বস্ত্র নাই। সকল বিষয়েই আমরা যেরূপ কল কৌশলে পরিচালিত উন্নত প্রণালীতে আকৃষ্ট হইতেছি তাহাতে বোধ হয় বাঙলার ক্ষেত্রগুলিতে অচিরে কলের লাঙ্গল চলিবে, তাহাতে ধনীর ধন খাটিবে কিন্তু বাঙলার কৃষক পরিবারের পৃথক সত্তা লোপ পাইবে, ফলে তাহারা কুলী মজুরের কার্য্য করিবে—প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও মনুষ্য জীবনের সফলতা হারাইবে।

আমরা যে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান কল্পে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহি, সেও বিলাতী আদর্শে। দেশের শিল্প নষ্ট করিয়া আমরা বড় বড় কল কারখানা স্থাপন করিতে চাহি। অন্যরূপে আমাদের মন উঠে না। বৃহৎ কাণ্ডের অন্তরায় অনেক, মূল ধনের অভাব, নবীন শিল্পের পক্ষে উন্নতি সাধনের সময় সাপেক্ষতা, রাজ নীতিক অবস্থা, আমাদের আদর্শ, শিক্ষার অভাব এসব আছে, আরও আছে এদেশের প্রাকৃতিক অন্তরায়, তাহা অতিক্রম করা কি সম্ভব? আর এই যে মূল ধনের অভাব, উহার জন্য দায়ী আমরা। বিলাসী আমরা কেমন করিয়া মূলধন জমাইব। যে জাতি বিলাসের উপকরণ কিনিতে বৎসরে ৩৫ কোটী টাকা বিদেশে দেয়, সে জাতি ব্যবসার জন্য মূলধন জমাইবে কোথা হইতে? সুতরাং আমাদিগকে এদিকেও আমাদের প্রাচীন আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

পুরাতন আদর্শ গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। আবার বিলাস ত্যাগ করিয়া সরল ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। বাবুগিরী আর পোসাইবে না। পল্লির স্বাচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে, পল্লীর স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয়, সে দিকে দৃষ্টি দিলে, দেশের লোকের সঙ্গে সরকার বাহাদুর সহযোগীতা করিলে, উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে পাঠশালার শিক্ষার পুনঃ ব্যবস্থা করিলেই হইবে।

এখন সকলের মুখে সর্ব্বদাই শুনিবে যে কেবল মাত্র কৃষিকর্ম্ম দ্বারা আমাদের জীবন ধারণ করা সম্ভব নহে। তাহার সহিত ব্যবসা বাণিজ্য যুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমরা এ কথা অস্বীকার করি না, কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু আমরা কেন ভুলিয়া যাই যে আমাদেরও সব ছিল—চাষ, শিল্প, ব্যবসা সবইত ছিল। আমরাত কোন কালে খাদ্য পরিধেয়ের নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতাম না, কতশত কুটীর শিল্পের প্রচলন ছিল আমরা তুলাচাষ করিয়া তুলাজাত বস্ত্র প্রস্তুত করিতাম, রেশম চাষ করিয়া রেশমী বস্ত্র উৎপন্ন করিতাম, কাঁসা, পিতল, তামার বাসন প্রস্তুত করিতাম, কাঠের, দাঁতের, হাড়ের, ঝিনুকের গড়ন গড়িতাম, কাপড় রঙ্গ করিতাম, গৃহসজ্জার দ্রব্যগুলি লাক্ষাদি রঙে রঞ্জিত করিতাম। আমরা অদ্যাপিও এ সকল কাজ করি, আমরা আজিও প্রতিমা গড়িতেছি এবং সেগুলিকে ডাকের সাজে সজ্জিত করিতেছি, আমরা অদ্যাপিও স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে সোণা, রূপার গহনা পরাইতেছি, এখনও কেমিক্যাল গোল্ড, রোল্ড গোল্ড, নিকেল ও জার্ম্মাণ সিলভার তাহার স্থান সম্পূর্ণ অধিকার করে নাই। তুমি বলিবে যে তখন যাহা সম্ভব ছিল এখন তাহা অসম্ভব—তখন প্রতিযোগিতা ছিল না এখন প্রতিযোগিতা পদে পদে—তোমার জিনিষ ভাল হইলে কি হয়, দুর্মূল্য, সস্তার জিনিষে বিশ্বের হাট ভরিয়া গিয়াছে। বাঙলা দেশ দারিদ্রের চরমসীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সস্তা ভিন্ন তাহার উপায়ন্তর কি ?

এক্ষণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত শিল্পগুলির রক্ষার উপায় কি ? কোন—উপায় অবলম্বন করিলে সেগুলি রক্ষা পায় ? য়ুরোপ, এমেরিকা জাপানের মত আমরা বৃহৎ কল কারখানার প্রয়াসী নাই, আমরা দেশের মানুষগুলাকে কলের মানুষ করিতে চাহি না। প্রাণহীন, ভাব ভালবাসা শূন্য লৌহ দণ্ডবৎ কতকগুলা মানুষ লইয়া আমাদের জাতীয়তা রক্ষা হইবে না। যদি আমরা জীবন চাই তবে আমাদিগকে যাবতীয় বিলাস বর্জ্জন করিতে হইবে এবং তাহার জন্য যে সংযম আবশ্যক তাহার সাধনা করিতে হইবে এই সংযমের মধ্য দিয়া ব্যক্তি ও সমাজ পুনরুজ্জীবিত হইবে।

বাঙলার কৃষকেই বাঙলার মেরুদণ্ড—কিন্তু সেই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ধনীর তাচ্ছিল্য ভূস্বামীগণের ঔদাসীন্যে তাহারা জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালসার। কৃষককুল ও গোকুল উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আমাদের শিল্পগুলি নষ্ট প্রায়, কৃষিকার্য্যই আমাদের এখন প্রধান সম্বল, তাহাও যায় যায়। আমরা কি ভাবিয়া এখনও নিশ্চিন্ত

হইয়া বসিয়া আছি, কোন্ সুখের মোহে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। বাঙলার পল্লীগুলির স্বাস্থ্যোন্নতি না করিলে, জলাশয়গুলির পুনরুদ্ধার করিয়া জল সংস্থান না করিলে কৃষক কুল, গোকুলকে না বাঁচাইতে পারিলে যে আমাদের উপায়ন্তর নাই। বাঙলাদেশ যে বড় দরিদ্র এমন দরিদ্র দেশ যে আর কোথাও নাই। আমাদের সমস্ত চাষযোগ্য ভূমি হিসাব করিলে জনপিছু ভাগে ২ বিঘারও কম পড়ে। দুই বিঘা জমি চাষ করিয়া কি কাহারও সাংসারিক সমুদয় খরজ নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব? তাহার উপর আবার অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবী আপদ আছে, রোগ শোক স্বাস্থ্য হানী আছে, সময়ে এই দুই বিঘাও চষা খোঁড়া হয় না। জন প্রতি বৎসরে অন্ততঃ সাত মণ খাদ্য শস্য আবশ্যক হয়, বাঙলার জন সংখ্যা হিসাবে আমাদের বত্রিশ কোটী কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্য শস্যের আবশ্যক কিন্তু আমরা সরকারী হিসাবে দেখিতেছি যে বাঙলার উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ মোটে চব্বিশ কোটি আশি লক্ষ মণ এবং তাহা হইতে আবার এক কোটি মণ প্রত্যেক বৎসরে রপ্তানি হয়। ইহাতে পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে আমাদের কি দারুণ অভাব! টাকার হিসাব ধরিলে এই শোচনীয় অবস্থার আরও স্পষ্টতর হয় বাঙলার জনে জনের বাৎসরিক আয় কেহ বলেন ২০৲ টাকা, কেহ বলেন ৩০৲ টাকা। ৩০৲ টাকাই হইলেও ইহা দ্বারা মানুষের সারা বৎসরের অভাব কি প্রকারে পূর্ণ হইতে পারে? বাঙলার রাজ সরকার বাঙলার ধনী সমাজ, বাঙলার ভূস্বামীগণ কৃষকগণকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা বাঙলা যে শ্মসানে পরিণত হইতে বসিয়াছে।

দেশের ভিতর স্কুল, কলেজ, শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হয় হউক, যাহাদের সামর্থ আছে যাহাদের সময় আছে তাহারা সহরে নগরে ও বিদেশে গিয়া শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা করুক কিন্তু চাষাদের ঘর ছাড়িয়া থাকিলে চলিবে না। সকলকেই চাষী, সকলকেই শিল্পী হইতে হইবে, চাষের সময় চাষ, অবসরে অবসরে শিল্প। ইহাদের স্বস্থানে বসিয়া শিক্ষার সুবিধা করিতে হইবে; শিক্ষিতগণকে সংযমী ও ত্যাগী হইতে হইবে এবং পুরাকালের গুরুর ন্যায় পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে বাস করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। নিজের মধ্যে দিয়া তাহাদের হৃদয়ে জীবনের পূর্ণ আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তাহাদিগকে মায়ের সন্তান তৈয়ারি করিতে হইবে। সকল দিক সামঞ্জস্য রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা এক মহাকার্য্য, এক মহাযজ্ঞ, ইহার জন্য গুরুর আশ্রক, আচার্য্যের আবশ্যক।

সহরে বসিয়া অনেকে কৃষির উন্নতির কথা ভাবেন ও তাহা সমাধানের জন্য মতামত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের সে কথার মূল্য কি? মাঠে মাঠে না ঘুরিলে কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায় না। বই পড়িয়া কোন বিদ্যালাভই হয়না। কর্ম্ম চাই, কর্ম্মব্যতীত জ্ঞান লাভ সম্ভবে না। আমরা অন্ধ হইয়া অন্ধকে পথ দেখাইতে চাই তাইত আমাদের এই দুর্দ্দশা। যে কোন উদ্ভিদ বা শস্য সম্বন্ধে আমরা কথা কহিব তাহার আদ্য প্রান্ত জানা চাই, তাহার স্বভাব রিতি পর্দ্ধতি আলোচনা করা চাই। ছেলের ধাত না জানিলে ছেলে মানুষ করা

যায় না। সকল বস্তু সকল বিষয়েই সেই নিয়ম। য়ুরোপ, এমেরিকার লোক যাহারা কৃষি কাজ অবলম্বন করিয়াছে তাহারা কত খাটে, কত অনুসন্ধান করে কত বিষয়ের সন্ধান রাখে বল দেখি।

আমাদের দেশে এক দল লোক আছে যাহারা মনে করে যে কেবল মূলধনের যোগাড় হইলেই যে কোন কার্য্য করা যায়, বলে টাকায় টাকা আসে। সত্য টাকাতে টাকা আসে কিন্তু কেবল টাকাতে হয় না তাহার সহিত জ্ঞান যোগ চাই।

টাকা, সুচাষী এবং উপযুক্ত জমি একত্র যুক্ত হইলে তবে চাষে সোণা ফলে। টাকা উপযুক্ত শিল্পী ও শিল্পানুরাগী লোকজন যুক্ত হইলে তবে টাকায় টাকা লাভ হয়। সকলের গোড়ায় কিন্তু সংযম।

পত্রাদি

শ্রীপ্রসাদ দাস সোম

মাধোগঙ্গা কৃষিক্ষেত্র, মৌজা সুরাইল, ইষাগড় পোঃ, গোয়ালিয়র ষ্টেট।

মান্যবরেষু,

পরে আজ একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও গুরুতর বিষয় লইয়া আপনার সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আশা করি আপনি আমার এই বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট ভরসা দিয়া আমাকে ও আমাদের দেশীয় দরিদ্র ভদ্রলোকদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

আমি একমাত্র কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত আছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এখানে আসিয়া বসবাস করি ও এখনও পর্য্যন্ত একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়া এখনও আমি আমার বর্ত্তমান অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছি।

ইংরাজি ১৯০৩ সালে এখানে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া জমিদারী ও কৃষি কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার নাম "শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভীমবাবু রুড়কি Engineering College এর final Examinationএ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াও B. L. পরীক্ষা দিয়াও এখানে আসিয়া ৪৫০০০/ বিঘা জমি ও কয়েকটি জমিদারী গ্রহণ করেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও কয়েকজন উচ্চ পদস্থ অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এখানে আসিয়া আবশ্যকমত জমি ও জমিদারী ক্রয় করেন। সেই সময় আমার বিশেষ আত্মীয় মিরাটের প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত কাশীপদ বসু মহাশয়ও

একটি প্রকাণ্ড agricultural & Industrial scheme খুলিয়া বসেন তাহার মূলধন ১০০০০০০৲ দশ লক্ষ টাকা স্থির করা হয়। অনেক গণ্যমান্য হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক উহাতে যোগদান করেন। মহারাজা গোয়ালিয়র (সিন্ধিয়া) ও এবিষয়ে কালীপদবাবুকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। কালীপদবাবু যে ভাবে কাজ আরম্ভ করেন তাহাতে তাঁহার কাজ কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই তিন বৎসরের মধ্যেই সব শেষ হইয়া যায়। এবিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিবার আবশ্যক দেখি না কারণ তাহাতে আমার মূল উদ্দেশ্যে বাধা পড়িবে।

বাঙ্গালীদের ন্যায় অনেক পাঞ্জাবী এদেশে আসিয়া কৃষি কার্য্য আরম্ভ করেন এখনও অনেকে কাজ কর্ম্ম চালাইতেছেন।

ভীমবাবুর আকর্ষণে যেমন অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক এখানে আসিয়া জমিদারী ও কৃষি কার্য্য আরম্ভ করেন আমি সেইরূপ তাঁহার আকর্ষণে এদেশে আসিয়া একমাত্র কৃষিকার্য্য লইয়া দিন যাপন করিতেছি।

ভীমবাবু এখানে একটি বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এখানে অধিকদিন বসবাস করিতে না পারায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় নাই। তিনি এখানে তিন বৎসর মাত্র বসবাস করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষি কার্য্যে কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই। সেজন্য একটি চাকরী লইয়া নেপাল রাজ্যে গমন করেন তাহার পর Bengal National council of Educationএ যোগদান করেন এখন কি করিতেছেন তাহা জানিনা।

আমি পুর্ব্বে মজফরপুরে কৃষি কার্য্য করিতেছিলাম। এখানকার বিষয় পাঠ করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া এখানে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য করিব স্থির করি।

যে ভাবে আমাদের দেশে কৃষি কার্য্য হয় এখানে সে ভাবে কাজ করা যায় না কারণ এখানে বর্ষা অত্যন্ত অল্পকালস্থায়ী। এখানে বৃষ্টি কৃষককে কিছুমাত্র অবসর দেয় না একেবারে আসিয়া চলিয়া যায় কোন বৎসর দুইমাস একাধিক্রমে বৃষ্টি হইয়াছে কোন বৎসর একাধিক্রমে তিন মাস কাল বৃষ্টি দেখিয়াছি এই ভাবে এখানে বর্ষা কাটে সে সময় এখানকার জমি একেবারে গলিয়া যায়। আর বৃষ্টি থামিয়া যাইবার পরে ৪।৫ দিনের মধ্যে কর্ষণ আরম্ভ করে যাহারা শীঘ্র জমি তৈয়ারী করিয়া লয় তাহারা জমি হাতে রাখিতে পারে নচেৎ একবার জমি শক্ত হইয়া গেলে আর উহা কর্ষণ করিবার কোন উপায় থাকে না।

এখানে অধিক বৃষ্টিতে বর্ষাকালের ফসল পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। আবার কখনও বৃষ্টি অভাবে শুকাইয়াও যায়। এরূপ অবস্থায় এখানে কৃষিকার্য্য করা দুরূহ ব্যাপার। এখানকার জমি Marl বা clay soil। তাহার উপর জমিতে এরূপ পরিমাণে কাঁশ জন্মে যে তাহাকে নষ্ট করা দুষ্কর ব্যাপার। সাধারণ কৃষকে নষ্ট

করিতে পারে না। এখানকার জমি চাষ করিবার জন্য এমেরিকা হইতে আমরা অনেক কৃষি যন্ত্র আনাইয়াছি যেমন Deep tilling machine, Disc ploughs, weaving mould-board ploughs, subsoil ploughs, এবং ভারী যন্ত্রাদি টানিবার জন্য একটি motor Tractor ও আনাইয়াছি কিন্তু এখানে কোন ক্রমেই জমি দুরস্ত করা যায়না। Irrigation canal এখানে নাই সেজন্য ইচ্ছামত কাজ করিবার কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। মজুর লইয়াও এখানে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় কিন্তু তাহাতে তত ক্ষতি হয় না কারণ এখানে আবশ্যক মত মজুর পাওয়া যায় আর মজুরের মজুরি ও মাস মাস মাহিনা ৪৲ ৫৲ ইত্যাদি। এখানে আরও দুইটি গুরুতর বিপদ আছে একটি তুষার পাত আর একটি শিলাবৃষ্টি এ' দুইটি দুই বৎসরে আমার ৫০০০৲ টাকা মূল্যের তৈয়ারী ফসল নষ্ট করিয়াছে। একবার কাটিবার সময় শিলা বৃষ্টিতে ২০০/ বিঘা জমির গম নষ্ট হইয়া যায়।

উন্নত কৃষির অভাবে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে দেশের কাজ করিব ও দেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধি করিব এই কামনা করিয়া এদেশে এই দারুণ জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। অনেক কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ ও নিদারুণ পরিশ্রম সব বৃথা গেল। এখন কি ভাবে চলিব ও কি ভাবে চলিলে কৃষির উন্নতি করিতে পারিব সে সকল সমালোচনা করিতে চাই। কারণ আপনারা ভুক্তভোগী, সহরে বসবাস করেন। আমি এখানে কৃষিকার্য্যে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলেও খাদ্য দ্রব্য আবশ্যক মত পাইয়া থাকি। ঘরের দুধ, ঘি, গম, ছোলা পাই। চাউল কিনিতে হয়। ভাল চাউল টাকায় /৮ পাওয়া যায়। তরকারী ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কেবল দিন কাটাইতে ও পেট চালাইতে এখানে আসি নাই। মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে এদেশে থাকা অসম্ভব।

কি উপায়ে কৃষিকার্য্য করিলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব ও দেশের ধনাগম হইবে তাহা আলোচনা করিতে চাই। দেশে উন্নত প্রণালীর বিদেশীয় যন্ত্রাদি লইয়া কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের আবশ্যক এ অর্থ কোথা হইতে আসিবে দেশের ধনকুবেরদের আর এসব কার্য্যে কিছুমাত্র আস্থা নাই তাহারা কোন ক্রমে এবিষয়ে উৎসাহ দিবেন বলিয়া মনে হয় না কারণ দেশে অর্জত্র দেশীয় শিল্প, কৃষি ও নানাবিধ ব্যবসা সম্বন্ধীয় Scheme সকলগুলিই একে একে হাত গুটাইয়াছে এখানে আমাদের Farm এর কয়েক ক্রোশ দূরে একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক বসবাস করেন তাঁহার নাম "পণ্ডিতদেশ পাণ্ডে" তিনি একজন mechanical Engineer. এখানে পাঞ্জাবীদের Gorawala Farm এর mechanical Engineer তাহার নিবাস দক্ষিণদেশে ওাঁধে গ্রাম নামক গ্রামে। তাহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে তাঁহাদের দেশে অনেক গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা একত্র হইয়া একটি কাযের

কারখানা স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু আবশ্যক মত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন না. তাহাতে তাঁহারা নিরুৎসাহ না হইয়া "পয়সা ফণ্ড" বাক্স একটি স্থাপন করিয়া দেশের লোকের নিকট থেকে একটি করিয়া পয়সা সংগ্রহ করিয়া আবশ্যক মত অর্থ সংগ্রহ করেন যে অর্থ সংগ্রহ হয় তাহাতে তাহাদের কাজ চলিয়া যায় এখন সে কারখানাটি দেশের গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

চেষ্টা করিলে আমরাও এই ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতে পারি। কি উপায়ে ভিক্ষা করিয়া এই কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে সেই সব বিষয় আলোচনা করিবার জন্য বর্ত্তমান পত্রের অবতারণা করিয়াছি। আপনারা অনেকদিন কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আপনাদের অজস্র পরিশ্রম অধ্যাবসায়ে আপনাদের কাজের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—এখন আপনারা চেষ্টা করিলে ও দেশের পাঁচজন গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিলে দেশে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতে পারা যায়। তাহাতে দেশের অন্নাভাব ঘুচিবে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সামান্য চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতে হইবে না। এইভাবে দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইবে।

(১) পয়সা ফণ্ড agricultural association আপনাদের Indian Gardening association এর একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে স্থাপিত হইলে ক্ষতি কি? আপনারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া এরূপ কয়েকজন উৎসাহি লোককে Director রূপে মনোনিত করিবেন যে তাহারা আন্তরিকভাবে এই সঙ্ঘের উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইবেন। সকলেই উচ্চপদস্থ ও রাজসরকারের জানিত ও শ্রদ্ধার পাত্র হইবেন কারণ রাজ সরকার এই schemeকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে না পারেন।

(২) যেমন কয়েকজন Director নির্ব্বাচিত করিতে হইবে সেইরূপ আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েকজন প্রচারকের আবশ্যক হইবে। প্রচারকেরা associationএর উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবেন ও পয়সা সংগ্রহ করিবেন।

(৩) কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবার স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধেও আমি বিশেষ কিছু লিখিতে চাই না তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে এরূপ স্থানে জমি নির্ব্বাচিত হইবে যে সে স্থান হইতে কল্পিত কৃষিক্ষেত্রের মালামাল সহজে কলিকাতায় লইয়া যাইতে পারা যায় ছোটনাগপুর, রাঁচি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া মেদিনীপুর, আসাম, শিলং ইত্যাদি স্থানে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা করা উচিত ঐ সকল স্থানে একসঙ্গে অধিক জমি পাওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে একত্রে অধিক জমি পাইবার সুবিধা নাই সেজন্য পশ্চিম বা পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন স্থানে কৃষিক্ষেত্র করা অসম্ভব।

কৃষিক্ষেত্রের নিকটে অধিক পরিমাণে জঙ্গলময় জমি থাকিলে গোপালন করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। কারণ বঙ্গদেশের কোন স্থানে এরূপ জঙ্গলময় জমি পাইবার

সুবিধা নাই। কৃষিক্ষেত্রের সংলগ্ন একটি গোশালাও স্থাপিত হইবে। কিভাবে Dairy farm স্থাপিত হইবে association তাহার বন্দোবস্ত ও আয়োজন করিবেন।

কৃষিক্ষেত্রের জন্য এরূপ জমি বন্দোবস্ত করিতে হইবে যাহাতে বাঙ্গালির প্রধান আহারীয় ধান অধিক পরিমাণে জন্মিতে পারে। পরে গম, ছোলা, মুগ, কড়াই ইক্ষু, কার্পাস ইত্যাদি ফসল সমুদয় জন্মিতে পারে। ইক্ষু চাষের জন্য বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক হইবে। ভিক্ষা করিয়া সংগৃহীত অর্থ অন্ততঃ ৫০০০৲ একত্র জমা না হইলে কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইবে না।

কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবার জন্য ২৫০০০৲ টাকার আবশ্যক হইবে। association ভিক্ষা বৃত্তির দ্বারা ঐ অর্থ সংগ্রহ করিবেন।

আসামে এখনও অনেক জমি পতিত ভাবে রহিয়াছে কিন্তু সেখানে মজুরের সুবিধা একেবারে নাই। অপর স্থান থেকে মজুর সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় দেখা যায় না। চট্টগ্রামে ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইতে পারে সেখানে এখনও বিস্তর জমি পতিত রহিয়াছে। চট্টগ্রামে মজুর কিভাবে ও কিরূপ পাওয়া যায় আমি তাহা বিশেষরূপে জানিনা। আপনারা সংবাদ লইতে পারেন।

একদিকে পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্যে যুগান্তর আনায়ন করিয়া দেশের অশেষ কল্যান সাধন করিতেছে আর অপরদিকে আমরা হাত পা ছুড়িয়া কেবল মজুর মজুর করিয়া চিৎকার করিয়া "কৃষিকার্য্য ভদ্রলোকের নয় উহাতে আমাদের চলে না" বলিয়া পরের দাসত্বে মনোযোগ দিতেছি। এরূপ কল্পনা লইয়া কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা অসম্ভব। দেশের দুঃখ দূর করিতে হইলে সংযত চিত্তে মজুরের ন্যায় পরিশ্রম করিতে হইবে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনয়ন করিয়া পরিশ্রম লাঘব করিতে হইবে। দেশের ভরসা স্থল যুবকদিগকে এইকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে (গোজাতির) উন্নতি করিতে হইবে। চির দারিদ্রে আচ্ছন্ন দরিদ্র কৃষকদিগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৃষির উপকারীতা প্রচার করিতে হইবে তবে আমরা দেশের অন্ধকার দূর করিতে পারিব। দেশে আবার নবযুগের আবির্ভাব হইবে।

"একমাত্র মজুরের উপর নির্ভর করিয়া কৃষিক্ষেত্রের কাজ চলিবে না।" যাহারা প্রচারকরূপে নিযুক্ত হইবেন ও অর্থ সংগ্রহ করিবেন সংগ্রহ কার্য্য শেষ হইলে তাহাদেরই কাজে লাগিতে হইবে।

একজন কৃষক একজোড়া দুর্ব্বল বলদ লইয়া সমস্ত দিনে হয়ত এক বিঘা জমি কর্ষণ করিতে পারিবে না আর সেই স্থলে আমরা একখানি Disc plough ও ৪টি বড় বলদ লইয়া বিনা মজুরের সাহায্যে ৪/ বিঘা জমি গভীরভাবে কর্ষণ করিতে পারিব ও তাহার ফলন সাধারণ কৃষকের জমির ফলন অপেক্ষা অধিক হইবে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে

আমরা প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক পৃথক উন্নত পদ্ধতীতে কাজ করিয়া কৃষিক্ষেত্রকে চিরস্থায়ী করিয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারিব।

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা আপনারাও যথেষ্ট করিতেছেন সেজন্য এ সকল কথা আপনাদের নিকট নূতন করিয়া বলিবার কোন আবশ্যক দেখিনা।

আমার এই বর্ত্তমান আকাশ কুসুম কল্পনা সম্বন্ধে একবার ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিবেন ও শীঘ্র আমাকে ইহার উত্তর দিবেন আমি নিশ্চেষ্ট হইয়া এখানে আর থাকিতে চাইনা কোননা কোন উপায়ে শীঘ্র একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা করিব। আমার সহিত পত্রাদি ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। আমি এক সময় আপনাদের officeএ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতাম আমার নিবাস উত্তর পাড়ায়। কলিকাতার 20 Raja's Lane এর সতীশচন্দ্র মিত্র আমার মাতুল। কাশীপুর Agri Horticultural garden ইত্যাদি স্থাপন কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ৺হেমচন্দ্র মিত্র আমার মাতুল ছিলেন। কলিকাতায় আমার অনেক আত্মীয় স্বজন আছেন। আমার বিষয় যদি কিছু অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে নং ১ ঈশ্বর ঠাকুর লেন দর্জ্জিপাড়া নিবাসি ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসুর নিকট আমার সমুদয় কার্য্য বিবরণ জানিতে পারিবেন।

উত্তর—কৃষিকার্য্যে আপনার উৎসাহ দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। যে কোন কার্য্যে প্রাণ মন সমর্পণ না করিলে তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

কিন্তু আপনার কৃষিকার্য্যে ঠিক স্থান নির্ব্বাচন হয় নাই। সকল দিক ভাবিয়া কার্য্য না করিলেই ঠকিতে হয়। আবার সব গুছাইয়া লইয়া তবে কাজে নামিব একথাও ঠিক নহে। কোন না কোন বিঘ্ন সর্ব্বত্রই আছে। বাঙলার স্থানে স্থানে ও আসামে অতিবৃষ্টির ভয় আছে, পশ্চিমে অনাবৃষ্টির আশঙ্কা আছে, হিম প্রধান দেশে তুষারপাতে শস্য হানির সম্ভাবনা।

উত্তর ভারতে এক জায়গায় একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন না করিয়া ৩টি বা ততোধিক কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। যে যেখানে যে প্রকার কৃষির সুবিধা সেই মতই বন্দোবস্ত থাকিবে। সরকারী কৃষিক্ষেত্রগুলি একভাবে কার্য্য। এই কৃষিক্ষেত্রগুলি সরকারী কৃষিক্ষেত্রগুলি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবে। ধনীগণ সহজে আসরে নামিতে রাজী হইবে না এবং নামিলেও তাঁহারা ও তাঁহার পার্শ্বচরগণ অযথা বিড়ম্বনা উপস্থিত করিবেন যেহেতু স্বভাবতই তাঁহারা বড়ই প্রভুত্ব প্রিয়।

সাধারণের মঙ্গলের জন্য কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিতে হইলে সাধারণের নিকট হইতে "পয়সা ফণ্ড" অথবা আনি ফণ্ড কিম্বা রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের মত সিকি ফণ্ড স্থাপন করাই ভাল। একার্য্যে পরমহংসদলের মত আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী প্রচারকের আবশ্যক। গরীবদের অমিতব্যয়ী ফ্যাসনেবল্ ট্রাভলার দ্বারা কোন কাজ হইবে না।

কেবল কৃষিতে কাজ চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে ফলের বাগান, গোশালা ও পশুপক্ষী পালন করিতে না পারিলে লাভ হয় না।

কলের লাঙ্গল এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। নরম মাটিতে ও অল্প জায়গায় কলের লাঙ্গল চলিবে না। অল্প দামের উন্নত কৃষি যন্ত্র কিছু কিছু ব্যবহার আবশ্যক। এ দেশে মজুরের এখনও নিতান্ত অভাব হয় নাই। দেশের লোকদিগকে যখন কাজে লাগান আবশ্যক তখন কলের লাঙ্গলের দিকে অত ঝোঁক দিলে চলিবে না। অল্প ব্যয়ের ও সময় বাঁচাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কৃষকে আমরা এই ভাবের অনেক কথার আলোচনা করিয়াছি দেখিবেন।

ভারতীয় কৃষি সমিতি দেশের কল্যাণকর যে কোন কৃষিকর্ম্মে যোগদান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

বেগুন গাছের গোড়ায় পোকা—

শ্রীতারিনীপদ মজুমদার, বারাশাত ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন—আমার ক্ষেতে বেগুণ গাছগুলির অধিকাংশ শুকাইয়া যাইতে দেখিয়া আমি কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকি। ইহা পোকার উপদ্রব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহা সুড়ঙ্গকারী বেগুণের পোকা নহে। ইহা এক প্রকার উইয়ের মত পোকা; আকৃতিতে প্রায়ই উইয়ের মত, কিঞ্চিৎ অধিক লম্বা ও সরু এই মাত্র প্রভেদ। ইহারা মাটির নিচে গাছের গোড়ার ছাল খাইয়া ফেলিতেছে। প্রতিকারের উপায় কি?

উত্তর—যে গাছ মরে নাই তাহার গোড়া খুড়িয়া পোকা যদি থাকে তবে মারিয়া ফেলিতে হইবে এবং কিঞ্চিৎ রেড়ীর খৈল চূর্ণ দিয়া গোড়া পুনরায় মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রেড়ীর খৈল অভাবে অন্য খৈলের সহিত আড়াই সেরে ১ তোলা এই মাত্রায় তুঁতের গুঁড়া মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিবেন। গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রের ঐ প্রকার পোকার উপদ্রব হইয়াছে আমরা আরও কয়েক প্রকার প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করিয়াছি। ফলাফল পরে জানাইব।

চন্দ্রালোকে উদ্ভিদ—

শ্রীমণিরুদ্দীন বিশ্বাস, রঘুনন্দনপুর, ফরিদপুর।

প্রশ্ন—সূর্য্যালোকে উদ্ভিদের যে প্রকার উপকার হয় চন্দ্রালোকে তেমন কোন উপকার হয় কি না?

উত্তর—সূর্য্যালোকের মত উপকার না হইলেও কতকগুলি কোমল প্রকৃতির উদ্ভিদের উপর চন্দ্রালোকের প্রভাব দৃষ্ট হয়। রৌদ্রের উত্তাপে অনেক উদ্ভিদকে

ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতে দেখা যায় কিন্তু চন্দ্রের শীত রশ্মিতে তাহারা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। পদ্মজাতীয় পুষ্পগুলি চন্দ্রালোকে ফুটিয়া উঠে। অনেক লতা গুল্ম আছে তাহাদের ফুলগুলি রাত্রাগমে ফুটিয়া থাকে এবং অনেকেরই রাত্রে গন্ধ থাকে, দিবালোকে গন্ধ থাকে না। সূর্য্যের রশ্মি অপসৃত হইলেই চন্দ্রের কোমল কমনীয় প্রভাব যেন তাহাদের উপর ক্রিয়া করিতে থাকে। বিজ্ঞান মত বিচারে ইহার গুণাগুণ এখন কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই।

আলুতে সুতুলে পোকা—

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ পাল, নছিপুর, পোঃ তারকেশ্বর।

প্রশ্ন—বর্ত্তমান বর্ষে আলুর ফলন মন্দ হয় নাই। বিঘাতে ৭০ মণ ফলিয়াছে। আলুর দর বর্ত্তমান বর্ষে কম। নূতন আলু ১৸০ হইতে ২৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। এখন দর ২৸০ হইতে ৩৲ টাকা। কিন্তু আর রাখা যাইতেছে না, কারণ আলুতে এক প্রকার সূত্রবৎ পোকা লাগিয়াছে। পোকাগুলি এক 'য'র (সিকি ইঞ্চ) কম। আলুর গাত্রে ছিদ্র দেখা যাইতেছে, ভিতরে পোকা, ফলে আলু অত্যন্ত অধিক পচিতেছে এবং পচা আলু একদিন বাছাই করিতে বিলম্ব হইলে মহা অনর্থ ঘটিতেছে।

উত্তর—এখন আলু নিত্য বাছাই করা ভিন্ন উপায় নাই। যেখানে বেশ হাওয়া পায় এমন শুষ্ক স্থানে আলুগুলি স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। পোকা সমেত আলু Pusa Research Instituteএ পাঠাইলে পোকার নাম ও পোকা সম্বন্ধে বিবরণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় জানা যাইবে।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

উচ্ছে বা করলা

ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য লিখিত

করলা সমগ্র ভারতবর্ষের পরিচিত উদ্ভিদ্। এই জন্য ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। মাত্র আলোচনায় সুবিধার জন্য দুই একটা কথার আবশ্যক। ইহা লতা জাতীয় উদ্ভিদ, মাটির সকল রকম অবস্থাতেই ইহার উৎপত্তি হয়। জমি আবাদ করিয়া কৃষকগণ যে করলা জন্মাইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ তবে "পুটুলে" উচ্ছে বলিয়া এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার উচ্ছে স্বভাবত আপনা হইতেই বনে জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে। মোটের উপর করলা তিন প্রকার, পুটুলে, জঙ্গুলে আর বৃহদাকার। এই তিন জাতীয় করলাই তিক্ত। পুটুলে উচ্ছে যাহা জঙ্গলে আপনি জন্মে, তাহা অত্যধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা খাইতে কৃষিজাত করলা হইতে উৎকৃষ্ট। ঔষধার্থে বুনো এবং পুটুলে করলাই অধিক ব্যবহৃত হয়। কৃষিজাত উচ্ছে রবিখন্দ মধ্যে গণ্য। এই জন্য সকল সময় পাওয়া যায় না। বনজাত করলা সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে পাওয়া যায়।

এই বুনো করলার, ধান্যক্ষেত্র জাত "মধুলতা" নামক একরূপ অতি তিক্ত লতিকার সহিত পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। মধুলতা অতিশয় তিক্ত। ইহার ফল আর পুটুলে উচ্ছে দেখিতে অবিকল এক। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষুতে মাত্র পার্থক্য ধরা যায় মনুষ্যের মস্তকে শ্লেষ্মাবদ্ধ হইলে এই লতার নাস দিয়া তাহা বাহির করা যায়। আবার পশু চিকিৎসায় মধুলতা শ্রেষ্ঠ ভেষজ। যাহা হউক বুনো আর কৃষিজাত করলার সঙ্গে মধুলতার মিল আছে। কাশী প্রদেশে যে উচ্ছে পাওয়া যায়—তাহা বঙ্গদেশীয় উচ্ছে অপেক্ষা অনেক বড়। আবার বঙ্গের স্থানে স্থানেও বড় উচ্ছে জন্মে। কিন্তু তাহাও অধিক নহে। তাহার গাছ মাটিতে লতিয়া বেড়ায় না, মাচা বান্ধিয়া বা আশ্রয় দিয়া তবে রক্ষা করিতে হয়।

বঙ্গীয় করলা হইতে কাশী প্রদেশীয় করলা অতি রসাল এবং অধিক তিক্ত। সম্ভবতঃ অধিকতর জল সেচন করিয়া আবাদ করা হয় বলিয়াই বোধ হয় এরূপ হইয়া থাকে। বস্তুত করলা জলা জমিতেও জন্মে। সাধারণতঃ বালুময় স্থানে ইহার উৎপত্তির আধিক্য দৃষ্ট হয়। আর্য্য ঋষিগণ ইহাও জানিতেন। তাই লিখিয়াছেন—

"জলজং কারবেল্লং স্যাৎতিক্তং ভেদকরং মতম্" এই করলার বহু ভাষায় বহু নাম আছে যথ সংস্কৃত—কারবেল্লী, কুরেল্লী সুষবী রাজবল্লী, তোপবল্লী ইত্যাদি।

মহারাষ্ট্রে—কড়ওয়াবল্লে।

হিন্দিতে—করেল্লা।

তৈলঙ্গে—কাকুরকায়া।

পারসিতে—করেল্লাহ।

আরবিতে—কিসমা উলিহিমার।

ইংরাজিতে—Harimorelica

ল্যাটিনে—মোসিম্বেলিরিয়া ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশে একটা না একটা প্রচলিত নাম আছে। সুপ্রসিদ্ধ ভাব প্রকাশকার বলেন—কারবেল্লং কটিল্লংস্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ। কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্ত নবাতলম্। জ্বর পিত্ত কফাস্রঘ্নং পাণ্ডু মেহ ক্রিমীন্ হরেৎ॥ তদ্‌গুণা কারবেল্লীস্যাদ বিশেষদ্দীপনী লঘুঃ। কারবেল্ল (করলা) কে কটিল্লও বলে, কারবেল্ল (করলা) অপেক্ষা কারবেল্লী ক্ষুদ্র, করলা শীতল, ভেদক, লঘু, তিক্ত অথচ বায়ুজনক নহে। জ্বর, পিত্ত বায়ু রক্তজ রোগ পাণ্ডু ও মেহরোগ নাশক। কারবেল্লীর গুণও এইরূপ কিন্তু বিষেতঃ দীপনও লঘু। চক্রদত্ত নামক বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার পত্রের রস দ্বারা বসন্ত পীড়ার চিকিৎসা উল্লেখ আছে যথা।

সুষবী পত্র নির্য্যাসং হরিদ্রা চূর্ণসংযুতম্
রোমান্তী জ্বরবিস্ফোট মসুরী যান্তয়ে পিবেৎ॥

অর্থাৎ করলা পত্রের রস হরিদ্রার গুড়া সহ খাইলে বিস্ফোট জ্বর হাম মসুরী (বসন্ত) রোগের শান্তি করে। আয়ুর্ব্বেদের এই মহামান্য আদেশ ব্যতীত আমরা ইহার পাতার ফলের, শিকড়ের গুণ বহুবার উপলব্ধি করিয়াছি। যথা—পিত্তনিঃসারক বলকারক বিরেচক শ্লেষ্মানিঃ সারক ক্রিমিনাশক, রক্ত সংশোধক এবং বাহ্য ব্যবহারে রক্ত রোধক, ধারক এবং স্নিগ্ধকারক। হরিদ্রা আর তিক্ত উদ্ভিদের নির্য্যাস সহ সেবনে ইহার গুণ বর্দ্ধিত হয়।

ইহার রক্ত শোধক শক্তির পরিচয় নিরক্ষরগণও পূর্ণ পরিজ্ঞাত। ডাক্তারি তিক্ত টিংচার সহ ইহার ব্যবহার করা যায়। ক্রিয়াগুলি অধিকাংশই পরীক্ষিত। ইহার পিত্ত নিঃসারক শক্তির পরিচয় শিক্ষিত কবিরাজগণের পরীক্ষিত। ডাক্তারি কোন পুস্তকে করলার উল্লেখ নাই। বিদেশী ঔষধ ব্যবহার প্রিয় ব্যক্তিগণ ইহা এক একবার পরীক্ষা করিবেন কি ?

আময়িক প্রয়োগ। যকৃৎ পীড়ায় ইহার ব্যবহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পিত্ত বমন আভ্যন্তরিক পিত্তবিকৃতি এবং পৈত্তিক অজীর্ণ এবং উদরাময় ইত্যাদিতে ইহা ব্যবহার করা যায়। রেচক গুণ আছে বলিয়া ইহা উদরাময় পীড়ায় যে উপকারী তাহা নহে; কেননা "যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই ক্ষয়" এই মহাসত্যের উপর নির্ভর করিলে উচ্ছে উদরাময় পীড়ায় ব্যবহার করা যায়। বস্তুত পিত্তকৃত কার্য্যের জন্য করলা পৈত্তিক উদরাময়ের ঔষধ। পাণ্ডু পিত্তকৃত সর্ব্বরূপ উপসর্গ; কামলা (জনডিস) প্রভৃতি রোগে ইহার পূর্ণ ব্যবহার হয়। পিত্তবদ্ধতা জন্য শিশুদিগের একরূপ দুর্নিবার কোষ্ঠ কাঠিন্য পীড়া জন্মিয়া

থাকে। এই উপসর্গে শিশু ক্রন্দন করিতে থাকে, দুধ তুলিয়া ফেলে, তাহার পেট ফুলিয়া উঠে, গলার ভিতর শ্লেষ্মা জমাট হওয়ায় একরূপ শব্দ হয়। মধ্যে মধ্যে শিশু চমকিয়া উঠে। এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে গৃহিণীরা করলা পাতার রস আর হরিণের সিং ঘসিয়া চন্দন তুল্য করিয়া সামান্য গোলমরিচ চুর্ণ সহ মাতৃদুগ্ধ দিয়া হরিদ্রার অল্পরস যোগে শিশুকে অঙ্গুলি দ্বারা অল্প অল্প খাওয়াইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাকে "আলুই" নামে অভিহিত করেন। "আলুই" বহু প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সদ্যজাত শিশুর জীবন এই শ্রেণীর ঔষধেই বঙ্গে রক্ষা পায়।

করলার রস আর পেঁপের দুগ্ধ এবং হরিদ্রার রস জনডিস্ (কামলা) পীড়ার প্রধান ঔষধ। স্বনাম ধন্য ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নের ব্যবস্থানুযায়ী কামলারোগ আরোগ্য করিতেন।

বুনো করলার নির্জ্জল রস ১ আউন্স, পেঁপের দুধ ½ আউন্স, কাঁচা হরিদ্রার রস ২ ড্রাম, সাধারণ লবণ ২০ গ্রেণ, অল্প উষ্ণ জল ২½ আউন্স মিশাইয়া দাগ করিয়া লইতে হয়। দিনে ২ বার ব্যবহার্য্য। আমি জানি একটি গড়ো গয়েলার সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাক্ত এবং ফুলিয়াছিল, যদুবাবুর এই ঔষধে ১২ দিনে আরোগ্য হইয়াছিল।

উচ্ছে পিত্তঘ্ন বলিয়া গৃহিণীগণ ইহাকে শুকতার ঝোলে দিয়া উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পিত্তবমন রোগে কচিফল পিসিয়া ২০ ফোটা মাত্রায় ব্যবহার করিলে উপকার হয়। বস্তুত শিশু জীবনের পক্ষে উচ্ছে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কোন স্থান হইতে রক্তপাত হইতে থাকিলে করলার পাতা বাটিয়া টাট্কা চুণের সহ ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ রক্তরোধ হয়। করলার পাতা বাটা অনুমান ½ পোয়া; নারিকেল তৈল ১ ছটাক, হরিদ্রার রস ১ ছটাক, নিমপাতা বাটা ১ ছটাক, কুইনাইন ২০ গ্রেণ মিশাইলে অতি উৎকৃষ্ট পাঁচড়ার ঔষধ হয়। ইহা ব্যবহার করিলে পাঁচড়ার জন্য জ্বর পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। বস্তুত করলা বিস্ফোটক প্রভৃতি পীড়ার প্রকৃত ঔষধ। শরীরের কোন স্থানে বিষফোড়া হইলে ইহার পাতা লবণসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। ডাক্তার Tarxaci ঔষধের অভাবে জ্বর ও যকৃৎ পীড়িত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত ভাবে মিক্সচার করিয়া দিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

কুইনাইন ২০ গ্রেণ, এসিড নাইট্রোমিউরিক ডিল্ ১½ ড্রাম, করলার রস ২ আউন্স পেঁপের দুধ ১ ড্রাম, কালমেঘ পাতার রস ২ আউন্স, জল ২ আউন্স, ৮ ভাগ করিয়া প্রাতে ও বেলা ১০টায় এবং সন্ধ্যায় খাইতে দিতে হয়। আমার একটী প্রমেহযুক্ত জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ পীড়িত আত্মীয় এই ব্যবস্থানুযায়ী ১ শিশি ঔষধ খাইয়া অর্দ্ধেক আরোগ্য হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে তাহার, প্রস্রাবের জ্বালা পুঁয পড়া পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছিল।

এই বিজ্ঞান প্লাবিত যুগে করলা এক নূতন শক্তি প্রকাশ করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত

করিয়াছে। বসন্ত ব্যাধির জন্য গোবীজের টীকা দিবার প্রথা বহুদিন হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। তাহার উপর আবার হোমিওপ্যাথিক কল্যাণে এবং ডাক্তারি Serum treatment এর প্রথার Melendrenum ইত্যাদি ঔষধ আর পীড়িতের পুঁয সঞ্চালন প্রক্রিয়া দ্বারা দেশে বসন্ত ব্যাধির প্রকোপ অনেক কমিয়াছে তথাপিও কম নাই। উচ্ছে রস কিন্তু এ সমস্তকে পরাস্ত করিয়াছে। ইহার নির্জ্জল রস অথবা টীংচার করলা পিচকারী যোগে চর্ম্ম নিম্নে (Hypodermic) প্রবেশ করাইলে বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। এবং বসন্ত পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি ইহা দ্বারা আরোগ্য পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই আবিষ্কার আয়ুর্ব্বেদীয় সম্মত।

ভারতীয় পুরাতন চিকিৎসকগণ এই তত্ত্ব বহুদিন হইতে জানিতেন। সম্প্রতি ইহা বহু ব্যাপক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। দেশীয় ল্যাবরেটরীতে উচ্ছের টিংচার প্রস্তুত হইয়া দেশময় প্রচার হওয়া আবশ্যক নহে কি ?

দেখিয়াছি কাশীতে বসন্ত পীড়ায় দেশীয় চিকিৎসকগণ যাহার বসন্ত উঠিয়াছে অথব উঠিবার উপক্রম হইয়াছে তাহাকে হরিদ্রা অনুপানে করলার রস খাইতে দিয়া গুপ্ত মসুরিকাগুলিকে উঠাইয়া লইয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। প্রায়ই অধিকাংশস্থলে খাইতে না দিয়া শরীরের "ছোব" অর্থাৎ নেকড়ার পুটলী যোগে উচ্ছেবাটা আর কাঁচা হরিদ্রার রস, অভাবে শুষ্ক হরিদ্রার গুড়া সহ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা জ্বর, জ্বালা, যন্ত্রনা, চুলকোনা, বেদনা ইত্যাদি দূর হয়। বস্তুত করলা এই পীড়ার প্রধান ঔষধ।

ইহার পাতার, শিকড়ের আর ডাঁটার গুণই অধিক। অভাবে ফল ব্যবহার হয়। বসন্ত প্রভাব সময়ে পাতার রস হরিদ্রাসহ প্রত্যহ খাইলে পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকেনা। ইহা আমার পূর্ণ পরীক্ষিত। সহর এবং উক্ত প্রধান স্থানে এই পীড়ার আধিক্য প্রায়ই দৃষ্ট হয় এই সকল স্থানবাসিগণ করলা পাতার রস ব্যবহার করিবেন। অভাবে খাদ্য সহ স্নিগ্ধভাবে ব্যবহার করিবেন। বর্ণী বাহুল্য ভাজা উচ্ছে খাইলে তত গুণ পাওয়া যাইবে না। (স্বাস্থ্যসমাচার)

শিকড় ছাঁটা—গাছের খুব তেজ বৃদ্ধি হইলে শিকড় ছাঁটার আবশ্যক হইয়া পড়ে। পুষা ক্ষেত্র হইতে বিধি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গাছের গোড়া হইতে অন্ততঃ ৬ ফিট দূরে গোল নালা কাটিতে হইবে, ইহা অন্ততঃ ৩ ফিট গভীর হইবে। খাদ খননের যে সকল শিকড় বাহির হইবে তাহা কাটিয়া দিলে গাছগুলির তেজ কমিয়া সমধিক পরিমাণে ফলপ্রসূ হয়। ৬ ফিট অন্তরে খাদ খুঁড়িয়া অধিক শিকড় না পাইলে গোড়ায় আরও সন্নিকটে খাদ খোঁড়ার আবশ্যক হয়। আবশ্যক কতগুলি শিকড় কাটার। শিকড় তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা দ্বারা কাটা কর্ত্তব্য। শিকড় কাটার পর খাথের যে মাটি তুলিয়া উপরে

রক্ষা করা হইয়াছে সেই মাটির সহিত আবশ্যক মত ১২ হইতে ২৪ ঝুড়ি গোয়ালের সার মিশাইয়া তদ্বারা গর্ত্তটি পুনরায় পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যে আশু প্রতিকার হয় তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গোবিন্দপুর ক্ষেতে বিগত আশ্বিনের ঝড়ে কতকগুলি পেয়ারা গাছ ঝড়ে আড় হইয়া পড়ে। ইহাতে তাহাদের কতকগুলি শিকড় ছিড়িয়া যায় এবং সেগুলিকে সোজা করিয়া তুলিবার সময় অপর পার্শ্বের কতকগুলি করিয়া শিকড় কাটার আবশ্যক হয়। অতঃপর পাঁক মাটি ও গোময় সার দিয়া তাহাদের গোড়াগুলি যত্ন পূর্ব্বক বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমাণ সময় সেগুলিতে অপরিযাপ্ত পেয়ারা ফলিতেছে।

মিশ্র ফসল—ভারতবর্ষে শরিষা, গম কিম্বা শরিষা মটর অথবা ছোলা গম একত্রে এক সঙ্গে রোপণের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে যদিও একটা ফসল নষ্ট হয়, অন্য ফসল হইতে কিছু আয় হইবে। গমের শিকড় অপেক্ষা ছোলার শিকড় মাটির অধিক নিম্নে প্রবেশ করিতে পারে। গমের শিকড় ভাসা। অনাবৃষ্টি বা অন্য কারণে মাটি নিরস হইয়া পড়িলে গম মরিয়া যায় কিন্তু ছোলা বাঁচিতে পারে। ছোলা, মটর মুসুর প্রভৃতি শুঁটিধারী শস্যের সহিত গমাদি শস্যের চাষ করিলে গমাদির আরও একটা উপকার দর্শে। শুঁটিধারী শস্য বায়ু হইতে নাইট্রোজেন টানিয়া লইয়া মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে এবং তাহাতে উভয় ফসলের উপকার হয়।

পুষা পরীক্ষা ক্ষেত্রে ইহা যে সত্য তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। সাধারণতঃ চাষীরা ক্ষেতে এক লাইন ছোলা, পরের লাইনে গম এই নিয়মে চাষ করে। পুষা ক্ষেত্রে দুই তিন লাইন গমের পর এক লাইন ছোলা বপন করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে ছোলার পরবর্ত্তী গমের গাছগুলি বেশ সতেজে বাড়িয়াছিল এবং তাহাতে গমের ফলনও অধিক হইয়া ছিল।

পাবনা জেলায় ধান ও আলু—এই জেলাতে ধান্য প্রচুর পরিমাণে হয় কিন্তু অধিকাংশই মোটা।

কয়েকটী প্রসিদ্ধ বিল আছে উহাতে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মে। বর্ষাকালে যমুনার ও পদ্মার জল বাড়িয়া প্রায় ৩ মাস কাল সমস্ত ঘাট, মাঠ জলে ডুবিয়া থাকে। এমন কি, স্থানে স্থানে ৭।৮ হাত জল হয়। এজন্য এই জেলায় আমন ধানেরই আবাদ প্রচলন, এবং সমস্ত স্থানে এই জাতীয় ধানেরই আবাদ করা হয়। ডাঙ্গা জমিতে আউস ধানও অল্পমাত্রায় জন্মিয়া থাকে।

এখানে কয়েকটী গ্রামে আমন ধানের জমিতে হাড়ের গুড়া সার ব্যবহার করা হইয়াছিল কিন্তু ভাল রকম ফল হয় নাই। আউস ধানের জমিতে হাড়ের গুঁড়া সার বিঘাপ্রতি ১৴ মণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল। আউস ধানের পর ঐ সকল জমিতে আলুর আবাদ হইয়াছিল।

এই জেলাতে আলুর আবাদ একেবারেই হইত না। কৃষি বিভাগের যত্নে কয়েক বৎসর হইতে সদর মহকুমায় মথুরা থানার অন্তর্গত কয়েকটী গ্রামে আলুর আবাদ করিয়াছিল সকলেই উহাতে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কৃষকদিগকে আলুর বীজ আনাইয়া দেওয়া হয় এবং ফল উঠিয়া গেলে বীজের মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

হাত লাঙ্গল বা চাকা কোদালী—আলু, মরিচ, পিঁয়াজ, রশুন প্রভৃতি যে সব শস্য লাইনবন্দী করিয়া লাগান হয়, তাহাদের গোড়ায় মাটী দেওয়া, নিড়ান করা, ঘাস বাছা প্রভৃতি কাজে এই যন্ত্র বিশেষ উপযোগী, অতি সহজে এবং অনেক কম সময়ে এই যন্ত্রের সাহায্যে এই সব কাজ করা যায়; একজন লোক এই যন্ত্র দিয়া এক দিনে ৪ জন লোকের কাজ করিতে পারে। ইহার মূল্য ২২॥০ টাকা মাত্র।

বাগানের মাসিক কার্য্য

শ্রাবণ মাস।

সব্জীবাগান।—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটি, বেগুণ, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি, প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি, তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (Sun-flower) মাটিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারি করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গামলা বদলাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কেহ কেহ সময়

না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন। মূলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়। ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিফা প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুতিয়া এই সময় বাড়াইতে পারা যায়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘণ ঘণ বৃষ্টি হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছে ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ভরা বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারি করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রমাসের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইতে পারে।

শস্যক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধানের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে বীজ ধান্য রোপনের উপযুক্ত সময়। বর্ষারম্ভ হইলেই বীজতলাতে ধান বুনিয়া বীজধান (ধান্য চারা) তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি বিচালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি

গাছের গোড়ায় এই সময়ে গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময়ে ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

সব্জী ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয় দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেত্রের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এমাসে পুতিলেও চলিতে পারে। বেগুণ, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোঁয়াস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁক আলুর বীজ পুতিবে। শাঁক আলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেস কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটে।

বাগানের বেড়া।—আষাঢ় মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই ক্ষেতের বা বাগানের চারিদিকে বেড়ার বীজ বপন করিয়া বেড়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। লোকে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র ঘিরিয়া রাখিতে পারে না। ক্ষেতে যখন ফসল থাকে তখন সকল চাষাই গরু বাছুর আটক করিতে চেষ্টা করে এবং গৃহস্থ গো মহিষাদি চরিতে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্য করে। কিন্তু সকলকেই বাগান ঘিরিতে হইবে নতুবা গো মহিষ ছাগলের উৎপাত হইতে রক্ষা হইবার কোন উপায়ন্তর নাই। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ডুরোণ্টা বা মেহদী, ত্রিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালই উপযুক্ত সময়। জ্যেষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে হয়। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।



পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র, এম,এ, বি,এল।

ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ, এবং প্রাদেশিক কৃষি-সমিতির কৃষি-সদস্য, সাহিত্যসভা ও সাহিত্য-পরিষদের সভ্য, ভারতীয় কৃষি-সমিতির ডিরেক্টর, পল্লী-সেবক, বাঙলা সাহিত্যসেবক এবং ভারতে এক লিপি প্রচলনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৮শ খণ্ড। | শ্রাবণ, ১৩২৪ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

গোলাপের চাষ

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়

(Supdt. Nursery Garden I. G. A.) লিখিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা গোলাপ ছাটা ও গোলাপের আবশ্যকমত ফুল ফুটাইবার কথা বলিয়াছি। গোলাপের পাইট সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু গোলাপ গাছ বসাইবার সময় ও পদ্ধতি, কলম করা এবং গোলাপের সারের কথা না বলিলে সে আলোচনা সম্পূর্ণ হইবে না।

গোলাপ বসাইবার সময় পদ্ধতি—শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে বর্ষা শেষে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কিম্বা চৈত্র বৈশাখ মাসে গোলাপ বসাইবার উপযুক্ত সময়। সমতল ভূমি ভাগে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ এই তিন মাসই গোলাপ রোপণের উপযুক্ত সময়। পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে গোলাপ বসাইবার মরসুমের যত অগ্রে গোলাপ রোপণ করা যায় ততই ভাল, বাঙলার যত শেষে হয় ততই বেশ।

কখন কখন বা ভাদ্র আশ্বিন মাসে গোলাপ গাছ নাড়িয়া বসান হইয়া থাকে এবং তাহাতে গাছ খারাপ হয় না। স্থূলকথা আবহাওয়ার গতি ও মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া গোলাপ বসাইবার সময় নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অতি বর্ষার সময় গোলাপ গাছ রোপণ করিলে শিকড় পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং গাছ খারাপ হইয়া যায়। অত্যন্ত গরমের সময়েও গোলাপ বসান চলে না। গরমে শিকড় গজায় না কারণ রস পায় না এবং গাছ খারাপ হইয়া যায়। অত্যন্ত অধিক শীতের সময় গাছ বসাইলে গাছ বাড়ে না। শীতে

গাছ অসাড় হইয়া থাকে এবং বাড়িতে না পাইয়া ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া যায়। যে কোন গাছ বসাইবার কালেই বিঘ্ন ও বাধা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের বাড় বৃদ্ধি থাকে না। পাহাড় পর্ব্বতে, বা সমতল ভূমিতে বা নিম্ন প্রদেশে যেখানেই গোলাপ গাছ রোপণ করা হউক না, বসন্তাগমে যখন শীতের তীব্রতা কমিয়া আসে, সুখকর মৃদু উত্তাপ অনুভূত হইতে থাকে এবং গাছের জড়ত্ব অনেকাংশে দূর হইয়া যায় তখনই গোলাপ গাছ বসাইবার উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করা উচিত। আমরা সকলেই দেখিয়াছি যে বসন্তকাল উপস্থিত হইলেই যাবতীয় বৃক্ষ, লতা, গুল্মের নব পত্র বিকাশ হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে বৃক্ষ লতা শীতের পর পুনরায় সজীব হইয়া উঠিতেছে। সমশীতল কালই গোলাপ গাছের বৃদ্ধির সময়। বসন্ত কালে গোলাপ গাছ রোপিত হইলে তাহারা যথাসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আগামী দারুণ গ্রীষ্ম, অত্যধিক বর্ষায় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় এবং শীত পড়িলে আবার একটু ঝাড়িয়া উঠিয়া দারুণ শীতে অসাড় হইয়া কোন রকমে দিন কয়টা কাটাইয়া দেয়। পরে বসন্ত আরম্ভ হইলে পুনঃ সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া পুষ্পপত্রে নিজ অঙ্গ সুশোভিত করে।

সমতল ভূমির গোলাপ পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের গোলাপ সমতলভূমিতে আনিয়া রোপণ করিলে ভাল ফুল হয়। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে গোলাপ গাছ আনাইয়া রোপণ করিতে হইলে শীত কালই প্রশস্ত, কারণ এই সময় গাছগুলি রাস্তায় খারাপ হইয়া যাইবার ভয় নাই।

আমরা সময় সময় য়ুরোপ হইতেও গোলাপ গাছ আমদানি করিয়া থাকি। এরূপ ক্ষেত্রে গাছগুলি যাহাতে অগ্রহায়ণ মাসে ভারতে পৌছে এই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। গাছগুলি পৌছিবামাত্র তাহার মরা শুষ্কপ্রায় ডাল পাতা বা শীকড় প্রভৃতি ছাঁটিয়া দুরস্ত করিয়া লইতে হয় এবং একদিন ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া তাহাদের ধাতু ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। কিম্বা যদি দেখা যায় যে গাছগুলি শুষ্কপ্রায় হইয়াছে অর্থাৎ আতড়াইয়া পড়িয়াছে তখন তাহাদের শীকড় গুলি কিছুক্ষণ জলে নিমজ্জিত রাখিতে হইবে এবং তৎপরে শীকড়ে শুষ্ক মাটি মাখাইয়া লইতে হইবে। এইরূপে গাছগুলি সজীব হইলে তবে তাহাদিগকে স্বস্থানে রোপণ করা কর্ত্তব্য। গাছগুলি যথাস্থানে বসাইয়া তাহাদের গোড়ায় ঘাস কুটাচাপা দিয়া রাখা ও আবশ্যকমত জলসেচনের ব্যবস্থা করা চাই। গোড়ায় তৃণের আচ্ছাদান থাকিলে জল বাষ্পাকারে সহজে উড়িয়া যাইতে পারে না এবং গোড়া অধিককাল বেশ সরস থাকে। বিদেশাগত গাছ যদি ছাঁটা না থাকে বা ছাঁটা কম থাকে তবে সে গুলিকে বসাইবার পূর্ব্বে ছাঁটিয়া লইতে হইবে। এরূপ স্থলে গোড়া ঘেঁসিয়া ছাঁটাই কর্ত্তব্য। ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি লম্বা ডাল থাকিবে এই মাত্র। গাছ বসাইয়া ঘন ঘন জল প্রয়োগের আবশ্যক হইয়া পড়ে।

সাধারণতঃ কলমগুলি কাটিয়া লইয়া কিছু কাল হাপরে রাখিতে হয়। হাপরে

গাছ গুলি সারিয়া গেলে তবে উহারা ক্ষেত্রে বসাইবার উপযুক্ত হয়। হাপর হইতে তুলিবার কালে যদি কোন শিকড় ছিঁড়িয়া বা দলিয়া যায় তাহা ছাঁটিয়া ঠিক করিতে হয়। অতঃপর শিকড় গুলি মাটির গুলে আবদ্ধ করিয়া গাছগুলিকে অন্ততঃ একদিন ঘরে রাখিয়া গুল কথঞ্চিৎ নিরস ও দৃঢ় হইলে তখন ক্ষেত্রে বসাইতে হইবে। আটাল মাটিতে গুল বাঁধা ভাল। যদি দেখা যায় যে মাটির গুল গুলি অধিক শুকাইয়া উঠিয়াছে তবে সে গুলিকে কিয়ৎক্ষণের জন্য জলে নিমজ্জনের আবশ্যক হইয়া পড়ে। শিকড় চতুপার্শ্বস্থ গুল বা মৃত্তিকা কথঞ্চিৎ সরস থাকে এবং মাটি দৃঢ় সম্বন্ধ থাকিবে ইহাই নিয়ম। অধিক নরম বা অধিক নিরস হইলে চলিবে না।

গাছ বসাইবার কালে তিনটি কথা মনে রাখা আবশ্যক—(১) গাছের মূল যেন মাটীর অধিক নিম্নে না থাকে বা উপরে ভাসিয়া না থাকে। (২) গোড়ায় চারি পার্শ্বের মাটি ভালমতে চাপিয়া দেওয়া চাই এবং (৩) গাছ বসাইবার সঙ্গে সঙ্গে জল প্রদান আবশ্যক।

চারি প্রকারে গোলাপের কলম করা যায়—জোড় কলম, চোক কলম, কটিং ও দাবা কলম। কটিং বা দাবা কলমে গাছের গোড়া হইতে পরগাছা বাহির হইবার আশঙ্কা নাই কিন্তু জোড় কলম ও চোক কলমের গাছের এই আশঙ্কা খুব আছে। বসাইবার কালে সংযোগ স্থান পর্য্যন্ত মাটি ঢাকা দিয়া না বসাইলে এই বিপদ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সম্পূর্ণ মাটি ঢাকার নিতান্ত সুবিধা না ঘটে তখন আগাছার (Rosa Gygantia যাহার সহিত জোড় বাঁধা হইয়াছে) ডাল বাহির হইলেই কাটিয়া দিতে হইবে। অনেকে বলেন যে সংযোগ স্থানটি কিঞ্চিৎ উপরে ভাসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ এবং ১ বা ॥০ ইঞ্চ উপরে থাকিলেই গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হয়।

গোলাপের চারি প্রকার কলমের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা ব্যতীত আরও দুই প্রকারে গোলাপের চারা তৈয়ারি করা যাইতে পারে, বীজ হইতে এবং তেউড় হইতে। হাইব্রিড ডামাস্ক প্রভৃতি গোলাপের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তেউড় নির্গত হয় বটে কিন্তু সেগুলিকে মূল বৃক্ষ হইতে যথোপযুক্ত শিকড় সমেত বিচ্ছিন্ন করা কষ্টসাধ্য। এইহেতু গোলাপের তেউড় রোপণের জন্য কেহ বড় একটা অধিক চেষ্টা করে না। বীজ হইতে উৎপন্ন চারা গাছ বড় হইতেও অধিক সময় ব্যয় হয়, এই হেতু বীজের চারা অপেক্ষা চারা উৎপন্নের অন্য সহজ পন্থাগুলি অবলম্বন করা হইয়া থাকে। তবে যদি সাঙ্কর্য্য দ্বারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় গোলাপ উৎপন্ন করিবার আবশ্যক হয় তখন বীজের চারাই বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

জোড় কলম, চোক কলমের গাছগুলি পরাশ্রয় করিয়া জন্মে কিন্তু কটিং বা খোঁচা কলম, দাবা কলম, তেউড় রোপণ বা বীজের চারায় গাছ সকল স্বমূলের উপরেই

প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদিগকে ইংরাজীতে Roses on thier own roots বলে। স্বমূলে প্রতিষ্ঠিত গোলাপের আপদ বিপদ কম থাকে।

আমের গাছের যেমন জোড় Grafting বাঁধে গোলাপেরও সেই নিয়মে জোড় বাঁধা হয় এবং কুলের যে নিয়মে চোক budding কলম্ করা হয় গোলাপের চোক কলম করিতে সেই নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। চোক বা জোড় কলম করিতে হেজ রোজ বা ডগ্ রোজের চারার আবশ্যক। ডগ্‌রোজ (Rose canina), হেজ রোজ (Rosa Gygantia) এই উভয় গোলাপ খুব বৃদ্ধিশীল এবং ইহাতে ঘন সন্নিবিষ্ট কণ্টক থাকা হেতু এইগুলি লোকে বেড়া দিবার কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ষাকালে ইহাদের খোঁচা কলম (Cuttings) করা হয়। ইহাদের শিকড় শীঘ্র গজায়। বর্ষার মধ্যেই চারা তৈয়ারি হয় এবং বর্ষা শেষে তাহারা জোড় বাঁধিবার কাজে লাগে। শরৎ-কাল বা শীতের প্রারম্ভে গোলাপের জোড় বাঁধা হইয়া থাকে। অধিক শীতের সময় জোড় ভাল লাগে না। বডিং করিবার সময় শীতের শেষ বসন্তকাল—যে সময় গাছের চোক বাহির হয়। তৈয়ারি কটিংগুলি কার্ত্তিক মাসে স্বক্ষেত্রে রোপণের পর গাছগুলি ধরিয়া বসিলে ফাল্গুন মাস নাগাইত তাহাতে চোক বসান চলে। অত্যন্ত শীতের সময় বা দারুণ গ্রীষ্মের সময় বাদ দিয়া চোক কলম অপর সব সময়েই করিতে পারা যায়। স্থান বিশেষে অবস্থা বুঝিয়া সময়ের আগু পিছু করিয়া লইতে হয়।

কলম করা রীতিমত শিখা চাই। পাকা হাত না হইলে শতকরা ১০টা কলমও বাঁচেনা কিন্তু যাহারা সিদ্ধহস্ত তাহাদের জোড় কিম্বা চোক বা জিব কলম একটাও মরে না। কলম পদ্ধতি আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

গোলাপের অধিকাংশই চোক কলম' কিন্তু জোড়ের গাছ অপেক্ষাকৃত সহজে হয় ও দৃঢ় হয় বলিয়া অনেকে এখন জোড় কলম করিবার পক্ষপাতী হইতেছে।

তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ভিন্ন জোড় কলম বা চোক কলম করা যায় না। জোড় বাঁধিবার জন্য ও চোক কলম করিবার জন্য স্বতন্ত্র ছুরি আছে।

গোলাপ পাহাড়িয়া জায়গায় ভাল রকম জন্মে বলিয়া অনেকেরই ধারণা যে উহারা শক্ত আটাল মাটি পছন্দ করে। এই ধারণা ঠিক নহে। কাদা দোয়াঁস মাটিই ইহার চাষের উপযুক্ত হয়। এইজন্য কাদা দোয়াঁস মাটির সংস্কার করিয়া লইয়া তবে তাহাতে গোলাপ চাষ করা হয় এবং শক্ত মাটির সহিত হাল্‌কা দোয়াঁস মাটি, পচা পাতা সার কিম্বা কাঠের ছাই মিশাইয়া লইতে হয়।

গোলাপ গাছের সার—উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী পদার্থসমূহ অল্পাধিক পরিমাণে সকল জমিতেই আছে। যে জমি যত অধিক তেজস্কর তাহা তত উদ্ভিদের বৃদ্ধির ও ফল ফুল প্রশবের অনুকূল। নিস্তেজ জমিতে সার দিয়া তবে কার্য্যকরী করিয়া লইতে হয়।

কাদা দোয়াঁস জমিতে গোলাপ গাছ ভাল জন্মিয়া থাকে। যে জমিতে আউস ধান, শণ, পাট, কপি, কালাই আদির চাষ হয় তাহাতে গোলাপ ক্ষেত করা চলে।

সগু বন কাটিয়া তাহাতে গোলাপ চাষ করিলে বিনা সারে কয়েক বৎসর খুব গোলাপ জন্মিয়া থাকে। বহুদিবস ধরিয়া পাতা পচা সার সঞ্চিত থাকায় এবং জমিতে বোদ মাটি (Humus*) অধিক মাত্রায় পাওয়া যায় বলিয়া এবম্প্রকার ফল হইয়া থাকে। গোলাপ ক্ষেতটি উচ্চ স্থানে স্থাপিত হইবে, জলনিকাশী পয়োনালা থাকিবে, জমিটি তেজস্কর হইবে এবং জলসেচনের সুবিধা থাকিবে তবে গোলাপ ক্ষেত রচনা করিয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

জমির অবস্থা বুঝিয়া যথাযোগ্য সার দিতে হয়। গাছগুলিকে শীঘ্র বাড়াইয়া তুলিবার জন্য নাইট্রোজেন-প্রধান সারের আবশ্যক এবং অধিক মাত্রায় ভাল ফুল ফুটাইবার জন্য ফস্ফরাস সার প্রদান করিতে হইবে। নাইট্রেট অব্ সোডা এবং সলফেট অব্ এমোনিয়া এই দুইটি অতি উত্তম ও তেজস্কর নাইট্রেজেন প্রধান সার। চিলিয়ান সোরা হইতে নাইট্রেট্ অব্ সোডা এবং কয়লার খনি হইতে সল্ফেট্ অব্ এমোনিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু খনিজ সার ব্যবহারের একটু বিপদ আছে ; ইহা কাদাযুক্ত মাটিকে আরও আটাল করিয়া তুলে এবং সেই মাটি চাষ কারকিত দ্বারা ফসল উৎপাদন উপযোগী করা একটু কষ্ট সাধ্য হইয়া পড়ে।

আর দুইটি নূতন সারের আমরা সন্ধান পাইয়াছি—নাইট্রোলিম (Cyanamide or Nitrolim) এবং নাইট্রেট্ অব্ লাইম। ক্যালসিয়ম কার্ব্বইড ও নাইট্রোজেন সংযোগে নাইট্রোলিম উৎপন্ন হয়। ক্যালসিয়ম কার্ব্বাইড ও সোরা সংযুক্ত করিলে নাইট্রোলিমের অনুরূপ সার প্রস্তুত করা যায় এবং সোরা ও কলি চুণ মিশাইলে নাইট্রেট্ অব্ লাইম উৎপন্ন হয়। ইহারা গোলাপের উপযুক্ত সার হইলেও অধিক তেজস্কর বলিয়া অতি সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

গোলাপ চাষের উপযোগী খনিজ সম্পূর্ণ সার—

সুপার ফস্ফেট—	১২ ভাগ
নাইট্রেট্ অব্ সোডা—	১০ „
সালফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া	২ „
„ আয়রণ—	১ „
„ লাইম—	৮ „

এই সবগুলিই খনিজ সার। যদি মাটি ভাল হয় তবে বাকিগুলি বাদ দিয়া

* Humus—A brown or black powder in rich soils formed by the action of air on animal or vegetable matter.

সালফেট অব, এমোনিয়া ২ পাউণ্ড এবং সুপার ফস্‌ফেট ৮ পাউণ্ড একত্র মিশাইয়া ১০ পাউণ্ড মিশ্র সার ৮০টা গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়।

আমি কিন্তু কৃত্রিম সার অপেক্ষা স্বাভাবিক সারের পক্ষপাতী। খনিজ সারের অনেক উপাদান এমন আছে যে জলে দ্রব হইয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় আসিতে বহুকাল বিলম্ব হয়, কখন বা আসেই না। মৃত্তিকাতে কিছু না কিছু খনিজ উদ্ভিদ খাদ্য বিদ্যমান থাকে কিন্তু সেগুলি থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ খাদ্যাভাবে মরিয়া যায়। এপক্ষে উদ্ভিজ্জ ও জান্তব সার বিশেষ কার্য্যকর। ইহারা সহজে জলে দ্রব হয়, শীঘ্র উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় আসে এবং ইহাদের দ্বারা মৃত্তিকার প্রাকৃতিক গঠনের পরিবর্ত্তন হইয়া চাষের উপযুক্ত হয়।

পশুশালার বা অশ্বশালার মল মূত্র গোলাপের খুব ভাল সার—

জন্তু বিশেষের মলমূত্রের গুণের তারতম্য আছে, কোনটি অধিক তেজস্কর, কোনটি কিছু কম। অশ্ব ও মেষ মল অপেক্ষা গোময় ও শুকর মল তেজী, হস্তিমলের তেজ আরও কম। যাঁহারা এই পশুশালার মল মূত্র ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক গাড়ী (২০ মণ) পশুশালার মল মূত্র মিশ্র সার ক্ষেতে প্রদান করিলে ক্ষেতে ১০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৪ পাউণ্ড ফস্ফেট এবং ১০ পাউণ্ড পটাস সার প্রদানের ফল পাওয়া যায়। অনাবাদী জঙ্গল জমি যাহাতে বোদা মাটির পরিমাণ অধিক—আবাদকালে তাহাতে যদি অল্পমাত্রায়ও পশুশালার সার ব্যবহার করা যায় তাহাহইলে সে জমিতে অধিককাল যাবত রস রক্ষা করা যায় এবং অনাবৃষ্টিকালে তাহার ফসল অধিকতর আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়।

এই কারণে আমরা বলি যে সকল সময় খনিজ বা রাসায়নিক সারের সন্ধানে না ফিরিয়া গোময় সারের সহিত কিছু হাড়ের গুড়া এবং পাক মাটি মিশ্রিত করিয়া গোলাপ গাছে প্রদান করিলে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

গোলাপের সহজ সার—

পরিণত গোময়—	১৫ সের
হাড়ের গুঁড়া—	৩ „
শুষ্ক পাঁক মাটি—	২২ „
	৪০ সের

৪০ সের সার ১৬০টা গাছে দেওয়া যায়। পূর্ণ মাত্রা সার এককালে প্রয়োগ না করিয়া দুই বারে দেওয়া ভাল। প্রত্যেক বার সার প্রয়োগের পর জল সেচন আবশ্যক। জমি অত্যন্ত নিস্তেজ হইলে সারের মাত্রা দ্বিগুণ বা চারিগুণ বৃদ্ধি করিতে হয়। সারের

মাত্রা ঠিক করা নিজের বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। বর্ষা অবসানে যখন গোলাপ গাছের ডাল ছাঁটিয়া গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয় সেই সময় গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ চূণ ছড়াইয়া দিলে বাঙলা দেশে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাঙলার মাটি বড় রসা, চূণ ছড়াইলে মাটি কথঞ্চিত শুষ্ক হইয়া আসে। চূণ দ্বারা আরও দুই একটি উপকার পাওয়া যায়। চূণ, মৃত্তিকা নিহিত উদ্ভিদ খাদ্যগুলিকে গলাইবার সুবিধা করিয়া দেয় এবং বোদ মাটি হইলে যদি তাহা অম্লাক্ত হয় তবে তাহার অম্লাক্ততা বিদূরিত করিয়া তন্নিহিত উদ্ভিদ খাদ্যগুলিকে গ্রহণোপযোগী করিয়া তুলে।

গোমুত্র—গোলাপ বা কোন গাছে সদ্য গোমূত্র প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় জল মিশাইয়া তরল সাররূপে ব্যবহার করা চলে। গোশালার পার্শ্বে একটি গামলা স্থাপিত করিলে তাহাতে পয়োনালা বাহিয়া যে মূত্র সঞ্চিত হয় তাহা ২।৩ দিন থাকিলেই পচিয়া সারে পরিণত হয়। টাটকা বা পরিণত মূত্র জল সংযোগ ব্যতীত ব্যবহার করা যায় না। টাটকা মুত্রে কিছু অধিক জল মিশাইতে হয়। মুত্রের পরিমাণ ১ সের হইলে তাহাতে ১০ সের জল মিশাইতে হইবে কিন্তু পচা মূত্র হইলে ৫।৬ সের জল মিশাইলেই যথেষ্ট।

নীল সিটী ও নীলের জল ও গোলাপের পক্ষে অনুকূল সার।

খৈল সার—কোন কোন উদ্যান পালক উপযুক্ত পরিমাণ গোময় বা গোমুত্র অভাবে খৈল সার ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। খৈল টাটকা ব্যবহার না করিয়া পচাইয়া ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

গলিত খৈল জলে গুলিয়া তরল সাররূপে ব্যবহার করা মন্দ পরামর্শ নহে। প্রত্যেক গাছে যাহাতে অন্ততঃ এক পোয়া হিসাবে খৈল ২ কিম্বা ৩ বারে পড়ে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

সোরা সার—ইহা নাইট্রোজেন প্রধান সার। নাইট্রোজেন অন্য প্রকারে প্রদান করিতে না পারিলে এবং অগু ফল পাইতে হইলে সোরা সার প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেক গাছের জন্য আধছটাক সোরাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়। সোরা জলে গুলিয়া অল্প মাটীর সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়।

চিমনির ভুসা বা ঝুল—গোলাপে প্রদান করা আবশ্যক। ইহারাও নাইট্রোজেন প্রধান সার। ইহাদের কাল রঙ হেতু ইহারা অধিক মাত্রায় সূর্য্য রশ্মি টানিয়া লয় এবং মৃত্তিকার উত্তাপ বৃদ্ধি করে। ইহারা কাদাযুক্ত আটাল মাটি কিম্বা ভারি মৃত্তিকাকে কথঞ্চিৎ আলগা করিবার ক্ষমতা রাখে।

পোড়া মাটি—গোলাপের বিশেষ উপকার হয়। মাটি পোড়াইলে মাটির

সারবত্তা বাড়ে ও অম্লাক্ততা নষ্ট হয়। গোলাপ গাছে যে কোন সারই দেওয়া হউক না কেন সারটি যেন সম্পূর্ণ সার হয়। যেন তাহাতে নাইট্রোজেন, ফস্ফেট ও পটাস বর্ত্তমান থাকে অধিকন্তু কিঞ্চিৎ চূণ, রঙের জন্য সামান্য মাত্রায় হিরাকস (Sulphate of Iron) ও ভুসা কিম্বা ঝুল (Lampblack or Soot) প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জমি বা মধ্য প্রদেশের জমি, রাঁচি অঞ্চলের জমি, যাহাতে যথেষ্ট লৌহ সাধারণতই আছে তাহাতে আর স্বতন্ত্র লৌহ দিবার আবশ্যক নাই। নতুবা হিরাকস যৎসামান্য, ১০০ ভাগ সারের সহিত এক ভাগ মাত্র হিরাকসই যথেষ্ট। ভুসা বা ঝুল এরূপ পরিমাণে প্রদান করিবে যে গাছের চারিপাশের মাটি কিয়ৎ পরিমাণ মশিবর্ণ ধারণ করে।

সারের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা বলিয়া দেওয়া বড়ই কঠিন, কারণ দেশ, কাল, গাছের অবস্থা, আবহাওয়ার গতি বুঝিয়া উহা নির্দ্ধারণ না করিলে পদে পদে ঠকিতে হইবে।

সার প্রয়োগের সময়—অতি বৃষ্টির বা অতিশয় গ্রীষ্মের সময় সার প্রদান অবিধেয়। বড় ফুল ফুটাইতে ইচ্ছা করিলে গোড়ায় শিকড় কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়া তাহাতে তরল সার সেচন করিতে হয়। শিকড় গুলি বাতাসে উন্মুক্ত করিয়া দিবার পর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে যখন গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া হয় তখন একবার সার দিতে হয়।

অত্যন্ত শীতের সময় যখন তুষার পাতের আশঙ্কা থাকে তখন শিকড় বাহির করিয়া সার প্রদান করিতে নাই। তখন সার দিবার আবশ্যক হইলে গাছের চতুর্দ্দিকে দূরে দূরে গর্ত্ত খুলিয়া তাহাতে তরল সার দেওয়া ভাল।

পাতাসার, ইহাতেও গোলাপের অনেক উন্নতি হইতে দেখা যায়। যখন পট বা গাম্‌লার গোলাপ তৈয়ারি করিতে হয় তখন পাতা সার ভিন্ন উপায় নাই। অল্প মৃত্তিকায় উদ্ভিদের খাদ্য প্রাচুর্য্য এক মাত্র পাতাসারেই দেখা যায়। ইহাতে উদ্ভিদের খাদ্য অল্প বিস্তর সকল গুলিই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোনটার মাত্রা কম থাকে তাহা পূরণ সহজেই হয়। গাম্‌লা গোলাপের পক্ষে (Potculture) ইহা নিতান্ত প্রয়োজন।

বাংলার আয়কর বৃক্ষাবলী।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত M.R.A.S.
(Botanist, Indian Gardening Association) লিখিত

প্রতি গ্রামে প্রতি পল্লীতে কতিপয় সংখ্যক বন্য অথবা অর্দ্ধবন্য বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকে এই সমুদয় বৃক্ষকে ও তৎসহ একত্র জাত লতা গুল্মাদির সমষ্টিকে জঙ্গল বলিয়া থাকে। অনেক স্থলে এইরূপ জঙ্গল দ্বারা গ্রাম্য স্বাস্থ্যের অপকার হয় বটে, কিন্তু ইহার উপকারিতাও আছে। কিছু দিবস পূর্ব্বে, যখন দেশে কয়লার প্রসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাদের জ্বালানী কাষ্ঠরূপে যথেষ্ট মূল্য ছিল এবং এখনও অনেক মূল্য আছে। কিন্তু বড় বড় সহরের নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম সমূহে একটা সাধারণ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে এইরূপ জঙ্গল অপকারী এবং সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস যোগ্য। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এই সমুদয় গ্রাম্য কুঞ্জে এমন অনেক গাছ আছে যে সমুদয় বাস্তবিকই রক্ষণ যোগ্য এবং গ্রামের উন্নতি সাধনের জন্য তাহাদের প্রতিপালনও আবশ্যক।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে বাংলা দেশের এইরূপ কয়েকটি প্রধান প্রধান আয়কর বন্য বৃক্ষাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। শাসন বিভাগ হিসাবে আজকাল বঙ্গদেশ যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে বংলার সেই সীমা অনুসরণ করা হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গের সহিত উদ্ভিদতত্ত্ব হিসাবে বিহার ও বঙ্গদেশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সুতরাং তাহারও কিয়দংশ এস্থলে বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অপরাপর দিকে বর্ত্তমান বাংলার সীমাই অনুসৃত হইয়াছে।

১। বাবলা

ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Acacia arabica willd সিন্ধু, রাজপুতানা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের উত্তরভাগই ইহার প্রকৃত জন্মস্থান এবং এই সমুদয় দেশেই বাবলার সুবিস্তৃত চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও নদীর চড়ায় পতিত জমিতে ও অন্যান্য স্থানে বাবলা জন্মিয়া থাকে। বাবলার কাঠ নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবহার গুলিই অন্যতম—ঘরের খুঁটি চৌকাট গাড়ীর নানাবিধ অংশ, লাঙ্গলের বাঁট ও জোয়াল, অন্যান্য কৃষি যন্ত্রাদির দারুময় অংশ, গুড় ও তৈলের কলের অংশাদি ও নৌকার অংশাদি।

এই সমুদয় ব্যবহার ব্যতীত বাবলা একটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি কাঠ। বাবলার কাঠের বাহ্যাংশ শ্বেতবর্ণ, মধ্যাংশ রক্তাভ। অধিক দিনের কাষ্ঠ হইলে মধ্যাংশ প্রায় কাল হইয়া যায়।

কাষ্ঠ অপেক্ষা ব্যবহারের হিসাবে, বাবলার ছালের অধিক মূল্য আছে। কারণ ইহা চামড়া কস করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কলিকাতায় অনেক চামড়া রঞ্জনের কারখানায় বাবলা ছালের যথেষ্ট কাটতি আছে। বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্বে ছালের মূল্য মণকরা প্রায় ১।৹ ছিল। বাবলা শুঁটিও উৎকৃষ্ট কস উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন ইহা একটি উত্তম পশু খাদ্য।

বাবলার গঁদ নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ছাপান বস্ত্রাদি প্রস্তুতে, কাগজের পালিসে, রং প্রয়োগে এবং ঔষধে অনেক পরিমাণ বাবলার গঁদ আবশ্যক হয়। অন্যান্য দেশে মেঠাই প্রস্তুতেও বাবলার গঁদ ব্যবহৃত হয়। বর্ণ ও গুণ হিসাবে বাবলার গঁদের মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। বড় বড় প্রায় স্বচ্ছ দানাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পাইকারি হিসাবে ইহার সের ১৲ টাকার কম নহে। অপকৃষ্ট দানাও ৷৷৹ আনা সেরের কমে বিক্রয় হয় না।

২। খয়ের

খয়ের, খদির, বৈজ্ঞানিক নাম—Acacia Catechu, willd—ভারত ও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে। অবশ্য ইহা অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জমিরই উদ্ভিদ। নিতান্ত সরস ও নিম্ন জমিতে খয়ের গাছ বড় একটা দেখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে খয়ের গাছ দেখা যায়। খয়েরের ব্যবহার নানাবিধ ; উৎকৃষ্ট খুঁটি, গাড়ীর প্রায় অধিকাংশ, পাতকুয়ার পাট, গৃহ সজ্জার অনেক দ্রব্য, তাঁতের অংশাদি, চিরুণি ও অস্ত্রাদির হাতল রূপে খদির কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। ইহার কাঠ অনেকটা বাবলার সমগুণ বিশিষ্ট ; সুতরাং যে সমুদয় কাজে বাবলা কাঠ আবশ্যক হয়, সে সমুদয় কাজে খদির কাষ্ঠও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

খয়ের কাঠের কাণ্ডের বাহ্যাংশ পীতাভ শ্বেত ও মধ্যাংশ রক্তাভ; উই কিম্বা অপর পোকা ইহাকে সহজে আক্রমণ করে না। এতদ্ভিন্ন ইহাতে অতি সুন্দর পালিস হয়।

কিন্তু খয়েরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য খয়ের প্রস্তুতের জন্য। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে খয়ের গাছের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। পশ্চিম বঙ্গে নানা স্থানে খদির প্রস্তুতও হইয়া থাকে। খদির প্রস্তুত প্রণালী আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত বিষয় নহে। যাঁহারা এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ভারতীয় বন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত বহুসংখ্যক বিবরণী প্রাপ্ত হইতে পারেন। সাধারনতঃ ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা মূল্যে খয়ের বিক্রয় হইয়া থাকে।

৩। কেলী কদম্ব

কেলী কদম্বের গাছ বেশী না হইলেও এতদ্দেশে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কাষ্ঠ পীত, দৃঢ়। এবং সহজে উত্তম পালিস হয়। নৌকা, প্যাকিং বাক্স,

চুরুটের বাক্স, নস্যর বাক্স, গৃহসজ্জাদি, চিরুণি খেলনা ও কৃষি যন্ত্রাদির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। রেলের স্লিপারের জন্তও ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিক দিবস টিকে না। প্রায় পাঁচ বৎসরের মধ্যেই খারাপ হইয়া যায়।

৪। বেল

কর্ষিত অথবা অর্দ্ধবন্য অবস্থায় বেলের গাছ অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ফলের জন্যই ইহার সমধিক আদর। ইহার কাঠ পীতাভ অথবা ধূসর বর্ণের। কৃষি যন্ত্র ও গাড়ীর অংশাদি, ঘানি ও আখ মাড়া কলের অংশাদি, চিরুণীর ইত্যাদি কার্য্যে বেলের কাঠ নিযুক্ত হয়। বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে বেলের খোলা হইতে মালা প্রস্তুতের ব্যবসার এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। আমাশয়ের ঔষধ রূপে বেল শুট দেশ বিদেশে অল্প বিস্তর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

৫। শিরিশ

শিরিশের গাছ খুব বড় হয়। কাষ্ঠের বাহ্যাংশ পীতাভ শ্বেত ও মধ্যাংশ রক্তাভ ধূসর বর্ণের। পালিস করিলে শিরিশের কাঠ সুন্দর দেখায়। সেইজন্য কাঠের উপর নক্সার কাজে ও সৌখিন গৃহসজ্জাদি প্রস্তুতের জন্য শিরিশের যথেষ্ট আদর আছে। আবার কাণ্ড কাষ্ঠ অপেক্ষা কাণ্ডের গাত্রে যে বহির্দ্দিকে প্রসারিত চওড়া কাঠ হয় নক্সার কাজে তাহার আদর আরও অধিক। এতদ্ভিন্ন খুঁটি, কুপের পাট, চিরুণী, লাঠি, খেলনা ইত্যাদি প্রস্তুতের পক্ষেও শিরিশ কাঠ বিশেষ উপযোগী। শিরিশের আরও ২।১টি জাতি বঙ্গদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের গুণাবলী প্রায় শিরিশেরই সমতুল্য।

৬। ছাতিম

ইহা পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গেই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ঔষধার্থ ছাতিমের ছাল কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ছাতিমের তরল সারের ক্রিয়া কুইনাইনের সমতুল্য। ছাতিম কাঠ শ্বেতবর্ণ; কোমল কিন্তু অধিক স্থায়ী নহে। ছাতিম কাঠ কাঁচা অবস্থায়ই চিরিয়া ফেলা ভাল। গুঁড়ি অধিককাল রাখিয়া দিলে বিবর্ণ হইয়া যায়। চা প্যাক করার ও অন্যান্য বাক্স প্রভৃতি, অল্প মূল্যের গৃহসজ্জা ও পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ছাতিম কাঠ ব্যবহৃত হয়।

৭ রোহিতক

অনেক স্থানে ইহাকে রড়াও বলে। রড়ার গাছ মধ্যমাকারের হইয়া থাকে। উহার কাষ্ঠ দৃঢ় ও রক্তবর্ণ। ঘরের জানালা কপাট প্রভৃতি, চা বাক্স নৌকার অংশাদি প্রস্তুতের ইহা বিশেষ উপযোগী। সুন্দর বনে ও নিম্ন বঙ্গের জলা অঞ্চল সমূহে আর

এক প্রকার রড়া দেখিতে পাওয়া যায়; উহাকে নটসীও বলে; উহার কাষ্ঠ হইতে হুঁকার নল প্রস্তুত হয়। রড়ার বীজে যথেষ্ট পরিমাণ তৈল থাকে এবং কোন কোন স্থানে ইহা জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয়।

৮ হিজলী বাদাম

মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমায় সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রদেশে ও চট্ট গ্রামের সমুদ্র উপকূলে এই গাছ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কাষ্ঠের রং রক্তাভ ধূসর বর্ণ। কাট শক্ত; প্যাক করা বাক্স ও নৌকার অংশাদি প্রস্তুতের জন্যই ইহার প্রধান ব্যবহার। হিজলী বাদাম ফল ও আটা উভয়ই ব্যবসায়ের দ্রব্য; বিশেষতঃ ফলের শাঁষ। শাঁষ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা উৎকৃষ্ট বাদাম তেলের সমতুল্য। খোসার তৈল গায়ে লাগিলে ফোস্কা হয়। কীটাদি নিবারণের জন্য ইহা বিশেষ উপযুক্ত। আটারও উক্তরূপ গুণ আছে।

৯ ধবা বাকলি

ইহা পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গেই অধিক। ইহার গাছ বেশ বড় হয়। উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরেই ধবা অধিক পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ পীতাভ ধূসর বর্ণ সেরূপ স্থায়ী নহে। গাড়ীর অংশাদি নির্ম্মাণের জন্যই ইহার প্রধান ব্যবহার। ধবার গঁদ ঔষধার্থ ও অপরাপর কার্য্যে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১০ কদম্ব

কদম্বের কাষ্ঠ পীতাভ ও কোমল। চার বাক্স, সালতি, জোয়াল ও গৃহসজ্জার কোন কোন দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কদম্বের কাঠ ব্যবহৃত হয়। কদম্বের কাঠ হইতে মন্দ কাষ্ঠপিণ্ড (wood pulp) প্রস্তুত হয় না। ইহা হইতে প্রস্তুত কাষ্ঠপিণ্ড সহজে বর্ণ হীন করিতে পারা যায়। পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামে যথেষ্ট পরিমাণ কদম্ব আছে এবং তদ্দেশের লোকেরা কদম্ব কাঠ নানা প্রকার ব্যবহারে প্রয়োগ করে।

১১ চাপলাশ

ইহা প্রধানতঃ অসাম, কাছাড়, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের গাছ। ইহার কাষ্ঠ পীতাভ ধূসর বর্ণ, হালকা, দেখিতে সুন্দর এবং নানাবিধ কার্য্যের পক্ষে উপযোগী। জাহাজ ও গৃহ নির্ম্মাণ, গাড়ির অংশ, সাধারণ গৃহ সজ্জা ও বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুতে চাপলাশ কাঠের যথেষ্ট চলন আছে।

১২ কাঁটাল

কাঁটাল কাঠের বাহ্যাংশ মলিন ও মধ্যাংশ উজ্জ্বল পীত বর্ণ। গৃহ নির্ম্মাণ, মাস্তুল, গাড়ীর অংশ, বুরুশের উপরিভাগ, ও নানাবিধ কাষ্ঠ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য কাঁঠাল কাঠের যে যথেষ্ট চলন আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন।

১৩ দেফল

দেফল অথবা মাদারের অম্ল ফলের সহিত অনেকেই পরিচিত আছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই গাছের সংখ্যা অধিক না হইলেও পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ইহা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। দেফলের কাঠের বাহ্যাংশ শ্বেত ও মধ্যাংশ প্রথমতঃ পীত ও পরে ধুসর বর্ণ। ইহা উই প্রভৃতি কীটাদীর আক্রমণ সহ ইহাই ইহার বিশেষ গুণ। খুঁটি, গরাদে নদীগর্ভস্থ জেঠি প্রভৃতি ও নিকৃষ্ট গৃহ সজ্জাদির জন্য ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

১৪ হিজল

হিজল গাছ প্রধানতঃ জলা অঞ্চলে এবং বিশেষতঃ সমুদ্র উপকুলস্থ প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে হিজল গাছ পাওয়া যায়। সুন্দর বনে হিজলের অভাব নাই। হিজলের কাঠ শ্বেতবর্ণ এবং উজ্জ্বল দানা বিশিষ্ট। নৌকা, গাড়ী, আলমারি দেরাজ প্রভৃতি গৃহ সজ্জাদিতে হিজলের কাঠ ব্যবহৃত হয়। স্থানে স্থানে হিজলের ছাল মৎস্য চুরি করিবার জন্য পুকুরে দুষ্ট লোকে ফেলিয়া দেয়। ইহাতে মৎস্য অজ্ঞান হইয়া যায়।

১৫ মহুয়া

মহুয়ার গাছ অনেকের নিকট সুপরিচিত। পশ্চিম বঙ্গেই ইহার যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ফল, ফুল, বীজ ও কাষ্ঠ সমস্তই ব্যবসায়ের দ্রব্য সেই জন্য অনেক স্থানে মহুয়ার ষাছ ধ্বংস করা নিষেধ। মহুয়ার তৈল ও ফুলের পুষ্টিকর গুণ সুপরিচিত। এতদ্বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। মহুয়া কাষ্ঠের রং প্রায় ইটের ন্যায়। বয়স হিসাবে ইহা আরও গাঢ়তর হইয়া থাকে। গৃহ নির্ম্মাণে, নৌকার, গাড়ীর অংশে, কৃষি যন্ত্রাদিতে ও গৃহে সজ্জায় মহুয়ার কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে সকল স্থানে মহুয়া অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে সে সমুদয় স্থলে লোকেরা প্রায় সমস্ত আবশ্যকীয় গৃহ দ্রব্যাদি মহুয়া দ্বারা সম্পন্ন করিয়া থাকে।

১৬ শিমুল

শিমুল বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। সিমুলের তুলাও অল্প বিস্তর পরিমাণে সিমুলের গঁদ ব্যবসায়ের দ্রব্য। সরস অপেক্ষা শুষ্ক জমিতে সিমুলের গাছ অধিক

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেই জন্ত পশ্চিম বঙ্গে বড় বড় গাছ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কাঠ শ্বেতবর্ণ অধিক দিন থকিলে একটু ময়লা রং হইয়া যায়। প্যাকিং বাক্স, জল রাখিবার পাত্র, নৌকার দাঁড়, তেলের পিপে, দেশলায়ের কাঠি, খেলানা প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্ত সিমুল কাঠ উপযোগী। ইহা হইতে উত্তম কাষ্ঠপিণ্ড প্রস্তুত হয় এবং তাহা সহজে বর্ণ হীন করা যায়।

১৭ পলাশ

শিমুলের স্তায় পলাশও বঙ্গের সাধারণ বৃক্ষ। তবে ইহা পশ্চিমবঙ্গেই অধিক। পলাশের গঁদ ঔষধের জন্ত ব্যবহৃত হয়। ইহার কাঠ শ্বেতবর্ণ কিন্তু কাঁচা অবস্থায় না চেরাই করিলে তক্তার রং খারাপ হইয়া যায় ইহা তেমন স্থায়ী নয়। কিন্তু সিমুল কিম্বা পলাশ উভয়েরই তক্তা জলের নিচে অনেক দিন টিকে। প্যাকিং বাক্স, কুয়ার পাট প্রভৃতি কার্য্য ভিন্ন পলাশ কাঠ অপর কোন কাজে লাগে না।

১৮ সোঁদাল

সোঁদাল ফলের শাঁস ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহার কাঠ পীতাভ রক্তবর্ণ হইতে মলিন রক্তবর্ণ। গৃহনির্ম্মাণ, পুলের খুঁটি, গাড়ীর অংশ, কৃষি যন্ত্রাদি প্রভৃতি কার্য্যে সোঁদালের কাঠ লাগিয়া থাকে। সোঁদালের শাঁস তামাকের মশলা রূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কলিকাতায় ইহার কতক পরিমাণে কাটতি আছে।

১৯ টুন

পূর্ব্ববঙ্গেই টুনের গাছ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দৈর্ঘে বেশ বড় হয়। কাঠের রং ইঁটের স্তায়। ইহাতে উত্তম পালিস হয় ও সহজে উই দ্বারা আক্রান্ত হয় না। গৃহ সজ্জাদি প্রস্তুতের জন্ত ইহা একটি উত্তম কাষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্রহ্মদেশ হইতে বিলাতে এই কাষ্ঠ রপ্তানি হয় এবং তথায় উত্তম মূল্যেও বিক্রীত হয়। অন্তান্ত কার্য্যের মধ্যে চা ও চুরুটের বাক্স, মাস্তুল, দাঁড় ও হাল, বাদ্যযন্ত্র ও বন্দুকের হাতল প্রস্তুতে টুন কাঠ ব্যবহৃত হয়।

২০ বরুণ

সমুদ্রের উপকূলে ও নদীতীরে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বরুণ গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহার গাছ খুব বড় হয় না। কাঠ পীতাভ শ্বেত ও পুরাতন হইলে ধূসর বর্ণ হইয়া যায়। অল্প মূল্যের গৃহ সজ্জা, ঢাক, চিরুণি প্রভৃতি কাজে বরুণ ব্যবহৃত হয়। খোদাই কাজে যে সকল স্থলে বিলাতী বক্সকাঠ ব্যবহৃত হয় সেরূপ স্থলে বরুণ চলিতে পারে। এ বিষয়ে পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২১ শিশু

উত্তর বঙ্গেই শিশু গাছের সংখ্যা অধিক। কাঠের বাহ্যাংশ পীতাভ। মধ্যাংশ বেগুণে ও মধ্যে মধ্যে কাল দাগ যুক্ত ইহা খুব দৃঢ় এবং স্থায়ী। বিলাতে ইহার যথেষ্ট আদর আছে। উচ্চ শ্রেণীর গৃহ সজ্জাদি, দ্বার জানালা, চৌকাট বিম, বরগা, কুকরির বাঁট, চিরুণি, ছড়ি, রেলের গাড়ীর প্যানেল, বারুদের বাক্স, গাড়ীর ফুটবোর্ড প্রভৃতি নানাবিধ কাজে শিশু কাঠ ব্যবহৃত হয়। যে সকল নদীর কুল বালু অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকরময় সেই সকল নদীর ধারেই শিশুর জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গ দেশে দুই জাতীয় শিশুদেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে এক জাতিই সংখ্যায় অধিক।

চোই চৈ Piper Chaba

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়
(Supdt. Nursary Garden I.G.A.) লিখিত

পান, কাবাবচিনি, কাল মরিচ বা ছোট পিপুল, গজ পিপুল এই সকল লতাগুলিই এক জাতীয় লতা। ইহাদের শাস্ত্রীয় নাম নিম্নে দেওয়া গেল—পাহাড়ি পিপুল Piper Sylvaticum পার্ব্বতীয় পিপুল। পার্ব্বতী হিমালয় পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মায়।

পান,	Piper Betle
কাবাবচিনি,	Piper Cubeba
গজ পিপুল,	Piper Longum
কাল মরিচ	Piper Nigrum
চৈ	Piper Chaba

ইহা পিপুল জাতীয় লতা। ইহার মুল, মসলারূপে ব্যবহার হয়। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার আদর বেশী দেখা যায়। তথাকার লোক চৈএর মূল বাটিয়া তরকারিতে দেয়। ইহার গন্ধ ঠিক জিরে মরিচের মত। শুষ্ক মূল ।৵০ হইতে ॥০ আনা সের হিসাবে বিক্রয় হয়। দুই তিন বৎসর পরে এক একটি গাছ হইতে ৩।৪ সের মূল পাওয়া যায়। চৈ আবাদ করিতে ভাল জায়গার আবশুক হয় না। আম কাঁটালের গাছের গোড়ায় গাছ লাগাইলেই চলে, ইহা ঐ সকল গাছকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। দোঁয়াস মাটি ইহার উপযুক্ত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে চৈ গাছের ডাল হইতে কাটিং করিয়া একটি জায়গায় হাপর করিয়া

রোপণ করিতে হয় তৎপরে ঐ কাটিং গুলি বর্দ্ধিত হইলে উঠাইয়া লইয়া গাছের গোড়ায় রোপণ করিয়া দিলে উহা ক্রমশঃ ঐ গাছ জড়াইয়া উঠিতে থাকিবে। ডালগুলি ঝুলিয়া পড়িলে উঠাইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দুই তিন বৎসর ঐ আশ্রয় গাছটিকে ঘেরিয়া ফলিবে তখন উহাকে কাটিয়া গোড়া হইতে মূল তুলিয়া লইতে হয় এবং পুনরায় নূতন কাটিং করিয়া লাগাইতে হয়।

ইহার জন্য বিশেষ কোন সারের আবশ্যক হয় না। ছাই এবং গোয়ালের আবর্জ্জনা দিলেই গাছ খুব তেজে উঠিতে থাকে আজকাল জিরে মরিচের যেরূপ মূল্য অধিক তাহাতে সকলেরই চৈ গাছ করিয়া রাখিতে পারিলে আর জিরে মরিচ কিনিতে হয় না। পূর্ব্বে বঙ্গে অনেক গৃহস্থের বাড়িতেই চৈ গাছ আছে। মশলা ছাড়া চৈ মূল হইতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয় আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চৈয়ের অনেক গুণ আছে। ইহা আমাদের খুব উপকারী গাছ অথচ ইহার চাষের জন্য ভাল জায়গার আবশ্যক হয় না। ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা যায়গা যেখানে আর কোন গাছ হয় না সেই জায়গায় চৈ গাছ লাগাইয়া রাখিলে চলিতে পারে।

চৈ যথা তথা গাছে তুলিয়া দিয়া জন্মান যায় বটে কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র চাষ করিলে আরও ভাল হয়। যখন দাম নিতান্ত কম নহে তখন ইহার চাষে অলাভ নাই। পান বা পিপুল জাতীয় লতার যে প্রকার চাষ ইহার চাষ কারকিতও তদ্রূপ। পানের চাষে লাভ অনেক বলিয়া তাহার জন্য তৃণ বিথিকা (বরোজ) প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে উপরন্তু পানের পাতারই প্রয়োজন। অধিক রৌদ্রে খোলা জায়গায় পানের পাতা অধিক জন্মে না এবং পাতা শক্ত হইয়া যায়। পানের পাতার রঙ মসৃণত্ব খারাপ হইয়া যায়। চৈ পাতার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তাহা না হইলেও পিপুল জাতীয় গাছগুলি সমশতীল স্থানে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া ইহাদের জন্য ছায় যুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত। আম কাঁটাল গাচে উঠাইয়া দিলে চৈ গাছ জন্মে বটে কিন্তু তাহাতে একটু বিঘ্ন আছে। ইহার লতা বেষ্টিত হইয়া ফলের গাছ গুলি একটু জীর্ণ হইয়া পড়ে। বৃক্ষগণ লতাকে আশ্রয় দিতে কোন কালেই কুণ্ঠিত নহে কিন্তু তাহাতে তাহাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। লতার দৃঢ় বেষ্টনে কখন বা তাহারা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে কখন বা তাহাদের ঘন বিন্যাসে নিজের পত্র, পুষ্প ফল প্রসবের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। বৃক্ষগণ তথাপিও তাহাদের আশ্রিত লতাকে পরিত্যাগ করে না। মানুষ কিন্তু তাহাদের নিজের স্বার্থানুরোধে ফল বৃক্ষে কোন লতাকে আশ্রয় দিতে চায় না। পূর্ব্ববঙ্গ আসাম অঞ্চলে অনেকেই পানের পিপুলের চৈয়ের লতাকে আম কাঁটাল গুপারি গাছে তুলিয়া দেয়। গুপারি গাছে পান, পিপুল বা চৈ লতা তুলিয়া দিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। বুনো আম কাঁটালের গাছেও ইহাদিগকে আশ্রয় দিতে পারা যায়। মোট কথা ছায়াযুক্ত স্থানে বাঁশের মাচায় বা অকেজো বুনো গাছেই ঐ সকল লতাকে আশ্রয় দেওয়াই কর্ত্তব্য।

গাছের তলায় বা স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে, যেখানেই চাষ করা হউক প্রত্যেক উদ্ভিদের জন্য যেমন সারের প্রয়োজন তেমনি সার দিয়া চাষ করিলে ফল ভালই হয়। ঘুঁটে গুঁড়াইয়া সার দেওয়া যায়। পুকুরের পাঁক মাটি এবং সরিষার খৈল গুঁড়াও ইহাদের পক্ষে ভাল সার। সারের গুঁড়া সমুদয় ক্ষেতময় না ছড়াইয়া লতার গোড়ায় শিকড়ের চারিপাশে ছড়াইয়া মাটি চাপা দেওয়া উচিত। এক জমিতে ৩ বৎসরের অধিক গাছ রাখিলে লতাগুলি খারাপ হইয়া যায়। ৩ বৎসর অন্তর স্বতন্ত্র স্থানে গাছ বসাইয়া নূতন চাষ করিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। ডাঃ রক্সবরো দেখাইয়াছেন যে ৫০ একর জমিতে ৫০,০০০ হাজার পিপুল লতা লাগান যাইতে পারে। চৈ লতাও এক একরে ১০০০ বসাইলে অসঙ্গত হয় না। প্রত্যেক গাছ হইতে তিন বৎসর পরে ৩।৪ সের মূল পাওয়ার সম্ভাবনা। ঐ মূল শুষ্ক হইলে ওজনে অন্ততঃ ২।২৷৷০ সের থাকে। এবং তাহার মূল্য প্রতি সের চার আনা ধরিলেও অনেক লাভ হয়। এবং চাষের খরচ বাদে পান পিপুল চাষের মত ইহাতেও লাভ হইবার সম্ভাবনা। মসলা হিসাবে ইহার ব্যবহার ব্যতীত ইহার লতাকাণ্ড এবং শিকড়ের অন্য একটি বিশেষ গুণ আছে। শিকড় এবং লতা কাণ্ড সূতার কাপড় রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বেশ সুন্দর ফিকে ব্রাউন রঙ হয়। জলে সিদ্ধ করিলেই রঙ বাহির হয় এবং কেবল সূতা বস্ত্র কেন কোরা রেশম রঞ্জনেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

পিপুলের ন্যায় ইহার ফলেরও ভেষজ গুণ আছে। ইহা উত্তেজক (Stimulant) বায়ু প্রশমক (Carminative) স্বর ভঙ্গ হইলে বা সর্দ্দি কাশি হইলে ইহার ফল সিদ্ধ জল ব্যবহারে উপকার দর্শে।

বাঙ্গলার গরু মহিষ

গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে ভারতের কয়েকটী প্রধান প্রদেশের গরু মহিষের সংখ্যা নির্ণয় করা হইতেছে।

মিঃ ব্লাকউড ১৯১১ সালে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ও আসামের এবং ১৯১১ সালের পর হইতে বাঙ্গলার অবশিষ্ট অংশের গো মহিষের সংখ্যা ও অবস্থা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৯১৫ সালে তিনি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। সেই রিপোর্টের সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গলা দেশের লোক সংখ্যা ৪ কোটি ৫৫৷৷ লক্ষ; গো-মহিষের সংখ্যা ২,৫৩,৫৫,৮৩৮ সুতরাং প্রতি ১০০ জন লোকে ৫৬টা গরু মহিষ আছে অর্থাৎ প্রতি দুই জনে প্রায় একটা গো মহিষ আছে। ইংলণ্ডে ১০০ লোকের মধ্যে গরুর সংখ্যা ২৬এর বেশী নহে।

বাঙ্গলার সমতলভূমি অতিশয় উর্ব্বরা কিন্তু গরুগুলির অবস্থা ভাল নয়। বাঙ্গলার

পশ্চিমাঞ্চলের গরুগুলি পূর্ব্বাঞ্চলের গরু অপেক্ষা একটু দীর্ঘকায় কিন্তু মোটের উপর সর্ব্বত্রই অনাহারে শীর্ণ ও ক্ষুদ্র দেহ। বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগে গরুর সংখ্যা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ অপেক্ষা বেশী।

বাঙ্গলার ৮০,৮৭,৮৭২ বলদের মধ্যে শতকরা ১২টা অন্য স্থান হইতে আমদানি করা, ৭১,১০,৬৩৪ গাভীর মধ্যে শতকরা ৩·৭টা মাত্র অন্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। বেহার ও যুক্তপ্রদেশ হইতেই গরু আমদানী করা হইয়া থাকে। মণিপুরী গরু ত্রিপুরা জেলায় আমদানী হয়।

অন্য প্রদেশ হইতে আনীত বলদগুলি খুব জোরয়ান বটে, কিন্তু তাহারা বেশীদিন বাঁচে না। ভিন্ন প্রদেশ হইতে আনীত গাভীর দুগ্ধ বাঙ্গলাদেশে আসিয়া কম হইয়া যায়। স্থানীয় গাভীগুলির দিনে ৩ সেরের বেশী দুধ হয় না।

ভাল ষাঁড়ের সংখ্যা বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত কম। ভাল ষাঁড় আনীত হইলেও তাহাদের পর্য্যাপ্ত খাইতে ও ইতস্ততঃ চরিতে দেওয়া হয় না সুতরাং তাহারা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। যে দেশের গাভী ও ষাঁড় উভয়ই দুর্ব্বল, সে দেশে বলবান গরু জন্মিবার আশা কোথায়?

গরুর খাদ্যের যথেষ্ট আয়োজন নাই। দিন দিনই গোচর হ্রাস হইতেছে, পূর্ব্বমত বাঙ্গলায় গরুর ভাল খাদ্যও জন্মে না।

প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী বিভাগে বিশেষতঃ বর্দ্ধমান জেলায় গরুর পরিবর্ত্তে মহিষের দ্বারা গাড়ী টানার ব্যবহার দিন দিন বেশী প্রচলিত হইতেছে।

বাঙ্গলার কৃষকদের জমি কম, ভূমি উর্ব্বরা সুতরাং দুর্ব্বল গরুর দ্বারাও চাষ করা সম্ভব। অনুসন্ধান করিয়া ইহা অবগত হওয়া গিয়াছে যে ঢাকা জেলার প্রত্যেক কৃষকের গড়ে প্রায় ৮॥ বিঘা জমি আছে এবং প্রত্যেক ২১ বিঘা চাষের জমির জন্য ২টা মাত্র হালের গরু আছে।

পঞ্জাবে প্রত্যেক ৪৫ বিঘা চাষের জমির জন্য ২টা মাত্র গরু আছে।

২।৩ জন চাষা মিলিত হইয়া পরস্পরের জমি চাষ করিয়া থাকে, কিন্তু পরস্পরে মিলিত হইয়া কার্য্য করার ভাব বর্দ্ধিত না হইলে ঐ প্রথা সম্যক বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রজার জমির পরিমাণ কম, তাই তাহারা উৎকৃষ্ট গরুর আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না। নিজের হাল ও গরুর দ্বারাই তাহা চাষ করে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে পতিত জমি অপেক্ষা চাষের জমি বেশী, বর্ষাকালে জমি ডুবিয়া যায় সুতরাং তথায় চাষের জন্য যত গরুর প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা বেশী কেহ রাখে না। বিশেষতঃ গরুর গাড়ীর প্রচলনও বেশী নাই, সুতরাং ঐ দুই বিভাগে গরুর সংখ্যা কম।

বাঙ্গলার আর্দ্র ভূমিতে গরু সবল হইতে পারে না। যে সকল স্থান বর্ষাকালে

জলে ডুবিয়া যায়, সে সকল স্থানে গোমহিষ সচ্ছন্দে চরিতে পারে না। ইহাতেও গরু সবল হইতে পারে না। গোচর ও ঘাসের অভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের গোজাতির উন্নতি হওয়া অসম্ভব। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে লোকে গোচর ভূমি পর্য্যন্ত চাষ করিতেছে সুতরাং গরুগুলি আর চরিতে পারে না। কিন্তু যথেষ্ট গোচরও যদি থাকে, তবু গোজাতির উন্নতি সম্ভব নয়, যদি ভূমি আর্দ্র থাকে। আসামে পশুখাদ্যের অভাব নাই। কিন্তু আর্দ্রতা বশতঃ গো-মহিষের দেহ সবল হইতে পারে না। বাঙ্গলার গোজাতির অবনতির আর কয়েকটী কারণ এই যে, এখানে ভাল ষাঁড় নাই, দুর্ব্বল ষাঁড়গুলিই বৎসের জনক হয়, বৎসগুলিকে যথেষ্ট দুধ খাইতে দেওয়া হয় না।

লোকের মুখে তিনটী অভিযোগ সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়।

১। দুধের দাম অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ২। গরু অল্প দুধ দেয়। ৩। গরুর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতেছে। লোকে বলে গোচর ভূমি যথেষ্ট থাকিলে ঐ ত্রিবিধ দোষ দূর হইত।

মিঃ ব্লাকউড ও গবর্ণমেণ্ট মনে করেন, উহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হইবে না। কৃষির জমি গোচর করা দুঃসাধ্য, যদি অনেক কৃষি ভূমি গোচর করা হয়, তাহা হইলে গরুর সংখ্যা বাড়িতে পারে, কিন্তু তখন গোচর আর পর্য্যাপ্ত হইবে না। চাম্পারণে অনেক গোচর আছে, কিন্তু গরু অতি নিকৃষ্ট। নাসিকে গোচর অতিশয় কম কিন্তু গরু অতি উত্তম।

জলপাইগুড়ি ও মালদহ ব্যতীত বাঙ্গলার আর কোথাও গরুর বংশ বৃদ্ধির ব্যবসায়ী নাই। বাঙ্গলার জলবায়ু যেরূপ তাহাতে ঐ ব্যবসায় লাভজনক হইতে পারে না।

ত্রিবিধ উপায়ে বাঙ্গলার গরুর উন্নতি হইতে পারে। (১) উত্তম ষাঁড় রাখা, (২) বাছুরকে বেশ দুধ খাইতে দেওয়া, (৩) ঘাসের চাষ করা। সঞ্জীবনী।

সার-সংগ্রহ

ভেজাল ঘৃতের প্রতিরোধ

ভেজাল ঘৃতের ব্যবসা বন্ধ করিবার জন্য কলিকাতার মাড়োয়ারি সমাজে যে হুলস্থুল হইয়াছিল, তাহার বিশদ সংবাদ সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরে মাড়োয়ারি সভার পক্ষ হইতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারির নিকট ঐ সম্বন্ধে দরখাস্ত প্রেরিত হইয়াছিল।

কলিকাতার মাড়োয়ারী পঞ্চায়তের বৈঠক বসিয়াছিল। কয়েকটি কারবারের অংশীদারেরা দণ্ডিত হইয়াছেন। একটী কারবারের তিন জন অংশীদার ছয় মাস হইতে এক বর্ষ পর্য্যন্ত সমাজচ্যুত রহিবেন এবং তাঁহাদিগকে গো-চারণের ভূমি ক্রয়ার্থ ৫০০৲ হইতে ৬০০০৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে, অপর একটি কারবারের তিনজন অংশীদার তিন মাসের জন্য সমাজচ্যুত হইয়াছেন। ইঁহাদিগকেও ১১০০৲ হইতে ২৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হইবে।

ঘৃতে ভেজাল রোধের নিমিত্ত একদল প্রতিনিধি কলিকাতা লাট প্রাসাদে বঙ্গেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই প্রতিনিধি দলে মাড়োয়রি সভা রাজপুত সভা, ব্রিটিশ

ইণ্ডিয়া সভা, বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সভা, বেঙ্গল ন্যাসন্যাল চেম্বার অব কমার্স ও মহাজন সভার সভ্যগণ যোগ দিয়াছেন।

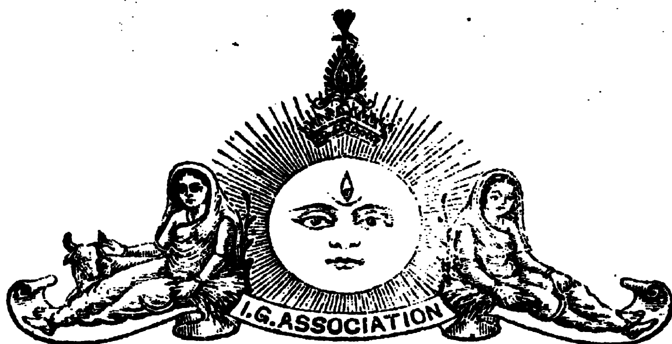
ডিব্রুগড় হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে তত্রত্য মাড়োয়ারী নেতৃগণ ঘৃতে চর্ব্বি প্রভৃতি অপবিত্র জিনিষ ভেজালের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছেন। তাঁহারা আর কলিকাতা হইতে ঘৃত আমদানি করিবেন না এবং যাঁহারা ভেজাল ঘৃতের ব্যবসা করেন, তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছেন। মাড়োয়ারী ব্যবসাদারেরা যাহাতে ভেজাল ঘৃতের ব্যবসা আর না করেন তজ্জন্য সহরে ও মফঃস্বলে নানা স্থানে বৈঠক বসিয়াছিল। মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণেরা এই হাঙ্গামার আশু মীমাংসাকালে অনাহারে ধন্না দিয়াছিলেন। ভেজাল বন্ধ করা সম্বন্ধে তত্রত্য মাড়োয়ারীগণের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। মাড়োয়ারী মহাজনগণের আড়ৎ দোকান প্রভৃতি বন্ধ ছিল। অন্যদিকে স্থানীয় জৈন মন্দিরে হোম ও যজ্ঞ হইতে থাকে। এই মত বিরোধ যাহাতে শীঘ্র মিটিয়া যায় এবং যাহাতে ব্যবসার ক্ষতি না হয় তজ্জন্য অনেকে চেষ্টা করিতেছিলেন। কেবল মাড়োয়ারীগণই এই গোলযোগ তুলিয়াছেন; স্থানীয় অন্যান্য অধিবাসিগণ এখন ও নিরপেক্ষ ভাবে সকল ব্যাপার দেখিতেছেন।

মাড়োরারি মহাজনেরা আবার দোকান পাট খুলিয়াছেন। তত্রত্য ডিপুটি কমিশনর মিঃ ক্লার্ক ও জয়েণ্ট ষ্টীমার এজেণ্ট মিঃ কলি বিবাদী মাড়োয়ারীগণের মিটমাটের জন্য নিজেরা স্থানে স্থানে গিয়া পক্ষগণকে সৎপরামর্শ দিয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। মেসার্স মঙ্গলচাঁদ রামকুমার আগরালায় পক্ষে বাবু বংশীধর সাহারিয়া ২১০১৲ টাকা ভেজালের দণ্ড দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু অন্য পক্ষ অর্থাৎ আসোয়ালের দল আগরওয়ালার নির্দ্ধারিত দণ্ড প্রদান করিতে স্বীকৃত হন নাই। কাজেই সামাজিক হাঙ্গামার মীমাংসা হয় নাই। এ দিকে অভুক্ত ব্রাহ্মণেরা স্থানীয় ধরমশালায় 'ধন্না' দিয়া পড়িয়া আছেন। প্রকাশ মাড়োয়ারী সমাজে পরস্পরের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা জল গ্রহণ করিবেন না।

হাজারিবাগ হইতে জনৈক পত্রপ্রেরক 'ষ্টেটসম্যান' পত্রে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—"সকল প্রকার চর্ব্বির অদ্ভুত রকম পিণ্ড প্রায়ই গঙ্গাবক্ষে ষ্টীমারের উপর হইতে কেরোসিনের টিনে করিয়া তীরে নামান হইয়া থাকে। ঐ অজান পদার্থের নাম 'কুক্‌ন্ গ্রাস' বা রাঁধুনি চর্ব্বি। জাহাজের উপরে পাচকেরা এ জিনিষটা উপরি লাভ করে। তাহারা কাষ্টম হাউসের দ্বারা উহা রাঁধুনি চর্ব্বি বলিয়া পাশ করাইয়া লয়। এই চর্ব্বি বাজারে নীত হইলে ঘৃতের ব্যবসায়ীরা তাহা কিনিয়া লয়। একথা স্মরণ করিতেই দুঃখ হয় যে, এই জিনিস আমাকে পরীক্ষা করিতে হইত। ইহাপেক্ষা দুর্গন্ধযুক্ত বিষময় ভেজালের কল্পনা করাও দুরূহ। এই তৈলাক্ত গরল ভক্ষণে মানুষের শরীরে যে কি গুরুতর ক্ষতি হইতে পারে তাহা চিকিৎসকের আলোচ্য। দেশীয় মাখনের তথাকথিত কারখানা গুলিতেও বিশেষ তদন্ত প্রয়োজন।"

দেশের জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে এই ভেজাল ঘৃত প্রতিরোধের এইরূপ আন্দোলন দেওয়া উচিত; নহিলে ধর্ম্ম স্বাস্থ্য সবই যে যায়!

ভেজাল প্রতিরোধের জন্য আইন পাশ হইয়াছে। যে কেহ ভেজাল ঘৃতের ব্যবসা করিবেন উচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ইহাতে ছোট বড় কোন ব্যবসায়ীর অব্যাহতি নাই। ছোট ছোট ব্যবসায়ীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। অনেকে বলিতেছেন যে আইন বড় কড়া হইয়াছে। কিন্তু সংস্কার আবশ্যক। আমরা বলি বিশুদ্ধ জিনিষ প্রচলনের জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে। কৃঃ সঃ।



শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২৪ সাল।

বিস্তৃত ক্ষেত্রে আবাদ এবং স্বল্পায়তন ক্ষেত্রে অধিক ফসল উৎপন্ন করা

(Intensive and Extensive Agriculture.)

আমাদের বাঙ্গলা দেশে সুন্দর বনের জঙ্গল কাটিয়া যে সকল আবাদ পত্তন হইতেছে তাহাকে বিস্তৃত আবাদ (extensive agriculture) বলা যায়।

দুই, চারি, দশ, বিশ হাজার বিঘার জঙ্গল কাটিয়া জমি হাসিল করা হইল; তাহাতে খাল, ভেড়ি, পোল দেওয়া হইল। জমিতে লোনা জল উঠার অবাধ গতি বন্ধ করা হইল; অনেকগুলি পত্তনিদার ঠিকাদার লইয়া আবাদ কার্য্য আরম্ভ করা হইল; গরু, জন, মনুষ্যের থাকিবার উপযোগী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, পাণীয় জলের ব্যবস্থা করা হইল। ইহাই বিস্তৃত আবদের পদ্ধতি। ইহাতে মূলধন অধিক আবশ্যক, অনেক লোক জনের আবশ্যক এবং জমি হাসিল করিবার সময় বহুতর কষ্ট স্বীকার অবশ্যম্ভাবী। সুন্দর বনে এইভাবে জঙ্গল কাটিয়া ধানের আবাদ হইতেছে।

আবার নদীর চর ভরাটি অনেক জমি পুর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গলা দেশে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা প্রভৃতি নদীর চরে বহু বিস্তৃত জমি পাওয়া যায়। সেই সকল চরে জমির অবস্থা ভেদে রবিখন্দ, পাট, তৈল শস্য ও নানা প্রকার শব্জী চাষ হইয়া থাকে। নিতান্ত বালির স্তূপের উপর কোন খন্দই জন্মে না, তদ্ব্যতীত পলিপড়া দোয়াঁস জমিতে নানা বিধ খন্দ হয় ও ফসলও ষোল আনার উপর আঠার আনা ফলে। সুন্দর বনের জঙ্গল কাটি নূতন আবাদ গুলিতে ২৫।৩০ বৎসর বিনা সারে পর্য্যাপ্ত ধান জন্মে। সুন্দর বনের

সাগর কূলে লোণা জমি গুলিতে পাট হয় না কিন্তু ধান যথেষ্ট হয়। এই প্রকার বিস্তৃত ভূমি পাইলে তবে বিস্তৃত আবাদের সুবিধা হয়।

রঙপুর, দিনাজপুরে এক একজন পত্তনিদারের অধীনে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত্র আছে। আসামে এক এক বন্দে বিস্তৃত চায়ের ক্ষেত্রগুলিও বিস্তৃত আবাদের পরিচায়ক। চট্টগ্রামে গভর্ণমেণ্টের বিস্তৃত জমিতে ফলের বাগান রচিত হইয়াছে। সিংভূম, ধলভূম, মানভূমে, ময়ুরভঞ্জে এখন কেহ কেহ রবারের আবাদ, বিস্তৃত ইক্ষুক্ষেত্র ও ফলের বাগান করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ লোকেই ছোট ছোট জমি লইয়া চাষাবাদ করে। তাহাদের জমির পরিমাণ ২০।২৫।৫০।১০০ শত বিঘার অধিক নহে।

বিস্তৃত আবাদেও স্বল্লায়তন আবাদের পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। যে জমিতে বিঘা প্রতি ৫০ মণ গুড় জন্মিতে পারে তাহাতে চেষ্টা করিয়া ৭০।৮০।১০০ মন গুড় উৎপন্ন করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। হাজার, ২ হাজার বিঘা পরিমাণ জমিতে বিঘা প্রতি ৮০ ১০০।১২৫ মণ আলু ফলান বিশেষ কিছু কঠিন কথা নহে। তবে এরূপ করিতে হইলে তত্বাবধানের লোক পাকা চাই, সার গোময়ের সংগ্রহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাই, সেচের জলের সুবন্দোবস্ত চাই, উপযুক্ত স্থানে ক্ষেত্রটি স্থাপিত হওয়া চাই। সকলই মূল ধন ও সুকৌশলে কার্য্য পরিচালনের উপর নির্ভর করে। অল্প জমি আয়ত্ব করিতে যেরূপ উদ্যোগ আয়োজনের আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক উদ্যোগ আয়োজন নিশ্চয় করিতে হইবে। এরূপ ভাবে বিস্তৃত চাষে লিপ্ত হইলে লাভের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।

রাজধানী এবং বড় বড় সহর ও বন্দরের নিকটে এক লপ্তে অধিক জমি মেলা সুকঠিন। এই সকল স্থানে অল্প জমি লইয়া অধিক ফসল উৎপন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। অল্প পরিমাণ জমিতে সার গোবর উপযুক্ত পরিমাণ প্রয়োগ করিয়া এক জমিতে অত্যধিক ফসল উৎপন্ন করা ও ফসলের মাত্রা বৃদ্ধি করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে চাষাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই বুঝা যায় যে তাহারা ফসলের মাত্রা বৃদ্ধির অর্থ বুঝে ও তাহার কৌশলও জানে।

তাহারা যে ক্ষেতে শসা চাষ করিবে তাহাতে গ্রীষ্মকালে বিঘা প্রতি ৩০০ ঝুড়ি পগারের পলিমাটি ছড়াইয়া রাখে এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে শসার বীজ বপন করে এবং গাছ বাহির হইলে প্রতি মাদায় গাছের গোড়ায় খৈল দেয়। ইহাতে বিঘা প্রতি ১মণ, ১।০ সোয়ামণ খৈল খরচ হয়। শসা চাষ বৎসরে তিন বার হয়। প্রথম জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বীজ বপন করে, ভাদ্র আশ্বিনে ফলে; ভাদ্র মাসে বীজ বোনা হয়, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ফলে; ফাল্গুন মাসে বীজ বপন করা হয়, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ফলে।

পাট কাটিয়া লইয়া সেই জমিতে কার্ত্তিকে শসার চাষ করিয়া থাকে। পাটের সময় জমিতে মাটি ছড়ান ও সার দেওয়া ছিল; শসা চাষের তাহা হইতে কতক সাহায্য হয়

এবং পাটের চাষেও জমির নাইট্রোজেন বৃদ্ধি হয়, তথাপি চাষীরা চারার গোড়ায় গোড়ায় ছাই গোময় মিশ্রিত গোয়ালের আবর্জ্জনা সার ও বিঘা প্রতি ৷৷০ অর্দ্ধমণ হিসাবে খৈল প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার মটর মুগ কলাই চাষের পরেও শসা চাষ করিয়া শসা পর্য্যাপ্ত ফলাইতে পারে।

তাহারা শসা চাষে বিঘা প্রতি চাষ কারকিত, সারের জন্য ও ক্ষেত ঘিরি-। এবং ৩০ ত্রিশ টাকারও অধিক খরচ করে। বিঘায় অন্ততঃ ৫০৲ টাকা খরচ বাদে লাভ করিতে পারিবে নিশ্চয় জানিয়া তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক খরচেও সা... বাঁধে।

কলিকাতার সন্নিহিত ধাপার মাঠে সহরের মল মূত্রবাহী খাল হইতে সেচের জলের সুবিধা আছে। তথায় চাষীরা ৩ ফিট ব্যবধানে কপি চারা বসায়। চারা গুলি কিঞ্চিৎ বড় হইলেই মাঝে মাঝে ১৫।২০ দিন পরে আর একটি করিয়া চারা বসায়। দেড় মাসের মধ্যে ফুল কপি, বাঁধা কপি কাটিবার উপযুক্ত হয়। কপি কাটিয়া লইয়া সেই স্থলে আবার নূতন চারা বসাইয়া থাকে। ৪ মাসের মধ্যে তাহারা একই ক্ষেত হইতে ৩টি ফসল প্রাপ্ত হয়। ধাপার ফুলকপি, বাঁধাকপি দেখিলেই চেনা যায়—উহারা আকারে বড় এবং ওজনে ভারি; ফুলকপি সাধারণতঃ ওজনে ২।৩ সের, বাঁধাকপি ৮।১০ সের ভারি হয়। ক্ষেতের ধারে ভিতে তাহারা পুঁই, পালম, ডেঙ্গো চাষ করিয়া থাকে। ক্ষেতটির বোদমাটি আধার মাত্র, সেচের জলে উদ্ভিদের আহার সংস্থান হয়। এতদঞ্চলের চাষারা বিঘা প্রতি ৫০৲ টাকা খাজনা এবং ২৫৲ টাকা চাষে খরচ করিয়াও যথেষ্ট লাভ করে।

কলিকাতার নিকট রসার মাঠে ও কাশিপুর, বরাহনগর অঞ্চলে দক্ষ চাষী আছে। তাহারা প্রতি বিঘায় ১৬০০ কপি চারা বসায়। প্রত্যেক চারার গোড়ায় ৷৷০ অর্দ্ধপোয়া খৈল দিয়া থাকে—বসাইবার সময় একবার, তার পরে ২০ দিনের মধ্যে আর দুই বার খৈল দেয়। প্রত্যেক বার খৈল দিবার পর জল সেচন করে।

চারা বসাইয়া বোমা বা কলসে করিয়া টোপা জল দিয়া থাকে, ২য়, ৩য় বার নালিতে নালিতে জল সেচিয়া দিয়া সমগ্র ক্ষেতটি শিক্ত করিয়া দেয়। ২য়, ৩য় বার জল সেচনের পর চারার গোড়া কোপাইয়া দাঁড়া টানিয়া দেয়। তাহারা প্রত্যেক কপিটি ৵০ আনা কিম্বা ⁄১০ ছয় পয়সার কম বিক্রয় করে না এবং বিঘা প্রতি খরচ বাদে অনায়াসে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকে।

রসার মাঠে বিখ্যাত মূলা জন্মিয়া থাকে। এক একটা মূলার ওজন ১০।১২ সের হইতে দেখা যায়। মূলার জমি খাঁটি দোয়াঁস হওয়া চাই, কপির জমি কাদা দোয়াঁস হইলেই ভাল। মূলার জমি লোকে কথায় বলে তুলার মত হইবে। মূলার জমি চষিয়া তাহারা এমন তৈয়ারি করে যে তাহাতে পা দিলে পায়ের গোছ সমেত মাটির ভিতর বসিয়া যায়। বিঘাতে তাহারা ২৷৷০ হইতে ৩ মণ খৈল ছড়ায়। ফসলও তেমনি সুন্দর

হয়। এক জোড়া মূলা খুসি হইয়া লোকে আনা /০ আনায় খরিদ করে। রসার নিকট গড়েতেও ভাল চাষী আছে। গড়ের আতা বিখ্যাত। ভাদ্র আশ্বিনে তাহারা বীজ হইতে চারা তৈয়ারি করিয়া লয়। আশ্বিনের শেষে কার্ত্তিকের প্রথমে ক্ষেতে ২ × ১২ ফিট ব্যবধানে গর্ত্তে সার গোবর দিয়া চারা বসায়। পাঁক মাটি, গোয়ালের সারই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। পর বৎসর সেই গাছ তৈয়ারি হইয়া ফলবান হয়। ২য় বৎসরে ফলের চরম উৎকর্ষ ও ফলনের সম্যক বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তৃতীয় বৎসর ফল সমান ভাবেই পাওয়া যায়। তার পর আতা বাগান তুলিয়া দিয়া তথায় অন্য ফসলের আবাদ করে। প্রথম বৎসর প্রত্যেক গাছ হইতে যৎকিঞ্চিৎ আয় হয়। ২য়, ৩য় বৎসরে প্রত্যেক গাছ হইতে ২৲ টাকা বা ততোধিক আয় হয়। আতা শ্রাবণ হইতে পাকিতে আরম্ভ করে—আশ্বিন মাস ফল শেষ হয়। ১ বিঘা একটি আতা বাগান হইতে খরচ বাদে বার্ষিক ৫০৲ টাকা লাভ অতি সহজেই হয়, অধিকও হইয়া থাকে। ফল হইবার পর আতার ডাল পালা কাটিয়া দেয় তাহাতে জমির আওতা কাটিয়া যায়, আতা বাগানের মধ্যে মুগ মশুরের চাষ করিয়া কিছু কিছু লাভও হইয়া থাকে।

চট্টগ্রামে ... ময়ূরভঞ্জে

গোবিন্দপুর নিজ ক্ষেতে আমরা বেগুণ চাষ করিয়া দেখিয়াছি—তিন বিঘাতে পাশাপাশি বেগুণ চাষ করা হইয়াছিল। এক বিঘা পরিমাণ এক একটি বেগুণ ক্ষেত করা হয়াছিল এবং তাহাতে জলদি ও নাবী, আউসে পৌষে হিসাবে জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ৩ দফা চারা বসান হয়। তিনটি ক্ষেতেই ৩০০ ঝুড়ি নূতন মাটি ছড়ান হইয়াছিল। প্রত্যেক ক্ষেতে বিঘা প্রতি ১ মণ খৈলের সার এবং ৪ মণ শুষ্ক ও পচা ছাই মিশ্রিত গোময় সার চারার গোড়ায় গোড়ায় ২।৩ বারে দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে চাষ করিয়া প্রত্যেক চারা হইতে খরচ বাদে /০ আনারও অধিক লাভ হইয়াছে। ক্ষেতের ধারে ধারে সীম ঝিঙ্গা ও নবীয়া কলাইয়ের গাছ ও মাটীতে লঙ্কা পুঁই গাছ ছিল। এই সকল সীম, ঝিঙ্গা কলাই হইতে ক্ষেত কয়টিতে হাল, মৈ, দিবার খরচ উঠিয়া গিয়াছে।

পটল ক্ষেতে পাঁক মাটি ছড়াইয়া এবং বিঘায় ১ মণ খৈল খরচ করিয়া ৫০ মণ পটল উৎপন্ন হইয়াছিল। ৫০ মণ পটলের দাম অতি কম হইলেও ১২৫৲ টাকা। উহা হইতে ৩০৲ কিম্বা ৩৫৲ টাকা খরচ বাদ দিলেও যথেষ্ট লাভ থাকে।

কার্ত্তিক মাসে পটল ক্ষেত চষিয়া আবার কড়াই বপন করা হইয়া থাকে। ইহা হইতেও বিঘা প্রতি ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকার ফসল পাওয়া যায় এবং কড়াই গাছ ও কলাইয়ের খোসা ভূষী গবাদির আহারের সংস্থান করিয়া দেয়।

গোবিন্দপুর ক্ষেত্রে একটা ধান জমিতে বিঘা প্রতি ১০০ ঝুড়ি নূতন মাটি ছড়াইয়া ধঞ্চে বোনা হয়, সেই ধঞ্চে গাছ চষিয়া এবং চষিবার কালে কিঞ্চিৎ চুণ (বিঘায় ৷৷০ মণ) প্রদান করিয়া মাটি, ধানের জন্য তৈয়ারি করা হইয়াছিল। আষাঢ় মাসের শেষে ধানের

বীজ রোপণ করা হয়। ধান বীজ রোপণের ২০ দিন পরে ধান ক্ষেতটি ভালমতে নিড়াইয়া সাফ্ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরে ২০ দিন অতীত হইলে বিঘায় এক মণ খৈল ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ৪।৫ দিনের মধ্যেই খৈল পচিয়া উঠিলে ধান ক্ষেতটি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ক্ষেতে সাধারণতঃ ৪ মণের অধিক ধান ফলিত না কিন্তু এইরূপ তদ্বির করিয়া তাহা হইতে ১। সওয়া কাহন বিচালি এবং ৮ মণ ধান পাওয়া গিয়াছে। সেই জমিতে সেই বৎসরেই আবার কড়াই চাষ করিয়া ৪ মণ ২॥০ই লাভ হইয়াছে। কড়াই গাছ খোসা ও ভুসীতে ৫।৬ পণ বিচালীর কাজ হইয়াছিল।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী, নিবাস বড় বেলুন, বর্দ্ধমান এবং শ্রীযুত শিরীশচন্দ্র রায়, নিবাস কাদপুর নাদনঘাট সব ডিভিসন, বর্দ্ধমান। ইহাদের উভয়েই এক বন্দে ৩০।৪০ বিঘা ধান ক্ষেত আছে, ইহাঁরা ধান চাষের বিশেষ তদ্বির করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলের অধিকাংশ স্থলেই ধানক্ষেতে সেচ দিবার আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহাঁদের উভয়েরই সেচ দিবার মত জলের সুবিধা আছে। ইহাঁরা প্রতি বৎসরই ক্ষেতগুলিতে বিঘা প্রতি ১০০ এক শত ঝুড়ি হিসাবে পলি মাটি ছড়াইয়া থাকেন। ধান রোপণের পূর্ব্বে জমি বারম্বার চষিয়া জমিকে কতটা নিস্তৃণ করিয়া রাখেন এবং গ্রীষ্মে চষিবার কালে বিঘা প্রতি ৮ হইতে ১০ গাড়ী গোময় দিয়া উহা মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ক্ষেতে ধান রোপণ উপযোগী জল না মিলিলে ক্ষেতে সেচন দ্বারা জল আনাইয়া ফেলা হয়। ধান রোপণের সময় জমির কাদা ভালরূপ হওয়া আবশ্যক এবং ভাল কাদা হইবার জন্য জমিটি এক দিন চাষ দিয়া ফেলিয়া রাখিয়া (ইহাকে পচানি দেওয়া বলে) ২য় দিনে ধান রোপণ করা হইয়া থাকে। সুরেশ বাবু বলেন যে তাঁহাদের দেশে পান দূর্ব্বা নামক এক প্রকার ঘাষ জন্মিয়া থাকে। সারবান মৃত্তিকা হইলে এই ঘাস প্রায় জন্মায়। ইহা অতিশয় নরম ঘাষ এবং সহজে পচিয়া থাকে। জমি ইহার পচানি পাইলে ধানের খুব বৃদ্ধি হয়। ধান রোপণের এক মাস পরে বিঘা প্রতি ১, ২॥ মণ খৈল ছড়াইয়া খৈল পচিয়া উঠিলে জমির মাটি ঘাঁটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তাঁহারা বিঘাতে এইরূপে চাষ করিয়া ৮।১০ মণ এবং মোটা ধান হইলে ১২ মণ ধান ফলাইতে পারেন। তাঁহারা বলেন যে ধান ভাল জন্মিলে খড় বেচিয়া রাজার রাজস্ব ও চাষের খরচ উঠিয়া যায়, ধানটি লাভে পাওয়া যায়। তাঁহাদের ধান চাষের বিবরণ আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব। দুই হাজার বিঘা একটা মাঠ, তাহাতে কত শত চাষী চাষ করিতেছে। ইহাঁরা চেষ্টা করেন যে কি প্রকারে তাঁহদের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। চেষ্টায় না হয় কি !

পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র

শুধু বঙ্গের কেন ভারতেরও নিরতিশয় দুর্ভাগ্য এই যে, কৃতি সন্তানগণ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে জীবন লীলা সম্বরণ করেন। এ দেশে অকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হওয়ায়, অকালে লোক দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বিলাতের বৃদ্ধগণ যেন চির যৌবন সম্পন্ন। তথাকার জন নায়ক গণের তুলনায় আমাদের দেশের গণ্য মান্য ও বরেণ্য নেতৃ-সমূহ অল্প দিবসই দেশ সেবায় জীবন নিযুক্ত করিতে পারেন। জন নায়ক সারদাচরণ মিত্র উনসত্তর বৎসর বয়সে ইহজগত হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

যে প্রতিভা, যে অদম্য উৎসাহ ও প্রগাঢ় দেশানুরাগ লইয়া সারদাচরণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহা অনন্যসাধারণ। তাঁহার মতের সহিত মত ঐক্য না হইলেও তাঁহার শত্রুগণ পর্য্যন্তও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। পিতা মাতার স্নেহ ও যত্ন তাঁহার ভাগ্যে অধিক দিবস যুটিয়া উঠে নাই; কিন্তু ইহাতে [illegible]র কর্ম্ম জীবন আদৌ ক্ষতি গ্রস্থ হয় নাই। নিজের অধ্যবসায়ে ও দৃঢ় সঙ্কল্পে তিনি সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পাঠদ্দশায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সর্ব্বজন বিদিত। ওকালতিতে ও বিচারাসনে বসিয়া তিনি ব্যবহার শাস্ত্রের যে গভীর জ্ঞান ও স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপিও কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই বোধ হয় বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার কতিপয় বিচার চিরকাল নিরপেক্ষতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার স্বাধীন চিত্তের সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

সাহিত্য সেবায় সারদা চরণের আজীবন অনুরাগ ছিল। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য্য যাহাতে অধুনা ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালী যথার্থরূপে বুঝিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি "বিদ্যাপতি"র মূল্যবান সংস্করণ প্রণয়ন করেন। "উৎকলে শ্রীচৈতন্য" তাঁহার প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে গবেষণার অন্যতম নিদর্শন। নানা প্রকার সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া, সাহিত্য সঙ্ঘ ও সাহিত্য পরিষদের ক্যার্য্যাবলিতে যোগদান করিয়া সারদাচরণের মাতৃভাষায় প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ অনেক পরিমাণে স্ফূর্ত্তি পাইত।

এক লিপি প্রচলন সম্বন্ধে আন্দোলনের তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নিখিল কায়স্থ সম্মিলন, ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলীর সহিত তাঁহার বিশেষ সংশ্রব ও সম্পর্ক ছিল। এবম্প্রকার বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেকের মত ভেদ থাকিতে পারে কিন্তু সারদা চরণের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে কেহ কখন সন্দেহ করেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধের এই সমুদয় বিষয়ের সমালোচনা অনাবশ্যকীয়।

আমাদিগের সহিত সারদা চরণের সম্বন্ধ ব্যবহারজীবী, সাহিত্যসেবী অথবা দেশ নেতা হিসাবে নহে। সারদা চরণ আজীবন কৃষি অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার কৃষির

উপর অনুরাগ তাঁহার পানশেওলা ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিভাত হইয়াছিল। এতদ্দেশের অন্যান্য সভা সমিতির ন্যায় ভারতীয় কৃষি সমিতিও বাল্যে অনেক দুরবস্থার মধ্য দিয়া কৈশোরে উপনীত হয়। কিন্তু ইহার সৌভাগ্যের মধ্যে এই যে কৈশোরে ইহা সারদা চরণের সহিত পরিচিত হয়। যে সময় হইতে সারদা চরণ বুঝিতে পারেন যে দেশের ভবিষ্যত উপকারের জন্য এইরূপ সমিতি একান্ত আবশ্যক সেই সময় হইতেই তিনি এই সমিতির উন্নতি সঙ্কল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

সারদা চরণের মৃত্যুতে ভারতীয় কৃষি সমিতি বাস্তবিকই একজন পরম উপকারী সুহৃদ হারাইয়াছে। সমিতির পুস্তকাগারে মূল্যবান পুস্তকাদি দান করিয়া কৃষিবিষয়কতত্ত্বাদি আলোচনায় উৎসাহিত করিয়া এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বসময়ে হিতকারী পরামর্শ প্রদান করিয়া সারদা চরণ সমিতির উন্নতির জন্য অকাতরে চেষ্টা করিতেন। পল্লীজীবনের ভিত্তি যে কৃষি তাহা তিনি সম্যকরূপে বুঝিয়া ছিলেন এবং তজ্জন্য কৃষির উন্নতি কল্পে কয়েকটি পরীক্ষাও প্রারদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা বারান্তরে তাঁহার কৃষি বিষয়ক কার্য্যাদির সমালোচনা করিব। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে সরকারী কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্ট যে কৃষি সমিতি সমূহের সৃষ্টি হয় সারদা চরণ উৎসাহের সহিত তৎসমুদয়ের স্থানীয় শাখায় যোগদান করেন। যৌথ ঋণ দান সম্বন্ধীয় আন্দোলনে সারদা চরণের যে বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং ইহার সভা প্রভৃতিতে তিনি যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

আজ সারদা চরণের মৃত্যুতে বঙ্গ যে রত্ন হরাইল কতদিনে তাহার আবার পূরণ হয় বলা যায় না। পরম সৌভাগ্য বলে বাঙলাদেশ বর্ত্তমান যুগোচিত উন্নতির জন্য যেন সারদা চরণের মত অনন্য সাধারণ কর্ম্মী পাইয়াছিল। দরিদ্র হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বলে আরও অনেক দেশ হিতকর কার্য্য সাধন করিতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের গতি কে রোধ করিবে! আমরা সারদা চরণকে হারাইলাম বটে কিন্তু তাঁহার জীবন্ত কীর্ত্তি যেন আমাদিগকে ভবিষ্যতে প্রোৎসাহিত করে।

সারদাচরণ ১৮৪৮ অব্দে ১৯শে ডিসেম্বর হুগলী জেলার অন্তর্গত পানিসেহলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যাবজ্জীবন দেশের নানাবিধ উন্নতিকর কার্য্য করিয়া তিনি ৭০ বৎসর বয়সে ইহধাম হইতে বিদায় লইলেন।

গোযান ও ভারবাহী মটর—আগে ভারতে গো-যান, অশ্বযান ইহাই ছিল, এখন বাষ্পচালিত বিদ্যুত চালিত যান, ভারতের সহর বন্দর ছাইয়া ফেলিয়াছে। গো-যান ৪টি মাত্র পাট কিম্বা তুলার বেল বহন করিতে পারে কিন্তু একখানা মোটর মাল গাড়ীতে ২৫।৩০টি বেল অনায়াসে লইয়া যায়। মোটর গাড়ী চলাচলের জন্য ভাল রাস্তা

আবশ্যক। সহর নগরের রাস্তায় ও বন্দর হইতে কারখানায় মাল বহনাবহন জন্য মোটর গাড়ীর বিশেষ উপযোগীতা দেখা যায়। মোটর গাড়ীতে ২টী সুবিধা—১ম অধিক মাল এক সঙ্গে যায়, ২য় মাল অতি শীঘ্র ঠিকানার গিয়া পৌছে। কিন্তু তাই বলিয়া গো, মহিষ, অশ্ব, অশ্বতর বাহিত যান উপেক্ষার জিনিষ নহে। পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে কিম্বা হাট বাজারে মাল বহনাবহনের জন্য গোযান ভিন্ন গতি নাই। পাহাড়ে রাস্তার গাড়ী টানিতে অশ্বতরযান অদ্বিতীয়।

আগে অশ্বযানই সমৃদ্ধির পরিচয় দিত এখন মোটর না হইলে সমৃদ্ধি সূচিত হয় না। কিন্তু ভারতের দরিদ্র পল্লীতে গো ও মহিষ যানই একমাত্র সম্বল।

বদ্ধ জল স্বাস্থ্য ও কৃষির প্রতিকুল—ছায়াযুক্ত সেঁতসেতে স্থানে ম্যালেরিয়া প্রকোপ অধিক। যে জমি অত্যন্ত রসা, যাহার জল নিকাশি পয়ো-নালা নাই তথায় চাষের সুবিধাও হয় না। জল নিকাশি পয়োনালার ব্যবস্থা করিলে ও জমি হইতে অতিরিক্ত জঙ্গল কাটিয়া সাফ্ করিলে জমি ক্রমশঃ শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য বাসের উপযুক্ত হইয়া থাকে যদি নিকটে নদী না থাকে, তবে খাল কাটিয়া অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা আবশ্যক। খাল, বিল, বা পুষ্করিণী যেমন পানীয় জল ও স্নানের জন্য আবশ্যক, তেমনি চাষের জন্য সেচের জলের আয়োজনও করিতে হয়। খাল, বিল, পুষ্করিণী ছাপাইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ জমি অতিরিক্ত রসা করিয়া না ফেলে। যাহা না পাইলে উদ্ভিদজীবন টিকে না, তাহা অতিরিক্ত পাইলেও উহাদের অনিষ্ট হয়।

অত্যন্ত আর্দ্র জলবসা জায়গায় প্রায়ই ম্যালেরিয়া হয়। সেখানে চাষের কৃষক মিলে না—কে চাষ করিবে! পল্লিগ্রামগুলি জলবদ্ধ হইয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। উপযুক্ত খাদ্য এবং সুপেয় জলের অভাবে গ্রামগুলি মনুষ্য বাসের অনুপযুক্ত হইতেছে এবং গ্রামসকল জঙ্গলে ভরিয়া যাইতেছে। দেশের লোক ইহার প্রতিকার না করিলে উপায় কি ?

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৮শ খণ্ড। | ভাদ্র, ১৩২৪ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

বাঙ্গালীর খাদ্য

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী F.R.H.S., গভর্ণমেণ্ট কৃষি-পরিদর্শক, লিখিত।

মাছ ও ভাত বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। মৎস্য দিন দিন দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে বাঙ্গালীর খাদ্যের সারভাগও ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। জীবনধারণ ও শরীর বর্দ্ধনের নিমিত্ত উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন। শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির ক্রিয়া, চিন্তা ও পরিশ্রম দ্বারা দেহের সর্ব্বদা ধ্বংস হয়। উপযুক্ত খাদ্য দেহের এই ধ্বংস পূর্ণ করে ও বর্দ্ধন করে। বাঙ্গালীর পরিশ্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীন নহে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ সাধ্যাবস্থা হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত মস্তিষ্ক চালনা করিতে বিরত হন না, কৃষকশ্রেণীও জলে ও স্থলে, রৌদ্র ও বৃষ্টিতে পরিশ্রম করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কিন্তু তাহারা উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের শারীরিক ধ্বংস পরিপূরণ করিতেছে কি না তাহা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি তাহাদের খাদ্য সারহীন ও অনুপযুক্ত হইয়া থাকে তবে কি উপায়ে খাদ্য পূরণ করা যায় তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিরই আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

খাদ্যের প্রোটিড্ নামক উপাদান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সারবান ও মূল্যবান। একজন পূর্ণবয়স্ক পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে ১০ তোলা প্রোটিড্ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালিগণ সাধারণতঃ কত পরিমাণে প্রোটিড্ দৈনিক গ্রহণ করে তাহা নিম্নলিখিত রসদের তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে।

খাদ্য	পূর্ণমাত্রা	প্রোটিডের পরিমাণ
চাউল	৪০ তোলা	১½ তোলা
ডাইল	৭ ,,	১½ ,,
তরকারী	১৫ ,,	¼ ,,
মৎস্য	৫ ,,	½ ,,
		মোট—৩¾ তোলা।

উদ্ধৃত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে উক্ত খাদ্য দেহ রক্ষা বা বর্দ্ধনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। মোটামুটি বলা যায় যে চাউলে শতকরা ৬ ভাগ, ডাইলে ২০ ভাগ, মাংসে ১৬ ভাগ, মৎস্যে ১০ ভাগ, গমে ১০ ভাগ, ফলে ১ ভাগ; তরকারীতে ১—২ ভাগ, দুগ্ধে ৩—৪ ভাগ প্রোটিড্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, যাহাতে দৈনিক প্রায় ৮ তোলা প্রোটিড্ গ্রহণ করা হয়; ডাইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রোটিড্ থাকে এবং ইহা অন্যান্য মেদকারী অর্থাৎ প্রোটিড্ প্রধান খাদ্য অপেক্ষা সুলভ। কিন্তু ডাইলের প্রোটিড্ অন্যান্য পদার্থের সহিত এমনভাবে সংবদ্ধ থাকে যে ইহা সহজে জীর্ণ হয় না। দৈনিক অর্দ্ধপোয়ার অধিক ডাইল সাধারণতঃ কেহ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন না। সুতরাং মৎস্য ও মাংস অপরিহার্য্য, যাহারা মৎস্য বা মাংস গ্রহণ করেন না তাঁহদিগের পক্ষে ইহার বদলে ছানা গ্রহণ কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ নিরামিষী হইয়া জীবনধারণ একরূপ অসম্ভব। বলা বাহুল্য যে দুগ্ধ, ঘি, ছানা প্রভৃতি গব্য পদার্থও জান্তব পদার্থ, সুতরাং ইহাদিগকে নিরামিষ বলা যুক্তিগত হয় না। মধ্যবিৎ এক ভদ্রলোকের নিম্নলিখিত পরিমাণে দৈনিক রসদ গ্রহণ আবশ্যক (মৎপ্রণীত খাদ্যতত্ত্ব হইতে গৃহীত।)

খাদ্যবস্তুর নাম	পরিমাণ	প্রোটিডের পরিমাণ
চাউল (একবেলা)	২০ তোলা	১½ তোলা
ময়দা (ঐ)	২০ ,,	২ ,,
মৎস্য	২০ ,,	২ ,,
মাংস	২০ ,,	৩ ,,
ডিম্ব (২টা)	১০ ,,	১ ,,
ডাইল	৫ ,,	¾ ,,
দুগ্ধ	২০ ,,	¾ ,,
তরকারী ও ফল	২০ ,,	½ ,,
ঘৃত ও তৈল	৫ ,,	—
শর্করা	১০ ,,	—
	১৪০	১১

যাঁহারা আটা বা ময়দা পান না, কিম্বা যাঁহাদের ইহা সহ্য হয় না, তাঁহাদের ভাতের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করা উচিৎ। যিনি মাংস গ্রহণ করেন না তাঁহার পক্ষে তৎপরিমাণে ছানা গ্রহণ কর্ত্তব্য। দুই বেলার পরিবর্ত্তে তিন বা চারিবেলা আহারের ব্যবস্থা উচিত। যে রসদ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এতদ্দেশীয় গরিবলোকের সাধ্যাতীত। তাহাদের জন্য নিম্নলিখিত দৈনিক রসদ ব্যবস্থা করা যাইতেছে।

খাদ্যবস্তুর নাম	পরিমাণ	প্রোটিডের নাম
চাউল	১০০ তোলা	৭ তোলা
ডাইল	১০ ,,	২ ,,
তরকারী	২০ ,,	¾ ,,
তৈল, গুড়	১০ ,,	
	১৪০	৯¼

যাহারা মাছ ও মাংসের সংস্থান করিতে পারেন না তাহাদের ভাতের দ্বারাই প্রোটীডের মাত্রা পূরণ করিতে হইবে। ইহা অবশ্য বলা আবশ্যক যে অধিক আয়তন বিশিষ্ট ভাত শাক সবজী প্রভৃতি খাদ্য দ্বারা পাকস্থলী ভারাক্রান্ত হইলে দেহের কার্য্যকারিতা শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অভাবে চাউল ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পরিমিত পরিমাণে ভাতও না জুটিলে লেখক নাচার। যাহারা খাদ্য পরিপাকক্রিয়া পাকপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা গ্রন্থকারের খাদ্যতত্ত্ব একবার পাঠ করিতে পারেন।

উদ্ভিদের পুষ্টি ও সৃষ্টি রহস্য

শ্রীশশীভূষণ সরকার

(Supdt. Gobindpore Experimental Farm) লিখিত।

সৃষ্ট ভুমণ্ডলের এককালে এমন অবস্থা ছিল যে তখন স্থল বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না—সমস্তই জল—তরল ভিন্ন কঠিন বলিয়া কোন কিছুই ছিল না। জল বা বায়ু ইহাদের আকারে কি তাহা ভাবিতে গেলে স্বতঃই মনে হয় যে আকাশই তাহাদের আকার। উপনিষদাদিতে সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথমে আকাশের সৃষ্টি হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ঔষধি, ঔষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য, বীর্য্য হইতে পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে। সকল দেশের পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে জীব সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে।

জলে উদ্ভিদ্ আপনা আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের জন্ম অযৌন। সূর্য্য কিরণ, সৃষ্ট বস্তুর নিদানভূত। জল মধ্যে সূর্য্য করস্পর্শে উদ্ভিদ আপনা আপনি (Spontaneously) জন্মিয়া সূর্য্যতাপ সংস্পর্শে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং নিজ দেহ হইতে ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই উৎপত্তি, চরম বৃদ্ধি ও অবশেষে ধ্বংস

হইবেই। উদ্ভিদ কিম্বা যে কোন প্রাণী, সকলই কতকগুলি বর্ত্তুলাকার কোষ সমষ্টি। নিম্নস্তরের উদ্ভিদ চরম পুষ্টিলাভ করিবার পর ধ্বংস কাল উপস্থিত হইলে ইহাদের কোষ সমূহ স্বাভাবিক নিয়মে দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং প্রত্যেক বিযুক্ত কোষ আবার নূতন কোষ গঠন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই প্রকার কোষ বিভাগ দ্বারা ইহারা স্বতন্ত্র প্রকৃতির উদ্ভিদেরও সৃষ্টি করিতে পারে। স্থলজ যাবতীয় উদ্ভিদ এই জলজ অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিদ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। জল হইতেই মাটি গঠিত হইয়াছে এবং জলীয় সিহালা হইতে স্থলজ নানা বৃক্ষ, লতা, তৃণ ও গুল্মের উৎপত্তি হইয়াছে।

স্থলজ উদ্ভিদও আপনার দেহ দ্বারা—পত্র, শাখা, শিকড়, মূল দ্বারা স্বজাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি করিতে পারে কিন্তু ইহারা আবার চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের ভিতর যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। পুং পুষ্পের প্ররাগ স্ত্রী পুষ্পের গর্ভাশয়ে নীত হইয়া বীজের উৎপত্তি হয় এবং বীজ হইতে স্বজাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

যে সকল বর্ত্তুলাকার অংশ লইয়া এক একটি উদ্ভিদ দেহ গঠিত হয় তাহাদের প্রত্যেকটিকে কোষ (Cell) বলে। কোষ গুলির প্রত্যেকটির আবার স্বচ্ছ আবরণ থাকে। ছোট বড় সকল বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এইরূপ কোষ সমষ্টি মাত্র। তবে বিভিন্ন উদ্ভিদে কোষ সকল ভিন্ন প্রকার এই মাত্র প্রভেদ। কোষগুলি এক প্রকার তরল পদার্থ, সার পদার্থে পূর্ণ থাকে। ইহাতেই উদ্ভিদের জীবনী শক্তি নিহিত থাকে। কোষের সারাংশেই উদ্ভিদের Neucleus। স-সার কোষ গুলিই Protoplasm (প্রটো-প্লাস্‌ম)। উদ্ভিদের দেহের যাবতীয় প্রক্রিয়া এই প্রটোপ্লাস্‌ম দ্বারাই সংসাধিত হয় এবং কোষস্থিত সারাংশ হইতেই নূতন নূতন কোষের সৃষ্টি হয়। সূর্য্য-কর স্পর্শে উৎপাদিত বর্ণ ও কোষাশয়ে নিহিত থাকে এবং ইহা দ্বারা উদ্ভিদের বর্ণ বৈচিত্র সম্পাদিত হয়।

আমি এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে উদ্ভিদের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা মোটা মুটি আভাস দিলাম মাত্র। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে আচার্য্য বসু মহাশয় অতি সুক্ষ্ম কারণ সমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত পৌনঃপুনিক সাড়া শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, উদ্ভিদের কোন অঙ্গে আঘাত বা উত্তেজনা দিলে প্রথমেই আঘাত প্রাপ্ত অংশ হইতে জলীয় ভাগ কোষ পরস্পরের সর্ব্বাঙ্গে চলিতে আরম্ভ করে এবং পরে আণবিক বিকার জাত প্রকৃত উত্তেজনা তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া গাছে সাড়া প্রকাশ করিতে থাকে।

"লজ্জাবতী লতার একটী লম্বা ডাণের গোড়ায় কোন প্রকার আঘাত দাও, প্রথমেই আহত অংশের কোষগুলির জলীয়ভাগ কোষপম্পরায় চলিয়া পত্রবৃন্তগুলিকে রসপুষ্ট ও খাড়া করিয়া দিবে, এবং পরে প্রকৃত আণবিক উত্তেজনা পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া পাতাগুলিকে নামাইয়া ফেলিবে। রসপুষ্টিজনিত পাতার আকস্মিক উত্থান, এবং পরক্ষণে

প্রকৃত উত্তেজনাজনিত তাহাদিগের পতন, লজ্জাবতী গাছে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অপর গাছে এই প্রকার প্রত্যক্ষ সাড়া দেখিবার উপায় নাই; কিন্তু বৃক্ষমাত্রেই যে ঐ উত্তেজনাদ্বয় বিচিত্র গতিতে চলা ফেরা করে, আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষায় তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

আচার্য্য বসুমহাশয় পূর্ব্বোক্ত রসসঞ্চালনকেই বৃক্ষের বৃদ্ধির মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাঁর মতে, উত্তেজনা প্রাপ্ত অংশ হইতে যখন তালে তালে রস সঞ্চালিত হইতে থাকে, গাছের বর্দ্ধনশীল অংশ তাহা দ্বারা ধাকা পাইয়া সেই প্রকার তালে তালে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। একটা রবারের নল টানিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটি যেমন পূর্ব্বের আকার পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ঐ আকুঞ্চন প্রসারণও কতকটা সেই প্রকারের। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গাছের বর্দ্ধনশীল অংশ রসের ধাক্কা পাইয়া যে টুকু প্রসারিত হয়, ধাক্কা বন্ধ হইলে রবারের নলের মত সেটি ঠিক্ পূর্ব্বের আকার ফেরত পায় না। প্রসারিত হইবা মাত্র ফাঁকা স্থানে বৃক্ষের বৃদ্ধিকর সামগ্রী সঞ্চিত হইয়া প্রসারণকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্থায়ী করিয়া দেয়। কাজেই পৌনঃপুনিক ধাক্কায় সেই এক একটু স্থায়ী প্রসারণ জমা হইয়া গাছটিকে বাড়াইয়া তুলে।

আমি অতঃপর বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় লিখিত প্রবাসীর উদ্ভিদের বৃদ্ধি শীর্ষক প্রবন্ধাংশ সন্নিবেশ করিয়া অত্র আলোচনা আপাততঃ শেষ করিব। তাহা এই—

প্রাণী বা উদ্ভিদ শরীরের কোনও অংশ সুস্থ আছে কি না জানিতে হইলে, সেই অংশ রীতিমত পরিপুষ্ট হইতেছে কি না দেখার রীতি আছে। পরিপুষ্টি হওয়া জীবনের অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু এই পরিপুষ্টি বা বৃদ্ধির কাজ উদ্ভিদ শরীরে কি প্রকারে চলে, তাহা এপর্য্যন্ত ঠিক জানা যায় নাই। উদ্ভিদ-শরীরে আঘাত উত্তেজনা দিয়া দেখা গিয়াছে যে, উত্তেজনা এখন গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে, পর মুহূর্ত্তে তাহা দ্বারাই আবার বৃদ্ধির রোধ হইয়া পড়িতেছে। বহু অনুসন্ধানেও উত্তেজনার এই উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যের মধ্যে কোনও নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায় নাই। বাহিরের উত্তেজনার ঐ বিসদৃশ কার্য্য দেখিয়া উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ গাছের ভিতরকার একটি স্বাভাবিক উত্তেজনার (Inner Stimulus) অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছেন, এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া আজ কাল গাছের বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় নানা ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ঐ অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা জিনিসটা যে কি এবং তাহার উৎপত্তিই বা কোথায়, আধুনিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে (Plant Response) ঐ কাল্পনিক উত্তেজনার উৎপত্তি-রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং উহার সহিত বাহিরের আঘাত-উত্তেজনার কি প্রকার সম্বন্ধ তাহাও সুস্পষ্ট দেখাইয়া তিনি উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধে সকল সমস্যারই সুমীমাংসা করিয়াছেন।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে, পৌনঃপুনিক সাড়া (Multiple response) সম্বন্ধে আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কারের যে সকল কথা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা একবার স্মরণ করা আবশ্যক। আমরা তখন আলোচনা করিয়াছিলাম, সাধারণ সুস্থ গাছে আঘাত দিলে প্রতি আঘাতেই এক একটি সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু উহার ভিতরকার শক্তির পরিমাণ যদি প্রচুর হয়, তবে একই উত্তেজনার পর পর অনেকগুলি সাড়া দেখা দিতে আরম্ভ করে। অপরিপুষ্ট দুর্ব্বল বনচাঁড়াল (Desmodium) গাছ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, প্রতি আঘাতে পাতা এক একবার মাত্র উঠিয়া নামিয়া সাড়া দিতে থাকিবে। পরিপুষ্ট সবল গাছে আঘাত দাও একই আঘাতে সেটির পাতা বহুবার উঠানামা করিয়া সাড়া দিতে আরম্ভ করিবে। এই পৌনঃপুনিক সাড়া কেবল বনচাঁড়াল গাছেরই বিশেষত্ব নয়। আঘাত উত্তেজনায় গাছ মাত্রেরই শরীরে পৌনঃপুনিক সাড়া চলা ফেরা করে, বনচাঁড়াল গাছের পাতার গঠন ও অবস্থান উত্তেজনা গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ সাড়া দিবার অনুকূল বলিয়া আমরা কেবল ঐ রকম দু' একটা গাছে পাতার উঠানামা দেখি। এ সকল স্থলে উত্তেজনাস্রোত বৃক্ষশরীরের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে পাতাগুলিকে নাড়া দিয়া যেন আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। অপর বৃক্ষে উত্তেজনা প্রবাহের অস্তিত্ব এই উপায়ে ধরা যায় না, বৈদ্যুতিক উপায়ে বুঝিতে হয়।

গাছের বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে আহত স্থান হইতে উত্তেজনাগুলি যেমন তালে তালে আসিয়া বর্দ্ধনশীল কোমল অংশে ধাক্কা দেয়, গাছও ঠিক সেইপ্রকার তালে তালে বাড়ে। উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে এ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে গাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা করা হয় নাই। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার "ক্রেস্কোগ্রাফ্" নামক যন্ত্র দ্বারা গাছমাত্রেরই ঐ প্রকার তালে তালে বাড়া সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

সুতরাং দেখা গেল, গাছের কোন অংশে আঘাত দিলে সেই স্থান হইতে উত্তেজনাটা পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা করিতে আরম্ভ করে, এবং তদ্দ্বারা গাছের বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সাধারণ অবস্থায় গাছে ঐ প্রকার আঘাত উত্তেজনা কোথা হইতে পায়? কোন গাছের পৌনঃপুনিক সাড়া দেখিতে ইচ্ছা করিলে, আমরা সেই গাছটীর কোন অংশে তাপ প্রয়োগ করিয়া বা অপর কোন প্রকার আঘাত দিয়া উত্তেজিত করি এবং এই উত্তেজনা পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করে। গাছ যখন আপনা হইতেই বাড়িতেছে, তখন এই প্রকার আঘাত কোথা হইতে আসে? আচার্য্য বসু মহাশয় এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়াছেন। তিনি নানা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা দেখইয়াছেন, বাহিরের তাপ আলোক ও রস সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদ সকল যখন শক্তিপূর্ণ থাকে তখন বাহির হইতে কোনপ্রকার আঘাত উত্তেজনা না দিলেও তাহাদের পৌনঃপুনিক সাড়া চলিতে থাকে। এই প্রকার অবস্থায় বায়ু দ্বারা গাছের পাতাগুলির মৃদু আন্দোলন

বা পত্রগুলির পরস্পর সংঘর্ষণ প্রভৃতি সামান্য আঘাতও অনেক সময় পৌনঃপুনিক সাড়া সুরু করাইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং যে পর্য্যন্ত সেই পূর্ব্বসঞ্চিত শক্তির ভাণ্ডার ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, ঐ সাড়ার আর বিলয় হয় না। আচার্য্য বসু মহাশয় নানা পরীক্ষা দ্বারা, পৌনঃপুনিক সাড়ার এই প্রকার সত্বর প্রবর্ত্তন অনেক গাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন এবং ইহার উপরই নির্ভর করিয়া তিনি বলিতেছেন, গাছগুলি যখন তাপালোকের শক্তি ও রস সংগ্রহ করিয়া বেশ স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন থাকে, তখন তাহাতে যেমন আপনা হইতেই পৌনঃপুনিক সাড়া চলিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে রসপ্রবাহের ধাক্কা পাইয়া গাছও সেই প্রকারে বাড়িতে থাকে।

বৃক্ষের পৌনঃপুনিক সাড়া ও উহাদের বৃদ্ধির সাড়া তুলনা করিবার জন্য আচার্য্য বসু মহাশয় অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং এই সকল পরীক্ষালব্ধ অনেকগুলি চিত্র তাঁহার নবপ্রকাশিত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই উভয়বিধ সাড়ালিপি তুলনা করিলে খুঁটি নাটি সকল ব্যাপারে তাহাদের একতা দেখা যায়। সুতরাং পৌনঃপুনিক সাড়ার রস প্রবাহ যে, গাছপালাকে বাড়াইয়া তুলে তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বলা বাহুল্য প্রাচীন ও আধুনিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ পৌনঃপুনিক সাড়ার খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার জানিতেন না। কাজেই উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ তাঁহাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাঁরা গাছের কোন এক অন্তর্নিহিত শক্তিকে (Inner Stimuli) তাহাদের বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন এবং এই শক্তির প্রকৃত পরিচয় তাঁহাদের নিকট পাওয়া যাইত না। আচার্য্য বসু মহাশয় এই আবিষ্কার দ্বারা এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার ছিল তাহা স্পষ্ট-ভাষায় সকলকে জানাইয়াছেন। উদ্ভিদ শরীরের তালে তালে কম্পন (Rhythmic activity) যে তাহাদের বৃদ্ধির একমাত্র কারণ তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এবং বৃক্ষের উত্তেজনাশীলতাই, যে ঐ কম্পনের মূল কারণ তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং এখানেই সেই রহস্যময় "inner stimuli" কথাটির সদ্‌ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে। উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া বাহিরের তাপালোক হইতে গাছপালা যে সকল শক্তি নিজের দেহে সঞ্চিত রাখে, স্থূল কথায় বলিতে গেলে তাহাই উদ্ভিদের inner stimuliর মূল উৎপাদক।

শক্তির সঞ্চয় না থাকিলে সজীব নির্জ্জীব কোন বস্তুই কাজ করিতে পারে না। বাহিরের তাপালোক উদ্ভিদ দেহে শক্তি-সঞ্চার করে, কাজেই গাছপালাকে তাপালোক হইতে বঞ্চিত করিলে, সেগুলির নির্জ্জীব হইয়া পড়ার সম্ভাবনা। আচার্য্য বসু মহাশয় শত শত পরীক্ষায় নানা জাতীয় উদ্ভিদকে ঐ প্রকারে নির্জ্জীব করিয়া, পরে তাহাদের দেহে কৃত্রিম উপায়ে তাপালোক প্রভৃতির উত্তেজনা প্রয়োগ করিয়া, সেগুলিকে সজীব

করিয়াছিলেন। বাহিরের উত্তেজনা দেহস্থ করিয়া মৃতপ্রায় উদ্ভিদ সকল সুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাহাদের বৃদ্ধি ও রসশোষণও দেখা গিয়াছিল।

শক্তি সঞ্চিত হইলেই, তাহা দ্বারা কাজ পাওয়া যায় না। আমাদের নিজের শরীরের কথা ভাবিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। যখন কোনও কারণে শরীর খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শক্তির সঞ্চয় আরম্ভ হইলেই তখন আমাদের কার্য্য করিবার সামর্থ্য ফিরিয়া আসে না। সে সময়ে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়, সুতরাং শরীরকে খাড়া রাখিবার জন্য যে একটু শক্তির আবশ্যক, সে টুকু-সর্ব্বাগ্রে আমরা আত্মসাৎ করিয়া লই, এবং ইহার প্রতিদানে আমরা কোন কার্য্যই দেখাইতে পারি না। এই প্রকারে খাড়া হওয়ার পর যে শক্তি পাওয়া যায় আমরা কেবল তাহা দ্বারাই কাজ দেখাইতে পারি। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদেও অবিকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রাণিলক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। দুর্ব্বল গাছ পরীক্ষা করিয়া দেখ,—তাহাতে বৃদ্ধি ও রসশোষণ প্রভৃতি কার্য্যের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইবে না। তারপর তাহাতে উত্তেজনা প্রয়োগ কর, স্পষ্টই বুঝা যাইবে উহার কতক অংশ গাছটীকে সবল করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া পড়িতেছে, এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বারা তাহার বৃদ্ধি ও রসশোষণের কার্য্য আরম্ভ হইতেছে।

শীতাতপের আধিক্য প্রাণীর স্বাস্থ্য-রক্ষার অনুকূল নয়। অত্যন্ত শীত বা অত্যন্ত গরমে সাধারণ প্রাণীর জীবন রক্ষা করা দায় হইয়া পড়ে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায় শীতাতপের মাত্রা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌছিলে প্রাণী বেশ স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়ে। নানা জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কোন্‌টি কি প্রকার উষ্ণতায় সুস্থ থাকে, তাহা আজও স্থিরীকৃত হয় নাই, তবে শারীরিক গঠন ও অবস্থা অনুসারে প্রত্যেক প্রাণীর যে এক একটা স্বাস্থ্যপ্রদ উষ্ণতা আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আচার্য্য বসু মহাশয় নানা উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া, প্রত্যেক জাতির এক একটা স্বাস্থ্যপ্রদ উষ্ণতা (Optimum Temperature) আবিষ্কার করিয়াছেন। উষ্ণতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌছিলে, যে গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে আরম্ভ করে, আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। শ্রীজগদানন্দ রায়।

জাপানে ব্যবসায়ের প্রসার—জাপানের ব্যবসায় কি প্রকার উত্তরোত্তর বাড়িতেছে তাহা তাহাদের একটি পণ্যবাহী জাহাজ কোম্পানির বিষয় আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। এই কোম্পানির মূলধন ৪৪,০০০,০০০ ইয়েন অর্থাৎ ৬৭,০০০,০০০ টাকা।

উক্ত কোম্পানির ১০১ খানি জাহাজ আছে, তাহতে ৪৭০,০০০ টন মাল বোঝাই হইতে পারে। ১ টনের ওজন বাঙলা প্রায় ২৭॥ মণ।

গোলাপ চাষের শেষ অংশ

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়,
(Supdt. Nursary Garden I.G.A.) লিখিত।

আমরা কতকগুলি প্রচলিত বিশিষ্ট গোলাপের নামোল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবনা শেষ করিব।

হাইব্রিড পারপেচুয়াল

এবি বেমেরেল (Abbe Brammerel) বর্ণ—উজ্জ্বল ভাল ভেল্‌ভেটের মত।

আলফ্রেড-ডি-রোগমণ্ট (Alfred de Rougemnt) বর্ণ—চক চকে লাল, ঠাস পাপ্‌ড়ি ; গাছ তেজাল।

আব্‌দুল কাদির (Abdul Kadir) বর্ণ—ভেল্‌ভেটের মত গাঢ় লাল, ফুলের গঠন সুন্দর।

এণ্টনি ডচার (Antonie Ducher) বর্ণ—উজ্জ্বল লাল, ফুল বড়, সুগঠন ; গাছ তেজস্কর।

এণ্টনি মাউটন (Antonie mouton) ইহার রঙ ডচারেরই অনুরূপ কেবল পাপ্‌ড়ির তলদেশ ঈষৎ শ্বেতাভ ; ফুলের গঠন সুন্দর।

ব্লাক প্রিন্স (Black Prince) ফুল বড় পাপ্‌ড়ি ঠাস্ রঙ কৃষ্ণাভ ঘন লাল।

বিউটি অব ওয়ালথাম (Beauty of Waltham) ফুল সুগঠন, রঙ উজ্জ্বল গোলাপী।

ব্যারনেস্ রথ চাইলড (Baroness Rothchild) ফিকে গোলাপী ফুল, তাহাতে সাদার আভাযুক্ত, ফুল বড়, পাপ্‌ড়ি ঠাস্, একটি শ্রেষ্ঠ গোলাপ।

ক্যাপ্‌টেন ক্রিষ্টি (Captain Christy) পাটকিলে জবার মত রঙ, মধ্যস্থল গাঢ় ; ফুলের চটক আছে।

চার্লস্ ডিকেন্স (Charles Dickens) ফুল বড়, পাপ্‌ড়ি ঘন, রঙ গোলাপী।

চার্লস ল্যাম্ব (Charles Lamb) রঙ উজ্জ্বল লাল ; মকুল অবস্থায় দেখিতে বড় সুন্দর, অপরিযাপ্ত ফুল ফুটে।

চার্লস্ ফন্‌টেন্ (Charles Fontaine) ফুল গাঢ় রক্তিমাবর্ণ, সুগঠন।

চার্লস্ উড (Charles Wood) সুগঠন লাল রঙের ফুল।

ককেট ডি ব্লান্‌সেস্ (Coquette de Blanches) ফুল ঘন পাপড়ি, বড় রঙ অতিশয় সাদা।

এম্পারার (Emperor) ঘোর লাল রঙ প্রায় কাল; ফুল ছোট, খুব ফুটে; গাছ বাড়ন্ত অনেক ফুল হয়। বটন হোল বুকে হইবার উপযুক্ত।

এম্প্রেস্ (Empress) ফুল সাদা মধ্যস্থল পিঙ্ক, ফুল ছোট আকৃতি সুন্দর। বটন হোল বুকে হইবার উপযুক্ত।

গ্লোরি ডি ডচার (Gloire de Ducher) ঘন রক্তিমবর্ণ, ফুলের গঠন সুন্দর।

জেনারাল জাকুইমিণ্ট (General Jacquiminot) উজ্জ্বল লাল ভেলভেটের মত রঙ, ফুল দেখিতে সুন্দর।

জ্যায়াণ্ট ডি ব্যাটোল্ (Geant de Batailes) বেগুনি আভা লাল বর্ণের ফুল, মাঝারি ও সুন্দর।

গ্লোরি অব ওয়ালথাম (Gloire of Waltham) লাল বর্ণ, বড় ফুল।

গ্রাণ্ড মোগল (Grand mogal) উজ্জ্বল লাল তলদেশ গাঢ় রক্তিমাভ, লাল জমিয়া কালিমাভা হইয়াছে। ফুল সাতিশয় সুগঠন, একটি উৎকৃষ্ট গোলাপ।

হার ম্যাজেষ্টি (Her majesty) উজ্জ্বল গোলাপী সাটিনের মত রঙ, ফুল সুগঠন; গাছও বেশ সুআকৃতি বিশিষ্ট হয়।

হোরেস ভার্ণেট (Horace Vernet) ঘন লাল বড় ফুল, গাছ বাড়ন্ত।

ইউজিন ফষ্ট (Eugene Faust) ফুল ঘন লাল ভেলভেটের মত; আকার বড়।

জিন গুজান (Jean Goujan) লাল রঙের বড় ফুল।

লেডি অফ দি লেক (Lady of the Lake) পিচ রঙ; ফুল গুলি সুগোল দেখিতে মনোহর। ইহাকে কেহবা নয়সেট্ শ্রেণীর গোলাপের মধ্যে স্থান দেন।

লা ফ্রান্স (La France) পীচ রঙের ফুল ভিতরটা গোলাপী; নিরতিশয় সুমিষ্ট গন্ধ।

মারকুইস ডি বোঁসেলা (Marquis de Boncella) ফিকে লালাভ ফুল, অধিক ফুটে গন্ধ মনোহর।

মিসেস্ জন ল্যাঙ (Mrs John Laing) ফুল পিঙ্ক রঙের, সুগঠন। গন্ধ মনোরম।

মিসেস্ উড (Mrs Wood) ফিকে লাল, ফুল মধ্যমাকৃতি।

গ্লোরি ডি ডচার (Gloire de Ducher) ঘন রক্তিম বর্ণের সুঠাম পুষ্প।

জেনারেল জাকুইমিণ্ট (General Jacquiminot) উজ্জ্বল দাড়িম্ব ফুলের বর্ণ, ফুল বড়, বহু পুষ্পা।

লুই ভ্যান হুট (Louise Van Houte) উজ্জ্বল গভীর লাল বা কৃষ্ণাভ। প্রথম শ্রেণীর পুষ্প।

আমেরিকান বিউটী (Amrican Beauty) উজ্জ্বল লাল বর্ণের সুরভী গোলাপ।

পিয়ার নটিং (Piere Notthing) রক্তিম বেগুনি বর্ণের পুর্ণায়ত বৃহদকার সুন্দর ফুল। গাছ অতি বাড়ান্ত। প্রথম শ্রেণীর ফুল।

ম্যাডাম জ্যাকিয়ার (Madame Jacquir) সুবৃহৎ ও সুঠাম ও পুর্ণায়ত বেগুনি বর্ণের। বাড়ান্ত গাছ।

রেনওল্ হোল (Reynolds Hole) রক্তিম বর্ণের; পুর্ণায়ত, সুঠাম ও পেয়ালা সদৃশ আকার।

এলিজাবেথ ভিনেরণ (Elizaboth Vigneron) ফিকে গোলাপী বর্ণের সুরভি গোলাপ।

কোমটিস্ ডি সিরিণী (Comtesse de Sereyne) ফিকে গোলাপী বর্ণের বৃহদকারের ফুল। বহু পুষ্পদ ও বাড়ান্ত।

ম্যাডাম বল্ (Madam Boll) গোলাপী বর্ণের।

মেরি রেডি (Marie Rady) উজ্জ্বল লাল বর্ণের, সুঠাম ও মনোহর।

লা ফ্রান্স (La France) ফুলের বর্ণ সাদা পীচ, বৃহদকার ও সুন্দর।

ফায়ার ব্র্যাণ্ড (Firebrand) অগ্নি শিখা সমোজ্জ্বল লাল বর্ণ ফুল, যেন বৃন্তক।

পল নিরন (Paul Neron) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদকার সুরভি গোলাপী বর্ণের ফুল। গাছে কাঁটা নাই। মধ্যমকার।

কুইন ভিক্টোরিয়া (Queen Victoria)

প্রেসিডেণ্ট মাস্ (President moss) ঘন লাল বর্ণের ফুল।

টী

ক্যাথারিণ মার্মেট (Catharine marmet) লাল বর্ণ; অর্দ্ধোন্মুক্ত পুষ্প বড়ই মনোহর।

এল্‌বা রোজিয়া (Alba Rosea) উত্তম গন্ধযুক্ত পুর্ণায়ত বৃহদকার শুভ্র বর্ণের ফুল ফুলের মধ্যাংশে গোলাপী বর্ণের ছায়া থাকে।

ডিভোনিয়েন্সিস্ (Devoniensis) গাছ লতিকা স্বভাব ও বাড়ন্ত; ফুল দুধি হলদে বর্ণের, সুঠাম ও সুন্দর।

গ্রেস্ ডার্লিং (Grace Darling) বর্ণ তুষার শুভ্র।

ইটয়েল ডি লিয়ন (Etoile de Lyon) সুন্দর জ্যাফ্রান রঙ্গের ফুল।

জিন ডচার (Jean Ducher) রং হরিদ্রাভ। কতকটা পিচ্ বর্ণের।

গ্লোরি ডি ডিজন (Gloire de Dijon) সুপরিচিত হরিদ্রা বর্ণ; বৃহদকার ও বহু পুষ্পী; অতি বাড়ান্ত।

মেরি ভান হোট (Marie Van Houte) গাছ প্রসারিণী ; বহু পুষ্পদ ; পুষ্পের বর্ণ দুগ্ধ হরিদ্রা, দলের শেষাগ্র ভাগ তাম্রবৎ ঈষৎ লাল। টী জাতীয় মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

পার্ল ডি লিয়ন (Perle de Lyon) সুঠাম ও ঘন পীত বর্ণের ফুল।

সম্বেরেল (Sombreol) বারমাসই ফুল হয়। ফুলের বর্ণ শুভ্র কিন্তু অনেক ফুল লালাভ, অনেক ফুল লাল ছিট্ সমন্বিত, ফুল তাদৃশ ঘন বা দীর্ঘ স্থায়ী নাই। ইহা 'সোমরেল' নামে সচরাচর অভিহিত। জোড় কলমাদির জন্য ইহার শাখা কলম বড় প্রয়োজনীয়।

এড্রিন ক্রিষ্টোপল (Adriene Christophle) পীচ ফুলের বর্ণের ছায়া সমন্বিত হরিদ্রা বর্ণের বড় জাতীয় ও পূর্ণায়ত পুষ্প।

নয়সেট

এমি ভাইবার্ট (Amie Vibert) স্তবকে স্তবকে বহু পুষ্প ধারণ করে ফুলের বর্ণ শুভ্র।

আমেরিকা (America) লতাইবার পক্ষে বড় উপযোগী ; পুষ্পের বর্ণ সাদা, মধ্যমাংশ ঈষৎ লালভ।

বোকে-ডি-অর্ (Bouquet'd Or) সুঠাম হরিদ্রা বর্ণের ফুল।

সেলিন ফরেষ্টার (Celine Forester) লতাইবার উপযোগী সুন্দর গাছ, ফুলের বর্ণ কেনেরি পক্ষীর ন্যায় দুগ্ধ হরিদ্রা সুটাম ও সুবাসিত। গাছ বড় বিক্ষিপ্ত স্বভাব, সুতরাং নিয়ত অস্ত্রাধীন রাখিতে হয়।

ক্লথ অফ গোল্ড (Cloth of Gold) উত্তম লতানীয়া স্বভাবের গাছ ; ফুল বিশুদ্ধ হরিদ্রা বর্ণের মধ্যমাংশ অধিকতর ঘন। বহু পুষ্পদ।

লামার্ক (Lamarque) বৃহৎ ও পূর্ণায়ত ; পীতাভ সমন্বিত শুভ্র বর্ণের অতি মনোহর গোলাপ। উত্তম লতানিয়া স্বভাব।

জীন-ডি-আর্ক (Jean de Arc) ফুল শুভ্র বর্ণের, কোরক মুল গোলাপী।

মার্শেল নীল (Marechal Neil) তেজাল, বৃদ্ধিশীল ও লতাইবার উপযোগী। পুষ্পের বর্ণ ঘন সুবর্ণ ; কোন কোন গাছের ফুলে পাপড়ীর শেষভাগ তাম্র বর্ণ; বহু পুষ্পক এবং প্রায় বারো মাসই ফুল হইয়া থাকে। প্রাচীর বা অট্টালিকার গাত্রে নিয়ন্ত্রণীয়। বাড়ন্ত রৌদ্র হিম স্থানে অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে। অতি মনোহর সুগন্ধী। গোলাপের মধ্যে বোধ হয় ইহাই উৎকৃষ্ট।

সলফেটার (Solfaterre) উজ্জল গন্ধক হরিদ্রা বর্ণের বড় ও পূর্ণায়ত পুষ্প।

ডব্লিউ, এ, রিচার্ডসন (W. A. Richardson) কমলা লেবু বর্ণের বৃহদাকার পূর্ণায়তন উত্তম পুষ্প, উদ্যানে অবশ্য রক্ষণীয়।

প্রিন্সেস্ অফ ওয়েলস্ (Prince of Wales) বাহিরের পাপড়ী গোলাপী হরিদ্রাভ, মধ্যস্থল হরিদ্রা বর্ণ। ফুল বড় ও ঠাস হয়।

মস্

ইউজিন ভার্ডিয়ার (Engenie Verdier) উজ্জল লাল বর্ণের।

মেরি-ডি ব্লইস (Marie de Blois) উজ্জল গোলাপী বর্ণের ফুল।

পার্পেচুয়াল হোয়াইট মস্ (Perpetual white moss) স্তবকে স্তবকে শুভ্র বর্ণের ফুল হয়।

হোয়াইট মস (White moss) ফুল, শুভ্র বর্ণের ক্রমে লালচে রং প্রবল হয়।

লিটল জেম (Little gem) গাছ বেশ ঝাড়াল হয়। ফুল লালসুন্দর।

মেরি ডচার (Marie Ducher) সামন গোলাপী, বড় ঠাস ফুল।

বোরবোঁ

লেভেনির (L' Avenir) ফুল চিকন গোলাপী, বড় ও পূর্ণাকাব; গঠন, পেয়ালা সদৃশ; গাছ, বাড়ান্ত।

আরমোসা (Armosa) ফুল মাঝারি, বর্ণ,-ফিকে গোলাপী; বহুপস্পক।

ব্যারণ ডি নরমণ্ট (Boron de Normoint) উজ্জল গোলাপী বর্ণের, সুঠাম, সুন্দর ও অতি সুগন্ধ পুষ্প।

বোকে-ডি ফ্লোর (Bouquet de Flore) উজ্জল বর্ণের সুবাসিত ফুল। আকার, বড় ও পূর্ণ; গঠন,—পেয়ালা সদৃশ ও সুন্দর; গাছ, অতিশয় বাড়ান্ত।

ভিরিডি ফ্লোরা (Viridiflora) প্রায়ই বার মাসই পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে। পুষ্প সবুজ বর্ণের ও ক্ষুদ্র কিন্তু প্রত্যেক শাখা প্রশাখায় শেষাগ্রভাগে প্রত্যেক স্তবকে ৮।১০ টী ফুল হয়। গাছের বর্ণ ও ফুলের বর্ণে প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। গাছ দেড় হইতে দুই হাত উচ্চ হয়; টী জাতীয় শাখা প্রশাখা সম্পন্ন। কৌতুহলোদ্দেশে উদ্যানে আশ্রয় পাইতে পারে।

সুভেনির ডিলা ম্যালমেসন (Souveinir de a malmaison) ফুল,—সুঠাম; সুন্দর ও ঘন বৃন্তক, পূর্ণাকার ও বড়; টাট্কা মাংসের ন্যায় বর্ণ। অতি উত্তম জাতির গোলাপ। গাছ, বাড়ান্ত ও বহু পুষ্পক।

হাইব্রিড টি

ডিন্ হোল (Deane Hole) ফুল সাদা লালাভ। ফুল ঠাস্ ও বড়।

আর্কাডিউক চার্লস (Archduke Charles) বাহিরের পাপ্ড়ি ঘোর লাল। ভিতর লালাভ সাদা। ফুল বড় হয়।

অরোরা (Aurora) গোলাপী রং। প্রথম ফুটীবার সময় দেখিতে চমৎকার। ফুল ঠাস্ ও বড়।

চেস্‌নট্ হাইব্রিড (Cheshnut Hybrid) পিঙ্গলাভ লোহিত বর্ণ। গাছ লতানে এবং কষ্ট সহিষ্ণু।

ক্লাইম্বিং ডিভোনিয়নসিস্ (Climbing Devoniensis) পিতাভ সাদা, ফুল পিয়ালা আকার ও সুগন্ধ যুক্ত।

ডচেস অফ এলবেনি (Duchess of Albany) ঘোর গোলাপী বর্ণ, ফুল দেখিতে অতি সুন্দর।

পিঙ্ক রোভার (Pink Rover) রঙ ফিকে পিঙ্ক, ফুল বড়, ঠাস্ পাপড়ি, গন্ধ মনোহর।

প্রিন্সেস্ মেরী (Princess Mary) ইহা গ্লোরি ডি জন জাতীয় গোলাপ কিন্তু উহার মত এত বৃদ্ধিশীল নহে, ফুল গোলাকৃতি, রঙ পিঙ্ক।

চেসনট হাইব্রিড (২) (Cheshunt Hybrid) মেরুণ রঙ, ফুল বড় পাপড়ি ঠাস।

টি ও এবং হাইব্রিড টি চেনা সুকঠিন। যাহারা সর্ব্বদাই গোলাপ গাছ লইয়া নাড়া চাড়া করেন তাঁহারই এতদুভয় শ্রেণীর গোলাপের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ গোলাপ

উপরে যে সমুদয় গোলাপের নামোল্লেখ করা গেল তাহা ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ গোলাপ আছে।

১। বসোরা (Bosorah) ইহাকে বাঙলায় বসরাই গোলাপ বলে। ইহার ফুল বড়, রঙ গোলাপী, গাছ মধ্যমাকৃতি, ফুল অপরিযাপ্ত ফুটে। গাজীপুর অঞ্চলে এই গোলাপের বড় বড় ক্ষেত আছে। ইহা হইতে আতর ও গোলাপ-জল প্রস্তুত হয়। এই বসরাই গোলাপ বোধ হয় ডামাস্ক গোলাপ শ্রেণীর অন্তর্গত।

২। ম্যাক্রোফিলা (Rosa macrophilla) ইহাকে বাঙলা দেশে সেঁউতি গোলাপ বলে। গাছ দুই তিন ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। গাছ খুব ঝাড়াল হয়। ঘাষ মাঠের মধ্যে রোপণ করিলে এক একটি ঝুপি গাছে বেশ বাহার হয়। ফুলের রঙ ঘোর গোলাপী।

৩। চায়না গোলাপ (China Rose) ইহাকে চীনে গোলাপ বলে। ইহাতে গাছও খুব ঝাড়াল এবং রাশি রাশি ফুল ফুটে। এই গোলাপকে অধিক যত্ন করিতে হয় না।

জয়ঘন্টি (Rose gigantia) ইহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছে। ইহা লতানিয়া স্বভাবের গোলাপ। বেড়ায় দিবার বিশেষ উগযোগী। ইহা হইতেই কটিং দ্বারা চারা উৎপন্ন করিয়া অন্য গোলাপের সহিত কলম বাঁধা হয়। ইহার প্রত্যেক শাখা প্রশাখাতে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটে। এক একটি স্তবকে ৩৫।৪০টা ফুল থাকে। ফুল ক্ষুদ্র বর্ণ দুধে আল্‌তা। চৈত্র-বৈশখে ফুল ফুটে। ইহাতে সাতিশয় কাঁটা আছে।

সুইট ব্রায়ার (Sweet Briar) গাছ টি শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার দণ্ড গুলি দীর্ঘ, গাছে বহু শাখা প্রশাখা থাকে। ফুল একহারা রঙ ফিকে গোলাপী, চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল ফুটে। ইহার ফুলের কোন আদর নাই কিন্তু এই জাতীয় গোলাপের পাতায় মনোহর গন্ধ আছে।

ডামাস্ক গোলাপ (Damask Rose) ভারতবর্ষে দুই প্রকার ডামাস্ক গোলাপ দৃষ্ট হয় একটির বর্ণ ফিঁকে গোলাপী, অন্যটির ফুল সাদা। এ দেশে এই গোলাপকেই বোসরাই গোলাপ এই নাম দিয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফুল ফুটে। ফুলে খুব সুগন্ধ। ইহা হইতে গন্ধসার আতরাদি প্রস্তুত হয়।

মস রোজ, বটনরোজ ইহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। মস্ রোজের অতিশয় মনোহয় গন্ধ। বটন রোজ ইহাতে জামায় আটিবার উপযোগী সুন্দর ছোট তোড়া হয়।

মোকামাটাল্ বা বিল্

এবং Catterpiller pest (পোকার উপদ্রব)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরি লিখিত।

টালের চৌহদ্দি—উত্তর E. I. Ry. লক্ষীশরাইয়ের নিকট। দক্ষিণ শেখ্‌পুর শরমেরা পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে কিউল নদী ও ঐ ষ্টেশন। পশ্চিম পুন্ পুন্ নদী পর্য্যন্ত। এই চৌহদ্দিস্থিত উত্তর দক্ষিণে লম্বা ১২।১৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে, মোকামা হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণের মৌরগ্রাম ও পুন্ পুন্ পর্য্যন্ত ৭।৮ ক্রোশ চৌড়া স্থান সমূহের গ্রামগুলি, যে বৎসর অধিক বর্ষা হয় সেই বৎসর বেশী জলে পূর্ণ হইয়া বোঝাই হইয়া যায়। এই জলরাশি প্রধানতঃ পাটনা জেলা, গয়া অপেক্ষা ক্রমশঃ

নিম্ন হইয়া উত্তর পূর্ব্ব মুখে চলিয়া আসায়, ফল্গু নদীর পাহাড়িয়া জলস্রোত হু হু শব্দে পুন্ পুন মোহানা, পাঁচ্না প্রভৃতি গঙ্গার ছোট ছোট খাড়ি বহিয়া, "মোকামা টালে" আসিয়া জমা হয় এবং যে বৎসর গঙ্গা নদীতে অধিক জলবৃদ্ধি হয়, সেই জলও মুঙ্গের জেলার বড়িয়া- ষ্টেশনের পশ্চিম, গঙ্গার খাড়ি বাহিয়াও ঐ "টালে" আসিয়া পড়ে। সুতরাং পাটনা এবং মুঙ্গেরের সীমান্তবর্ত্তী "মোকামা টালে" আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত পাঁচ মাস প্রায় ১২।১৩ হাত গভীর জলে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ, অতল জলে ডুবাইয়া রাখে। ইহাতে স্থানটি যেন একটী বিস্তীর্ণ সমুদ্রবৎ দেখায়। কিন্তু আবার ঐ জল, গঙ্গার জল কমিবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পুন্ পুন্, মোহানা, প্রভৃতি নদী, নিকাশ হওয়ায়, পাঁচ মাস যাবত বদ্ধজলে, এক প্রকার গাঁইটওয়ালা নরম জাতীয় কাল ও হলদে ইত্যাদি বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু জন্মে। উহাকে সাধারণতঃ ফসলধ্বংশী "জড়া পোকা" বলে। টালের জল, কার্ত্তিক মাস মধ্যেই আবার শুখাইয়া যায়। কারণ টালের দুই দিক্ দিয়াই জল বাহির হয় বলিয়াই আবার কার্ত্তিক মধ্যেই উহা শুখাইয়া যাইয়া, একমাত্র রবিফসলের উপযুক্ত হয়। নূতন "পলিমাটির" রস (moisture) দ্রুতবেগে সূর্য্যতাপে শুখাইয়া যায় বলিয়া, ঐ টালের প্রজা এবং জমিদারেরা, একমাস মধ্যেই রবিখন্দ বপনের চেষ্টা করে। নূতন পলিপড়া জমিতে, স্থানীয় চাষীরা একবারমাত্র হলকর্ষণপূর্ব্বক, তাহাতেই খেঁশারী, মশুরী, সাদা ও বুট মটর সরিষা, তিল, এবং কখন জামালি বাংলা গমও বুনে। কিন্তু এই "জড়া পোকা" বড় হইয়া, তখন ঐ সকল ফসলের মিষ্টাস্বাদ যুক্ত কোমল শিকড় ও মূল খাইয়া বড় ও মোটা হইয়া, সমুদায় "টালের" ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়িয়া ষোল আনা ফসলই খাইয়া ফেলে। ইহাদের একটী বিশেষ স্বভাব এই যে, সকল বৎসর একভাবে, এক মৌজার ক্ষেতে জমা হয় না, সুতরাং ইহাদের মাটীর ভিতরের ঝাঁক্ অনুসারে ফসলের কমিবেশী হারেই মৌজার ক্ষতির ইতর বিশেষ হয়। এইভাবে আজ ২০ বৎসর ধরিয়া ঐ টালের ফসলের ধ্বংস হইতেছে। গবর্ণমেণ্টও আজ ২০ বৎসর ধরিয়া এই পোকা নিবারণের জন্য কয়েক প্রকার মতলব খাটাইয়া রাত্রিতে আলো টাঙ্গাইয়া ক্যারো- সিনের ফাঁদ (trap) বসাইয়া, প্রত্যহ ৮০।৯০টী বালক নিযুক্ত করিয়া, পোকা মারিবার ও গণিবার ব্যবস্থা করিয়াও, কোন ফল ফলে নাই এবং কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেবল "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" হইয়াছে মাত্র। ইহাতে দুইটা উড়চুঙ্গা, ফড়িং, পাখীওয়ালা পিপিলিকা, ঐ ফাঁদে পড়িয়া মরিতে থাকে। "জড়াপোকা" মাটির ভিতরেই জন্মে ও গুটী হইয়া থাকে। রাত্রিতে ঝাঁক্ বাঁধিয়া বাহির হইয়া যে ক্ষেতের উপর আসিয়া পড়ে, সেই ক্ষেতের উল্লিখিত রবিখন্দ খাইতে খাইতে সেই দিকেই চলিয়া যায়। এইজন্য কাহারও ক্ষেত উৎসন্ন যায়; আর কাহারও ফসল বাঁচিয়া যায়। আর ইহারা সরিষা, ঝাঁপ্‌রি, তিল ফসলের শিকড় ও মূল, অপেক্ষাকৃত শক্ত ও ঝাল্ বলিয়া তাহা

কাটেনা ও খায় না। ধান গাছ জলের ভিতর শিকড় গজায়, সুতরাং জলের ভিতর মরিবার আশঙ্কায় যায় না। অধিকন্তু ছোলা, বুট, মটর, মশুরীই সমূলে খাইয়া ফেলে। স্থানীয় চাষারা বদ্ধমূল সংস্কার বশতঃ, ঐ টালের বোদ্ বা নূতন পলি জমিতে, নিয়ত তাহাই বুনে। এদেশের কৃষকেরা ফসল পরিবর্ত্তন ও বিজ্ঞানের যুক্তি বুঝিয়া, কাজ করিতে জানে না বা বুঝে না। আবাহমানকাল হইতে, যাহা করিয়া আসিতেছে, তাহাই করিয়াই হতাশ হয়। পোকার অগণিত বংশের নির্ব্বংশ করিতে হইলে, ভূমি কর্ষণের কালে অধিক পরিমাণে গভীর করিয়া হল কর্ষণ দ্বারা চাষ দিলে, মাটীর ভিতরের পোকাকে কতক পরিমাণে হাতে বাছিয়া, উঠাইয়া মারিয়া ফেলিতেও পারা যায় বটে; কিন্তু সে যুক্তি অযুক্তি মাত্র। অতএব কীড়া অবস্থায় এককালীন সমূলে, নির্ব্বংশ করিতে হইলে, ফসল বপনের সময় লাঙ্গলের সীরালে সীরালে নিম্নলিখিত কীট নিবারক অব্যর্থ চূর্ণ বা তরল ঔষধ ছড়াইয়া দিয়া সেই লাইনে লাইনে বীজ বপনপূর্ব্বক, যথারীতি মাটী চাপা দিয়া ক্ষেতকে চৌরাশ করিয়া দিলে, সম্ভবতঃ কীটানু নষ্ট হইয়া, ফসল ভাল রকম উৎপন্ন হইতে পারে। এই প্রণালী অবলম্বন করিলে সম্ভবতঃ দুই এক বৎসরের মধ্যেই, এই বিস্তীর্ণ "মোকামা টাল" বা বিল, কীট শূন্য হইয়া পূর্ব্ববৎ ফসলের আশা হইতে পারে। এইভাবে মূল হইতে কীটানু নষ্ট করিবার উপায় করিলে, তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যতদূর তত্ত্ব জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে গবর্ণমেণ্টের কীটতত্ত্ববিদ্ এবং প্রাদেশিক কৃষিতত্ত্ববিদ্ উচ্চপদস্থ অনেক কর্ম্মচারী শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে মোকামায় এবং চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানসমূহ, আলি চালি অনুসন্ধান করিয়াও, কোনই কিনারা করিতে পারেন নাই।

অনেকে অনুমান করেন যে ঐ সকল বীজাণু বা ডিম্ব হিমালয় অথবা তাদৃশ কোন উচ্চ পর্ব্বত হইতে, উড়িয়া আসিয়া শীতকালে "মোকামা টালেই" ডিম্ব পাড়িয়া যাওয়া, অথবা বর্ষার জলে, ভাসিয়া আসিয়া, চারি পাঁচ মাস, জলে জীবিত থাকিয়া, কার্ত্তিক মাসেই ফুটিয়া উঠিয়া মোকামা টালের ফসল নষ্ট করাই, বিজ্ঞান সম্মত কারণ হইবে কি? যদি তাহাই হইত, তবে তো, সমুদায় দেশের খালে বিলেই এই পোকার জন্ম হইয়া দেশময় রাশি ফসল এককালীন নষ্ট করিতে পারিত? সুদ্ধ "মোকামা" টালের রবি খন্দই আজ ২০ বৎসর ধরিয়া নষ্ট করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিত?

মাছের ডিম্ও স্রোতের জলে ভাসিয়া যাইয়া, কোন স্থির জলে জমিয়া অল্প দিন মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়া "পোনা হয়।" আর জড়া পোকার ডিম্ব এত দীর্ঘ কাল, না ফুটিয়া, কোন্ নির্জ্জন স্থানে, বাঁচিয়া থাকিয়া কার্ত্তিক মাসেই কেবল মোকামা টালে, পোকারূপে পরিণত হয়? অতএব এ যুক্তি সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না কি? আর ইহাই যদি যুক্তি সঙ্গত, বিজ্ঞান সম্মত কারণ হইত তাহা হইলে, সরকারি কীটতত্ত্ববিদেরা আজ বিশ বৎসর মধ্যে সেই পোকার নিদানভূত স্থানের অনুসন্ধান

পূর্ব্বক উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে পারিতেন না কি? এবং মোকামা টালের ও জমীদার প্রজাদিগকে এই সাংঘাতিক ক্ষতি হইতে মুক্তি করিতে পারিতেন না কি?

স্থানীয় সাধারণ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঐ টালের জল শুকাইয়া গেলে ঐ বিলে "হুর্ হুরা" নামক রাই সরিষা গাছের ন্যায় একপ্রকার গাছ জন্মে, তাহার মজ্জার ভিতরেই "জড়াপোকার" জন্ম হয়। তাহাদের ধ্বংস করিলেই, জড়াপোকার নির্ব্বংশ হইতে পারে। অনেকেই এই গাছের ভিতর ডিম্বাণু বীজ দৃষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও বিশ্বাসযোগ্য কারণ নহে। বিলের দুর্গন্ধময় গ্যাস জনিত মৃত্তিকা হইতেই ইহার (Germs) নিশ্চয় উৎপত্তি হইয়া হুর্‌হুরার মজ্জায় সঞ্চিত হয়। সুতরাং হুর্‌হুরাকে শৈশব হইতে নির্ম্মূল করিয়া দিলেও স্থানীয় রবি ফসলের বিঘ্ন নাশ হইতে পারে। অতএব ঐ টালের পলিমাটিতে ইহাদের জন্ম এবং হুরহুরা গাছের মধ্যে ইহাদের বৃদ্ধি কখনই অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই।

ইহাও বেশ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যে বারে, যে কৃষক, যে ক্ষেত্র হইতে হুরহুরাকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে ক্ষেত সেবার ঐ পোকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। অতএব ঐ কীটের ডিম্বাণু অন্য কোথাও হইতে ভাসিয়া আসা যুক্তিপূর্ণ কারণ বলিয়া স্বীকার করা, সঙ্গত নহে। এই পোকার মাথাটি গোলাকার, গাত্র গাঁইট গাঁইট, মুখটি ধারাল এবং চলন অতিশয় দ্রুত। বড় হইয়া দিবাভাগে ক্ষেতের ফাটলে ফাটলে ঠাণ্ডা মাটীতে সূর্য্যতাপের ভয়ে লুকাইয়া থাকে, অন্ধকার হইলেই রাত্রিতে বাহির হইয়া ক্ষেত্রময় ঝাঁক বাঁধিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া রাত্রি মধ্যেই অনেক বিঘা জমির ফসল খাইয়া ভোরের পূর্ব্বেই অদৃশ্য হয়।

এই টাল বা বিলকে সমগ্র জমীদার ও প্রজা একত্রিত হইয়া নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে কাজ করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা—টালকে ২৪ পং জেলার বিলবল্লী ও দাঁত্তভাঙ্গার বিলের ন্যায় চারি পাঁচটী ডিভিশনে বিভক্ত করিয়া, উভয়দিকে গঙ্গা ও পুনপুনের ধারে বাঁধ দিয়া ও কপাটে পোল করিয়া, প্রয়োজনমত জল বাঁধিয়া রাখিয়া এবং ইচ্ছামত জল নিকাশ করিয়া, শুখাইয়া ফেলিয়া ধানের চাষ এবং রবিখন্দ, উভয় প্রকারেই দে-ফসলী জমিতে পরিণত করিতে পারেন। কারণ প্রধানতঃই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে কোন ক্ষেতেই যে কোন পোকা তাড়াইবার দরকার হইলে ক্ষেত্রময় জলে ভাসাইয়া দিলেই, কীটাণু সকল অবিলম্বে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। আর এই পোকা, টালের উচ্চ জমিতে গমের ক্ষেতে এবং জলের মধ্যে ধানের ক্ষেতের কোনই ফসল নষ্ট করে না এবং যায় না। সুতরাং এই পন্থাই ভাল বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ এই টালের জল, কার্ত্তিক মাসে শুখাইবার পূর্ব্বেই এই বিলের উভয় দিকেই ১২।১৪ ইঞ্চি জল রাখিয়া, দুই একখানি চাষ দিয়া কার্ত্তিক মাসে, বাংলা দেশের ন্যায়

"চৈতা বোরো ধান বুনিলেও উহা চৈত্র মাসে পাকিয়া বিঘা প্রতি অন্যূন ৮।৯ মণ ধানও উৎপন্ন হইয়া জমীদার ও প্রজাকে রক্ষা করিতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য এই বৃহৎ ব্যাপারের বিশেষ অনুসন্ধান জন্য ও একটু অন্যান্য কাজের জন্য মোকামায় বাবু রামচন্দ্র বসু এবং রাঁচির শ্রীযুত বাবু তারাপ্রসন্ন ঘোষ জমিদার মহাশয় আমাকে এই বিষয়ে সহায়তা না করিলে, আমি কদাচই প্রবন্ধের কলেবর পূর্ণ করিতে পারিতাম না। ঐ টালের শুষ্ক অবস্থায় কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ মধ্যে নানা জাতীয় লঙ্কার চাষ করিয়াও আর একটী লাভবান এবং প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। লঙ্কার চারা ঐ পোকায় কাটে না, অথচ বেহারের দ্বারবঙ্গ মজঃফরপুর প্রভৃতি বন্যাপ্লাবিত সারবান জমির ন্যায় মোকামা টালের সারাল জমি হইতে লঙ্কা ফসল পাওয়া যায়। বর্ত্তমান অবস্থায় লঙ্কার বাজার দর অন্যূন ১০৲ টাকার কম মণ নহে। ঊর্দ্ধসংখ্যায় ১৫৲ টাকা মণই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কার্ত্তিকমাসে ঐ টালের জমিতে লঙ্কার চাষ করিয়া বর্ষার পূর্ব্বে এই ফসলও বেশ পাওয়া যায়। অতএব মোকামা টালের জন্য একেবারে হতাশ হওয়া উচিত নহে। বিহারের জমির বিঘা, বাঙলা অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ বেশী। আর এখানকার বিঘা প্রতি ফলনও খুব বেশী।

সার-সংগ্রহ

ছাত্রেরা খাবে কি ?

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় লিখিত]

বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতি ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন যে "কলিকাতার মেস্‌গুলিতে মুড়ী চিড়ার প্রচলন করিতে পারিলে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচার করা হয়।" উক্ত শ্রদ্ধাস্পদ বসু মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া আমি তখনকার "প্রতিবাসী" নামক সাপ্তাহিক পত্রে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, উহা কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন ঘৃতের সঙ্গে এত অধিক পরিমাণ চর্ব্বি মিশ্রিত ছিল না, কিন্তু অর্দ্ধেক পরিমাণ চিনা বাদামের তেল থাকিত। এইরূপ মিশ্রিত ঘৃতের দ্বারা যে সকল খাবার প্রস্তুত হইত, তাহাই ছিল উৎকৃষ্ট খাবার। আর মচ্‌মচে খাস্তা গজা যে বস্তুতে প্রস্তুত হয়, তাহা জানিয়া সেই হইতে অনেক ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র, জন্মের মত গজা পরিত্যাগ করিয়াছেন। যত জিনিষ বিক্রয় হয় না, পচিয়া নষ্ট হয়,

সেই সমস্ত পিসিয়া গজা প্রস্তুত হয়। একে ঘৃতের অবস্থা শোচনীয়, তাহাতে পচা জিনিষে প্রস্তুত খাদ্য, সুতরাং স্বাস্থ্য থাকিবে কিসে ?

বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে সকল ছাত্র সহরে থাকে, তাহাদিগকে প্রায়শঃ মেসেই থাকিতে হয়। নিকটে তাহাদের আত্মীয় স্বজন থাকে না, বিশেষতঃ মায়ের জাতি অর্থাৎ জননী, খুড়ী, জেঠাই, ভাজ, ভগিনী কেহই কাছে থাকে না, কে তাহাদের জন্য যত্ন করিয়া খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিবে ? বিদ্যালয় হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া যখন বাসায় উপস্থিত হইল, তখন ক্ষুধায় বাছাদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তখনই খাবারওয়ালা তাহার ঝুড়িখানি আনিয়া সম্মুখে রাখিল, ইচ্ছামত যত খাও কিছুমাত্র বাধা নাই। তখন সেই ক্ষুধিত বালক ও যুবকগণ, গুড়ের হাঁড়িতে মাছির মত বসিয়া গেল। এইরূপে তাহারা পিতার অর্থ ও নিজের স্বাস্থ্য একত্রে ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমি জানি, একটী মেসের ছেলে খাবারওয়ালার কাছে ৪৫৲ টাকা বাকী পড়ায় তাগাদার জ্বালায় সে কলেজ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। মা বাপ দূর দেশে, ক্ষুধায় কাতর, তাহাতে বাটীতে মুখরোচক খাদ্য উপস্থিত, ছেলেদের দোষ কি ? তাহারা একে অজ্ঞ, তাহাতে প্রলুব্ধ, তাহারা ত পরমহংস হইয়া পড়িতে আসে নাই। পিতা কিংবা অন্য অভিভাবক যথাকালে টাকা পাঠাইতে পারিলেই আপনাদের কর্ত্তব্য হইল মনে করেন, শিক্ষকগণ পড়া বলিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করেন। আজকাল মেসের তত্ত্বাবধারকগণ কি করেন ঠিক জানি না, তবে ছাত্রদের দোকানের খাবার খাওয়া সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু খবর রাখেন, তাহা বোধ হয় না।

দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (সরস্বতী) মহাশয় যখন "চক্রবেড় শিশু বিদ্যালয়ে" বর্ণ পরিচয় হাতে করিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন বোধ হয় তাঁহার বয়স ছিল ৬।৭ বৎসর। উজ্জ্বল শ্যামলবর্ণ নাদুসনুদুস দিব্বি ছেলেটী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ছেলেটীকে বড়ই আদরে গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতেন। আদর করার কারণ ছিল, তখন আশুতোষের পিতা ৺গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্-বি মহাশয় ভবানীপুরে প্রধান ডাক্তার ছিলেন। সে কথা দূরে থাকুক, যে কথা বলিতে ইচ্ছা, তাহা এই যে, প্রতিদিন ১টার সময় আশুতোষের জন্য এক গ্লাস দুধ এবং ২।১টী সন্দেশ লইয়া একটী ঝি উপস্থিত হইত। যখন ১টার ছুটীর সময় সকল ছাত্র মাছি ভন্ ভন্ করা খাবারের ডালা হইতে কুপথ্যগুলি গোগ্রাসে খাইত, তখন আশুবাবু (তখন শিশু আশু) সকল ছাত্র হইতে দূরে দাঁড়াইয়া দুধ ও সন্দেশ খাইতেন, সেই বিদ্যালয়ের কত ভাল ভাল প্রতিভাশালী ছাত্র যৌবনের প্রারম্ভেই নানা রোগে জীর্ণ হইয়া অকর্ম্মণ্য ও অকালমৃত্যুর কবলশায়ী হইয়াছে। আশুতোষ ভগবানের কৃপায় সুস্থ শরীরেই আছেন। পিতা ডাক্তার এবং সু-বিবেচক লোক ছিলেন, কিন্তু এদেশে কয়জন পিতামাতা সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন ? আহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাস্থ্য যদি বাল্যাবধি ভাল

থাকিত, তবে তিনি আরও কত কাজ করিতে পারিতেন। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য এই যে,—"ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষণামারোগ্যং মূলমুত্তমং", ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—সকলেরই মূল স্বাস্থ্য। কবি বলিয়াছেন,—"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনং," শরীরই সকল ধর্ম্ম সাধনের মূল! বিদ্যা উপার্জ্জন ও ধনোপার্জ্জন, ইহাও গৃহীর পক্ষে ধর্ম্মকার্য্য। শরীর রক্ষা না করিলে এ সকল লাভ হয় না। এই নিত্য-প্রত্যক্ষ ব্যাপার আর প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে না। কিন্তু ছাত্রেরা খাবে কি ?

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যখন এই বিষয় লইয়া আমি সংবাদপত্রে আলোচনা করিয়াছিলাম, তখন অনেক ছাত্র আমার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত,—মহাশয়! খাব কি ? তখন যে উত্তর দিয়াছিলাম, এখনও তদধিক কিছু বলিবার নাই। কিন্তু এ পথে চলিবে কে ? যদি কেউ চলে, যদি শতকরা একজনও আত্মরক্ষা করিতে যত্নবান হয়, সেই ভরসায় লিখিতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে খাদ্যবস্তুতে যেরূপ ভেজাল চলিতেছে, তাহাতে চাউল, দাইল, চিড়ামুড়ী, খৈ, তিল, যব—এই গুলিই বিশুদ্ধ খাদ্য। ঘি, তেল, ময়দা, আটা—এই চারিটী উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু অখাদ্য হইয়াছে। ঘৃতের কথা আর বলিতে হইবে না। তৈলেও ভেজাল বেশই চলিতেছে। কলের তেলে না কি সোরগুজিয়া না দিলেই নয়, আর ঝাল করার জন্য অর্থাৎ খাঁটি সরিষার তেল বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য তুলোর বিচি ও মূলোর বিচি প্রভৃতির আশ্রয় লওয়া হয়। ময়দার গমের সঙ্গে মকাই মরুয়া প্রভৃতি দুষ্পাচ্য বস্তু থাকে, সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশের কথা এই যে, ওজনে ভারি করার জন্য সাদা পাথরের গুঁড়ো ও কাঁকর মিশাইয়া দেওয়া হয়। আমরা বাজারে "দুধিয়া" গম কিনিয়া ঘরে জাতায় ভাঙ্গাইয়া দেখিয়াছি, বাজারের ময়দার সঙ্গে স্বাদে উহার বিশিষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। যদি দুটোই এক জিনিষ, তবে এত প্রভেদ হয় কেন ?

অপবিত্র ঘৃত খাওয়া অপেক্ষা তেল খাওয়া ভাল, কেননা ঘৃতের মত সর্ব্বনেশে ঘৃণিত জিনিষ তেলে থাকে না। বলিতে পারেন, মধুর পিপাসা কি জলে মিটে ? কথা ত সত্য, কিন্তু ঘৃত কোথায় ? ঘৃত খাবেন কি তেল খাবেন, ইহা ত প্রশ্ন নয়—সাপ ব্যাং, কুকুর, বিড়াল, শূয়োর গরুর চর্ব্বি খাবেন, কি তেল খাবেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য এবং ইহাই বিবেচ্য।

কেহ কেহ বলেন যে, ঘৃত না খাইলে শরীর রক্ষা পাইবে কিসে ? ইহার উত্তর এই যে, ঘৃত খাইলে শরীর রক্ষা পায়, এ কথা সত্য ; কিন্তু ঘৃত ভাবিয়া বিষ খাইলে তাহাতে শরীর রক্ষা পায় কি বিনাশ পায়, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। যদি খাঁটী ঘৃত পাওয়া যায়, সে ত অমৃত, তাহার বিন্দুমাত্রও আয়ুবর্দ্ধক ও স্বাস্থ্যরক্ষক। যদি সে অমৃত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হও তবে ত কথাই নাই, নতুবা বাজারের ঘৃত কখনই খাওয়া উচিত নয়। অনেক দিনের কথা মনে পড়িল। বরিশালে একটিকা বাসায় নগদ পয়সা দিয়া

অনেক লোক আহার করিত। ঠিকাদার তাঁহার চাকরকে বলিত—"ওরে! এক আনার পচা ঘি নিয়ে আয়।" "পচা ঘি" আনিতে হুকুম করার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, ২০।২৫ জনার ডাল তরকারিতে চারি আনার ভাল ঘি দিলেও গন্ধ পাওয়া যায় না, ভোজন কারীরা বলিবে, ডাল তরকারিতে ঘি দেওয়া হয় নাই কিন্তু চারি পয়সার পচা ঘি দিলে উহার উগ্রগন্ধ সকলেই অনুভব করিবে। শুধু ঠিকা বাসার ও হোটেলের মালিকরাই যে এইরূপ করে, তাহা নয়, অনেক গৃহস্থ গৃহিণীও এই পাপ কার্য্য করিয়া থাকেন। আজ আমি ছাত্রদের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। কলিকাতার ছাত্রাবাসগুলিতেও তেল ঘি খরিদের ভার সচরাচর ঝি চাকরের উপরই থাকে; তাহারা যে ভাল জিনিষ কিনিয়া আনিবে, সেরূপ ভরসা করা দুরাশা। এ সম্বন্ধে যদি ম্যানেজারগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, তবে কিছু উপকার হইতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য ছাত্রদের ও নিজেদেরও এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বাজারের ঘি একেবারে বিষবৎ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। খাদ্য তেল প্রতিদিন চাকরের দ্বারা খরিদ না করিয়া ম্যানেজার বা ছাত্রদের মধ্যে কেহ অন্ততঃ এক সপ্তাহের উপযোগী তেল ঘানি হইতে নিজেরা কিনিয়া আনিবেন। গায়ে মাথার তেল খারাপ হইলে তেমন হানি নাই।

ব্যঞ্জনগুলিতে মসলা অতিশয় অল্প দেওয়া কর্ত্তব্য। রাশীকৃত মসলা ব্যবহারে বাঙ্গালীর পেট খারাপ হইতেছে, উহাতে তরকারির স্বাদ বাড়ে না শুধু একটা অস্বাভাবিক তীব্রতা উৎপাদন করে। হলুদ একান্ত প্রয়োজনীয় মসলা, শুনিয়াছি উহাতে অনেক রোগাণু নষ্ট করে। অন্যান্য মসলা যাহা না হইলে নয়, তাহাই দেওয়া উচিত। মসলাগুলি অন্ততঃ সাতদিনের উপযোগী এক সঙ্গে আনিয়া নিজেরা কেহ কাছে থাকিয়া ভাল করিয়া ধোয়াইয়া শুকাইয়া বোতলে ভরিয়া রাখা আবশ্যক। ঝি চাকরেরা উহা না ধুইয়া অথবা ভাল করিয়া না বাছিয়াই পিষিয়া ফেলে। ঐ সমস্ত মসলায় অনেক খারাপ জিনিস এমন কি পাথরের কুচি, কঙ্কর ও ধুলা বালি মিশ্রিত থাকে। ব্যবসায়ীরা এক মণ জিনিসে এক সের ধুলা বালী মিশাইয়া যে দরে খরিদ, সেই দরেই বিক্রয় করে। এই জুয়াচুরিটা সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই সমান ভাবে চলিতেছে। এমন কি, চাউল ডাইল প্রভৃতিতেও বাজে জিনিস মিশাইয়া দেয়। অতএব সকল প্রকারের শস্য ও মসলা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া ধুইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ছাত্রাবাসের কর্ত্তা ও ছাত্রগণ এই সকল কার্য্য নিজেরা দাঁড়াইয়া করাইবেন।

প্রত্যেক রবিবারে যদি ম্যানেজার কিংবা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত কোন ছাত্র পালা করিয়া এই সকল কাজ করেন, তবে কাহারও অধিক সময় নষ্ট করিতে হইবে না। সপ্তাহে একজন দুই ঘণ্টা সময় দিলেই এই কার্য্য অনায়াসে হইতে পারে।

আর একটী কথা এই যে ঝি চাকরেরা প্রায়শঃ বাসি মসলা রাখিয়া দেয়; শিল

নোড়া ভাল করিয়া ধোয় না, তাহাতে মসলা লাগিয়া থাকে এবং এই সঙ্গে সমস্ত মসলাই কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়। কুসঙ্গে যেমন ভাল লোকও নষ্ট হয়, সেইরূপ বাসি মসলার সংসর্গে টাটকা মসলাও অপকারী হয়। বাজার হইতে মসলার গুঁড়ো কিনিয়া ব্যবহার করা কখনও উচিৎ নয়। সেগুলি ভেজাল ঘৃতের ছোট সংস্করণ মাত্র।

শুনিতে পাই, ছত্রাবাসে নাকি শুষ্ক মাংস ও নষ্ট ডিম্ব এবং পচা মাছ অবাধে চলিয়া থাকে। ছাত্রেরাই অজ্ঞতাবশতঃ সস্তায় পাইয়া ২।৩ দিনের বাসি মাংস ও আধা-পচা ডিম কিনিয়া আনে। আহারান্তে অনেকের বমির উদ্বেগ হয়। কিন্তু কণ্ঠনালী অতিক্রম করিয়া খাদ্য যখন উদরগহ্বরের উপস্থিত হয়, তখন আর উহাকে ফিরাইয়া আনিবার উপায় থাকে না। আয়ুর্ব্বেদে শুষ্ক মাংসকে "সদ্যঃ প্রাণনাশক" বলিয়াছেন। এমন মারাত্মক খাদ্য যাহাতে ছাত্রদের আবাসের মধ্যেও না আসিতে পারে, ম্যানেজার এবং বয়স্ক ছাত্রদিগের তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, পচা মাছ বিশেষতঃ পচা চিংড়ি যখন কড়াতে ভাজা হয়, তখন দুর্গন্ধে তিষ্ঠান ভার হয়।

জল খাবার

জল খাবারের জন্য ভিজা বা ভাজা চিড়া নারিকেল কোরা ও চিনি কিংবা গুড়ের সঙ্গে মিলাইয়া অতি সুখাদ্য হয়। মুড়ী ও নারিকেল ত অম্বলের ঔষধ। যদি ভাল ময়দা পাওয়া যায়, তবে রুটি নারিকেল অতি সুখাদ্য। ছানা ও চিনি যেমন মুখ রোচক তেমনি বলকারক। কলিকাতায় অনেক সময় ছানা খুবই সস্তায় পাওয়া যায়। ভাল সন্দেশও ভালই জিনিস। টাটকা সন্দেশ আয়ুবর্দ্ধক ও বলকারী। দই খই ও গুড় খাইতে অতি মধুর। কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলিয়াছেন, চিড়া অত্যন্ত বলকারী।

আমি কোনও নূতন কথা বলিবার জন্য এই সকল লিখিতেছি না; তুষের আগুন যেমন উসকাইয়া না দিলে নিভিয়া যায়, সেইরূপ সকলের জ্ঞাত কথাও বার বার বলিয়া উসকাইয়া দিতে হয়, আমিও সেই চেষ্টাই করিতেছি।

হে ছাত্রগণ! দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশের লোকেরা যেমন নবোদ্যত শস্য ক্ষেত্রের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকে, এই বঙ্গদেশে, এই ভারত ভূমি, সেইরূপ অসীম আশার সহিত তোমাদের দিকে তাকাইয়া আছে। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা। তোমরা যদি তোমাদের শরীর মন সুস্থ রাখিতে যত্নপর না হও, তবে আর দেশের কোন ভরসা নাই। মনে রাখিও—মোটা ভাত, মোটা কাপড়, সুস্থ দেহ, শুদ্ধ মন, এই চারিটী সর্ব্ব প্রকারে উন্নতির নিদান।—বঙ্গবাসী

পত্রাদি

কাঠে ঘুণ—

শ্রীসুবোধ কুমার মিত্র, বারাসত, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন—ঘরের কড়িকাষ্ঠ গুলি ঘুণে খাইয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কড়ি গুলিতে ভাল করিয়া আলকাতরা লাগাইয়া দিয়াও ঘুণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতেছে না। বাঁশেও ঘুণ লাগে। ইহার প্রতিকার কি?

উত্তর—ভিতরে ঘুণ, উপরে আলকাতরা লাগাইলে কোন প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। ভিতর হইতে ঘুণ পোকা গুলিকে বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। কীড়া ও পুত্তলি গুলিকেও নষ্ট করিয়া ফেলা আবশ্যক। ক্ষত স্থানটি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া কেরোসিন তৈলের পিচকারি দ্বারা সিক্ত করিলে প্রতিকার হইবে। কাঠে ঘুণ লাগিবার পূর্ব্বে বার্ণিস কিম্বা আলকাতরা লাগাইলে ঘুণ পোকা তাহার উপর ডিম্ব পাড়ে না অথবা ডিম পাড়িলেও সে ডিম নষ্ট হইয়া যায়। বাঁশ কাটিয়া দুই এক দিন রৌদ্রে শুকাইয়া ১০।১২ দিন জলে ফেলিয়া পচাইয়া লইলে তাহাতে আর ঘুণ ধরে না। কাঠ, কিম্বা বাঁশ কিছুক্ষণ কেরোসিন তৈলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহাতে আর ঘুণ লাগে না।

রস সংরক্ষণ—

সেখ কিসু, মুক্তগাছা।

প্রশ্ন—আমি কতকগুলি ফলের গাছ বসাইয়া ফলের বাগান বসাইতেছি। ফলের গাছগুলির গোড়ায় কি প্রকারে রস রক্ষা করা যায় উপদেশ দিলে বাধিত হইব।

উত্তর—বর্ষার পরে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি গুঁড়া করিয়া দিয়া 'যো' বাঁধিয়া দিলে রস রক্ষা করা যায়। মৃত্তিকাস্থিত রস বাষ্পাকারে উবিয়া যাইতে না পারে ইহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। গাছ গুলির যো বাঁধিয়া গোড়ায় মাটি কুটি পোয়াল দ্বারা ঢাকিয়া দিলে রস সংরক্ষিত হয়। ইহাতে গাছের গোড়ায় তৃণাদি জন্মিতে পায় না এবং সত্ত্ব বৎসরে গাছগুলি বাড়িয়া উঠে।

পেঁয়াজ বীজ—

শ্রীভূষণচন্দ্র মাইতি, তারকেশ্বর।

প্রশ্ন—পেঁয়াজের বীজ বপন করা ভাল কিম্বা পেঁয়াজ রোপন লাভজনক। বিঘা প্রতি কি পরিমাণে পেঁয়াজ বসান আবশ্যক?

উত্তর—পেঁয়াজ বীজ বপন করিয়া চাষ করিলে অল্প বীজে অধিক জমিতে চাষ হয়। কিন্তু প্রথম বৎসরে ইহার ফল বুঝিতে পারা যায় না। বিস্তৃত ক্ষেত্রে চাষ করিতে হইলে বীজ বপনই প্রশস্থ। বীজ হইতে যে পেঁয়াজ উৎপন্ন হইবে তাহা সন্থ বৎসরে খুব ছোট থাকে; সেই গুলি বসাইয়া ২য় বৎসরে বিক্রয়োপযোগী ফসল উৎপন্ন হয়।

পেঁয়াজ বসাইলে সন্থ বৎসরে ফসল পাওয়া যায়।

ছোট পেঁয়াজ হইলে ১ মণ পেঁয়াজে এক বিঘা জমির চাষ হয়, বড় হইলে ১॥০।২৲ মণ পেঁয়াজের আবশ্যক।

বাজারে ফল ফুলের অভাব—বর্ত্তমান সময়ে এমন দিনে ফল ফুলের আমদানী অতি বিস্তর হইয়া থাকে। এ বৎসর এখনও সহরের বাজারে ফল ফুল কম দৃষ্ট হইতেছে। ভাল কলা বা পেঁপে কলিকাতার বাজারে মিলা কঠিন, যদি, বা মিলে তবে একটা ভাল চাটিম কলার দাম ২।২॥ পয়সা, কাঁটালির দাম ১ পয়সার কম নহে। পাকা আমের আমদানী যৎসামান্য। কুমড়া ফুলে এতদিনে বাজার ছাইয়া যাইত, এ বৎসর দুষ্প্রাপ্য বলিলেই হয়। এবার দোপাটি, কস্‌মস্, সনফ্লাউয়ার ভালরূপ ফুটিল না। বাজারে ক্রিসান্থিমাম নাই; জিনিয়া না থাকিলে কলিকাতার সরকারি পার্কগুলির কোন শোভাই থাকিত না। মরসুমী ফুল এতদিনে এত দেরীতে ফুটিতেছে। অতি বর্ষণ হেতু নিশ্চয়ই ঐ সকল ফুল ফুটিতে এত বিলম্ব ঘটিল।

এখন ক্রমশ বাজারে বেগুণ, ঝিঙা করলা আমদানী হইতেছে এবং দাম নামিয়াছে, ভাল বেগুণ একটা ১ পয়সা; করলা ৵০ আনা সের, ঝিঙা পয়সায় ২টা। ৩০শে ভাদ্র।

যুদ্ধ হেতু দ্রব্যাদি দুর্ম্মুল্য—বাজরে সব দ্রব্যই চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে। বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আমদানী হইত তাহা হয় মিলিতেছে না, না হয় ৪।৬।৮ গুণ দরে বিক্রয় হইতেছে। লোহা লকড়, রঙ, ঔষধ একেবারে অগ্নি মুল্য। কাপড়ের বাজার দ্বিগুণ চড়া। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে চাউল, গম কিছু সস্তা রহিয়াছে। তাহার কারণ মালগাড়ীর অবাধ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেখানের জিনিস সেইখানেই বিক্রয় হইতেছে। মোটা চাউলের দর ৩৸০ টাকা মণ, সরু চাউল প্রতি মণ ৪।৪।০ সওয়া চারি টাকা। গম, টাকায়

১২।১৩ সের। কিন্তু মালগাড়ীর অভাবে কয়লার বাজার অভূতপূর্ব্ব চড়িয়াছে। যে কয়লা ।৴০ পাঁচ আনা মণ বিক্রয় হইত তাহার দর এখন ১৲ ৵০ পাঁচ সিকা তাহাও মিলিতেছে না। মধ্যে মধ্যে পোড়া কয়লার অভাবে লোকের রান্না বন্ধ হইবার উদ্যোগ হইতেছে এবং কাঁচা ষ্টীম কয়লা অভাবে অনেক কল কারখানা বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে।

জাপানে সলফিউরিক এসিড ও অন্য সারের কারখানা—এখানে সলফিউরিক এসিড ও অন্যান্য রাসায়নিক সার প্রস্তুতের জন্য ৮টী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ৮টা কারখানার প্রত্যেকের আয়তন প্রায় ৭০ একর। এই কারখানা গুলিতে উৎপন্ন পণ্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং রুসিয়া অষ্ট্রেলিয়া, চায়না, ভারতবর্ষ, আফ্রিকায়ও সর্ব্বত্র ইহার রপ্তানি হইতেছে। ইহাতে ১২,৫০০,০০০ ইয়েন অর্থাৎ প্রায় ১,৮৭,৫০,০০০ টাকা মূলধন খাটিতেছে। বৎসর এই কারখানা গুলি হইতে ১৮০,০০০ টন সলফিউরিক এসিড, চূণাক্ত সুপার ফস্ফেট সার ৩২০,০০০ টন এবং মিশ্র সার ১২০,০০০ টন উৎপন্ন হয়। দ্রব্যগুলি অতি বিশুদ্ধভাবেই বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। পাত্রের বা থলের গায়ে খাঁটি ওজনের লেবেল আঁটা থাকে। প্রত্যেক প্যাকের সহিত একখানি দায়িত্ব পত্র সম্বলিত থাকে তাহাতে দ্রব্যের গুণাগুণ, কার্য্যোপযোগীতা যথাযথ বর্ণিত থাকে। এই গুলি বাজারে যাইবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হয় এবং যে কর্ম্মের উপযোগী এবং তাহার ফলাফল নিশ্চিত নির্ণিত থাকে। ইহা ভুয়া দায়িত্ব পত্র নহে। খরিদ্দারের কোন মতে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

যে কয়টি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে The Greater Japan Fertilizer Companyটিই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এত সারের আয়োজন বলিয়া জাপানের উদ্যান গুলি সহজেই ফলফুলে সুশোভিত। শস্য, সব্জী, বা ফলের বাগানে এই সার প্রদত্ত হইলে নিশ্চিতই জমির ফলন বৃদ্ধি হইবে এবং উৎপন্ন ফল ফুল শস্যের উৎকর্ষ সাধন হইবে। ঐ সকল শস্য যে কেবল দেখিতে সুন্দর বা খাইতে সুস্বাদু হইবে এমন নহে, উহারা শরীর রক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আশ্বিন মাস

সব্জীবাগান। এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জলদি জাতির কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারী হইয়াছে। এই সময় নাবীজাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুন চারা ইতিপূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জলদি কপিচারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতে এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফুলের বাগান। এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্রিয়াছান্সি, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় বেগোনিয়া, জেরিনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কাটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়—সুতরাং সাসি দ্বারা আবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোতা উচিত। গোলাপের কলম (Budding) এখন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ হাইব্রীড পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের বডিং হইবে। চীনা, টি, বুরবন জাতীয় গোলাপের কাটিংও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্ব্বত্য প্রদেশে সব্জী তৈয়ারী করা হইয়া উঠে না। তবে আচ্ছাদনের ভিতর যত্ন করিয়া করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্ব্বতে দ্রাক্ষালতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলি কাটিয়া ছাটিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া, একটু বাড় কমাইতে হইবে।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় এই সময় গোলাপ চাপের হইতে নাড়িয়া বসাইতে পারা যায়। এই সময় উক্ত প্রদেশে লোকে ফুলকপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতেছে। আশ্বিনমাসের শেষে কার্ত্তিকমাসের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারী হইয়া উঠিবে।

সব্জীবাগান।—এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জলদি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারী হইয়াছে। এই সময় নাবীজাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ। মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুন চারা ইতিপূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সে গুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া

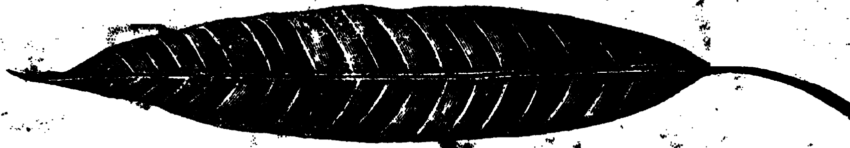
দিতে হইবে। শীতঋতুর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জলদি কপিচারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতা গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফলের বাগান—কাঁটাল এবং নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি তালজাতীয় বৃক্ষগুলির ও বাঁশঝাড়গুলির গোড়ায় চারিদিকে মাটি সরাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে শিকড় অনাবৃত করিয়া শেষ বর্ষার জল খাওয়াইতে হয়। ভাদ্রেই এ কার্য্য করা কর্ত্তব্য কিন্তু তাহা না হইলে আশ্বিন মাসের ১৫ দিনের মধ্যে করিতেই হইবে। ভাদ্র মাসে তালজাতীয় গাছগুলির পুরাতন পাতা ফেলিয়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ভাদ্র আশ্বিনে ইহাদের পাক বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হয়।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় গোলাপ ছাপর হইতে বাড়িয়া বসাইতে পারা যায়। এই সময় উক্ত প্রদেশে ফুলকপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতেছে। আশ্বিন মাসের শেষে কর্ত্তিকের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারী হইয়া উঠিবে।

বাঙ্গলায় কৃষির বর্ত্তমান অবস্থা—বাঙলাদেশে কৃষি প্রধান অন্তরায় অনাবৃষ্টি ও অনিয়মিত বৃষ্টি। বর্ত্তমান বর্ষে বৃষ্টি সময় মতই আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বত্রই ধানের আবাদ ভালরূপ চলিতেছে। তথাপি দেখা যায় যে মেদিনীপুরের কতকাংশ ও হুগলীর স্থানে স্থানে নদীর জল উঠিয়া বিস্তর ক্ষেত ভাসাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে পাটের আবাদ ভালরূপই হইয়াছে। কোথাও কোথাও পাটকাটা হইয়াছে এবং এখন নূতন পাট কলিকাতার বাজারে প্রচুর আমদানী হইয়াছে। রথের সময়ই নূতন পাটের প্রথম কেনা বেচা হয়। নূতন পাটের দর ৬৷৽ টাকা হইতে ৮৷৽ টাকা। নিম্ন বঙ্গে ও ২৪ পরগণায় পাটের আবাদ বিলম্বে হয়। এখানে এ বৎসরের বৃষ্টি পাটের পক্ষে কিছু অতিরিক্ত বোধ হওয়ায় এতদঞ্চলে পাটের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। পূর্ব্ববঙ্গে বৃষ্টি সুপরিষ্যাপ্ত বা অতিরিক্ত হইয়া থাকে। সেখানে বিল জমিতে পাট বুনা হয়। পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ পাট উঁচু জমিতে হইয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গ ব্যতীত বঙ্গের অন্যাংশে বৃষ্টির অভাবে বা অনিয়মিত বৃষ্টি হেতু অজন্মা হইয়া থাকে। জল নিকাশি পয়ো প্রণালী ব্যতীত অতিবৃষ্টির হাত হইতে ক্ষেত খামারগুলি বাঁচাইবার উপায় নাই। সেচন জলের জন্য খাল, দীর্ঘায়তন জলাশয় বা পুষ্করিণী অথবা কুপ খনন করিয়া অনাবৃষ্টির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। খাল খনন সরকারী সাহায্য ভিন্ন হওয়া অসম্ভব। জলাশয় ও কুপ খনন জমিদারগণের সাহায্যে হইতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়েই প্রজার সম্পূর্ণ অভাব মোচনে উদাসীন।





আপুজ আম গোল



আলফান্সো



বোম্বাই পিয়ারি [illegible]



পিয়ারি আম

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৮শ খণ্ড। | আশ্বিন, ১৩২৪ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আম্র—আম—Mango.

ইহার শাস্ত্রীয় নাম Mangifera Indica ইহা Anacardiacae উদ্ভিদ পর্য্যায় ভুক্ত। কাজুবাদামও এই পরিবার ভুক্ত।

ভারতে আম্র সকলের নিকট সুপরিচিত। ভারতের সর্ব্বত্র আমের গাছ দেখিতে পাওয়া যায় এবং অধিকাংশস্থলে আমের রীতিমত চাষাবাদ ও বাগান করা হয়। পূর্ব্ব এসিয়াখণ্ডে ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে আমের বাগান আছে। পর্ব্বতের উপরে ৩০০০ ফিট উচ্চে ও সমতল ভূমিতে সর্ব্বত্রই আমের বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নানা স্থানে ইহা অরণ্য মধ্যে আপনা আপনি জন্মিয়া থাকে। অরণ্যজ আম প্রায়ই ছোট, অম্লাস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে এবং তাহার আঁঠি (বীজ) বড় ও শাঁস কম হয়।

আম্র যে ভারতের স্বভাবজাত ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই কারণ পুরাতন হিন্দু গ্রন্থাদিতে ইহার বহু বর্ণনা আছে। ইহাকে অমৃত ফল, চ্যুত ফল বলা হয়। বস্তুতঃই ইহা স্বাদে গন্ধে দেবভোগ্য ফল ও অমৃত তুল্য। সংস্কৃত কবিগণ, ইহা মধু (বসন্তে) মাসের সূচনা করে বলিয়া, মধুদূত আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই আমের আদর। য়ুরোপীয়গণ আমকে ফলের রাজা, King of fruits বলেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আম বিভিন্ন প্রকারের এবং স্বাদ ও গন্ধে অনেক বিশেষত্ব অনুভব করা যায়। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, মান্দ্রাজ, মহীশূর, ত্রিহুত, সিংহল ও বাঙলার আমগুলিকে স্থানানুসারে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। স্থানভেদে আমের যে বিশেষত্ব তাহা সহজেই ধরা যায়। নানাজাতীয় আমের বিশেষ বিবরণ ও আম চাষের তত্ত্বির জানিতে অনেকেই সমুৎসুক। আমরা এইহেতু এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি।

আমের আবাদ করিতে এক্ষণে অনেকেই শিখিয়াছেন এবং ভারতে অনেক আমের বাগান রচিত হইয়াছে। চাষাবাদ দ্বারা ক্রমান্বয়ে কতকগুলি আমের অনেক উন্নতি হইয়াছে। যেগুলি ভাল আম তাহাদিগকে বোম্বাই, ল্যাঙড়া, মালদা বা ফজলী এই কয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। ছোট সুমিষ্ট আমের মধ্যে পিয়ারাফুলিই প্রধান। ছোটজাতীয় মিষ্ট আমগুলিকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

আম্র ভারতের স্বভাবজ হইলেও আম সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক কথা প্রচলিত আছে। রামায়ণের কবি বলেন যে, আম সিংহল হইতে হনুমান কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছে। কিন্তু আবার বেদ পুরাণ, সংহিতা ও আয়ুর্ব্বেদে আমের নাম ও গুণাগুণ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে, আম অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রধান ফলের স্থানাধিকার করিয়া আছে। ইহার জন্ম ভারতে হইলেও ইহা আর এখন ভারতের গণ্ডীর মধ্যে আটকান নাই, ইহা এক্ষণে ব্রহ্মদেশ, চীন, মালাক্কা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি উপনিবেশসমূহ, জ্যামেকা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দ্বীপসমূহ, আফ্রিকা ভূখণ্ডে ইজিপ্টে প্রবেশলাভ করিয়াছে। য়ুরোপীয় ও আমেরিকগণ ইহাকে কাঁচের ঘরের ভিতর রাখিয়া পালন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। গ্রেট ব্রিটনে কিউ উদ্যানে কাঁচের ঘরে আম্রবৃক্ষ ফলবান হইয়াছিল।

কোন স্থানে শত চেষ্টা করিয়া ইহার ফল ফলাইতে হয়, কোনখানে ইহা স্বভাবতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোন্ ফল কোথায় জন্মিবে, কোন্ মাটি ইহার উপযুক্ত, কিরূপ জল হাওয়া ইহার বৃদ্ধির অনুকূল ইত্যাদি খবর না জানিলে কোন ফল বৃক্ষের আবাদ করা চলে না।

সিংহল হইতে ভারতে আম আসিয়াছিল তাহা কবির কল্পনা মাত্র, কারণ ভারতে এত প্রকারের এবং এত উৎকৃষ্ট আম দৃষ্ট হয় সিংহলে তাহার কোনটি নাই। সিংহলে আমের নাম অম্বা—গিরি অম্বা (পাহাড়িয়া আম), মাই অম্বা (মধুর আম), রূপি, প্যারট প্রভৃতি আম সিংহলে আছে। মান্দ্রাজে তোতা নামে এক প্রকার আম আছে তাহার আকৃতি ঠিক টেয়া পাখীর ঠোঁটের মত ; সিংহলের প্যারট আমের সহিত তাহার কোন না কোন সৌসাদৃশ্য থাকা সম্ভব। ভারতে ও ভারত সংলগ্ন সিংহলে আম্র স্বভাবতঃ জন্মিয়া থাকে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পুরাতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমাদের এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আম্রের গুণাগুণ, আবাদের প্রণালী ও ফলের ব্যবহার ও প্রধান প্রধান আমের বিবরণ জানিয়া যাহাতে সাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার হয় তৎপক্ষে চেষ্টা করা যাইতেছে মাত্র।

আম্রের শাস্ত্রীয় বিবরণ—আম বৃক্ষ বৃহৎ ও সুদৃশ্য হইয়া থাকে। ইহা উচ্চতায় ৫০।৬০ ফিট পর্য্যন্ত হয় এবং পূর্ণায়তন কাণ্ডের বেড় ১৫।২০ ফিট হইয়া

থাকে। কতকগুলি আম্র বৃক্ষ স্বভাবতঃ এত বড় হয় না এবং দুই এক জাতীয় আম গাছ গুল্ম সদৃশ হইয়া থাকে। চীনা মাডাম নামক আম গাছ গুল্মাকৃতি ক্ষুদ্রায়তন আম গাছের সংখ্যা সাতিশয় কম এবং এই হেতু আম বৃক্ষকে বৃহদায়তন বৃক্ষ-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। পাতার সন্নিবেশ ছাড়া ছাড়া ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি লম্বা এবং ২।৩ ইঞ্চি চওড়া। ফুল বৃন্তাগ্রভাগ হইতে বহির্গত হয়। ফুলের শীষ লম্বা হয় এবং গুচ্ছাকারে ফুল ফুটে। ফুলে ৪ অথবা ৫টা পাপড়ি থাকে, মধ্যস্থলে পরাগ কেশর ও গর্ভাশয় থাকে। ফল গোল, লম্বা, চেপ্টা প্রভৃতি বিবিধ আকারের হইয়া থাকে। অত্যুচ্চ পর্ব্বতে কিম্বা হিমপ্রধান দেশে আম্র বৃক্ষ জন্মে না, ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফল। ফলের শাঁস হলদে, গোলাপী ও লাল বর্ণের হইয়া থাকে। শাঁসের মধ্যে আঁশ থাকে, ভাল আমে আঁশ কম। শাঁস মিষ্ট, টক কিম্বা অম্লমধুর হইয়া থাকে। আম্রবীজের (আঁঠির) আবরণ শক্ত, বীজ দ্বিজল। আম্র পর্য্যায়ভুক্ত বৃক্ষগণের মধ্যে দুই প্রকার বৃক্ষ দেখিতে প্রায় আম গাছের মত অথচ তাহাদের পার্থক্য অনেক। উহারা M. oppositifolia ও M. Sylvatica। প্রথম প্রকার বৃক্ষ ব্রহ্মদেশে জন্মিয়া থাকে, দ্বিতীয় প্রকারের আম সিলেটে দেখিতে পাওয়া যায়। সিলেটের লোকেরা ইহাকে লক্ষ্মী আম বলে। ইহাও নিতান্ত মন্দ আম নহে এবং এই প্রকার বৃক্ষও আবাদের উপযোগী।

আমের কাঠ দৃঢ়, ইহাতে তক্তা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্যাকিং বাক্স ও জানালা দরজার কবাট হইয়া থাকে। আমকাঠে জ্বালানির পক্ষে ভাল। ইহাতে প্রচুর আঠা থাকে বলিয়া কাঁচা জ্বালান যায়। কাষ্ঠের বর্ণ ধূসর ; তাত বাত না লাগিলে কাঠ অনেক দিন টিকে।

আমের পরাগ সঙ্গম ও গর্ভাধান কার্য্য অতি সহজেই হইয়া থাকে। আম্র ফুলের সৌরভে ও মধুলোভে মক্ষিকা ও প্রজাপতিকুল আকুল হইয়া ছুটিতে থাকে এবং তাহাদের দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে পরাগ নিষেক ক্রিয়া সংসাধিত হয়। এই প্রকারে শত শত প্রকার আমের প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হইতেছে। ভারতে যেমন নানা জাতীয় ধান আছে সেইরূপ নানাজাতীয় আমও আছে। স্বাভাবিক পরাগ সঙ্গম ক্রিয়া দ্বারা কত শত ভাল ও মন্দ ধান ও আমের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই জন্য লোকে আঁঠির আমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না।

আম্রের দেশ, কাল—বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বস্থ প্রদেশ সমূহ—যথা মকর ও কর্কট ক্রান্তির মধ্যে অবস্থিত ভূমিভাগ আম্রের আবাদ উপযোগী। যেখানে অত্যন্ত তুষার পাত হয় ও শীতের প্রকোপ অধিক তথায় আম্র বৃক্ষ ভালরূপ জন্মিতে পারে না এবং জন্মিলেও ফলপ্রসূ হয় না।

বসন্ত সমাগমে আম্র বৃক্ষ মুকুলিত হয় এবং গ্রীষ্মে বৃক্ষে ফলোদয় ও ফল পুষ্ট পরিণত হয় এবং গ্রীষ্মাবসানে ফল শেষ হইয়া যায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। ঋতুর ইতর বিশেষে ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত গাছে আম থাকে। ভাদুরে, দোফলা গাছের আম আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। বারমেসে বা তেফলা আম গাছ কেবল শীতের দুই মাস বাদ বার মাসেই আম পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে সময়ের আম যেমন সুস্বাদু অসময়ের আম তেমন নহে। গ্রীষ্মের কচি, কাঁচা, ডাঁসা, পাকা আমের তুলনায় অসময়ের আম স্বাদে হীন।

আমের আবাদ উপযোগী আবহাওয়া ও মৃত্তিকা—

আর্দ্র জলহাওয়ায় আম গাছ গুলির সুন্দর গঠন হয় কিন্তু ইহা নিতান্ত আর্দ্র জল হাওয়া ভাল বাসে না। পশ্চিম প্রদেশের শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ায় ইহারা অধিকতর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় ও অন্ততঃ অধিক ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। স্থূল কথায় বলা যায় যে যেখানে ফার্ণহিট নামক তাপমান যন্ত্র ৭০° হইতে ৮০° ডিগ্রি তাপ সূচিত করে এবং যেখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া মাটি সরস থাকে সেই সকল স্থানেই ইহাদের আবাদ প্রশস্থ। মরুভূমের ন্যায় নিরস ও শুষ্ক স্থানে কিম্বা হিম মন্দিত পার্ব্বত্য প্রদেশে কিম্বা দারুণ শীত প্রধান স্থানে আম গাছের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যেখানে বসন্তকালে অত্যধিক তুষারপাত হয় তথায়ও আমের পর্য্যাপ্ত ফসল পাওয়া কঠিন। উদ্যানতত্ত্ববিদ উড্রো সাহেব বলেন যেখানে অল্প কালের জন্য তুষার পাত হয় তুষার পাতের পর তুষার দগ্ধ ডাল পালা গুলি ছাঁটিয়া দিলে তাহারা আবার গ্রীষ্মাগমে পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারে বটে কিন্তু তাদৃশ ফলপ্রসূ হয় না।

নিতান্ত আর্দ্র জল হাওয়া আমের ফল প্রসবের পক্ষে অনুকুল নহে। নিম্ন বা তলায় নিরতিশয় সরস মাটি গাছকে খুব বাড়াইয়া তুলে কিন্তু ফল প্রসবের তাদৃশ সহায়তা করে না। নিম্ন বঙ্গের আম গাছে সকল বৎসরে ফল হয় না। নিম্ন বঙ্গের আম যাহা দেশী আম বলিয়া খ্যাত প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না এই সকল আমে আঁশ অধিক, মিষ্টত্ব কম থাকে, কোন কোন আমের গন্ধও মধুর নহে। মৃত্তিকায় অত্যধিক সরসতা এবং আবহাওয়ায় সাতিশয় আর্দ্রত্ব উত্তম ফল প্রসবের অনুকুল বলিয়া মনে হয় না।

নিম্নবঙ্গ ছাড়াইয়া উত্তর বঙ্গ, বেহার, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে পৌছিলে ভাল আম গাছের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। জলা সেঁতসেঁতে স্থানে আমের জন্য না হউক কাষ্ঠের জন্য দেশী আমের বাগান করাও লাভজনক।

নিম্ন বাঙলায় বারিপাতের পরিমাণ ৫০ হইতে ১০০ ইঞ্চ, উত্তর বঙ্গ, বিহার, মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানের বারি পতনের পরিমাণ ৩০ হইতে ৫০ ইঞ্চ মাত্র। ঘাট পর্ব্বতমালায় ১০০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বারিপাত হয়, এই কারণে এতদঞ্চলে আমের ফল ভাল হয় না।

নিতান্ত আর্দ্র জল বায়ুতে আমের আর একটি বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে কীটাদির উপদ্রবের প্রকোপ অধিক। জলবসা ও আর্দ্র বায়ুতে বহুতর কীট পতঙ্গের জন্ম ও শীঘ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহাতে আমের ফসলের বিস্তর ক্ষতি হয়। শুষ্ক প্রদেশে কীটাদির অপেক্ষাকৃত উপদ্রব কম।

মনে রাখা উচিত যে, রসাল মৃত্তিকায় ও আর্দ্র আবহাওয়ায় আম গাছ জন্মিলেও জলবসা, জলা জমিতে আমের গাছ হয় না। আমের বাগানের চতুর্দ্দিকে জল নির্গমের পয়োনালা থাকা আবশ্যক।

প্রত্যেক ফল গাছের জন্য পটাস, কাস্ফরিকাম্ল, নাইট্রোজেন ও চূণের আবশ্যক। মৃত্তিকাতে এই সকল দ্রব্যের অভাব ঘটিলে ফলের বাগান বা কেবল ফলের বাগান কেন কোন শস্যেরই আবাদ চলিতে পারে না। মাটির প্রাকৃতিক গঠন ও উদ্ভিদের শিকড় প্রবেশের মত সুবিধাজনক হওয়া প্রয়োজন। লোকে কথায় বলে শক্ত মাটিতে বিড়ালে আঁচড়ায় না, তেমনি নিতান্ত কঠিন প্রস্তরময় মাটিতে উদ্ভিদগণ শিকড় চালাইতে পারে না। আবার নিতান্ত আল্‌গা মাটি হইলেও উহা উদ্ভিদের শিকড়কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে না। মাটি উদ্ভিদের শিকড় চালাইবার মত নরম হইবে, অথচ দৃঢ় সম্বদ্ধ হইবে, এমন মাটিতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহজে হয়। মাটি সাধারণতঃ দেখিতে এক হইলেও তাহাদের উপাদান বিভিন্ন। দোঁয়াস মৃত্তিকাই সর্ব্ববিধ চাষাবাদের পক্ষে উপযোগী। ইহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ (Humus), জান্তব পদার্থ, কর্দ্দম, বালি, কিঞ্চিৎ চূণ, কিছু কিছু খনিজ পদার্থ প্রায়ই বিদ্যমান থাকে। বৃক্ষগণ উহা হইতে প্রয়োজনানুরূপ তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়। খাদ্য বস্তু জল সংযোগ রসরূপে পরিণত হইয়া উদ্ভিদের শিকড় আকর্ষণে উদ্ভিদ শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া উদ্ভিদের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। আম গাছের পোষণ উপযোগী মৃত্তিকা ভারতের বহুতর স্থানে পাওয়া যায় এবং এই কারণে বহুতর স্থানেই আম গাছ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার ওয়াট বলেন যে মৃত্তিকার প্রকার ভেদে আম গাছের বড় কিছু আসে যায় না, বহু প্রকারের মাটিতেই আম গাছ জন্মিতেছে ও তাহা ফলপ্রসু হইতেছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে আম্র বৃক্ষগণ অধিকতর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। বঙ্গ দেশের কর্দ্দম ও বালুময় ভূমির উপর পলিমাটি পড়িয়া যে সকল চর নির্ম্মিত হয় তাহাতেও আমের বাগান করা চলে। জল নিকাশি পয়োনালা করিতে পারিলে সাতিশয় সরস ভূমিও কতকটা নিরস করিয়া আম চাষের উপযোগী করা যায়। চূনাক্ত কঙ্কর বহুল ভূমিভাগে বড় বড় আমের বাগান আছে। আম গাছ গুলি যেমন ঊর্দ্ধে বাড়ে তাহারা তদনুরূপ মৃত্তিকাভ্যন্তরে শিকড় চালায়। আত্ম রক্ষা সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের নিয়ম। আপনার দেহটিকে ঠিক দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য আশে পাশে নিম্নে যতদূর শিকড় চালান আবশ্যক তাহা করিতে তাহারা বাধ্য। আহার অন্বেষণে তাহারা বহুদূর, বহু নিম্ন পর্য্যন্ত শিকড় চালাইয়া থাকে। পর্ব্বত সঙ্কুল স্থানে আম গাছগুলি বহুঊর্দ্ধে উঠিয়া

তবে ...লপালা বিস্তার করে। প্রস্তরের ফাঁকে ফাঁকে অনেক নিম্নদেশ পর্য্যন্ত শিকড় ...ইয়া যখন অনুকূল মৃত্তিকা পায় তখনই তাহারা তাহাদের শিকড় বিস্তার করে এবং আলোক উত্তাপ পাইবার জন্য কাণ্ডটিকে বাড়াইয়া লইয়া উর্দ্ধে যাইয়া শাখা বিন্যাস করে। আম বাগানের জন্য স্থান নির্ণয় করিতে হইলে উপরের জল মাটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না। নিম্ন স্তরের মাটিও ভাল চাই—৮।১০ ফিট গভীর মৃত্তিকা ভাল না হইলে তথায় আম গাছ রোপণ চলিবে না। উপরের মাটি বালুকা বা কঙ্করময় হইলে তাহাতে ৩।৪ ফিট গর্ত্ত খনন করিয়া অন্য ভাল মাটি দ্বারা পূরাইয়া লইলে চারা গাছ রক্ষা করা যাইতে পারে কিন্তু নিম্নের মাটি খারাপ হইলে উপায় নাই। ১০ ফিট নিম্নে কঙ্কর বা বালি থাকিলে ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে। কারণ নিম্নস্তরে বালি কঙ্কর থাকিলে বাড়তি জল নিকাশ হইবার সুবিধা হয়।

উড্রো সাহেব আম্র বৃক্ষের আদর্শ মৃত্তিকার নিম্নলিখিতানুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন উপরের ৫ ফিট পর্য্যন্ত দোঁয়াস মৃত্তিকা। তন্নিম্নে মার্ল (কর্দ্দম চূণযুক্ত সার মাটি), তৃতীয় স্তর প্রস্তর ও কঙ্করময় মাটি। এরূপ মৃত্তিকা পাইলে আমের আবাদ যে তাহাতে ভালরূপ হইবে তদপক্ষে সন্দেহ নাই কিন্তু এমন মনোমত মাটি কদাচিত মিলে।

আমের আবাদ উপযোগী মৃত্তিকা সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেন—

কেহ কেহ বলেন পাহাড়তলীতে পাহাড় বিধৌত পলি পড়া মাটিতে আমগাছের আবাদ সুন্দর হয়। আমরা বলি যে মাটীতে বালি, চূণ, কর্দ্দম আছে, যে মাটী লৌহের সংমিশ্রণহেতু কথঞ্চিৎ লালাভযুক্ত এবং যেখানে গভীর দোঁয়াশ মাটি পাওয়া যায় সেখানেই আমের বাগান রচনা করিলে ভাল। অন্যত্র একটা না একটা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, গাছ হইবে ফল হইবে না অথবা গাছই ভালমতে জন্মিবে না। নিরস প্রস্তর ভূমিতে আমগাছ হইবেনা বা রাজপুতনার বালুকাময় কলা মাটিতে আম বাগান বসিবেনা।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি জলাজমিতে আমগাছের আবাদ হয় না কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে বর্ষাকালে জল দাঁড়ায়, রাজসাহী, মৈনমসিংহ, ঢাকা ও বরিশাল জেলায় এমন জমিতে আম বাগান আছে। ঐ সকল গাছ জীবিত থাকে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ফলও প্রদান করে। এখানকার আমও খারাপ নহে। তবে ঐ সকল স্থানের উচ্চ ভূমির আমগাছের ফলের গুণ ও ফলনের সহিত ও নিম্ন জলমগ্ন ভূমির ফলনের ফল ও পরিমাণ কেহ তুলনা করিয়া দেখে নাই এবং উভয় প্রকার জমির ফলের পুঙ্খানুপুঙ্খ গুণাগুণ কেহ বিশ্লেষণকরে নাই। পেয়ারা, লেবু, প্রভৃতি ফলগাছ জলবসা জায়গায় আদৌ হয় না কিন্তু আমগাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইলে আমগাছ মরে না বা খারাপ হয় না এবং ইহাতে ফল প্রদানের বিশেষ কোন ব্যাঘাত জন্মে না। এমন দেখা গিয়াছে যে আমের বাগান জলাশয়ের নিক থাকিলে গাছের অধিকাংশ শিকড় জলাশয় অভিমুখে চালিত হয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে

যে জলবসা স্থান আমের পক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় নহে। ডাক্তার ওয়াট বলেন যে আমগাছের মৃত্তিকা বিচার নাই তাহা কতকটা সত্য হইলেও কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে উচ্চ ভূমি ভাগে উত্তর বঙ্গে এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে আমের ফলন অধিক এবং তথায় ভাল আমের সংখ্যাও অধিক। দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই অঞ্চলেও অনেক উৎকৃষ্ট আম আছে কিন্তু তথায়ও উচ্চ ভূমির আমই ভাল। বাঙলা দেশের যে সকল স্থান অত্যন্ত রসা তথায় আমগাছ হয়, ফলও হয় বটে কিন্তু সকল বৎসর আম গাছ ফলে না। যে বৎসর বৃষ্টি কম হয় এবং মাটি ও আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই বৎসর নিম্ন বঙ্গে আম ফলার সম্ভাবনা এবং সেই বৎসর প্রচুর ফলেরও আশা করা যায়।

সুচাষ ও নির্ব্বাচন দ্বারা আম্রজাতির উন্নতি— এখন লেঙড়া, বোম্বাই, মাল্‌দা, এই কয়টি আম সকলের নিকট সুপরিচিত এবং ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা আদর। এমন অনেক আম আছে যে তাহারা অন্য নামে অভিহিত হইলেও তাহাদিগকে উক্ত তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়।

বোম্বাই আম ঈষৎ লম্বা হইলেও গোলাকৃতি বলা যায়। একটা আমের ওজন ২০ কিম্বা ২৫ তোলার অধিক নহে। কিষণভোগ, হিমসাগর, বিশ্বনাথ মুখুর্য্যে, বেলখাস প্রভৃতি আমগুলিকে বোম্বাই শ্রেণীতে ফেলা যায়। বোম্বাই আমের আঁশ নাই, ভিতরের শাঁস পেপের মত এবং আস্বাদ অতি মিষ্ট।

লেঙড়া আম বোম্বাই অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়, ঈষৎ চেপ্টা, নাক আছে, বোঁটা খুব সরু, খোসা পাতলা, আঁশ বিরল, স্বাদে অম্ল মধুর। এমন অনেক আম আছে যাহার আকৃতি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইলেও লেঙড়া শ্রেণীতে ফেলা যায়। মালদহের আমগুলি বড়, শাঁস পেপের মত, আস্বাদ মিষ্ট, আঁশ কম। যাবতীয় বড় আমগুলিকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। স্বভাবজ ও মনুষ্যকৃত সাঙ্কর্য্য দ্বারা বিবিধ প্রকার আমের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এক একটা স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইতেছে। অনেক আম আরণ্য অবস্থা হইতে সুচাষ এবং ক্রম নির্ব্বাচন দ্বারা উৎকৃষ্ট আমে পরিণত হইয়াছে। কত পরিবর্ত্তনের পর ল্যাঙড়া, বোম্বাই, মালদা, এই বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বোম্বাই আকুজ আম কাওড়া জাতীয় আমের বংশধর; ত্রিহুত ও মালদা আমের পূর্ব্ব পুরুষগণ এখনও বন্য অবস্থায় বনে বিরাজ করিতেছে। ত্রিহুত ও উত্তর বঙ্গে যে কোন আমের চারা লইয়া আমের আবাদ বসানর রীতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ঐ সকল গাছের মধ্যে যে গুলির আম ভাল হইল সেইগুলি রাখিয়া বাকি গাছগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। পরিত্যক্ত বৃক্ষগুলিতে জ্বালান কাঠ হয়। ভাল, মাঝারি আম পরস্পর সাঙ্কর্য্য দ্বারা ছোট, বড় মাঝারি উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতম উৎকৃষ্টতর আমের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমের চারা বা কলম—ফলের ব্যবহার যতই উত্তর উত্তর বাড়িতেছে মানুষ এক্ষণে নানা উপায়ে ফল বৃক্ষের বংশ বৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতেছে। বীজ হইতে চারা উৎপাদনই সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্ব প্রধান প্রণালী। কিন্তু আঠী বা বীজের চারা শীঘ্র ফলবান হয় না বা তাহাদের ফল সকল সময় মাতৃবৃক্ষের অনুরূপ হয় না এই হেতু চারা উৎপাদন করিবার নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গুল কলম (Gooti) জোড় কলম (Grafting, Inarching), দাবা বা ধাপ কলম (Layering), চোখ কলম (Budding), চোঙ্গ কলম (Tube grafting) ও জিভ কলম (Tongue grafting) কলম করিবার এই কয় প্রণালী প্রচলিত আছে। সর্ব্ব প্রকার গাছে কলম করিবার সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করা যায় না—কাহার বা গুল কলম হয়, কাহারও বা জোড় কলম হয় কাহার বা চোখ কলম হয় কাহার বা জিভ কলম হয়। আমের জোড় কলম করাই সুবিধা, লিচুর গুল কলম সুবিধা, লেবুর গোলাপের দাবা কলম ভাল হয় পেঁপের জিভ কলম হইয়া থাকে, কুলের চোখ কলম ভিন্ন অন্য কলম হয় না। আমের গুল কলম দাবা কলম হইতে পারে। উদ্যান তত্ত্ববিদ্ ফার্ম্মিঞ্জারের পুস্তকে আমের কটিং (ডাল কাটিয়া রোপণ) দ্বারা চারা উৎপাদনের কথা লেখা আছে। হয়ত বিশেষ চেষ্টাতে কটিং দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। সামান্যতঃ কাটিং পুতিয়া কোন ফল হয় না—আমি ইহা বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার বিশ্বাস বালি ও পাতা সারে মাটি তৈয়ারি করিয়া কাঁচের বাক্সের ভিতর কটিং রোপণ করিলে শিকড় গজাইতে পারে। এই প্রকারে কটিং করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে।

দুই এক প্রকার আমের গুল বা গুটি কলম করা যায়, কোন কোন গাছের দাবা কলমও হয় কিন্তু সাধারণতঃ আমের জোড় কলমেই ভাল চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, জোড় প্রায় ব্যর্থ হয় না। গুল ও দাবা কলম সহজ সাধ্য হইলেও তাহাতে সকল সময় মনোমত ফল পাওয়া যায় না—সব সময় ঠিক ঠিক শিকড় আসে না, অনেক [illegible]রা মরিয়া যায়।

আঠী হইতে চারা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা জনক, কিন্তু তাহাতে ফল প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া অধিকাংশ সময় আঠীর চারার আম বাগান কেহ পছন্দ করে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আঠীর চারার আম বাগান তৈয়ারি করিতে পারিলে ভবিষ্যতে অধিক লাভবান হওয়া যায়। যেখানে কলম লইয়া যাওয়া অতিশয় ব্যয়সাধ্য বা যেখানে আদৌ কলম সংগ্রহের উপায় নাই সেখানে যত্নপূর্ব্বক আঠীর চারার গাছ বসানই বিধেয়।

সুপুষ্ট বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিয়া, চারা গুলি হাপরে (Nursery) ২।৩ মাসের বড় হইলে সেগুলিকে তুলিয়া তাহার মূল শিকড় কিঞ্চিৎ কাটিয়া দিতে হইবে, যেমন

বেগুনের, মুলার শিকড় ছাঁটে। ইহাকে খাসি করা বলে। অতঃপর চারাগুলিকে পুনরায় হাপরে বসাইয়া এক বৎসরকাল রাখিতে হইবে এবং পর বৎসর বাগানে স্বস্থানে বসাইয়া, উপযুক্ত সারাদি দিয়া তদ্বির করিতে পারিলে ৪ বৎসরে বাগান তৈয়ার হইয়া যাইবে এবং বৃক্ষগুলিও ফলবান হইবে। বীজের চারার কেহ তদ্বির করে না বলিয়া হয়ত তাহা আশু ফলপ্রদ হয় না। আমি চেষ্টা করিয়া দুই একটি গাছ শীঘ্র ফলবান করিতে পারিয়াছি মাত্র। কিন্তু অনেক সময় আমার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। মালদহ অঞ্চলে বীজের চারা ৪ বৎসরে সাধারণতঃ ফলবান হয়। কলমের গাছগুলিও পূর্ণায়তন হইতে ৪।৫ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়, তখন তাহা হইতে সম্ভবমত ফল পাওয়া যায়। আঁঠীর চারাকে ঐ সময়ের মধ্যে ফলবান করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আঠীর গাছ হইতে অধিক ফলের আশা নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে। কলমের গাছগুলি ঝাড়াল হয় বটে কিন্তু আঁঠীর গাছ কালে কলম অপেক্ষা দীর্ঘায়তন হয়, উহাদের কাণ্ড বড় ও স্থূল হয় এবং কাষ্ঠ হিসাবে ঐ বৃক্ষগুলি অধিক মূল্যবান হইয়া থাকে। অনেকেই কিন্তু ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া আঁঠীর চারা রোপণের বড় বিরোধী; কেহ বা অনুকূলমত প্রকাশ করেন। আমরা কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মত প্রকাশ করিতেছি,—

Dr. Watt's Dictionary of Economic Products—"Mangoes are propagated by inarching, that is grafting by approach. They can be grafted in other ways, but inarching is the simplest. They can also be grown from seed. In fact if only the finest and best sorts be selected, the chances are that 50 per cent. will be as good as the fruits sown, a few better and the rest worse. I should advise planting seedling mangoes, where grafts are difficult to obtain, taking for the seed only such sorts as Peary, Kishenbhog, Darbangah, Bombey, Fazlee, and good forms, and then only from well fromed quite ripe fruits. The season of ripening too might be prolonged if such kinds as Rhari Budaya, Monohur thakoor, and other budya sorts used for seed. This was done on rather large scale in Durbhunga. A good mango seed should never be thrown away; always plant it if possible."

Dr. Prain, *Superintendent, Sibpur Botanic Garden*, says that, "if a seedling mango is allowed to grow, it takes a considerable number of years, for it to become so mature as to be able to bear flowers and fruits. In making a graft the stock used is a young vigorously growing plant still some seasons removed from the maturity necessary to it before it will flower. The scion on the other hand is part of an older tree, a branch of which is selected

after it has become mature enough to bear flowers and fruits. Thus the stock and the scion are really of very different ages and in very different stages of maturity, and if the stock is allowed to grow it is only natural it should have no flowers, being still too young to bear any, while the scion being composed of mature tissues equally naturally bears flowers. If the stock is permitted to grow, it will be found that by the time that mother seedling mango of the same age on which no scion has been grafted, is sufficiently old to bear flowers, the one on which a scion has been grafted will also begin to flower."

From *the Report of the Botanic Gardens in the N. W. P. for the year* 1854, the Rev. Mr. Firminger quotes :—Mr. J. Homfray has likewise in his garden received from the Botanic Garden, grafted tree of the Mazagon mango, stones from which he planted, and one or two trees raised therefrom, produce the fruit exactly alike and fully equal in every respect to the fruit of the present trees. The Rev. gentleman further observes :—"In a conversation I had with Mr. J. Homfray many years after he had made the above communication, he told me that he had since sown the seeds of other kinds, but had not met with the same result from them. The seedlings did not yield fruit equal to that of the parent tree. The Java kind, however, always came true as a seedling."

উপরে উল্লিখিত অভিমত হইতে আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে জাভা আমের আঁঠী হইতে উত্তম চারা প্রস্তুত করা যায় এবং উহারা মাতৃবৃক্ষের অনুরূপ ফল প্রসব করে। আঁঠীর চারা লইয়া আমাদের এত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন এই যে আঁঠীর গাছগুলি দৃঢ় হয় এবং উহারা কলমের গাছ অপেক্ষা তাতবাত সহিষ্ণু হইয়া থাকে।

কেহ কেহ আমাকে পত্র লিখিয়াছেন ভাল আমের আঁঠীতে চারা হয় না। সুপুষ্ট আঁঠীতে কলম না হইলে বিধাতার সৃষ্টির ব্যতিক্রম হইয়া পড়ে। মাদ্রাজী তোতা প্রভৃতি আম কিম্বা ল্যাঙড়া আম যাহা দূর দেশ হইতে কলিকাতা বা পূর্ব্ববঙ্গে উপস্থিত হয় তাহা অধিকাংশ সময় কাঁচা ভাঙ্গা এবং কখন অপুষ্ট অবস্থায় ভাঙ্গা; এই অবস্থায় বাজারে আসিয়া কোন ক্রমে গরমে শুষ্ক হইয়া পাকিয়া উঠে। ঐ সকল আমের আঠীর চারা উৎপাদনের শক্তি থাকে না। কখন বা দেখা যায় ক্রমান্বয়ে উত্তম চাষ দ্বারা আমের উন্নতি করিলে আমের আঁঠী ছোট হইয়া আসে এবং উহাদের উৎপাদিকা শক্তিও কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়ে। এই প্রকার আঁঠীতে চারা ভাল হয় না বা আদৌ হয় না। ইহা

বিচিত্র নহে। উদ্ভিদ জগতের বহুল বৃদ্ধির জন্য যেমন বীজের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অঙ্গ মূল ও গাত্র হইতে চারা উৎপাদনের বিধানও আছে।

জোড় কলম বাঁধিবার প্রণালী—গুল কলম করিতে হইলে বৃক্ষ শাখার এক অংশ হইতে ছাল তুলিয়া ফেলিয়া অল্প চাঁচিয়া সারবান মৃত্তিকা দ্বারা উক্ত স্থান আচ্ছাদন করিতে হয় এবং মাটি ঝরিয়া না পড়ে বা বৃষ্টিতে বিধৌত হইয়া না যায় এইজন্য চঠ বা নারিকেল আঁশ (ছোবড়া) দ্বারা জড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। দাবা কলমে ডাল চাঁচিয়া মাটিতে দাবাইয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। জোড় কলম করিতে হইলে স্বতন্ত্র একটি চারার আবশ্যক। আঁঠীর চারার সহিত ডালে জোড় বাঁধিতে হয়। চারাগুলি হাপরে এক দুইবার নাড়িয়া বসাইয়া ও খাসি কটা করিয়া এক বৎসর যাবত পালনান্তর পর বৎসর উহাদের সহিত জোড় করা চলে। জোড় বাঁধিবার এক মাস পূর্ব্বে চারাগুলি হাপর হইতে তুলিয়া মাটির টবে, গামলা বা হাঁড়িতে বসাইয়া চারাগুলি বেশ ধরিয়া বসিলে (সারিয়া গেলে) জোড় বাঁধার উপযুক্ত হয়। যে গাছের ডালে কলম বাঁধা হইবে সে গাছটি হয় এক পার্শ্বে হেলাইয়া শোওয়াইতে হইবে নতুবা গাছের তলায় মাচা বাঁধিয়া তদুপরি চারার টবগুলি স্থাপন করিতে হইবে। চারার কাণ্ডের সহিত, শাখার মিলন যাহাতে হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। চারা যেমন স্থূল হইবে জোড় বাঁধিবার জন্য শাখাটিও তদনুরূপ স্থূল হইবে এবং কলম বাঁধা ছুরিকা দ্বারা চারা ও শাখার সংযুক্ত স্থান কিয়ৎপরিমাণ চাঁচিয়া মিলন স্থান যোজনা করিয়া দৃঢ়রূপ বাঁধিয়া দিলে জোড় লাগিয়া যায়। জোড় কলমের মূল হইল, আঁঠীর চারা, অগ্রভাগ হইল ভাল আমের শাখা ; মূল রস যোগাইবে, গাছ বাড়াইবে, ভাল আমের শাখাগ্র ক্রমশঃ বৃক্ষে পরিণত হইয়া তাহাতে ভাল আমই উৎপাদন করিবে। নীচ যদি মহতের সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে মহতের গুণ প্রাপ্ত হয় যেমন কাঞ্চনের সহিত কাচের মিলন হইলে কাঞ্চনের প্রভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মালদহ অঞ্চলে ৩।৪ বৎসরের চারার সহিত জোড় বাঁধা হয়। বড় শাখায় কলম বাঁধিবার জন্য তথায় এই প্রথা চলিত আছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি বড়, ছোট শাখায় বিশেষ কিছু আসে যায় না—২ বৎসর পরে বড় ছোট শাখার গাছ প্রায়ই সমানায়তন দাঁড়ায়। অনেকে আবার সদ্যজাত চারার সহিত জোড় বাঁধিয়া থাকে। চারাগুলি ২ মাসের বড় হইলেই সে গুলিকে তুলিয়া মাটি সমেত চটে (পাটের থলে) বাঁধিয়া অভিষ্ট গাছের শাখায় ঝোলাইয়া অনুরূপ শাখাগ্রের সহিত জোড় বাঁধে ; এই প্রকারে সহজে জোড় বাঁধে, বর্ষাকালে জোড় বাঁধা হয় বলিয়া চারা সংলগ্ন মাটি নিরত বারিপাত হেতু সর্ব্বদাই ভিজা থাকে এবং চারাটিও সরস থাকে। যদি বৃষ্টি বারির অভাব হয়, তবে পিচকারি দ্বারা মাঝে মাঝে চারার গোড়া গুলি ভিজাইয়া দিবার [illegible]

হইয়া পড়ে। জোড় কলমে এবং এই প্রকার কলমে কখন বা ভাঁড় বাঁধিয়া জলের যোগান রাখিতে হয়।

বর্ষারম্ভেই আঁঠী হইতে চারা করিতে হয় এবং বর্ষার মধ্যেই এই প্রকারের জোড় বা কলম না করিলে অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। নতুবা সাধারণত জোড় কলম শেষ বর্ষায় বাঁধিলেও চলে।

জোড় বাঁধিবার পর সংযুক্ত স্থানটিতে আটাল মাটি ও গোময়ের প্রলেপ দিলে মন্দ হয় না। বিলাতী পদ্ধতি হইতেছে মোম, রজন ও সঙ্গে কিছু পীচ একত্র গলাইয়া তাহা ঠাণ্ডা হইলে তাহার প্রলেপ দেওয়া – বিলাতী দুইটী ফর্ম্মুলা এই,—

I. "Take 24 oz. of comnon yellow resin, and melt it gradually, so as not to drive off the turpentine. When reduced to the consistency of a syrup add 10 oz. of alcohol. Shake them thoroughly together and pour the mixture at once into a well-stoppered bottle."

II. "Five-eights of black pitch, one eighth each of the wax of bee, tallow, and resin. Put them together in a glue pot and melt them down over a slow fire." The composition should be applied when it is cool.

কলম বাঁধা সম্বন্ধে সংক্ষেপত কিছু বলা গেল। সুদক্ষ হস্ত না হইলে কলম বাঁধা কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

সাঙ্কর্য্য—এই প্রসঙ্গে সাঙ্কর্য্য সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক—স্বভাবত বায়ু চালিত কীট পতঙ্গ বাহিত পরাগরেণু, পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে নীত হইয়া কত রকম আমের সৃষ্টি প্রতিনিয়ত হইতেছে। মানুষে ইচ্ছা করিয়া ইচ্ছানুরূপ পরাগ নিষেক দ্বারা ল্যাঙড়ার সহিত বোম্বাই আমের, ফজলীর সহিত ল্যাঙড়া বা বোম্বায়ের মিলন ঘটাইয়া নূতন উৎকৃষ্ট জাতীয় আমের সৃষ্টি করিতে পারে। আম্র মুকুলে পরাগ নিষেক করা হইলে সেই মুকুলটিকে সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত করিয়া বায়ু কিম্বা কীটাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা যে ফল উৎপাদিত হইবে তাহা মনোমত হওয়াই সম্ভব এবং তাহা স্বতন্ত্র একটি জাতি হইয়া বাজারে নিজ নাম জাহির করিতে পারে।

স্থান নির্দ্দেশ—আমের উপযোগী মৃত্তিকা কি তাহার কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে; এখন যদি কেহ একটি আম বাগান রচনা করিতে মানস করেন তবে কি প্রকার স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে বিচার আবশ্যক। স্থানটি উচ্চ হওয়া, এবং তাহার জল নিকাশি পয়োনালা থাকা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। যেখানে রৌদ্র বাতাসের অবাধ গতি আছে এবং চারিদিক ফাঁকা এরূপ স্থানই সর্ব্বোত্তম। যদি সব দিকে খোলা না পাওয়া যায়,

তবে যাহাতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক উন্মুক্ত থাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; তাহা না থাকিলে সূর্য্যালোকের সম্পূর্ণ প্রভাব উপভোগ হয় না। বাঙলাদেশে বৎসরের ৯ মাস কাল দক্ষিণা বাতাস বহিয়া থাকে এবং বাঙলা সীমা অতিক্রম করিলে পশ্চিম বাতাস প্রবল। যাহাতে বায়ু প্রবেশের পথ উন্মুক্ত থাকে উদ্যান পালকের এতাদৃশ সতর্কতা অবলম্বন সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন। বন্য বৃক্ষাদির আওতা থাকিলে সেগুলি কাটিয়া আওতা ঘুচাইয়া তবে ফলের বাগান রচনা করা কর্ত্তব্য।

ফলের বাগানের চারিদিকে সুগভীর খানা খনন করিয়া ফলের বাগান রচনা করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রশস্থ বাগান হইলে মধ্যে মধ্যে পুষ্করিণী, ঝিল প্রভৃতি জলাশয় রক্ষার বিধান করিতে হয়। ইহাতে জল সেচন ও জল নিকাশের সুবিধা হয় এবং পুস্করিণী ও পগারের পলি মাটি ও জলজ উদ্ভিদাদি হইতে ফল বৃক্ষের সার সংগ্রহ হইয়া থাকে। চারিদিক বেড়িয়া পগার বা গড় থাকিলে বায়ু চালিত হইয়া বৃক্ষ পত্র ক্ষেত্রান্তরে নীত হইতে পায় না, পত্র সমূহ পগারে সঞ্চিত হইয়া পচিয়া সারে পরিণত হয়। অধিকন্তু জমির ধোয়াট নামিয়া পগার ও জলাশয়গুলির মাটি সারবান করিয়া তুলে। এই সকল কারণে পগার বা জলাশয়ের তলস্থ মৃত্তিকা ফল বৃক্ষের সারের পক্ষে এত উপযোগী।

অল্প বিস্তর রসা জমিতে আমের বাগান হইতে পারে বটে কিন্তু আমার অনুমান যে রসা জমি অপেক্ষা উচ্চ জমির বাগানে অধিক ফল ফলে এবং ফলও গুণে শ্রেষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা।

নিম্ন শ্রেণীর জলবসা জমিতে আম বাগান প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার চারিদিকে পগার বা গড় কাটিয়া এবং মাঝে ঝিল খনন করিয়া জমিটিকে উচ্চ করিয়া লইলে জমি কাজের উপযোগী হইয়া উঠে।

সহর বন্দরের নিকট ফলের বাগান অত্যন্ত আয়কর সম্পত্তি কিন্তু সহর বন্দরের নিতান্ত সান্নিধ্য ফল বৃক্ষের পক্ষে শুভকর নহে। কারণ, সহর বন্দরের ধুলা ও ধোয়া ফল বৃক্ষের বৃদ্ধির ও ফল প্রসবের অতিশয় অসুবিধা ঘটায়। মানুষের যেমন স্বাস্থ্যের জন্য নাক, মুখ, চোখ ত্বক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক বৃক্ষের পক্ষেও সেই নিয়ম। নাকে, মুখে, চোখে ত্বকে ধুলা প্রবেশ করিলে যেমন মানুষের স্ফুর্ত্তি থাকে না, উদ্ভিদগণেরও তাদৃশ দশা হইয়া থাকে। এই হেতু সহর, বাজার বন্দর হইতে দূরে যথায় ধুলা ধোঁয়ার প্রাবল্য নাই এমন স্থানে ফলের বাগান রচনা করাই বিধেয়। বলা বাহুল্য যে উদ্ভিদের পত্রই তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র এবং তাহাদের চক্ষুও বটে, তাহাদের মুল ও শিকড় তাহাদের মুখ। বৃক্ষগণের মুকুলের উপর ধুলা বা ধোঁয়া লাগিলে মুকুল প্রস্ফুটিত হইতে পায় না, ফুটিলেও তাহাদের সম্পূর্ণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

ফলের বাগান রচনা—সব বিষয়েই একটু হিসাব করিয়া কাজ করিলে সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা অধিক। আম গাছের মধ্যে বড়, ছোট, মধ্যমাকৃতির গাছ আছে। আঁঠীর আম গাছগুলি প্রায়ই অধিক উচ্চ ও কালে দীর্ঘায়তন হয়। এই সকল গাছ এই জন্য বাগানের উত্তর সীমানা ঘেঁসিয়া বসাইতে পারা যায়। পূর্ব্ব, দক্ষিণ বা পশ্চিম প্রদেশে পশ্চিম দিকে উচ্চতম গাছ বসাইলে অন্য গাছে বাতাস ও রৌদ্র পাইবার অসুবিধা হইতে পারে। উচ্চ গাছের পর মধ্যমাকৃতি এবং তৎপরে ক্ষুদ্রাকৃতি গাছ বসানই কর্ত্তব্য।

ল্যাঙড়া, ফজলী, বোম্বাই, ফুলী প্রভৃতি আমগাছ সমুদয় একত্র না বসইয়া এক এক জাতীয় গাছ স্বতন্ত্র চৌকায় বসাইলে গাছের তদ্বিরের এবং ফল আহরণের অনেক সুবিধা হয়। কোন আম জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে পাকে, কতকগুলি আষাঢ় শ্রাবণে, কোন কোন আম ভাদ্র আশ্বিনে পাকে এবং তাহাদের বৌলও অগ্র পশ্চাত হইয়া থাকে। আবার দোফলা, বারমেসে গাছও আছে। ফল প্রসবের কালানুযায়ী আম গাছের অগ্র পশ্চাৎ চাষ কারকিত ও সার প্রদানের ব্যবস্থা না করিলে চলে না। সুদক্ষ উদ্যান পালকগণ এই হেতু বিভিন্ন জাতীয় আমগুলি ভিন্ন ভিন্ন চৌকায় বসাইবার পক্ষপাতী। আবার ২৫।৩০ টা গাছ একসঙ্গে বসাইয়া মাঝে মাঝে কিছু ফাঁকা স্থান ফেলিয়া রাখা অনেকে ভাল বলিয়া মনে করেন। ইহাতে চারিদিক হইতে বাতাস ও আলোক পাইবার সুবিধা হয়। এইরূপ স্তবকে স্তবকে গাছ বসান ভাল ব্যতীত মন্দ নহে। বাগান প্রশস্থ হইলে বাগানের ভিতর দীর্ঘে প্রশস্থ চওড়া রাস্তা রাখিতে হয়। এই সকল রাস্তা অনেক সময় বায়ু প্রবাহের প্রণালীর মত কার্য্য করে এবং ইতস্তত রাস্তা থাকিলে বাগানটি আপনা হইতেই অনেকগুলি চৌকায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। বাগানের রাস্তা, ঝিল পয়োনালা গুলি কখন ঋজু, কখন কখন বক্র, কখন গোলাকারে ইতস্তত রচনা করিয়া স্তবকে স্তবকে গাছ বসাইলে বাগানটি সুদৃশ্য হয় এবং বাগানের মেরামত কারকিত ও আলোক বাতাস, জল সংগ্রহের সুবিধা হয়।

বাগানের আগাছা কুগাছা উঠাইয়া জমি কোপাইয়া, হল দ্বারা কর্ষণ করিয়া চারা রোপণ করাই বিধি। অধুনা কেহ কেহ তৃণ মণ্ডলের (ঘাষ মাঠের) মাঝে মাঝে ফলের গাছ বসাইবার পরামর্শ দেন। তৃণ মণ্ডলের মধ্যে মধ্যে গাছের স্তবক মন্দ নহে। গাছের তলদেশগুলি কিন্তু তৃণ শূন্য ও সারবান মৃত্তিকায় পূর্ণ থাকিবে। গাছের বৃদ্ধির কোন অন্তরায় না হয় এতদূর প্রশস্থ স্থান সুপরিষ্কৃত থাকা আবশ্যক।

ফলের বাগান রচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শিশু বৃক্ষগুলিকে রক্ষার বিধান চাই। বাগানের বেড়া দেওয়া একটা প্রধান কার্য্য। বাগানের চারিদিকে যদি গভীর পগার কাটা থাকে এবং বাগানের দিকে পগারের পাড় যদি উচ্চ করিয়া বাঁধা হয়, তাহা হইলে গবাদি সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। পাড়ের উপর কোন প্রকার কাঁটা গাছ,

আনারস, মুর্গা, বা মনসা জন্মাইলে বাগানটি বেশ সুরক্ষিত হয়। বাগান বড় ছোট অনুসারে কোন্ বেড়া সুবিধা মত দেওয়া যাইবে তাহা উদ্যানপালক ঠিক করিয়া লইবেন। মনে থাকে যেন যে আদার সত্ব পুঁই থাড়ায় টানিয়া না লয়—বেড়ার গাছে যেন অধিকাংশ ভূমির সত্ব খাইয়া না ফেলে। প্রশস্ত বাগানে ডুরাণ্টা বা ইঙ্গাডাল্‌সিসের বেড়া মন্দ নহে। বেড়া কিন্তু চাই—গবাদির ও দুষ্ট লোকের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য বেড়া চাই; তাই খনা বলিতেছেন "যে আগে বেঁধে বেড়া, তবে বাগ বাগিছা বাড়া।" কথা যুক্তিযুক্ত।

হাওয়া চলাচলের জন্য যেমন বাগানের দিক সকল উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক, তেমনি আবার মাঠ ময়দানের মাঝখানে বাগান হইলে হাওয়ার হাত হইতে উদ্যান রক্ষার জন্য চারিদিকে বড় বড় গাছ বসাইতে হয়। অনেক বাগানে শিশু গাছের বেষ্টনি থাকে। দেবদারু গাছের বেষ্টনি মন্দ নহে কিন্তু দেবদারু প্রবল বাতাসে ভাঙ্গিয়া যায়।

আমগাছ বসাইবার সময় ও নিয়ম—বৈশাখের ঝড় বৃষ্টির পর মাটি কিঞ্চিৎ নরম ও ঠাণ্ডা হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসে চারা বসাইতে হয়। এই সময় চারা বসাইলে মাঝে মাঝে বৃষ্টি বারির সাহায্য পায় বলিয়া চারাগুলি বিনা আয়াসে সহজেই ধরিয়া বসে। পুরা বর্ষায় চারা বসান অকর্ত্তব্য, এইরূপ গ্রীষ্ম বা শীতকালে আম প্রভৃতি চারা বসাইতে নাই। বর্ষার অবসানে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে চারা বসান মন্দ পরামর্শ নহে। এই সময় মাটিতে যথেষ্ট রস থাকে এবং চারাগুলি মাটিতে শিকড় চালাইবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। বাঙলা দেশের এই নিয়ম সর্ব্বত্র; কিন্তু এক নিয়মে সকল স্থানে কাজ হয় না। আঁঠীর চারা ৩৫ ফিট এবং কলমের চারা ৩০ ফিট ফাঁক বসান যাইতে পারে। অধিক ফাঁক ফাঁক বসাইলে জমি বৃথা নষ্ট হয় এবং ঘন গাছ হইলে ফল কম হয়। আমাদের দেশের প্রবাদ আছে তাহাও আমাদের মতের সহিত মিলে। প্রবাদ এই,—

হাত বিশ করি ফাঁক।
আম কাঠাল পুতে রাখ॥
গাছ গাছালি ঘন সবে না।
গাছ হয়ে তার ফল হবে না॥

আর একটি প্রবাদ বাক্যের অর্থ কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না—

আম টুটুয়ে কাঁঠাল ভো,
গো নারিকেল নেড়ে রো।

আম চারা নাড়িয়া পুতিলে ফল ছোট, কাঁঠাল নাড়িয়া পুতিলে কাঁঠালের ভিতর কোয়া থাকে না। কিন্তু ইহা যথার্থ বলিয়া আমি মনে করি না। নাড়া আম কাঁঠালের

গাছে ভাল ফলই হইতে দেখিয়াছি। নারিকেল, গুপারি নাড়িয়া পোতা তাহাদের বৃদ্ধির ও উন্নতির অনুকুল সন্দেহ নাই কিন্তু আম কাঁঠালে ইহা দ্বারা কোন অনিষ্ট হইতে আমি দেখি নাই। গাছগুলি সমসূত্রে এবং সমান অন্তরে রোপণ একান্ত প্রয়োজন।

গাছ বসাইবার কিছুকাল পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট বাগান জমিতে ৪ × ৪ × ৫ ফিট গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে সার গোবর ফেলিয়া রাখিলে ভাল হয়। চারা রোপণের ৩ মাস পূর্ব্বে এই কার্য্য করিয়া রাখিতে হয়। চারাগুলি বসাইয়া গোড়ায় মাটি দাবাইয়া বসাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। চারা আলগা মাটির উপর থাকিলে মাটির অধিক নিম্নে বসিয়া যাইবার সম্ভাবনা। চারা বসাইয়া উপর হইতে বোমা বা ঝারি দ্বারা জল প্রদান করিতে হয়। মাটির রন্ধ্র পথে জল প্রবেশ করিয়া মাটিকে আবশ্যক মত জমাইয়া দেয়। আম চারা বসাইবার সঙ্গে সঙ্গে কলা বাগান করা মন্দ পরামর্শ নহে। কলা গাছের আওতায় চারাগুলি শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং কলাগাছ গুলি প্রবল রৌদ্র বাতাস ও জন্তু জানোয়ারের হাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করে।

এই অধ্যায়ের উপসংহারে বলিতে চাই, যে আমগাছ বসাইবার সময় সম্বন্ধে মার্শাল উড্র সাহেবর মত—বর্ষারম্ভেই আমগাছ বসান ভাল। ভারতে ঐ সময় বর্ষা বায়ু (Monsoon) চলিতে থাকে। বায়ু-তাড়িত জলভরা মেঘ সমূহ ভারত ভূমির উপর দিয়া যাইবার কালে বারি বর্ষণ করিতে থাকে। ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশে বর্ষা-বায়ু চলিতে থাকে। উড্র সাহেব বলেন যে সময় যেখানে উক্ত বায়ুর আবির্ভাব হইবে, সেই সময় সেখানে আম লিচু প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইবে।

ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা

১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে ভারতবর্ষে ৫ বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তাহার ফলে ১০ লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়।

১৮২৬ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে ২ বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে ৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়।

১৮৫১ হইতে ১৮৭৫ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে ৬ বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে ৫০ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

ইহার পর ১৮৭৬—৭৮ খৃষ্টাব্দে ১ কোটী, ১৩ লক্ষ, ২০ হাজার লোকের জীবন নষ্ট হয়।

৩ বৎসর ১,১৩,২০,০০০ লোকের মৃত্যু হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের হৃদয় কম্পিত হয়। সুতরাং দুর্ভিক্ষ দমনের উপায় উদ্ভাবন করা শ্রেয় মনে করেন।

দুর্ভিক্ষের কারণ নির্দ্ধারণ এবং পুনরাক্রমণ নিবারণ মানসে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৮ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশন বসাইয়াছিলেন। কমিশনারগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কৃষিবিভাগ স্থাপন করিতে গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেন। তাঁহারা স্পষ্ট বলেন যে কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী ভারতবর্ষীয় লোকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত হইবে। ইহার ফলে ভারতবর্ষীয় কয়েকজন শিক্ষিত যুবককে কৃষিশিক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক কৃষিবিভাগসমূহ স্থাপিত হয়। প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগের কর্ত্তা একজন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তাহার পদের নাম কৃষিডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর। তাহার অধীনে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় অম্বিকা চরণ সেন, তৎপরে স্বর্গীয় সখায়েৎ হোসেন, নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। তৎকালে বঙ্গদেশে ৫০ বা ৬০ হাজারের অধিক টাকা খরচ হইত না। সহকারীগণ কৃষি উন্নতিকল্পে অতি যৎসামান্য টাকা পাইতেন। তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আর কোন নিম্নস্থ কর্ম্মচারী ছিল না :—

সুতরাং প্রজাদের মধ্যে কৃষিবিদ্যা শিক্ষাদানে তাহারা বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।—তাঁহারা শিবপুর ও বর্দ্ধমানে সামান্য রকমের কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া কিছু কিছু তত্ত্বানুসন্ধান করেন।

কৃষি-কমিশন স্থাপনের পর ১৮৮৪ সালে ৭॥০ লক্ষ, ১৮৮৮—৮৯ সালে ১৫ লক্ষ, ১৮৯১ সালে ৪ লক্ষ ২০ হাজার, ১৮৯২ সালে ১২ লক্ষ, ১৮৯৫ সালে ১২ লক্ষ, ১৮৯৬

১৮ লক্ষ, ১৮৯৭ সালে ২৬৷৷ লক্ষ, ১৮৯৯—১৯০০ সালে ২৫ লক্ষ, ১৯০১ সালে ৭৷৷ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। লর্ড কর্জ্জন এই ভীষণ মৃত্যুসংবাদে চমকিত হন।

তিনি কৃষির উন্নতিকল্পে অনেকটা মনোযোগী হন। আশা করা গিয়াছিল যে এইবার কৃষি উন্নতির যথেষ্ট ব্যবস্থা হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষিবিভাগে "ইম্পিরিয়াল" নামক উচ্চ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য যে ভারতবাসীর ইহাতে স্থান হইল না। কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিলেন যে ভারতবাসীগণ শাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ অক্ষম। ইম্পিরিয়াল কর্ম্মচারীগণ এই ১২ বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া বিশেষ কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালী সহকারীগণ যে দুই একটী পরীক্ষালব্ধ ফল প্রকাশ করিয়াছিলেন এখনও আমরা তাহাই শুনি। প্রজাদের মধ্যে এই ফল প্রচারের যথেষ্ট ব্যবস্থা এখনও হইতেছে না। পরন্তু ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ প্রজাদের সহিত মিশিতে পারেন না। এদেশের কৃষকদের ভাষা, তাহাদের সংস্কার, তাহাদের কৃষিজ্ঞান কত এই সব প্রয়োজনীয় বিষয়ও তাঁহারা জানেন না। এমতাবস্থায় প্রজাদের কৃষি উন্নতিকল্পে ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ কোন ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অন্যপক্ষে তাহারা তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন কাজ করাও লজ্জাজনক বলিয়া মনে করেন। বলা বাহুল্য যে এই সব কারণে তাঁহাদের সহিত দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের—সদ্ভাব হয় না, প্রজাদিগের উন্নতি করিতে হইলে বাস্তবিক দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের উপর সম্পূর্ণ ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সার্ভিস্ কমিশনের মেম্বরগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে কৃষিবিভাগ সমূহ দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের হস্তেই দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যে অবিলম্বে শতকরা ৫০ জন দেশীয় লোক দিগকে উচ্চ পদে উন্নীত বা নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে বহুসংখ্যক বহুদর্শী কর্ম্মচারী কৃষিবিভাগে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগকে ডেপুটী ডাইরেক্টরের কাজ দিলে তাঁহারা সুচারুরূপে কৃষিবিভাগের কাজ নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।—ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের মতামত গ্রহণ করিতেছেন। যদি কমিশনের অনুরোধ উপেক্ষা করা হয় তবে ভারতবাসীদিগের ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। সত্যপ্রিয় পুনা কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ম্যান্ সর্ভিস কমিসনে সাক্ষী দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন যে কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীগণ প্রজাদের সহিত আপনার লোকের মত হইয়া না মিশিতে পারিলে কৃষিবিভাগ দ্বারা কোন উপকারই হইবে না। এই কাজের জন্য বিদেশী ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ম্যান সাহেব মহৎ ও সাধু ব্যক্তি। তাহা না হইলে এমন স্পষ্ট কথা আমরা শুনিতে পাইতাম না। অন্যান্য ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ সাক্ষী দিয়াছিলেন যে ভারত বাসীরা কখনও শাসন করিবার ক্ষমতা রাখে না সুতরাং ইম্পিরিয়াল নামক উচ্চপদ ইংরেজের জন্যই রাখিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট কমিশনের অনুরোধ কতটা রক্ষা করেন জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। আমরা শুনিতেছি যে "ইম্পিরিয়ালের"

ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ যাহাতে ভারতীয়গণ তাঁহাদের পদ না পাইতে পারে তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। সকল বিভাগেই "ইম্পিরিয়াল"" প্রভিন্সিয়াল" ও "সাবর্ডিনেট্" নামক কর্ম্মচারী শ্রেণী বিভাগ করাতে উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের মাথা বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের এই জাতিভেদ দূর না হইলে দেশের মঙ্গল হইবে না।

সঞ্জীবনী।

বারী হীন চাষ

কালে ইহার অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে এবং আমরা অনুসন্ধান সূচক অনেক পত্রাদি পাইতেছি। কোথায় কত পরিমাণ বারিপাত তাহা না জানিলে ইহার মিমাংশা হয় না বা সদুত্তর দেওয়া যায় না।

বারিপাতের বিষয় বিবেচনা করা যাউক। অনেক জমিতেই মোট জল প্রত্যহ কিছু কম হয় না। কিন্তু নানাপ্রকারে জল অপচয় হইয়া যায়। বস্তুত শৈত্য সংরক্ষণ দুই শ্রেণীর পরস্পর বিরোধী শক্তি সমষ্টির উপর নির্ভর করে। একদিকে জমি ও জলপ্রপাত অন্যদিকে উত্তাপ দ্বারা মৃত্তিকাস্থিত জল শোষণ ও বিকীরণ, মৃত্তিকার গভীরস্তরে জল প্রবেশ ও মৃত্তিকায় জল প্রবেশ না করিয়া উপর দিয়া জল বহিয়া যাওয়া। যদি এই তিনটি বিরোধী শক্তির ক্রিয়া কোন কর্ষণ প্রাণলী দ্বারা হ্রাস করিতে পারা যায় এবং তাহা যদি সুলভে সম্পাদিত হয় তাহা হইলেই বারিহীন চাব সফল হইতে পারে। আমাদের দেশে তত অধিক পরিমাণ জল মৃত্তিকার গভীরস্তরে চলিয়া যায় না। কিন্তু অন্য দুইটি কারণে জলের যথেষ্ট অপচয় হয়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সূর্য্যের উত্তাপ অধিক এবং বায়ুর প্রকোপও কম নহে। সুতরাং সেচন দ্বারা অনেক জল নষ্ট হইয়া যায়। অন্যদিকে এদেশে বর্ষাকালে যেরূপ ঝড়ের সহিত দমকা বৃষ্টি হয় তাহাতে অনেক জলই ক্ষেত্রের কোন কাজে না আসিয়া কেবল উপর দিয়া বহিয়া চলিয়া যায়। এরূপ স্থলে কেবল যে জল অপচয় হয় তাহা নহে, ক্ষেত্রের উপরিস্তরের উত্তম মৃত্তিকাও সঙ্গে সঙ্গে ধুইয়া বাহির হইয়া যায়। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বারিপাত হইলেই সূক্ষ্ম মৃত্তিকাকণা সমূহ একত্রিত হইয়া গিয়া এরূপ একটি স্তর গঠিত হইয়া যায় যে তাহার অভ্যন্তরে সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে সমতল ক্ষেত্রেও এইরূপে বারি অপচয়ের মাত্রা মোট জল প্রপাতের ৮০ ভাগের কম নহে। দমকা বৃষ্টিতে ফসলের যেমন সুবিধা হয় না সামান্য "ছিটে ফোঁটা" বৃষ্টিতেও সেইরূপ। এক

মাসে আধ ইঞ্চি করিয়া ৫।৭ বার জলপ্রপাত হইতে পারে কিন্তু উহাদের ব্যবধান যদি ঠিক না থাকে তাহা হইলে জল মৃত্তিকায় প্রবেশ না করিয়া উপর হইতেই তাপ দ্বারা শোষিত হইয়া যায়। এইরূপ বৃষ্টিতে উদ্ভিদ মৃত্তিকার অনতিনিম্নে মূল উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতে উহারা আর অনাবৃষ্টিসহ হইতে পারে না।

এই সমুদয় কারণে বারিহীন চাষের মুখ্য উদ্দেশ্য যত অধিক মাত্রায় সম্ভব বৃষ্টির জল মৃত্তিকার সংরক্ষণ করা। দুইটি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে প্রথমতঃ গভীর কর্ষণ ও দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মকালে চাষ। এই দুই প্রথারই আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে অনেক অনুমোদক আছে। উহাদের প্রত্যেকের উপযোগীতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া মোটের মাথায় ইহা বলিতে পারা যায় যে ভারতবর্ষে স্থান বিশেষে উভয় প্রথাই প্রযুক্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে মার্কিন প্রথাসমূহ প্রযুক্ত হইবার প্রধান অন্তরায় অবশ্য অর্থাভাব। জমিতে সমানভাবে চাষ দিতে হইলে এবং বৃষ্টি প্রপাত সংরক্ষিত করিতে হইলে উন্নত প্রণালীর কল কব্জা আবশ্যক। তৎ সমুদয়ের সাহায্য গ্রহণ করা দরিদ্র কৃষকের পক্ষে সম্ভব নহে।

তবে ইহাও স্থির যে আপাততঃ যে অত্যধিক পরিমাণ জমি অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে কোন প্রকার বারিহীন চাষের উদ্ভাবনা না করিলে সেগুলির কোন উদ্ধার হইবার আশা নাই। এ সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রম আছে। তন্মধ্যে অন্যতম এই যে কাঁদা দোঁয়াস ভিন্ন অন্য জমি বারিহীন চাষের উপযুক্ত নয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। নিম্নে ৭।৮ ফুট পর্য্যন্ত যে সমুদয় জমির গঠন প্রায় একরূপ, তৎসমুদয় কাদা বা কাদা দোঁয়াস বা বেলে, বেলে দোঁয়াস কিম্বা যাহাই হউক না কেন, যে সকল স্থলে বারিহীন চাষে উপকার দর্শে। কারণ এই সমস্ত জমিতে মাধ্যাকর্ষণ ও কৈশিল আকর্ষণের শক্তি সমানভাবে কাজ করে এবং উপরের জল নীচে যাইতে অথবা নীচের জল উপরে আসিতে কোন বাধা প্রাপ্ত হয় না। ভারতবর্ষে এরূপ গভীর জমি অপ্রতুল নহে।

বারিহীন চাষ দ্বারা কেহ যদি অধিক লাভের আশা করেন তাহা হইলে তিনি নিরাশ হইবেন। তবে ইহার ফল সামান্য হইলেও নিশ্চিত এবং দৈবের উপর নির্ভর করিয়া কিছু না পাওয়া অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বনে অপেক্ষাকৃত কম পাওয়াও যে অনেকাংশে শ্রেয়স্কর তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। এ সম্বন্ধে দিন দিন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে আমরা বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

লেবু রসের গুণ

কাগজী কিংবা পাতি লেবুর রস প্রত্যহ সৈন্ধব লবণ সংযোগে কিঞ্চিৎ গরমজলে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

পিত্তাধিক্য অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

পিত্তাধিক্যে কাশীর চিনির সহিত লেবুর রস ব্যবহার পরম হিতকারী।

লেবুর রসের সহিত মিছরির গুঁড়া মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে বমন ইচ্ছা প্রশমিত হয়।

জারক লেবু (লবণে জরাইয়া যাহা প্রস্তুত হয়) ব্যবহারে অরুচি সারিয়া যায় এবং আহারের শেষে ব্যবহারে ভুক্ত অন্ন শীঘ্র জীর্ণ হয়।

ভাতের সহিত লেবুর রস ব্যবহারে অরুচি সারিয়া যায়।

পাতি লেবুর শাঁস, পুরাতন ঘৃতের সংযোগে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া ভাল হয়।

ম্যালেরিয়া প্রধান দেশে প্রত্যহ লেবুরস ব্যবহার করিলে সহজে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না।

ফলকথা লেবুর রসে যকৃতের ক্রিয়ার সাহায্য হয়, কোষ্ঠ সাফ্ হয়, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু সরল হয়।

ইহার বাহ্য প্রয়োগে আবার মানবদেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়—

সামান্য পরিমাণ লেবুর রস জলসংযোগে বাহুলতা, ঘাড়ে মুখে মর্দ্দন করিলে শুদ্ধ যে রং ফর্সা হয়, তাহা নহে, ইহার দ্বারা চর্ম্ম কোমল হয়।

ম্যাগনেসিয়া এবং লেবুর রস একত্রে মিশাইয়া উত্তমরূপে ফোটাইয়া মুখে, হস্তে, হস্ততলে গ্রীবায় ব্যবহার করিলে নারীগণের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হয়, এমন কি কাল চামড়াও একটু ফর্সা হইয়া দাঁড়ায়। ইহা মুখ প্রভৃতি স্থানে লাগাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিয়া তাহার পর ধৌত করিয়া ফেলিতে হয়। ইহা দ্বারা মুখের ঘাড়ের কুঞ্চিত লোল মাংস বেশ সুডোল হয়।

নখের দাগ প্রভৃতি উপসর্গে এক চামচ লেবুর রস এক বাটী গরমজলে মিশাইয়া নখ এবং হস্ত ধৌত করিলে নখের দাগ নষ্ট হইয়া নখগুলি বড় সুন্দর হইবে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দেশে স্নানীয় জলে লেবুর রস মিশাইয়া স্নান করা একটী বিশেষ আনন্দদায়ক ভোগসুখের মধ্যে গণ্য। ইহারা স্নানীয় জলে কতকগুলি লেবুকে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার পর অর্দ্ধঘণ্টা পরে লেবুর রসকে কচলাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নান করিয়া থাকে।

মুখ ধুইবার সময় জলে লেবুর রস দিয়া ধাবন করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, এবং ইহাতে দন্ত ও মুখরোগ নিবারিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। ইহা দ্বারা দন্তের মূলে যে

Tarter বা এক প্রকার চুণের মত দ্রব্য জমিয়া দাঁত আলগা করে; তাহা জন্মিতে পারে না।

স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়তা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা ব্যতীত বস্ত্রাদিতে দাগ লাগিলে বা হস্তে কোন প্রকার রঙ্গের দাগ লাগিলে লেবুর রস এবং একটু সামান্য মাত্র লবন একত্রে মিশাইয়া দাগের উপর মর্দ্দন করিয়া ধৌত করিলে তাহা অনায়াসে উঠিয়া যায়।

লেবুর এতগুলি প্রয়োজনীয় গুণ আছে, পাঠকগণ পরীক্ষা করিলে ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবেন। বিজ্ঞান।

ইন্দ্রশালীধান।—ইহা বিগত বর্ষে অনেক চাষীগণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। অনেক চাষী বলিতেছে যে অনেকের ক্ষেতে ঐধান ভালরূপ জন্মায় নাই ও বীজ ভালরূপ অঙ্কুরিত হয় নাই। ইহা বীজের দোষ, কিম্বা জমীর দোষ, অথবা চাষের দোষ অনুসন্ধান আবশ্যক। যদি বীজ খারাপ হয় তবে তাহার জন্য দায়ী কে?

মিষ্টার ফিনালো কৃষকদিগের অভিযোগের উত্তরে বলিয়া দিয়াছেন, "এই অভিযোগের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই ধান্য বিশেষরূপে পরীক্ষা করায় দেখা গিয়াছে যে, এই ধান্যের উপরের আবরণ (খোসা) একটু পাতলা এইজন্য অঙ্কুরিত হইবার সময় অন্যান্য অপেক্ষা একটু বেশী সতর্ক হওয়া দরকার।" ধান্যের খোসা পুরু কি পাতলা, সে কথাটা জাতিনির্ব্বাচনের পূর্ব্বে জাতিবিচারকালেই নির্দ্ধারিত করাই কর্ত্তব্য ছিল।

যদি বীজ এত সহজে খারাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে তাহা লইয়াচাষীরা কি প্রকারে ব্যবহার করিতে পারিবে এবং তাহার চাষে ধানের ফলন বাড়াইবে। অনেক সময় সকল দিক না দেখিয়া ধান, পাট বা অন্য শস্যের কোন একটা নূতন বীজ চাষীদের সমক্ষে উপস্থিত করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

এস্থলে প্রথম বক্তব্য—কৃষি-বিভাগ যে ফলনের আধিক্য দেখাইয়াছেন, তাহা ঢাকা কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রের মৃত্তিকা জল-বায়ুর সহিত সম গুণ-বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই সম্ভব। তাবতম্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির গুণের ও ফলনের তারতম্য হয়। দ্বিতীয় বক্তব্য—এরূপ পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বীজের ফলনের ওজনের তারতম্য বুঝা যাইতে পারে—মূল্যের যথার্থ প্রভেদ কত, তাহা বুঝা যায় না। কেন না, মোটা ইন্দ্রশাইল ধানের দাম এক নহে। আবার এ ক্ষেত্রে দাদখানির ফলন যত কম দেখান হইয়াছে, সর্ব্বদা তেমন শুনা যায় না। সম্ভবতঃ ঢাকা পরিক্ষা-ক্ষেত্রের জমী ইন্দ্রশাইলের উপযুক্ত হইলেও দাদখানির বা তদনুরূপ সরু ধানের উপযোগী নহে এই সকল বিশেষরূপ বিচার আবশ্যক।

কাকিয়া বোম্বাই পাট—ইহারও ফলন যদি অন্যান্য জাতীয় পাটের ফলন অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে, তাহাতেই ইহার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হয় না। দাম খতাইয়া তুলনায় যতক্ষণ ইহার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন না হইতেছে, ততক্ষণ সবই কথার কথা। বাজারে এই পাটের আদর কিরূপ হইয়াছে বা হইতে পারে এবং ইহা কি দরে বিকাইতে পারে, সরকারী রিপোর্টে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কাজেই রিপোর্ট ছাড়িয়া আমাদিগকে স্বাধীনভাবে একটু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। সেই অনুসন্ধান ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি, কাকীয়া বোম্বাই পাট ভাল জাতীয় পাটের কাছে দাঁড়াইতে পারে না; তাহার প্রধান কারণ, ইহার গোছার সকল আঁশ সমান লম্বা নহে—কতকগুলি অত্যন্ত ছোট। সেইজন্য বাজারে ইহার দাম কম হয়। পাটের গোছায় আঁশ ছোট বড় হইলে সে পাট ছোট আঁশের দরেই বিকায়। ইহাই বাজারের যাচনদারদিগের কথা। পাটের গাছ যদি শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হয়, তবে পাট কাচিবার সময় গাঁইটের কাছে আঁশ ছিঁড়িয়া যায়, তাহাতে আঁশ ছোট বড় হয় এবং পাটের দর কম হয়। সুতরাং কেবল ফলন দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না, বাজারে ইহার যাচাই ও মূল্য নির্দ্ধারণ আবশ্যক।

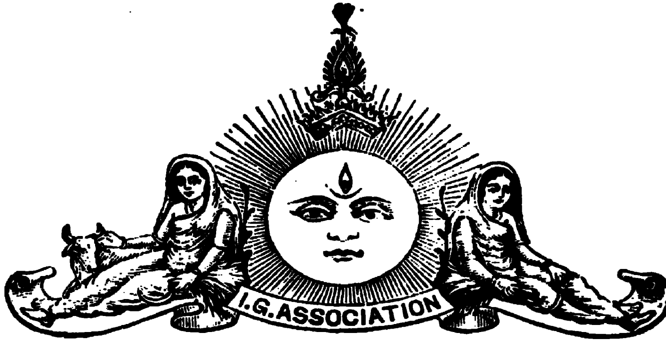
অট্টালিকা নির্ম্মাণে কাষ্ঠের অপচয়ের কারণ—ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার নামক একখানি পত্রিকায় এই অপচয়ের কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ জানা থাকিলে অনেক সময় অপচয় নষ্ট করা সম্ভব। এইজন্য নিম্নে তাহার অনুবাদ দেওয়া হইল:—(১) যে সমস্ত কাষ্ঠ সহজে নষ্ট হইয়া যায় এরূপ কাষ্ঠ ভিত্তিতে স্থাপন করা, অথবা কাষ্ঠকে একেবারে মৃত্তিকায় সংলগ্ন করিয়া রাখা; (২) গুঁড়ি রীতিমত বদ্ধ না করিয়া ইষ্টক বা কঙ্কটের উপর স্থাপন করা; (৩) ভিজা বা কাঁচা অবস্থায় অনুত্তপ্ত গাঁথুনিতে ল্যামিনেটেড মেঝেম করা; (৪) গার্ডার খুঁটী অথবা ল্যামিনেটেড মেঝে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই প্লাষ্টার বা ঐরূপ কোন পদার্থ প্রয়োগ করা; (৫) পাকা কাঠ সিজন্‌ড হইবার পূর্ব্বেই ব্যবহার করা; (৬) যে সমস্ত গৃহ বা অট্টালিকা স্বভাবতঃই আদ্র্র হইয়া উঠে বা কার্য্যের জন্য আদ্র্র করিতে হয় সেই সমস্ত গৃহে শুষ্ক এবং সিজন্‌ড কাঠ ব্যবহার না করা; অথবা কাঠ আদৌ শক্ত না হওয়া; (৭) বহুকাল ধরিয়া কাষ্ঠ অযত্নে রাখিবার পর ব্যবহার করা এবং অযত্নের কালে কাঠের কীটাক্রান্ত হওয়া। এইগুলি অপচয়ের প্রধান কারণ। বিজ্ঞান।

রবারের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য সামগ্রী—জারমাণীতে রবারের অপ্রতুলতা বশতঃ গাড়ী বা বাইসিকেলের চাকার রবারের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে, তজ্জন্য নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। প্রথমে ইস্পাতের তারের কুণ্ডলী গাড়ীর চাকায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই তারের স্থূলতা $\frac{1}{25}$ ইঃ; ১২ মার্ক

প্রায় ১০্ টাকা মূল্যে ইহা পাইকেরী বিক্রীত হইত। প্রথমতঃ মূল্য অত্যধিক, দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা রাস্তা খারাপ হইত, তৃতীয়তঃ ইহার শব্দ এত বেশী যে, লোকে কিছুতেই ইহা ব্যবহার করিতে পারিত না, অতএব ইহা পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর কাঠ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কাঠের নানারূপ টায়ার নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু কেনটাই কার্য্যকর হয় নাই। প্রথমতঃ অত্যধিক ব্যয় হয় এবং সেরূপ মজবুত হয় না অতঃপর চামড়া এবং ক্যাম্বিসের টায়ার নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার ব্যবহার না কি অনেকটা সুবিধা-জনক এবং ইহাতে ব্যয়ও অত্যধিক নহে। অথবা ব্যয়ের তুলনায় এরূপ টায়ার বেশ মজবুত। যাহাই হউক জার্ম্মানি পরমুখাপেক্ষিতা নষ্ট করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছে তাহা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। বিজ্ঞান।

স্পেন দেশীয় নূতন ইন্ধন।—স্পেনদেশে ইন্ধনের অত্যন্ত অভাব। এইজন্য স্পেনকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পাথুরিয়া কয়লার পরিবর্ত্তে কোন্ দ্রব্য সুবিধামত ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা লইয়া লোকে নানারূপ পরীক্ষা করিতেছে। স্পেনে প্রচুর ধান জন্মে। ধান্যের তুষ ইন্ধনরূপে ব্যবহারে চেষ্টা চলিতেছে। যে যে স্থানে চাউলের কল আছে, সেই সেই স্থানে তুষের অগ্নি দ্বারা কল চালানও হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে সকলেই অবগত আছেন যে তুষকে একবারে দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত একরূপ অসম্ভব। এইজন্য তুষের অনেক দাহ্য পদার্থ বৃথা নষ্ট হয়। এক্ষণে যাহাতে তুষ রীতিমত দগ্ধ হয় তাহা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আলকাতরার সহিত তুষ রীতিমত মিশ্রিত করিয়া সেই তুষকে হাইড্রলিক যন্ত্রের চাপে পিষ্টক আকারে পরিণত করিয়া ইন্ধনরূপে ব্যবহারের চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে তুষ সম্পূর্ণ দগ্ধ হইবে ও তুষের দ্বারা প্রচুর উত্তাপ পাওয়া যাইবে। এক এক বস্তা তুষের দাম ।৹ আনা। বিজ্ঞান।

গাছের পচা শিকড় হইতে বস্ত্র।—সুইডেনে Tegeaus নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার পচা গাছের শিকড় (Peat) হইতে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া ঐ সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিতে-ছিলেন এবং সূতা প্রস্তুতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পড়তা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ঐ সূতার বস্ত্রের চলতির পক্ষে অন্তরায় ছিল। যুদ্ধের দরুণ তিনি আবার নূতন উদ্যমে লাগিয়া উহা সস্তায় প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ পিটের তৈয়ারী বস্ত্র কৃত্রিম পসমী কাপড় অপেক্ষা কিছু সস্তা পড়ে এবং উহা অনেক দিন স্থায়ীও হয়। এই সূতার আবিষ্কারক স্বয়ং ও আরও কয়েকজন লোক উহার প্রস্তুত পোষাক ব্যবহার করিতেছেন। নূতন আবিষ্কৃত প্রণালীতে পিঠ হইতে সূতা ও তাহা হইতে কাপড় প্রস্তুতের জন্য শীঘ্রই একটা কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিজ্ঞান।



আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩২৪ সাল।

ভারতীয় শর্করার নব প্রতিদ্বন্দী

এতদ্দেশে উৎপাদিত চিনি যে দেশের অভাব সংকুলান করিতে পারে না এবং বিদেশ হইতে চিনি আমদানির আবশ্যক হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বিদেশে যেরূপ উন্নত প্রথায় বীট অথবা ইক্ষু চাষ হয় এবং যেরূপ আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রথায় শর্করা প্রস্তুত হয় ও এই সমুদয় কারণে বিদেশীয় চিনি যেরূপ সুলভ হয়, এতদ্দেশে সেরূপ হয় না। ভারতে সুবিস্তৃত ইক্ষু চাষ থাকিলেও ভারত সেইজন্য বিদেশীয় চিনির প্রতিদ্বন্দীতায় বাজার দাঁড়াইতে পারে না।

বর্ত্তমান মহাসমরের পূর্ব্বে জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারি, বীট শর্করা এতদ্দেশে চালান দেওয়ায় ভারতীয় শর্করা ব্যবসায়ের যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিযোগীতা তিরোহিত হইয়াছে কিন্তু এখনও ভারতীয় শর্করা ব্যবসায়ী বিদেশীয়ের হাত এড়াইতে পারে নাই। বিগত কয়েক বৎসরের চিনির আমদানির হিসাব দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। জর্ম্মণি অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারি ব্যতীত যব ও মরিচ দ্বীপ হইতে ইক্ষু শর্করা ভারতে আমদানি হইত। ১৯১৩-১৪ সালে যবদ্বীপ ৫৮২,৯৮৫ ও মরিচ দ্বীপ ১৩৯,৫৬৮ টন চিনি ভারতে চালান দেয়। ১৯১৪-১৫ সালে উক্ত দেশদ্বয়ের চালানের পরিমাণ যথাক্রমে ৩১৬,৭৪৮ ও ৮১, ৭১৮ টন হয়। তৎপর বৎসর মরিচ দ্বীপের চিনি অন্য বাজারে যাওয়ায় ভারতে আমদানির মাত্রা কমিয়া গিয়া ৬৯,৪১৮ টনে দাঁড়ায় এবং যবদ্বীপের চিনির আমদানি কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৪১৫,০১৭ টন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই তিন বৎসরে যব ও মরিচ দ্বীপের চিনি মোটের মাথায় কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আর একটি শর্করা

ব্যবসায়ীর চালান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে—তাহা জাপান। ভারতের বাজার অপরাপর বিষয়ের ন্যায় চিনি সম্বন্ধেও ক্রমশঃ জাপানের হস্তগত হইয়া পড়িতেছে। ১৯১৩-১৪ সালে অতি সামান্য মাত্রায়ই জাপানী চিনি এতদ্দেশে আসিয়াছিল অর্থাৎ ১৩১ টন। তৎপর উহার মাত্রা ৭০৪ টন হয় আবার ১৯১৫-১৬ সালে জাপানী চিনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১১,৫০৭ টনে দাঁড়াইয়াছে। তিন বৎসরে ১৩১ টন হইতে ১১,৫০৭ টন সামান্য ব্যাপার নহে। এই অনুপাতে জাপানি চিনির আমদানি বৃদ্ধি হইতে থাকিলে দশ বৎসরে ভারতের বাজারে যে উহা প্রবল প্রাধান্য লাভ করিবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

এইরূপ প্রাধান্য লাভ করা যে জাপানের আন্তরিক ইচ্ছা তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদ হইতে বিষদরূপে বুঝিতে পারা যায়। বিলাতের "ষ্টাটিষ্ট" নামক সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী পত্রে প্রকাশ যে একটি জাপানি কোম্পানি ৬০ লক্ষ ইয়েন (১ ইয়েন—প্রায় ১॥০ টাকা) মূলধন লইয়া যব দ্বীপে চিনির কারখানা খুলিতেছেন। ২৪০০০ বিঘা জমি ৭৫ বৎসরের জমায় লইয়া এই কারখানার জন্য আবশ্যকীয় ইক্ষু উৎপাদিত হইবে। বলা বাহুল্য যে, কারখানায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চিনি প্রস্তুত হইবে। জাপানীরা কোন বিষয়ে অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। সেইজন্য চিনির রপ্তানি ব্যবসায়ে যাহাতে কোনরূপ ভবিষ্যৎ অসুবিধা না ঘটে, তাহারও ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি নূতন ষ্টীমার লাইন খুলিবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহাতে প্রস্তুতীকৃত মাল চালান দেওয়ার জন্য আর অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। যবদ্বীপ বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর একটি প্রধান ইক্ষু উৎপাদন কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ স্থানে নিজেদের মূলধনে এবং আয়ত্তে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ উদীয়মান জাপানী জাতির উপযুক্ত কার্য্যই বটে। কিন্তু ইহাতে ভারতের শর্করা ব্যবসায়ের ক্ষতির যে সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে ২৬,৩৬,০০০ টন শর্করা উৎপাদিত হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা ইক্ষুর জমির পরিমাণ শতকরা তিন গুণ এবং উৎপাদনের হার শতকরা ৭ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্থলে গড়ে একর প্রতি ১৯ হন্দর গুড় হইত এমন যে স্থলে ২২ হন্দর গুড় হয়। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশেও প্রায় লক্ষ মণ তাল ও খেজুর গুড় জন্মিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় চিনির মহার্ঘতা ও কতিপয় দেশ হইতে আমদানি বন্ধ থাকিবার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এক রকম ব্যবসা চালাইতে পারিতেছেন বটে ; কিন্তু যুদ্ধান্তে, কি উৎপাদনের পরিমাণ, কি দরের সুলভতায় কোন দিকেই ভারতীয় চিনির মহাজনেরা, বিদেশীয় মহাজনগণের সহিত প্রতিযোগীতা করিয়া উঠিতে পারিবেন তাহা বোধ হয় না। শর্করা ব্যবসায়ে আমাদের প্রধান সমস্যা শুধু ইক্ষু চাষের পরিসর বৃদ্ধি নহে ; উৎপাদনের মাত্রা অধিক হওয়াও একান্ত আবশ্যক। আবার উৎপাদনের মাত্রা অধিক করিতে হইলে উৎকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষু চাই।

কইম্বাটোর, সাজাহানপুর এবং বিহারের স্থানে স্থানে উন্নত জাতি ইক্ষু জননের ব্যবস্থা কয়েক বৎসর হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক ব্যক্তি পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে নাই এবং যেগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে সেগুলিরও বীজ অথবা ডগা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানা স্থানে প্রবর্ত্তিত হইতেছে না। যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ প্রবল বেগে বিদেশীয় দ্রব্যভার ভারতে আসিয়া পড়িতেছে, সেই অনুপাতে দেশকে স্বাবলম্বন পরায়ণ করিবার চেষ্টা হইতেছে না।

এখন হইতে উপযুক্ত কারখানাদি প্রস্তুত, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইক্ষু চাষ, যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন প্রভৃতি কার্য্যে মনঃসংযোগ না করিলে জাপান ও যবদ্বীপের ন্যায় প্রবল প্রতিদ্বন্দীগণের সহিত সমকক্ষতা লাভ করা কঠিন হইয়া পড়িবে। রাজসরকার ইক্ষু চাষের উন্নতি কল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয় শর্করা ব্যবসায়ের শৈশবাবস্থায় আরও কিছু সাহায্য আবশ্যক। ইক্ষু উৎপাদন যোগ্য খাস সরকারী জমি কম জমায় দেওয়া, সরকারী অভিজ্ঞগণের দ্বারা কল কব্জাদি ব্যবহারে শিক্ষা দেওয়া, রেল প্রভৃতিতে দেশীয় চিনি অল্প ভাড়ায় চালান দেওয়ার সুযোগ প্রদান করা—শর্করা ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে এই সমুদয় বিষয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষগণের আলোচনা যোগ্য। এতদ্ভিন্ন সকল স্বাধীন দেশেই কোন নূতন ব্যবসায়কে রক্ষা করিবার জন্য সমশ্রেণীয় বিদেশীয় পণ্যের উপর শুল্ক বসাইবার রীতি আছে। ভারতের চিনির ব্যবসায়ের হিতার্থে সেরূপ কোন ব্যবস্থা না হওয়ারও কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্ততঃ মহাজন সভা সমূহ এ বিষয়ে আন্দোলনও করিতে পারেন।

বর্ত্তমান বৎসরে জল হাওয়ার বিশেষত্ব

বিগত বৎসর হইতে বৃষ্টির মাত্রা যে কিছু অধিক হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কলিকাতায় এ বৎসর ত এক রকম বৃষ্টির বিরাম নাই বলিলেই হয়। কিন্তু শুধু কলিকাতায় যে এই প্রকার হইতেছে তাহা নহে, ভারতের অধিকাংশ স্থল হইতেই বারিপাতের আধিক্যের খবর পাওয়া যাইতেছে। সরকারী ব্যোমতত্ব (meteorological Department) বিভাগের বিবরণী প্রভৃতি পাঠেও ইহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়।

জ্যৈষ্ঠের মধ্য হইতে আশ্বিনের মধ্য পর্য্যন্ত এতদ্দেশে বর্ষার সময়। এই সময়েই মনসুন হাওয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। এ বৎসরও মনসুন ঠিক সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এত অধিক বারিপাত অন্য কোন বৎসরেই হয় নাই। গড়পড়তায় প্রতি

বৎসর যে পরিমাণ বারিপাত হয় এ বৎসর তদপেক্ষা ৬৪ ইঞ্চি অধিক বারিপাত হইয়াছে, অর্থাৎ উহার মাত্রা প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ অধিক। বিগত বৎসরও ৫ ইঞ্চি অধিক বারিপাত হইয়াছিল। সুতরাং আধিক্যের হিসাবে এই দুই বৎসরের সমতুল্য বৎসর আর দেখা যায় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আরব উপকূল হইতে ভারতের পশ্চিম তটে এবার মনসুন ঠিক সময়েই আসিয়াছিল এবং নিরন্তর ক্ষিপ্রতার সহিত মধ্যদেশ সমূহে প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গ উপসাগরের বায়ুস্রোত উত্তর পূর্ব্ব ভারতে স্বাভাবিক সময়ের প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এবার দেখা দিয়াছিল। ইহার ফলে পঞ্চনদে ও যুক্ত প্রদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে জুন মাসের প্রথমেই বর্ষা আরম্ভ হইয়া যায়, সাধারণতঃ এই সমুদয় দেশে জুন মাসের শেষেই বর্ষা আরম্ভ হয়। সুতরাং এবার বর্ষা বিশেষ জলদি বলিতে হইবে।

জুন হইতেই যে বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মাঝে ২।৩ বার অবসর ব্যতীত প্রায় সমভাবেই চলিয়াছে। অবশ্য দেশ বিশেষে কিছু কম বেশীও হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে তুমুল বাতাস ব্যতীতও আসাম যুক্ত প্রদেশ, পূর্ব্ব রাজপুতনা ও মধ্যভারতে অত্যধিক বারিপাত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ সমুদয় স্থান ভিন্ন ভারতের অধিকাংশ স্থলে ও উত্তর পশ্চিম ভারতে তত অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই।

আগষ্ট মাসে মনসুনের কিছু পরিবর্ত্তন হয়। এই মাসেই দেশ মধ্যে শতকরা ১৩ ভাগ অধিক বারিপাত হয়। ভারতের মধ্যাংশে এই সময় প্রায় ২ সপ্তাহের জন্য বৃষ্টি কিছু কম ছিল উত্তর ভারতে বারিপাতের আদৌ বিরাম ছিল না। ইহার ফলেই পাটনা ও গয়া জেলায় প্রবল বন্যা উপস্থিত হয়।

সেপ্টেম্বরে আবার দ্বিগুণ বেগে বর্ষা আরম্ভ হয়। কোন স্থানেই এই বৃষ্টির মাত্রা কম হয় নাই। বস্তুতঃ এই মাসে শতকরা ৫৩ ভাগ অধিক বারিপাত হয়। এইরূপ বারিপাত এতদ্দেশে আর কখন লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই সময় উত্তর পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হয়।

মোটের মাথায় দেখিতে পাওা যায় যে এবারের বর্ষায় পঞ্জাবে সর্ব্বাধিক (১৫ ইঞ্চি) ও তন্নিম্নে রাজপুতনা, মধ্য ভারত ও হায়দ্রাবাদে বারিপাত হইয়াছে। দক্ষিণব্রহ্ম, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, বেরার ও বোম্বায়ের কোন কোন স্থলে সামান্য কম হইলেও তাহা গণনার মধ্যে আসে না। কেবল বিহারের দুই এক স্থানেই কিছু কম বারিপাত হইয়াছে। বস্তুতঃ এবারের বর্ষা সর্ব্বপ্রকারেই অসাধারণ। উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ভারতে ত এরূপ বৃষ্টি কখনই হয় নাই। তদ্ভিন্ন ব্যোমতত্ত্ব বিষয়ক সম্পূর্ণ অঙ্কাদি প্রকাশিত হইলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ভারতের অকিাংশ স্থলেই এরূপ বারিপাত বহু কাল দেখা যায় নাই।

ধান্যের ইতিহাস—ইউরোপ খণ্ডে আরবগণই প্রথমতঃ ধান্য চাষের প্রবর্ত্তন করে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে স্পেন দেশে ধান্য চাষের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার বহু পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীতে ধান্য চাষ আরম্ভ হয়। ১৭০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে আমেরিকায় ধান্য চাষের উল্লেখ দেখা যায় না কিন্তু এই সময়ে যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণাংশে, বিশেষতঃ কেরোলিনা প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণ ধান্য উৎপাদিত হইত। পুরাতন জাতি সমূহের মধ্যে মিশরীয়, গ্রীক, রোমান অথবা পারসীকগণের মধ্যে ধান্য চাষ ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমান সমর ভূমি মেসোপটিমিয়া ও পুরাতন সিরিয়া দেশে ইউফ্রেটিস্ তটে ধান্য চাষের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্ ডি, ক্যাণ্ডোলের মত চীন দেশেই ধান্যের আদিম চাষ। খৃঃ পূর্ব্ব ২৮০০ অব্দে চীন সম্রাট চিন্নুং ধান্য বপন কালীন একটি উৎসবের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার পরে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত উক্ত উৎসব চলিয়া আসিতেছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশে ধান্য একটি প্রধান খাদ্য শস্যরূপে পরিণত হয়। বর্ত্তমান জগতেও ইহা খাদ্য শস্য হিসাবে অন্য কাহারও নিম্নস্থান অধিকার করে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে কৃষকের প্রকাশিত ধান্য সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধে ধান্যের ইতিহাস বিষয়ক আরও কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছে। চাউল অবশ্য পূর্ণ খাদ্য নহে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে শরীর পুষ্টির জন্য ভাতের সহিত ডাল, মাছ, ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস ডিম অথবা ঐ প্রকারের কোন প্রোটিড্ প্রধান উপকরণের আবশ্যক হয়। পক্ষান্তরে ভাতের ন্যায় কোন খাদ্যই এত সহজে হজম হয় না।

নেবুর চাষ—আমাদিগের দেশে নেবুর চাষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশ মধ্যে বন্য ও অর্দ্ধ বন্য নেবুর অভাব নাই এবং অনেক স্থানেই সুবিস্তৃত নেবু ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার কোন চেষ্টাই নাই। পক্ষান্তরে আমেরিকায় নেবুর চাষ অধিক দিনের নহে, কিন্তু ইতি মধ্যেই ইহা একটি বিপুল ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। ইহাতেও মার্কিনবাসীগণ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের আবেদন করিয়াছিলেন যে নেবু হইতে উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। ফলে লস্ এঞ্জেলেস্ নামক স্থানে নেবুর জন্য একটি স্বতন্ত্র উপ বিভাগ খোলা হইয়াছে। নেবু হইতে প্রস্তুত সাইট্রিক আসিড, সাইট্রেট অব্ লাইম, লঘু তৈল, শুষ্ক ও সংরক্ষিত নেবুর খোসা, নেবুর আরক, ঘণীভূত নেবুরস প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের প্রসার যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তজ্জন্য উক্ত উপবিভাগ হইতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। দুঃখের বিষয় যে এই সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত সহজসাধ্য হইলেও আমাদিগের দেশে এ পর্য্যন্ত এই দিকে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই।

পত্র হরিৎ—উদ্ভিদাদির সবুজ বর্ণের কারণ পত্রে ও উদ্ভিদের অন্যান্য অংশে পত্র হরিৎ নামক বিশেষ পদার্থের অবস্থিতি। রং করিবার জন্য পত্র হরিৎ নানাবিধ ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জন্য বিশেষ বিশেষ রকমের পত্র হরিৎ বিক্রয় হয়—কোনটি সুরাসারে, কোনটি তৈলে ও কোনটি জলে দ্রবনীয়। ইহা প্রস্তুতের জন্য পত্রকে কোন ক্ষার কার্ব্বনেটের সহিত মিশ্রিত করা হয়; তৎপরে উহা সুরাসারের সহিত চোলাই করিলে সুরাসার বহির্গত হইয়া গিয়া এক প্রকার সবুজ বর্ণ আঠা আঠা পদার্থ থাকিয়া যায়। ইহাই ব্যবসায়ের পত্র হরিৎ। পত্র হরিৎ প্রস্তুতের ব্যবসা এতদ্দেশেও সহজে হইতে পারে। ইহা প্রস্তুতের জন্য নানা প্রকারের ঘাস, শন ও বেগুণ জাতীয় গাছই প্রস্তুত।

দানবীর টাটা স্থাপিত বিজ্ঞান মন্দির—মহিশুররাজ্যে বঙ্গালোর নগরে এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাই নিবাসী জেমসেট্জী নসের ওয়ানজী টাটা মহোদয় উক্ত বিজ্ঞানালয়ে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার জন্য ১,২৫,০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান মন্দিরের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। মহিশুর গভর্ণমেণ্টও উক্ত দেশে সাহায্য করিতেছেন। এক্ষণে এই বিজ্ঞানালয়ের মোট আয় ২॥০ লক্ষ টাকা। ব্যয়ও প্রায় তদ্রূপ।

এই বিদ্যামন্দিরের শিক্ষানীয় বিষয় ৩টী—রসায়নতত্ত্ব (General and Organic Chemistry; ব্যবহারিক রসায়ন (Applied Chemistry) এবং তড়িততত্ত্ব (Electro Technology) এই তিন বিভাগে ৪০ হইতে ৫০ হাজার টাকা বৎসরে ব্যয় হয়। পুস্তকাগারের খরচ ১৫০০০ টাকা।

বর্ত্তমান সময়ে ত্রিশ জন ছাত্র কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ১৪ জন তড়িততত্ত্ব লইয়া আলেচনা করিতেছেন, বাকী ১৬ জনের আলোচ্য বিষয় রসায়নতত্ত্ব। ইহাঁদের মধ্যে মহিশুর ও নিজাম গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত লোকও আছেন। মহিশুর গভর্ণমেণ্ট ছাত্রেরা চন্দন তৈল ও স্থানীয় আটাল মাটি লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। হাইদ্রাবাদের ছাত্রগণের পরীক্ষা বিষয় মহুয়া মদ।

এতদ্‌সংলগ্ন কয়েকটি যন্ত্রাগার (Laboratories) আছে। সেখানে যে কেহ যাইয়া বিনা খরচে যে কোন বিষয় পরীক্ষাদি করিতে পারেন। বিগতবর্ষে ৬৭ জন ছাত্র যন্ত্রাগারে নানা বিষয়ের পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিল।

এই বিদ্যামন্দিরে উচ্চ অঙ্গের রসায়ন তত্ত্ব শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত আছে।

ব্যবসায়ের উন্নতি জন্য যে প্রকার ব্যবহারিক রসায়ন শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছে তাহার অভাব পূরণের যথোচিত চেষ্টা হইয়াছে। গালা, সাবান, রঞ্জনের (dyes) ও চর্ম্মাদি পরিষ্করণের উপাদান (Tanning materials) ম্যাগ্নেসিয়া, ইথার, ক্লোরোফরম প্রভৃতি উৎপাদনের উপায় চিন্তা করা হইতেছে। আহার্য্য তৈল ও চর্ব্বি, এসেন্সিয়াল তৈল সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলিতেছে। দৈবানুগ্রহে কার্য্য ঠিক মত চলিলে ভবিষ্যতে প্রভূত উপকারের সম্ভাবনা। কারণ, ভারতে এমন কোন অকেজো জন্তু, উদ্ভিদ কিম্বা খনিজ পদার্থ নাই যে যাহা লইয়া আলোচনা করিলে কোন না কোন ফল হইবেই। আশাকরা যায় মহাত্মা টাটা বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

তুলা বীজ ও তুলা বীজের খৈল—ভারতে তুলার চাষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এমেরিকা যুক্ত প্রদেশে সমধিক মাত্রায় তুলার আবাদ হয়। তাহার পরই ভারতের তুলার আবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রেটব্রিটনে যাহা কিছু তুলার আবশ্যক হয় তাহা ভারত এবং ইজিপ্ট হইতেই সরবরাহ হয়। কিন্তু তুলার ব্যবসায়ে এমেরিকাবাসী প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে ভারতের ভাগ্যে তাদৃশ লাভ সম্ভব নহে কি?

ভারতের তুলা বীজ কোন কাজে লাগান হয় ইহা বিচার করিয়া দেখিলেই উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা আপনা হইতেই হইবে। ভারতে বৎসরে ১৬,০০,০০০ টন তুলা বীজ উৎপন্ন হয়। ইহার দশমাংশ বীজ না হয় চাষের জন্য আবশ্যক হয়, আর কম বেশী ২॥০ লক্ষ টন য়ুরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে। তাহা হইলে ১২ লক্ষ টন ভারতে থাকিয়া যায়। ইহা যে কি প্রকারে ব্যবহার হয় তাহার সঠিক খবর পাওয়া যায় না। অনুমান যে ইহা গবাদি পশুর খাদ্যরূপে খরচ হইয়া থাকে। গবাদিকে খাওয়াইলে উপকার নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ইহা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইয়া ইহার খৈল, খোসা ভুসি খাওয়াইলে ক্ষতি কি?

অনেকে বলিবেন—আস্ত বীজ গবাদিকে খাওয়াইলে অধিক উপকার হইবে। তখন তুলা বীজ ভাঙ্গিয়া তৈল প্রস্তুতের এত কি প্রয়োজন?—প্রয়োজন আছে—মিঃ নিওল-প্যাটন বলেন যে, আস্ত বীজে যে অধিক তৈল ভাগ থাকে তাহা গবাদির উদরে সহজে পরিপাক হয় না কিন্তু খৈল খোসা ভুসি সহজে তাহারা হজম করিতে পারে এবং সাগ্রহে খায়। তাহা যদি হয় তবে তৈল বৃথা নষ্ট করিবার আবশ্যক দেখা যায় না। তৈল হইতে যে অনেক টাকা পাওয়া যাইতে পারে। অনেকে আশঙ্কা করেন যে ভারতে তুলাবীজ ভাঙ্গিবার কল স্থাপিত হইলে গবাদির একটা প্রধান খাদ্যের অভাব অনুভব হইবে। তাহার উত্তর এই যে কলে তৈল ভাঙ্গিলেও মোটে ১০০ মণ বীজ হইতে ১২ মণ তৈল উৎপন্ন হইবে বাকী ৮৮ মণ গবাদির খাদ্যের নিমিত্ত থাকিয়া যাইবে অথচ তৈল হইতে অনেক অর্থ আসিল।

একটা হিসাব ধরিয়া দেখা যাউক—১২০০,০০০ টন তুলা হইতে ১২০,০০০ টন তৈল—৪৫০৲ টাকা টন হিঃ— ৫,৪০,০০,০০০ টাকা।

৫৩০,০০০ টন খোসা ছাড়ান বীজের খৈল ৫০৲ টান হিঃ—	২,৬৫,০০,০০০	,,
৫৫০,০০০ ,, ,, ভুসী ২০৲ টাকা টন হিঃ—	১,১০,০০,০০০	,,
মোট আয়—	৯,১৫,০৯,০০০	টাকা।
১২,০০,০০০ টন তুলা বীজ ৫০৲ টাকা টন হিঃ—	৬,০০,০০,০০০	,,
	৩,১৫,০০,০০০	টাকা।

এতটা টাকা গবাদিকে তুলা বীজ আস্ত খাওয়াইয়া লোকে লোকসান করিতেছে।

তুলা বীজ আস্ত খাওয়াইবার অপেক্ষা যে উহার খৈল খোলা ভুসী খাওয়ান অনেকাংশে শ্রেয়ঃ তাহা বিশেষ পরীক্ষা করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ কালে গবাদির খাদ্য শস্যের অভাব হয় তখন গবাদিকে কেবল তুলা বীজ খাওয়াইয়া রাখা যায় না কিন্তু যদি খৈল, খোসা ভুসী খাওয়ান যায় তাহা হইলে তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় না। তুলা বীজের খৈল খোসা ভুসীর গুণাগুণ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষা ক্ষেত্রে পরীক্ষা হইয়াছে।

১৯১২ এবং ১৯১৫ সালে যখন দুর্ভিক্ষ হয় এবং ১৯১৩ যখন আমেদনগরে দুর্ভিক্ষ হয় তখন ইহা ভালরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা নিম্নে গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টের অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"The Fodder Problem in the Bombay Presidency," the following remarks appear about Cotton seed hulls—

"The Cotton tracts of the Presidency, especially Khandesh, suffer from a lack of fodder in proportion to the increase in the area of cotton grown. In the cotton tracts of America cotton seed hull are extensively used as fodder. The experiments tend to show that the hulls are equal in value as a fodder to ordinary Kadbi. It was found at the Surat farm that heavy Guzrat bullocks weighing 1,500 lbs. can be maintained in good condition on light work when fed with 20 lbs. of hulls as sole fodder plus 3 lbs. of concentrate. The hulls cost Rs. 11-14-6 per 100 lbs., delivered at Surat from Navasari. The great advantage of feeding cotton seed hulls instead of cotton seed whole, as is often done at present, lies in the fact that it is possible first to extract valuable by-products *i. e.*, cotton seed oil and oil cake. Hence the adoption of hull feeding would confer an immense economic benefit on the cotton tracts of the Presidency."

আম্র—আম—Mango.

উদ্যান রচনা, সার প্রয়োগ, চাষ-কারকিত।

উদ্যানতত্ত্ববিদ্ শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।

আমের চারা হউক বা কলম হউক নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বসাইতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়। যদি পূর্ব্ব হইতে গর্ত্ত তৈয়ারী করা থাকে এবং তাহাতে সার গোবর দিয়া গর্ত্তস্থ মৃত্তিকা সারবান করা থাকে তাহা হইলে ত ভালই হয়। এরূপ গর্ত্তস্থ মৃত্তিকা বৃষ্টি পাইয়া সরস থাকাই সম্ভব। যদি আচট মাটিতে সদ্য গর্ত্ত খনন করিয়া গাছ বসাইতে হইলেও গর্ত্ত কখন ছোট করা উচিত নহে। লম্বা চওড়া গভীরতায় বড় গর্ত্তই আবশ্যক। এই গর্ত্তস্থ মাটি উপরে উঠাইয়া ইট, খোলা, কাঁকর বাছিয়া এবং মাটি ভালরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন পাঁক মাটি ও পুরাতন গোময় সারাদি মিশাইয়া গর্ত্তটি আবশ্যকমত পূর্ণ করিতে হইবে; অতঃপর চারাটিকে প্রয়োজনানুরূপ উঁচু, কিম্বা নিচু, করিয়া বসাইতে হইবে। কলমের চারা হইলে এইখানে একটু গোল বাধে—কলমের সংযোগ স্থলটি জমির সমতল হইবে, নিচু হইবে কিম্বা উচ্চে থাকিবে? চারার কাণ্ডটি মাটির অধিক নিম্নে প্রোথিত করিয়া ফেলা সু-যুক্তি নহে। চারার গোড়া ঘেঁসিয়া যদি কলম যোজনা করা থাকে তবে সংযুক্ত স্থল মাটি চাপা দিয়া কলম বসাইলে ক্ষতি নাই কিন্তু দারবঙ্গ, বেনারস, মালদা প্রভৃতি স্থানে যে প্রকার ২।৩ বৎসরের বড় চারার কলম বাঁধা হয় এবং চারার অগ্রভাগের সহিত মূল বৃক্ষের শাখার যোজনা করা হয় তাহাতে সংযোগ স্থলটি ১॥-২ ফিট উচ্চে থাকে। চারার এই সমস্ত কাণ্ডাংশ ভূ-প্রোথিত করা যাইতে পারে না। এরূপ স্থলে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করাই বিধেয়। জানা উচিত যে, কাণ্ডটি মাটির অধিক নিম্নে প্রোথিত হইলে গাছে ফল কম হয়।

কলম বা চারা গর্ত্তে স্থাপন করিয়া সার মিশ্রিত মাটি দ্বারা গর্ত্তের বাকী অংশ পূরণ করিতে হয় এবং চারার চারি পার্শ্বের মাটি চাপিয়া দিয়া ও জল সেচন দ্বারা গর্ত্তস্থ মাটিকে পুনরায় জমাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

আর একটি বিশেষ কথা বলিয়া আমি চারা রোপণ অধ্যায় শেষ করিব। চারাগুলি মাটির অধিক নিম্নে প্রোথিত হইলে তাহাদের শিকড় মাটির অধিক নিম্নে চলিয়া যায় এবং তজ্জন্য উহারা উপরের মাটির চাষকারিত হইতে কোন সাহায্য পায় না। উপর স্তরের মাটি ভাল থাকিলে স্ফূর্ত্তি অধিক হয়। আবার কেহ কেহ গাছ বড় হইলে গাছের গোড়ায় কতক দূর ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত মাটি চাপাইয়া দেয়।

* আম—আম্র—Mango শীর্ষক আশ্বিন মাসের প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।

গাছের গোড়ায় জল বসার ভয়ে অনেকে এরূপ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে দোষ ঘটে এই যে গাছের শিকড় উপরে ভাসিয়া উঠে। চাষ কারকিত, কোপানর সময় ঐ সকল শিকড়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া গাছ জখম হয়। জলবসা স্থান হইলে সমুদয় জমিটিতে মাটি ছড়াইয়া উচ্চ করিয়া লওয়া ভাল। সর্ব্বত্র সকল দিক ভাবিয়া কার্য্য করিতে ভুলিলে পদে পদে ঠকিতে হয়।

গাছ প্রাতঃকাল অপেক্ষা বৈকালে বসান ভাল—রাত্রের ঠাণ্ডা পাইয়া গাছ অনেকটা সারিয়া যায়; বৃষ্টি বাদলের দিন গাছ বসাইতে নাই—ঐ সময় মাটি লইয়া নাড়া চাড়া করার অসুবিধা হয় এবং মাটি ঢেলা বাঁধিয়া শক্ত হইয়া যায়। বিদেশ হইতে আনীত চারা এক দুই দিন ঠাণ্ডায় রাখিয়া সারিয়া গেলে তবে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসান কর্ত্তব্য। চারা বা কলম হাপর হইতে তুলিয়াই জমিতে বসান অবিধেয়, ২।৩ দিন ঘরে রাখিয়া শিকড় আচ্ছাদিত মাটি (গুল) কিঞ্চিৎ টানিয়া (নিরস) গেলে তবে নির্দ্দিষ্ট গর্ত্তে বসান চলে। কোমল চারা বাতাসে অনবরত নাড়া পাইলে তাহাদের শিকড় চালাইবার ব্যাঘাত ঘটে এবং চারাগুলি শীঘ্র ধরিয়া বসিতে পারে না। প্রত্যেক চারার নিকট এক একটি কাঠি পুতিয়া দিয়া চারাগুলি আলগাভাবে উহার সহিত বাঁধিয়া দিতে হয়।

চারা হাপর হইতে তুলিবার দুইটি প্রথা অবলম্বন করা যায়। ১ম, চারা তুলিয়া শিকড়গুলি মাটি শূন্য করিয়া এমন কি ধৌত করিয়া নির্দ্দিষ্ট গর্ত্তে বসান; ২য়, শিকড় সমেত মাটির গুল বাঁধিয়া, গুল ঘরে কিঞ্চিৎ শুকাইলে তবে গর্ত্তে বসান। প্রথম প্রথানুযায়ী চারা উত্তোলিত হইলে চারা সদ্য গর্ত্তে বসান যায়। বেলে মাটিতে হাপর দেওয়া থাকিলে ১ম প্রথাই বাধ্য হইয়া অবলম্বন করিতে হয়।

দারুণ শীত বা গ্রীষ্মে চারা বসাইতে নাই। গরম দেশে যেখানে সূর্য্যের প্রখর তাপ তথায় চারাগুলির ছায়া প্রদান ব্যবস্থা না করিলে চলে না। আমের চারা বসাইয়া সেই ক্ষেত্রে কলা বাগান তৈয়ারি করা সুপরামর্শ।

চারা গাছগুলি ঘেরি দ্বারা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে গাছের ছাওয়া হয় এবং গবাদি হইতেও সংরক্ষিত হয়। বড় গাছ ঘেরার আবশ্যক নাই। কলা বাগান করিলে যেমন গাছ বড় হইবে কলা গাছও ক্রমশঃ পাতলা করিয়া দিতে হইবে নতুবা আওতায় পড়িয়া গাছ খারাপ হইয়া যাইবে।

গর্ত্তে গাছগুলি ধরিয়া বসিলে এবং গর্ত্তের মাটি জমিয়া গেলে গাছের চারি পার্শ্বের মাটি কোপাইয়া জল দিয়া, যো হইলে পুনরায় খুসিয়া দিয়া কুটি, তৃণ চাপা দিলে মাটি বেশ সরস থাকে এবং অধিক জল সেচনের আবশ্যক হয় না। ইহাকে যো বাঁধা বলে। ইহাতে আরও একটি উপকার এই যে, তৃণাদি পচিয়া মাটি ক্রমশঃ সারবান হয় ও গাছের চারি ধারে সহজে ঘাস বা আগাছা জন্মিতে পায় না। এই প্রকার তদ্বির করিলে ২।৩ বৎসরে গাছ তৈয়ারী হইয়া ফলবান হয়।

আম গাছের সার—কৃষি-রসায়নে পূর্ণায়তন বৃক্ষের নিম্ন লিখিতানুরূপ সার প্রয়োজনের ব্যবস্থা আছে।

চূণ	৪০ তোলা।
পটাস	৩৬ ,,
নাইট্রোজেন	১৬ ,,
গ্রহনোপযোগী ফস্ফরিকাম্ল	৩২ ,,

আম গাছের মাটি বেশ দোঁয়াশ হইলেই ভাল হয়।

এক্ষণে দেখা উচিত কোন্ কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ বা খনিজ পদার্থ হইতে আমরা উক্ত পরিমাণ সার সংগ্রহ করিতে পারি। গাছের আয়তনানুসারে অবশ্য সারের পরিমাণ কমাইতে ও বাড়াইতে হয়। আমরা এ স্থলে পূর্ণায়তন বৃক্ষের কথাই বলিব।

প্রত্যেক গাছের গোড়ায় যদি আমরা ২ ঝুড়ী গো মল বা অশ্ব মল, ১ ঝুড়ী ছাই, ৪ পাউণ্ড বা কিছু কম /২ সের হাড়ের গুঁড়া, অর্দ্ধ সের সোরা সার এবং মৃত্তিকায় যদি চুণের অভাব লক্ষিত হয় তবে কিঞ্চিৎ চুণ (১ পোয়ার অধিক নহে) দিতে পারি তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত সার ও সম্পূর্ণ সার দিলাম। কারণ ফস্ফেটের জন্য সোরা দিলাম, নাইট্রোজেনের জন্য সোরা ও অশ্বমল দিলাম, পটাসের জন্য ছাই দিলাম এবং চুণ দিলাম। পাতা পচা সার গাছের পক্ষে বিশেষ উপকারী, ইহাতে গাছের পোষণ উপযোগী অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়। পাতা পুড়াইয়া গাছের গোড়ায় দিলেও পাটাস পাওয়া যায়। তলস্থ পাতা জ্বালানীর জন্য এই কারণে কুড়াইয়া লইয়া যাইতে দিতে নাই।

অন্য প্রকারেও আমরা সারের মাত্রা পূরণ করিতে পারি। সাধারণতঃ বাঙলা দেশে বাগান পালকগণ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া আইল বাঁধিয়া গোড়াতে ৪ ঝুড়ি পাঁক মাটি, ৪ ঝুড়ি পরিমিত গোময় সার দিয়া গর্ত্তটি পুনরায় চতুঃপার্শ্বস্থ মাটি দ্বারা পূরণ করিয়া আইল বাঁধিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করেন। পাঁক মাটিতে পটাসের অংশ থাকে এবং গোময় ও পাঁক মাটি হইতে নাইট্রোজেনও মিলে তথাপি ইহা সম্পূর্ণ সার হইল না। আমি ইহার সহিত অন্ততঃ /১ সের হাড় সার ও এক পোয়া সোরা সার মিশ্রিত করিয়া দিতে বলি।

সার প্রয়োগের সময়—যতদূর গাছের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয় ততদুর পর্য্যন্ত গাছের তলস্থ মাটি বিচলিত করিয়া গাছের চারি দিকে জমা করিতে হইবে এবং [illegible] গর্ত্তের শেষ প্রান্ত গভীর ভাবে খনন করিয়া অন্ততঃ ১ ফুট গভীর খাদ করিয়া রাখিতে হইবে। শিকড় সকল তাহাদের প্রান্তদ্বারা রসরূপে আহার সংগ্রহ করে। শিকড়ের মূল দেশে বা কাণ্ড মূলে সার দিলে যথাস্থানে পড়িল না। খাদ্য মুখে তুলিয়া দেওয়াই [illegible] গোড়ার মাটি বিচলিত করিবার সময় দুই একটা শিকড়ে আঘাত

লাগিলে বা কাটিয়া গেলে পুর্ণায়তন বৃক্ষের বিশেষ অপকার হয় না কিন্তু নূতন গাছের তলার মাটি সাবধানে না নাড়িলে ক্ষতি অনেক। শিকড় হইতে মাটি বিচ্ছিন্ন করিবার এই ছোট বড় ফর্ক ব্যবহার করা মন্দ নহে।

কার্ত্তিক মাসে, বারি পাতের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে তবে আমের গোড়া খোলার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং অন্ততঃ ১৫ দিন যাবত শিকড়ে ও চারি দিকের খোদিত মাটিতে রৌদ্র বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হয়। মাটী নাড়িয়া চাড়িয়া রৌদ্র বাতাস খাওয়াইতে পারিলেই মাটি সারবান হইয়া উঠে। গোড়াটি সার ও মাটি দ্বারা পুনরায় ঢাকিয়া দিলেও প্রান্তদেশে খাদটি বজায় রাখা ভাল। উহাতে বৃষ্টি জলের ধোয়াট আসিয়া সঞ্চিত হইবে এবং বৃক্ষে জল সেচন কালেও ঐ গর্ত্তটি জল পূর্ণ করিয়া দিলেই যথোচিত কার্য্য করা হইল—আহার পানীয় মুখে যোগান হইল।

বলা বাহুল্য সার প্রদানের পর মাঝে মাঝে জল সেচনের আবশ্যক হয়। জল ব্যতীত সারকে পরিণত করিয়া উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী করিবে কে? বড় গাছগুলির গোড়ার মাটি চূর্ণ করিয়া শুষ্ক তৃণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে রস রক্ষার সুবিধা হয়।

বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ার অবস্থা বুঝিয়া কার্ত্তিক মাসে আম গাছের গোড়া কোপান ও সার দিবার কথা বলিলাম, স্থানভেদে, অবস্থা ভেদে সময়ের ইতর বিশেষ করিতে হয়, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমি প্রয়োজনানুসারে সব কাজ করিতে সকলকে অনুরোধ করি; প্রয়োজনটি ঠিক কি তাহা বহু বিচার দ্বারা ও ভুয় দর্শন দ্বারা জানা যায়।

প্রয়োজন হইলে গাছের গোড়ায় সার দেওয়া সত্ত্বেও গাছের চারিভিতে খাদে মল মুত্রের তরল সার বা খৈলের জল দেওয়া, গাছে ফল ধরিলে ফল ঝরা নিবারণের জন্য গাছে জল দেওয়া ইত্যাদি অনেক কাজ আছে। এমন কি পিচকারী দ্বারা ফলের বৃন্তগুলি সিক্ত করিয়া দেওয়া, রসা ভুমি হইলে গাছের গোড়া অনাবৃত করা, রস নিঃশোষণ জন্য গুঁড়া চুণ ছড়ান ইত্যাদি অনেক কার্য্য করিতে হয়।

বড় বাগান হইলে জল সেচনের বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক। যদি ঝিল বা পুষ্করিণী হইতে জল তোলা হয় বাগানের সর্ব্বোচ্চ অংশে পয়োনালা নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেক রকম আমের চৌকার সহিত পয়োনালার যোগ করিয়া দিলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। জল অধিক নিম্ন থাকিলে সিউনি দ্বারা জল তুলিবার ব্যাঘাত হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে পম্প ব্যবহার আরশ্যক হইয়া পড়ে। পম্প দ্বারা উচ্চ স্থানে স্থাপিত জলাধার (Tank) হইতে বাগানের যথা তথা ইচ্ছামত জল চালান যায়।

আম বাগানে সার দেওয়া প্রদানের জন্য উড্র সাহেব একটি সাধারণ কৌশল অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন। আম বাগানের তলস্থ জমিতে শণ, ধঞ্চে, মুগ, মসুর প্রভৃতি শুঁটিধারী শস্যের আবাদ করিলে জমি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা হয়। ইহারা বায়ুমণ্ডল

হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া ইহাদের মূলে সঞ্চয় করে এবং এতদ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। একথা খুব সত্য হইলেও আমি বলিতে চাই যে ইহাতে সাধারণতঃ গাছের কিছু উপকার হইলেও বিশেষ সার প্রয়োগের আবশ্যকতা ঘুচিয়া যায় না। গর্ত্তে চারা রোপণের সময় গর্ত্ত মধ্যে কয়েক খণ্ড হাড় স্থাপন করিলে বৃক্ষগণের স্থায়ী উপকার হয়। মাটি জলের প্রভাবে হাড়গুলিও ক্রমশঃ গলিতে থাকে এবং বৃক্ষগণও ফস্ফেটিক সারের উপকার পাইতে থাকে। উড্র সাহেব গর্ত্ত মধ্যে মোটা অস্থি চূর্ণ দিতে বলেন। কথা একই। নাইট্রেট অব সোডা ও সালফেট অব এমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া দিলে কিম্বা মনুষ্য মল (Poudrette), মাছের গুঁড়া (Fish manure) দিলে ফল বৃক্ষের বিশেষ উন্নতি হয় এবং তাহা শীঘ্র উত্তম ফল প্রদান করে।

উদ্যান রক্ষা—গাছ বসাইয়া এবং বৎসর বৎসর তাহাতে সার গোময় প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলে না। আমের বাগান হউক বা যে কোন ফলের বাগান হউক তাহা সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে রাখা বিশেষ কঠিন। মানুষে প্রথম উদ্যমে এক দমে অনেক কাজ করিয়া ফেলিতে পারে। কাজের প্রথম সূচনায় উৎসাহের বশে ব্যয়াধিক্যও গ্রাহ্য করে না, অতিরিক্ত ক্লেশ সহিতেও কাতর হয় না কিন্তু এই উদ্যম ও উৎসাহ অধিকাংশ স্থলে শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে না। যে সময় অধিক কঠোরতার প্রয়োজন, যে সময় অধিক যত্নের প্রয়োজন, এমন কি যে কালে সময়োচিত খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন তাহা যেন সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—যৌবনে অধিক ব্যয়ে কাঙ্গালের মত দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শেষ রক্ষাই রক্ষা নতুবা সব আড়ম্বর বৃথা।

গাছ ছাঁটা—প্রথমতঃ ২।৩।৪ বৎসর যাবত চারাগাছ গুলি যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে ও আশু ফলবান হয় তাহার জন্য তদ্বির করা কর্ত্তব্য। আমগাছ ছোট কালে ছাঁটিবার আবশ্যক নাই কিন্তু তথাপিও শুষ্ক, অর্দ্ধ মৃত ডালগুলি যত্ন পূর্ব্বক কাটিয়া বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছ যত বড় হইতে থাকে এবং তাহাতে ফল ধরিতে আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ গাছগুলি ছাঁটার প্রয়োজন হয়। গাছের ফল শেষ হইয়া যাইবার পর শাখাগ্রভাগ ছাঁটিয়া দিলে আবার নূতন প্রশাখা নির্গত হইয়া গাছ পুনরায় সঞ্জীবতা প্রাপ্ত হয়। ফল প্রসবের পর গাছের শক্তি যে কমিয়া যায় ইহা সহজেই বুঝা যায়। গাছগুলির শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা এবং তাহার কলেবর কতক পরিমাণে নূতন করিয়া গঠনের চেষ্টা নিশ্চয়ই করিতে হইবে।

আমগাছ ছাঁটার সাধারণ সময় কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস। কিন্তু আমের ফলনের সময়ের অগ্র পশ্চাতে গাছ ছাঁটার সময় নিয়ন্ত্রিত হয়।

সব আম এক সময় ফলে না, সব আমের মুকুল সর্ব্বত্র এক সময় ধরে না। আম্র বৃক্ষ মুকুলিত হইবার সময়ানুসারে তাহাদের পাইট, কারকিতের সময়ের অগ্র পশ্চাত

হইয়া থাকে। দেশ কাল ও শ্রেণীভেদে আম বাগানের তদ্বির ও পাইট অগ্র পশ্চাত আরম্ভ হয়।

শীতের শেষে অর্থাৎ পৌষের শেষ ভাগে আম্র মুকুল হইতে আরম্ভ হয়। মাঘ মাসে প্রায়ই শ্রীপঞ্চমী হইয়া থাকে, এই দেবী আরাধনায় সেই কারণে নবোদ্গত আম্র-মুকুল দিবার ব্যবস্থা আছে। পৌষে আমের মুকুল হইতে আরম্ভ হইলেও ফাল্গুন এমন কি চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আম গাছ মুকুলিত হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণ বিধি।

ইহা ছাড়া মালদা ও ত্রিহুতে কার্ত্তিকে আমের জ্যৈষ্ঠ মাসে মুকুল হয়, ফল পাকে আশ্বিনে অথবা কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সব আমগাছ প্রতি বৎসর মুকুলিত হয় না। বাঙলার প্রায় অর্দ্ধেকের উপর আমগাছ দুই কিম্বা তিন বৎসর অন্তর মুকুলিত হয়। দাক্ষিণাত্যেও অধিকাংশ আমগাছ এক বৎসর অন্তর মুকুলিত হয়। বোধ হয় ভারতের সর্ব্বত্রই প্রতি বৎসর ফল প্রদান করে এমন আমগাছ খুব কম আছে। বিশেষতঃ বাঙলায় আমের ফল হওয়া বড়ই অনিশ্চিত। প্রথমতঃ দুই বা তিন বৎসর অন্তর কোন কোন গাছ যদি বা মুকুলিত হইল, নানা কারণে মুকুল ঝরিয়া গেল বা ফল ধরিয়া থাকিলে, ফল ঝরিয়া গেল। বাঙলা দেশে পোকার উপদ্রব অধিক এবং বাঙলার মাটি অতিশয় রসা বলিয়া গাছে অত্যধিক রস সঞ্চারিত হয়। সেই রস সহসা গরম বা ঠাণ্ডা হইয়া ফল ঝরার হেতু হয়। যে সব গাছে কোন বৎসর মুকুল হইল না তাহাতে কচিপাতা বাহির হইয়া পড়ে। প্রতিবৎসর ফলে এমন আমগাছও আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলির পৌষ মাসে মুকুল হয়, কতকগুলিতে দুই বার মুকুল হয়, একবার পৌষ মাসে, দ্বিতীয় বার শ্রাবণ ভাদ্রে। এরূপ আমের সংখ্যা কম। কতকগুলি আম বারমাস ফলে। পৌষ হইতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস অন্তর মুকুল হয়। মহারাষ্ট্র দেশে আম খুব জলদি মুকুলিত হয়। সেখানে সাধারণতঃ বর্ষার শেষে কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত মুকুল হইবার সময়। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে দেশে এই আমের সংখ্যা অধিক।

যে সকল আম কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে ফলে তাহাদিগকে রবি আম বলা হয় এবং তাহা রবি খন্দের মধ্যে গণ্য। দোফলা তেফলা বা বারমেসে আম বাঙলা দেশেই দেখা যায়; অন্যত্র কচিৎ দৃষ্ট হয়। ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট দ্বীপপুঞ্জে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের মুকুল হয়। সেখানে দোফলা আম দেখিতে পাওয়া যায়। একবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে এবং আবার কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে মুকুল হয়।

মূল কথা যাহা বলা গেল তাহা হইতে এই বুঝা যায় যে, আমের মুকুলিত হইবার নির্দ্ধারিত সময় নাই। স্থান বিশেষে ও বৃক্ষ বিশেষে কোন আম গাছ পৌষ মাসে, কোনটি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে, কোনটি কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে, কতগুলি দুইবার, কতকগুলি তিন বার ফলে; কোনটি বা বারমেসে। কোন কোন আমগাছ এক বৎসর অন্তর কোন গাছ

প্রতি বৎসর ফলিয়া থাকে। দুই বা তিন বৎসর অন্তর ফলিতেছে এমন আম গাছ অন্যত্র না দেখা গেলেও বাঙলায় বিরল নহে।

এই সকল আম গাছের শ্রেণী বিভাগ করিয়া একটা তালিকা করিতে পারা যায়—

১। এক বৎসর অন্তর ফলে

২। বৎসর ফলা

৩। দো-ফলা

৪। তে-ফলা ও বারমেসে

দো-ফলা আম গাছের সংখ্যা খুব কম। তে-ফলার সংখ্যাও তদপেক্ষা কম।

এই কয় শ্রেণীর গাছের চায কারকিত বিভিন্ন সময় আরম্ভ ও শেষ করা আবশ্যক। এক শ্রেণীর গাছ এক এক সময় ছাঁটিয়া দিতে হইবে। গাছ ছাঁটার সময় কেবল শাখাগ্রভাগ কাটা হইবে তাহা নহে, মরা অকেজো ডাল, রোগ দুষ্ট ডাল বাদ দিতে ভুল হওয়া উচিত নহে এবং গাছের গোড়ার মাটির পাইট করিবার জন্য অকেজো শিকড়ও কাটিয়া ছাঁটিয়া বাদ দিতে হয়। গাছের কলেবর অযথা বাড়িয়া উঠিলে এবং তাহাতে উচিত মত ফল না হইলে কখন বা কতক কতক কাজের শিকড় কাটিয়া দিয়া গাছের তেজ খর্ব্ব করিয়া দিতে হয়। গবাদি জন্তু এবং মানুষের দেহে অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধি যেমন সন্তান প্রসবের অনুকূল নহে বৃক্ষেরও অতিরিক্ত কলেবর বৃদ্ধিতে সেই দশা ঘটে।

কোপাইবার কালে কোদাল দ্বারা এবং ভাষা শিকড় হইলে চষিবার কালে লাঙ্গল দ্বারা শিকড় কাটিয়া যায় এবং ছাঁটার কার্য্য আপনা হইতে সম্পন্ন হয়। কখন বা মাটি অধিক দূর খুলিয়া কোদাল বা অন্য কোন তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র দ্বারা শিকড় ছাঁটার আবশ্যক হয়। ডাল ও শাখা প্রশাখা ছাঁটার জন্য ডাল ছাঁটা কাঁচি আছে। শাখা প্রশাখা পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে এমন লম্বা হাতল ওয়ালা কাঁচি আছে। মৈ বা ঘোড়াঞ্চের উপর উঠিয়াও ডাল পালা ছাঁটিবার আবশ্যক হয়।

বাগানের যে কত কাজ, কত তদ্বির, কত যত্ন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা গাছের গোড়ায় জল সেচনের কথা বলিয়াছি মাত্র; সময়ে সময়ে গাছগুলি পিচকারী দ্বারা ধৌত করিবার আবশ্যক হয়; গাছে ধোঁয়া দিবার আবশ্যক হয়, পোকা নিবারণের জন্য ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক হয়। মূল কথা ঐকান্তিক যত্ন এবং সকল দিক বিচার করিয়া কার্য্য করা।

আম গাছে প্রায়ই আগাছা দেখা যায় উহারা গাছের ডালের উপর শিকড় চালাইয়া গাছের রস শোষণ করিতে থাকে এবং এক ডাল হইতে অন্য ডালে ছড়াইয়া পড়িয়া আমগাছগুলিকে সম্পূর্ণ ফলধারণাক্ষম করিয়া ফেলে। দুই রকমের আগাছা আছে। একটির শাস্ত্রীয় নাম Loranthus longiflorus; অন্যটির নাম L. Globulus.

প্রথমটির পাতা অনেকটা আতা পাতার মত কিন্তু উহা অপেক্ষা মোটা, ফুলগুলি হরিদ্রা রঙের। পাতার রঙ ফিঁকে সবুজ; দ্বিতীয়টির পাতা ছোট, রঙ গাঢ়, ফুলও ছোট কিন্তু ফুলের রঙ ও গঠন প্রথমটির সমান।

এই গুলি তীক্ষ্ণধার ছুরি দ্বারা কাটিয়া না দিলে উহা অবিলম্বে গাছটি ছাইয়া ফেলিবে এবং অপরাপর গাছেও বংশ বিস্তার করিবে। উহার ফল পাখীর ভক্ষ্য; পাখীরা ফল খাইয়া মলের সহিত অন্য বৃক্ষে উহাদের বীজ ছড়াইয়া আসে। ঐ সকল আগাছা আমগাছ হইতে বেল, লিচু গাছেও সঞ্চারিত হয়, তবে দেখা যায় যে আমগাছেই ইহাদের আধিপত্য অধিক। অন্য আগাছা—রাস্না-অর্কিডও আম গাছে দৃষ্ট হয়। অর্কিড বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু ইহাদের কোন ক্ষতি করে না। তবে যখন উহাদের বংশাবলি অতিমাত্রায় বাড়িয়া যায় তখন বৃক্ষের পক্ষে গুরুভার হয়। তাহা নিবারণ না করিলে ক্ষতি হয়।

বড় বড় আম, কাঁটালের গাছ যেন পরাশ্রয়ের জন্যই সৃষ্টি। কত লতার বেষ্টনে উহারা ক্লিষ্ঠ হয় তাহার গণনা করা যায় না। লতার বেষ্টনে, লতার পীড়নে উহারা প্রাণে মারা যায় তবু লতা তাহাকে ছাড়ে না—কবি বলেন—শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা। উহা লতার গুণ কি দোষ আমরাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কবির চক্ষে নিশ্চয়ই গুণ। সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট দায়ক গোলঞ্চ লতা উহার অসংখ্য মূল; উহারা গাত্র হইতে ঝুরী নামাইয়া নূতন মূলের সৃষ্টি করে। এই লতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া না দিলে উহাদিগকে মারা যায় না। কবিরাজ মহাশয়েরা বলেন যে আম গাঁছের গোলঞ্চ বড় উপকারী; আবার মিষ্ট আম গাছের গোলঞ্চ আরও অধিক উপকারী কিন্তু গোলঞ্চের আদর করিতে গেলে যে আম খাওয়ার আশা ছাড়িতে হয়। আমরা বলি যে, উহারা আম গাছের পরম শত্রু। শত্রু হইতে বৃক্ষগণকে রক্ষা করা চাই—কতদিকে দৃষ্টি রাখিলে তবে উদ্যান রক্ষা করা যায়।

ভারতে মোগল অধিকারের সময় আমের আবাদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে পেশওয়াগণ আমের উন্নতি কল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোয়াতে পর্ত্তুগীজগণ আম্রের আবাদ করিয়াছিল এবং বোধ হয় তাহারাই সর্ব্ব প্রথমে জোড় কলম দ্বারা অনেক নূতন আমের সৃষ্টি করে। বর্ত্তমানকালে দাক্ষিণাত্যে উড্র সাহেব, বাঙলায় মেরী সাহেব ভারতের নানা স্থান হইতে অন্যূন পাঁচশত প্রকার আম সংগ্রহ করিয়া তালিকাভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ এতগুলি বিভিন্ন প্রকার আম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা-দেশ ও কৃষির অন্তরায়

(১)

বাঙ্গালার লোকসংখ্যা ও অধিবাসী।

গত ১৯১০ সালের আদমসুমারীতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে সমস্ত বাঙ্গালাদেশের মোট লোকসংখ্যা ৪,৬৩,০৫,৬৪২। তন্মধ্যে সাড়ে তিন কোটি লোক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন যাপন করে। ইহার মধ্যে প্রায় তিন কোটি প্রাণী অর্থাৎ পূর্ণ লোকসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ সাধারণ চাষী, আর কেবল মাত্র ১২ লক্ষ, অর্থাৎ শতকরা ৩ জন ব্যক্তি চাষোপযোগী জমির আয় হইতে জীবন ধারণ করেন, অর্থাৎ জমিদার, ভূস্বামী ইত্যাদি; এবং মাত্র ৩২ লক্ষ লোক অর্থাৎ শতকরা সাড়ে সাত জন মজুরের কার্য্য করিয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে কেবলমাত্র ৩৪,৪১,০০০ জন উৎপাদক ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, তন্মধ্যে এক-চতুর্থাংশ সূতার ব্যবসায়ে নিযুক্ত। অতএব যে জাতির পূর্ণ লোকসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ আজীবন কৃষিকার্য্য দ্বারা প্রাণ রক্ষা করে, সকল কৃষিকার্য্য যে কতদূর সেই জাতির জন্ম মৃত্যু ও বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ কারণ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। সরকারি সেন্সাস্ রিপোর্ট প্রথম ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। তখন হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে কি পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা একটু শিক্ষাপ্রদ হইবে বিবেচনা করিয়া নিম্নে দিলাম,—

গণনার বৎসর	লোক সংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৮৭২ সাল	৩৪৬৮'২৯২	...
১৮৮১ „	৩৭০১৪৯৮৯	৬'৭
১৮৯১ „	৩৯৮০৫৯৪২	৫'৫
১৯০১ „	৪২৮৮১৭৭৬	৭'৭
১৯১১ „	৪৬৩০৫৬৪২	৮'০

ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, (১) ক্ষেত্রফলের তুলনায় তত্তদ্দেশীয় প্রদেশসমূহের মধ্যে বাঙ্গলার স্থান এইরূপ— জর্ম্মানি, ফ্রান্স, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বেহার-উড়িষ্যা, যুক্ত প্রদেশ, যুক্তসাম্রাজ্য, বাঙ্গলাদেশ; (২) লোকসংখ্যার তুলনায় বাঙ্গলার স্থান এইরূপ—জর্ম্মানি, যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গলাদেশ, মান্দ্রাজ যুক্তসাম্রাজ্য, ফ্রান্স, বেহার-উড়িষ্যা, বোম্বাই, (৩) কিন্তু অধিবাসীবর্গের ঘনত্বের তুলনায় এইরূপ—বাঙ্গলাদেশ, যুক্তসাম্রাজ্য, যুক্তপ্রদেশ, বেহার-উড়িষ্যা, জর্ম্মানি, মান্দ্রাজ, ফ্রান্স বোম্বাই। অর্থাৎ অধিবাসীবর্গের ঘনত্বের তুলনায় যাবতীয় পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষীয় প্রদেশ-সমূহের মধ্যে (কেবলমাত্র বেলজিয়ম ও নিজ ইংলণ্ড ব্যতীত) বাঙ্গলার স্থান সর্ব্বপ্রথম এবং যদি মনে রাখা যায় যে এই বিস্তৃত ৮৫,০৯২ বর্গমাইল অথবা ৫৩৮৩১৫০৪ একার

ভূমিখণ্ডের মধ্যে কত ভূমিখণ্ড নদ, নদী, পর্ব্বত, জলা, অরণ্য আদির দ্বারা আবৃত, তাহা হইলে বাঙ্গলার অধিবাসীবর্গের ঘনত্ব কত অধিক তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে।

বাঙ্গলার এই বহুল অধিবাসী, গ্রাম এবং গণ্ডগ্রাম বা ছোট সহরে বাস করে। বাঙ্গলার আধুনিক সহর-সকল কোন কোন রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সকল সহর ক্রমশঃ কুলিদিগের বাসস্থান, পণ্য দ্রব্যের গুদামঘর, ফিরিওয়ালা ও রেলযাত্রীর উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীর দোকান-ঘরে ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে। বাঙ্গলার পুরাতন সহরগুলি প্রায় নদীর নিকটবর্ত্তী কোন সুবিধাজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইত। বাঙ্গলার মাঠে মাঠে, ধানক্ষেতের মধ্যে আম্র-কাঁটাল-কদলী-বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত, পরস্পর হইতে কিছু দূরে দূরে অবস্থিত চালাঘরের সমষ্টিগুলিই বাঙ্গলার গ্রাম। গ্রামগুলির নিকটে কোথাও ধানের আড়ত, পাটের গুদাম, কোন কোন স্থানে ধানের বা পাটের হাট বা বাজার বসে; গৃহস্থের ঘর হইতে শস্যাদি সেই-সকল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে পুনরায় রপ্তানির জন্য বিদেশে অথবা অন্য কোথাও দেশের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য চালান হয়।

বাঙ্গলার চাষী-সম্প্রদায় জাতিতে অধিকাংশ মুসলমান এবং নমঃশূদ্র। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যগণ নিজেরা চাষের কার্য্য কুত্রাপি করেন না। তাঁহারা আজকাল চাষের কার্য্য "চাষার" কার্য্য বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন এবং বরং চাকরি, উমেদারি, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন তথাপি চাষের কার্য্য করিবেন না। বাঙ্গলার এই চাষী-সম্প্রদায়ের বিষয়, ডাঃ (Dr. ভোয়েল্‌কার Voelcker) তাঁহার Report of the Improvement of Indian Agriculture নামক পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

"At his best, the Indian ryot or cultivator is quite as good and in some respects superior to, the average British farmer, while at his worst it can only be said that this state is brought about largely by an absence of facilities for improvement which is probably unequalled in any other country; and the ryot will struggle on patiently and uncomplainingly in the face of difficulties in a way that no one else would. The native, though he may be slow in taking up an improvement, will not hesitate to adopt it if he is convinced that it constitutes a better plan and one to his advantage."

"ভারতীয় চাষী তাহার সচ্ছল অবস্থায় ইংরেজ কৃষকের সমকক্ষ কিম্বা কোন কোন বিষয়ে তদপেক্ষা উন্নত। তাহার অসচ্ছল অবস্থায়, এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উন্নতি করিবার সুবিধার অভাব—এবং সুবিধার এত অভাব বোধ হয় আর কোন দেশে নাই।—ইহাই তাহার সেই নিকৃষ্ট অবস্থার কারণ। ভারতীয় কৃষক তাহার সহস্র প্রতিবন্ধকের

মধ্য দিয়া ধীরভাবে বিনা আক্ষেপে দিনগুলি এমন ভাবে কাটাইয়া দিবে যেমনটি আর কেহ পারিবে না। দেশীয় চাষী-সম্প্রদায় উন্নত উপায় অবলম্বন করিতে প্রথমে ইতস্ততঃ করিলেও যদি বুঝিতে পারে যে ঐ উপায় উৎকৃষ্টতর, অথবা উহা তাহার পক্ষে সুবিধা-জনক, তখন উহা অবলম্বন করিতে তাহারা তিলমাত্র দ্বিরুক্তি করিবে না।"

বাঙ্গালার চাষী-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বুদ্ধিমান দক্ষ ও কার্য্যতৎপর হইলেও, বাঙ্গালার অধিবাসীবর্গ ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল হইলেও এবং চাষোপযোগী জমি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও, কেন যে বাঙ্গালার খাদ্যসামগ্রী এত দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালী এত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহা প্রত্যেক চিন্তাক্ষম ব্যক্তির চিন্তার বিশেষ কারণ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার প্রতিকার নিরূপণ করিবার সময় আসিতে আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব নাই।

বাঙ্গালার জলবায়ু ও আবহাওয়া।

চাষোপযোগী জল বায়ু সম্বন্ধে বাঙ্গালার অদৃষ্ট পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রসন্ন। বৃষ্টি কিছু অধিক হয় বলিয়া অজন্মার সম্ভাবনা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অল্প, তথাপি অতিবৃষ্টিতে পূর্ব্ববঙ্গ এবং অনাবৃষ্টিতে বাঁকুড়া কিরূপে অন্নাভাবে পীড়িত হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে দেশের লোক যুদ্ধবিগ্রহে মারা পড়িত, আজ-কাল অনশনে মরিতেছে; অনাবৃষ্টিজনিত অন্নাভাবগ্রস্ত কোন বিশেষ প্রদেশ জনশূন্য না হইয়া, আজ-কালকার দুর্ভিক্ষ সমস্ত দেশব্যাপী অন্নকষ্ট জন্মায়।

জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত যে ষান্মাসিক দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ সাগর হইতে আমাদের দেশের উপর দিয়া বর্ষার অবিরল জলধারা বর্ষণ করিয়া যায়, তাহার উপরই সমস্ত বাঙ্গালাদেশের হৈমন্তিক ধান্য ও অন্যান্য শস্যের সুজন্মা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উত্তর-পূর্ব্ব বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবাহের প্রত্যাবর্ত্তন মাত্র। ইহার জন্য কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুনের মধ্যে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। ইহার দ্বারাই বাঙ্গালার রবিশস্যের বিশেষ উপকার ঘটে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ভীষণ গ্রীষ্মকালে ভারতের মধ্যে একমাত্র আসাম, বাঙ্গালাদেশ ও ব্রহ্মদেশে কিঞ্চিৎ জলপাত হয়, অন্যত্র যাহা হয় তাহা অকিঞ্চিৎকর। বাঙ্গালার অধিবাসীগণ হৈমন্তিক ধান্যের উপরই জীবনধারণের নিমিত্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ঐ হৈমন্তিক শস্য কোন প্রকারে নষ্ট হইলে দেশ দুর্ভিক্ষে ছাইয়া যায়।

বাঙ্গালায় বৎসরে গড়পড়তা ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ১০০ ইঞ্চির উর্দ্ধে বৃষ্টিপাত হয়। চিরাপুঞ্জির (আসামে) গড়পড়তা বৃষ্টিপাত ৪০০ ইঞ্চি। কলিকাতায় ৬৫ ইঞ্চি, পাঞ্জাবে মাত্র ২০ ইঞ্চি। বৃষ্টিপাত এত অধিক বলিয়া আমাদের দেশে ধান এবং পাট চাষের এত সুবিধা, এবং সাধারণ কৃষিকার্য্য সহজ ও

তাহার ফলাফল কতক পরিমাণে নিশ্চিত। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে শস্তের পর্য্যাপ্ত ফলন কোন বৎসরের মোট বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে না। যদি একই পরিমাণের বৃষ্টি অল্পে অল্পে সমস্ত ঋতু ব্যাপিয়া হয় তাহাতে চাষের সমূহ উপকার দর্শে; আবার যদি সেই পরিমাণের বৃষ্টি এককালে অধিক পরিমাণে পড়ে, তাহাতে চাষের সুবিধা না হইয়া বরং ক্ষতি হয়।

দেশ ও দেশবাসীর অবস্থা।

বাঙ্গালার কৃষিবিষয়ে পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে মোটামুটি যে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন তাহা কতক পরিমাণে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা গেল। এখন দেখা যাইতেছে আমাদের দেশের অন্তরায় বড় অল্প নহে। বহুজনাকীর্ণ এই প্রদেশ দক্ষ কার্য্যকুশল ও বুদ্ধিমান জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। ইহার বিস্তৃত প্রান্তরগুলি কৃষির উপযোগী যথেষ্ট উর্ব্বর মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত। ইহার বক্ষের উপর দিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের কাণ্ড শাখা প্রশাখা লইয়া বহিয়া চলিয়াছে। জগৎ পিতার অপার করুণায় ইহার আকাশে ঘনঘটা প্রচুর বারিবর্ষণে মৃত্তিকাকে আর্দ্র করে ও বায়ুকে শীতল রাখে। ইহার স্বাভাবিক দৃশ্যাবলী নিরন্ন দরিদ্রেরও নিরাশ হৃদয়ে শান্তি ও তৃপ্তির মাধুরী বিস্তার করে। ক্ষমতাশালী রাজার শাসনে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি চিরসংরক্ষিত। তবে কেন আমাদের এ সোনার বাঙ্গালার দ্বারে দ্বারে দুর্ভিক্ষ, অনশন, অভাব, অস্বচ্ছন্দ, ও মড়ক তাহাদের মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে? অনেকে বলেন ভারতের অধিবাসীর অবস্থা মন্দ কে বলে! পূর্ব্বে, দেশের লোকেরা খালি পায়ে খালি গায়ে থাকিত, কোথাও যাওয়া আসা করিতে হইলে পদব্রজে ভিন্ন উপায় ছিল না। সহরের দৃশ্য এখন কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কত পাকাবাড়ী, ট্রাম, গাড়ি সহরের উপকণ্ঠে ধনীগণের সুদৃশ্য সৌধাবলী, বাগান-বাটী—এসব কি দেশের লোকের সুদিনের চিহ্ন নয়? আমরা বলি দেশের লোক ত সহরের মধ্যে বা উপকণ্ঠে বাস করে না; "The nation lives in the huts" "পল্লীবাসীরাই দেশবাসী; এই দেশবাসীর অবস্থা দেখ, গ্রামে যাও, প্রতি চাষাচাষির জনমজুরের কুটীরে উঁকি মারিয়া দেখ। দেখিবে, দরিদ্র পিতা মাতা সন্তানভারে প্রপীড়িত, সারাদিনের কর্ম্মলব্ধ মুষ্টি-অন্ন সকলের উদর পূরণে অক্ষম। তাহারা একবেলা খাইয়া কোন রকমে জীবন কাটাইয়া দিতেছে। পিতামাতা মুখের গ্রাস সন্তানের মুখে তুলিয়া দিয়া নিজেরা অভুক্ত রহিতেছে। লজ্জা নিবারণের আবরণ দেহে নাই, রোগে চিকিৎসার সামর্থ ও সুযোগ নাই। বর্ষায়, শীতে, জ্বরে, প্রপীড়িত হইয়া দরিদ্রের আয়ু স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইতেছে। জীবনে উৎসাহহীন, মরণে আশাহীন, প্রাণে দুর্ব্বল—ইহাই ত বাঙ্গলার ছবি, ইহাই আমাদের দেশ!

আমাদের দেশের এই বর্ত্তমান অবস্থার (একমাত্র কারণ বলিলে যদি অত্যুক্তি হয়) শ্রেষ্ঠ কারণ কৃষিকার্য্যের উন্নতির অভাব। যে দেশের লোক সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ

জীবনধারণের নিমিত্ত মুখ্যভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে, সে দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন না করিলে দুর্দ্দশার ছায়া যে অচিরেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ত্তমান কৃষিপদ্ধতি যে কতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। অতএব বাঙ্গালায় কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিতে হইবেই। কৃষির উন্নতি করিতে হইলে, কৃষির উন্নতির অন্তরায়গুলি অথবা অবনতির কারণগুলি দূর করিতে হইবে। কৃষির উন্নতির অন্তরায়গুলি আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চাহি—১। কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে কৃষকদিগের অজ্ঞতাজনিত অন্তরায়, ২। লোকসাধারণের প্রকৃতিগত, শিল্প ও শিক্ষাবিষয়ক, সামাজিক, অর্থব্যবহার এবং অন্য সম্বন্ধীয় অভাব।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র।—প্রবাসী।

---

(২)

নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধের অংশ

(ক) অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টি।

সুফলা বাঙ্গালার চাষের একটী প্রধান অন্তরায় অল্পবৃষ্টি বা স্বল্পনাবৃষ্টি। বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ অনাবৃষ্টি কখনও ঘটে না। অনাবৃষ্টি অপেক্ষা উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না হইয়া আজকাল চাষের বিশেষ বিঘ্ন জন্মাইতেছে। বাঙ্গালার মাটী আলগা ও নরম। একবার বৃষ্টি পড়িলে প্রথম জলটা মাটী সম্পূর্ণভাবে শুষিয়া লয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জল মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্তিকারেণুগুলিকে ফুলাইয়া দিয়া অধোমুখে জল প্রবাহের পথ রুদ্ধ না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৃষ্টির জল মাটী ভিজাইতেই খরচ হইয়া যায়। মাটী ভিজিবার পর অতিরিক্ত বৃষ্টির জল মাটীর উপর জমিয়া থাকে, অথবা নীচুদিকে প্রবাহিত হইয়া অন্যত্র চাষের সুবিধা জন্মায়। ধান চাষের জন্য ক্ষেত্রের উপর এককালীন ১।২।৩।৪ ফুট জল জমিয়া থাকা আবশ্যক, এবং ধানই আমাদের দেশের প্রধান শস্য; এবং তাহার সফলতার জন্য অধিক পরিমাণ জলের আবশ্যক। বাঙ্গালায় জলাগমের প্রধান উপায় বর্ষা। বৃষ্টির পরিমাণ অনুযায়ী বাঙ্গালাদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম-ভাগ, পূর্ব্ববঙ্গ, যেখানে বৃষ্টি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় অর্থাৎ চাষের জন্য বৃষ্টির জলই যথেষ্ট বা অতিরিক্ত, দ্বিতীয় বিভাগ, অবশিষ্ট বঙ্গ, যেখানে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ চাষের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত; বিগত কোন কোন বৎসর উপযুক্ত বৃষ্টি না হইয়া, বা বারে বারে পরিমিত বৃষ্টিপাতের পরিবর্ত্তে একবারে অপরিমিত বৃষ্টিপাত হইয়া, বা মোট বৃষ্টিপাতের অল্পতাপ্রযুক্ত যাবতীয় শস্যের অল্পাধিক অজন্মা ঘটাইয়াছিল। ভারতবর্ষে আর এক

শ্রেণীর স্থান আছে যথা পঞ্জাব, রাজপুতনা, সিন্ধু প্রভৃতি, যেখানে বৎসরের মধ্যে হয়ত মোট ১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতও হয় না।

অনাবৃষ্টির ক্ষতিপূরণের উপায়—(১) কৃত্রিম জলসেচন বা Irrigation.

চাষ করিতে হইলে যে স্থানে স্বাভাবিক উপায়ে জলাগমের সুবিধা নাই, সেখানে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। উল্লিখিত তিন শ্রেণীর দেশ সমূহের মধ্যে প্রথমোক্ত দেশ সকলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিবার কোন আবশ্যক হয় না। তৃতীয় প্রকার দেশ সমূহে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন অপরিহার্য্য; তজ্জন্য সেই সকল স্থানে উক্ত উপায় স্থায়ীভাবে অনুষ্ঠিত হইলে দুর্ভিক্ষ বা অন্নাভাবের হাত হইতে একরকম পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কেবল উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলির অবস্থা বড়ই অনিশ্চিত ও দৈবাধীন; একদিকে বরুণদেবের জল দানের অনিশ্চয়তা, অপর দিকে স্থায়ী জলসেচন পদ্ধতির অব্যবস্থা।

যাহা হউক বাঙ্গালার এই অনিয়মিত বৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান উপায় সরকারি অথবা বেসরকারি কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন। কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লাবন দ্বারা অনুর্ব্বর পতিত জমি যে কি পরিমাণে শস্যশ্যামলা করিয়া তোলা যায় তাহার দৃষ্টান্ত ইজিপ্টে এবং ইয়ুরোপের কোন কোন দেশখণ্ডে বহুপুরাকল হইতে বর্ত্তমান থাকিলেও, আদর্শের নিমিত্ত আমাদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে না। মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে ইংরেজের পূর্ব্বে ও ইংরেজশাসনকালে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন প্রথা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

জলসেচন মোটামুটী তিন উপায়ে করা হইয়া থাকে। প্রথম পয়ঃপ্রণালী (Irrigation Canals); যেমন শোন কেনাল, মেদিনীপুর কেনাল, কাবেরী ডেল্টা সিষ্টেম, পাঞ্জাব কেনালস্ ইত্যাদি। কোন একটী বৃহৎ নদীর সুবিধাজনক স্থানে এপার ওপার বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া ফেলা হয়, এবং সেই বাঁধের ঊর্দ্ধে কোথাও নদীর পাড় কাটীয়া খাল প্রস্তুত করা হয়। আবদ্ধ জল সেই খালের মধ্য দিয়া নদী হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়া, খালের ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা দ্বারা জল চালাইয়া, কৃষি জমির অভাব মোচন করা হয়। এই পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল যোগান গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন বেসরকারি কোম্পানী অথবা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সিতে বেসরকারি কোম্পানির হস্তে কাজ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কোম্পানি অসমর্থ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে তাহার ভার গ্রহণ করেন। পঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে পয়ঃপ্রণালী দ্বারা গবর্ণমেণ্ট জলহীন, মরুপ্রায়, বিস্তৃত ভূখণ্ড-সকল উর্ব্বর আবাদী জমিতে পরিণত করিয়া জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছেন। যথা চেনাব কেনাল ২০ লক্ষ একার ভূখণ্ডে জলসেচন করে, এবং তাহার জলনির্গম-ক্ষমতা সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ১১ হাজার

কিউবিক ফুট; এ বিষয়ে সার জন ষ্ট্রাচী (Sir John Strachey) তাঁহার 'ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকের ২২২ পৃষ্ঠায় যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত,—

"No similar works in any countries approach in magnitude the irrigation works of India, and no public works of nobler utility have ever been undertaken in the world."

"পৃথিবীর অন্য কোন দেশ ভারতবর্ষে জলসেচন প্রণালীর পরিমাণের সমতুল্য হইতে পারে নাই, এবং পৃথিবীর কুত্রাপি এতাদৃশ মহত্তর পূর্ত্তকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই।" পঞ্জাবে এ বিষয়ে জনসাধারণের ও ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ উদ্যোগ আছে। সেখানে প্রায় ১০ লক্ষ একার ভূমি ব্যক্তিগত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা চাষ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়—বৃহৎ জলাশয়, জলাধার বা কৃত্রিম হ্রদ। বোম্বাই ও সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস্, বিশেষতঃ মান্দ্রাজে এই প্রকারে জল যোগাইবার প্রথা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়; বিহারেও এরূপ কিছু কিছু আছে। দেশের মধ্যে সুবিধাজনক উচ্চ স্থানে পাড় দিয়া বৃহৎ গভীর জলাশয়ে বৃষ্টির অথবা কোন নদীর জল আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, অথবা কোন ঢালু ভূপৃষ্ঠে বাঁধ দিয়া তাহার উপরিভাগে বৃষ্টির জল অবরোধ করা থাকে। সেই জলাশয়ের পাড় হইতে জলসেচনের জন্য খাল কাটা হয় এবং অতিরিক্ত জল জমিয়া জলাশয়ের ক্ষতি করিবার ভয় থাকিলে জল-নিষ্কাশন করিবার পথও রাখিতে হয়। জলসেচনের খাল জলাশয় হইতে নির্গত হইয়া তাহার শাখাপ্রশাখা লইয়া দূরদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ প্রকার জলাশয় ব্যক্তিগত উদ্যম এবং গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা উভয় উপায়েই হইতে পারে। ভারতবর্ষে এ প্রকার জলাশয়, সাড়ে ছয় কোটি কিউবিক ফুট জলধারণক্ষম ও নয় বর্গমাইল ব্যাপী। বিশাল জলাশয় হইতে, মাত্র দশ একার ভূমি প্লাবনে সমর্থ জলাশয় পর্য্যন্ত আছে। বৃহৎ জলাশয়গুলি গবর্ণমেণ্টের সংরক্ষিত, ক্ষুদ্রগুলি সাধারণতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই প্রকার জলাধার নির্ম্মাণ ব্যয়সঙ্কুল ও কষ্টসাধ্য। ইংরেজ-পূর্ব্ব-ভারতে বিশেষতঃ মান্দ্রাজে বহু পুরাতন জলাধার ছিল; ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কাবেরী নদীতে বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দুরাজগণ শস্য-ক্ষেত্র সকল জলপ্লাবিত করিতেন। এক্ষণে উক্ত প্রকার অনেক জলাধার অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; অনেকগুলি আবার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাগণ কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিয়াছেন।

তৃতীয়—কূপ অথবা পুষ্করিণী। বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র কূপ খনন করিয়া কপিকলের দ্বারা মানুষের অথবা বলদ মহিষাদির জোরে, চক্রাকারে আবদ্ধ একসারি বালতি অথবা ডোলের সাহায্যে, কিম্বা পম্প দ্বারা জল উত্তোলন করিয়া দুইটি আইলের মধ্য দিয়া জল-প্রবাহ চালাইয়া ক্ষেত্রে জল দেওয়া হয়। দেশ, কাল ও স্থানীয় নিয়মানুসারে এতদ্ভিন্ন উপায় প্রচলিত হইয়াছে, যে সেগুলি এককালীন যেমন মনোহর, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। পুষ্করিণী হইতে জল উত্তোলন করিবার সাধারণতঃ এই চারিটি উপায় প্রচলিত আছে,—

ডোঙ্গা, লাটাথাম্বা, মোশক অথবা সিউনী। এগুলি আমরা সকলেই প্রায় একপ্রকার জানি বলিয়া প্রত্যেকটির বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম না। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কূপ বা নদী বা পুষ্করিণী হইতে জল উত্তোলন করিবার নিমিত্ত সেখানকার লোকেরা বিবিধ উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু প্রায় সকলগুলিই উক্ত প্রণালী কয়টির অল্পাধিক রূপান্তর মাত্র। তবে ঐ সামান্য রূপান্তর হইতে কোন দেশের উপায় অন্যদেশের উপায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মনে হইতেছে "ব্যবসা বাণিজ্যের" কোন এক সংখ্যায়, মান্দ্রাজে নূতন এক water lift বা জল-উত্তোলন-যন্ত্র উদ্ভাবনের কথা পড়িয়াছিলাম। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল উপায় প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে কোনটি আমাদের দেশে প্রচলিত উপায় অপেক্ষা অল্প আয়াসে, অল্প লোক বা বলদের সাহায্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে, অথচ আমাদের অসুবিধাজনক না হয়, তাহা পরীক্ষা করা উচিত। উক্ত উপায় গুলি ব্যতীত, আজকাল এক প্রকার Tube well বা নলকূপ বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে, তাহাও অতিশয় সুবিধাজনক। যাহা হউক, উক্ত উপায়গুলি এত সহজসাধ্য ও একটি কূপে বা পুষ্করিণীতে এত অল্প জমি প্লাবিত হয় যে ইহাতে সরকারের প্রত্যক্ষ-ভাবে হাত দেওয়া অধিক সুবিধাও নহে, আবশ্যকও হয় না। এই কূপগুলি কোথাও বৃহদাকার ইষ্টক বা প্রস্তরগাত্র করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়, আবার কোথাও বা মৃত্তিকাগাত্র অস্থায়ী কূপও খোদিত হইয়া থাকে। পুষ্করিণী বা কূপ হইতে জল তুলিয়া চাষ অতি উচ্চ অঙ্গের। অন্য উপায়ে জলপ্লাবন দ্বারা লব্ধ শস্য অপেক্ষা কূপ প্লাবন দ্বারা লব্ধ শস্যের মূল্য অনেক অধিক।* যে সকল স্থানে অল্প মাটি কাটিলেই কূপ হইতে জল পাওয়া যায় সেই সকল স্থানের পক্ষে কূপপ্লাবন বিশেষ উপযোগী। ভারতবর্ষে ১৩০ লক্ষ একার ভূমিতে কূপজলে চাষ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে ৯৫ লক্ষ একার যুক্তদেশে ও পঞ্জাবে এবং প্রায় সাড়ে ২৭ লক্ষ একার মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত। বাঙ্গালাদেশে মাত্র ১৬,৩৮৫ একার ভূমিতে কূপপ্লাবন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ৬ হাজার প্রকার জলপাইগুড়ি জেলায় ও ৪ হাজার বর্দ্ধমানে, অবশিষ্ট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বাঙ্গালায় কূপ খনন অতি অল্প আয়াসেই হইতে পারে; সাধারণতঃ তিন চারি শত টাকা খরচ করিলে ২০।২৫ বিঘা জমি চাষ করিবার উপযোগী একটি স্থায়ী কূপ নির্ম্মান করা যাইতে পারে। কূপ প্লাবন প্রথা বাঙ্গলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।† কূপ প্লাবনের উপযোগিতা ইচ্ছামত সংযত জল সেচন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সেই কারণে পুষ্করিণী অথবা কূপ প্লাবন রবিশস্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কূপজল এত আয়াসলব্ধ ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের যে তাহার দ্বারা ধান অথবা পাটচাষ সম্ভব নহে; তবে ঐ উপায়ে অনাবৃষ্টির সময়ে পাট বা ধান্য চাষের কতক সাহায্য করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে তামাক, ইক্ষু, তুলা,

* Imperial Gazetteer Val III, পৃঃ ৩১৮

† Do Do Do পৃঃ ৩১৯

সব্জী প্রভৃতি অন্যান্য শস্যের পক্ষে কূপজলে চাষ অত্যন্ত উপযোগী। বর্ত্তমানে এই সকল শস্য অনেক স্থলে পুষ্করিণীর জলে চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে এবং বৃহৎ পুষ্করিণী কাটিতে হইলে বেশী খরচ ও অনেকটা উত্তম জমি নষ্ট করিতে হয়। লোকাধিক্য ও অন্যান্য কারণবশতঃ উত্তম কৃষিজমির অভাব ঘটায়, এ বিষয়ে বিশেষ কৃচ্ছ্রতা আবশ্যক।

বাঙ্গালাদেশে জলাধারে জল আবদ্ধ করিয়া চাষের নিমিত্ত জলসেচন প্রথা যে, ধান্য ও পাট প্রভৃতি সকল প্রকার চাষের বিশেষ সুবিধাজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালায় একেবারে অনাবৃষ্টি কখনও হয় না, অনিয়মিত বৃষ্টিই এদেশের কালস্বরূপ। অতএব উক্ত প্রথা দেশের মধ্যে যতই প্রচলন হয় ততই মঙ্গল। বাঁকুড়া জেলার বিবরণী District Gazetteer পাঠে জানা যায় যে ঐ প্রদেশে এই উপায়ে জল সেচন পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রচলন হওয়া উচিত। পার্ব্বত্যময় বাঁকুড়া জেলায় কোন বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিলে তাহা হইতে জল নিঃসরণ হওয়া একেবারে অসম্ভব; অতএব স্থানে স্থানে কোন পর্ব্বত-বেষ্টিত গভীর ভূভাগের একদিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া বর্ষার জল আবদ্ধ করা উচিত। বাঁকুড়াতে পুরাকালের ঐরূপ কোন কোন বৃহৎ জলাধার বা বাঁধ এখনও নষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অভিমত এই যে, উক্ত জলাবরোধ জমিদারগণেরই কর্ত্তব্য এবং তাঁহারাই পূর্ব্বে ইহার সংরক্ষণাদি কার্য্য করিতেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় এ বিষয়ে বাস্তবিক সরকার এবং জমিদারগণের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, এবং এই সব জেলায় রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদী হইতে জল গ্রহণ করিয়া জলাধার বা জলাশয় হইতে জলপ্লাবন করা বিশেষ অসুবিধার কার্য্য নহে।

Canal system বা পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জলসেচন কার্য্যের অনুষ্ঠান কেবলমাত্র এক মেদিনীপুর ভিন্ন বাঙ্গালায় আর কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু গবর্ণমেণ্ট করেন নাই। জলপাইগুড়ি ও বর্দ্ধমানে কিছু আছে বটে, কিন্তু মোটের উপর ১,০৭,০৪৫ একার মাত্র ভূমিতে বাঙ্গালাদেশে সরকারি সাহায্যে জল সেচন হইয়া থাকে। নিম্নের তালিকাটি বাঙ্গালায় কৃত্রিম উপায়ে জলপ্লাবনের বিবরণ দেখাইতেছে:—

যে উপায়ে জলপ্লাবন হয়	একার ভূমি
সরকারি কেনাল	১,০৭,০৪৫
বেসরকারি কেনাল	১,৬১,৪৩২
জলাশয়	৯,৯০,২৫৮
কূপ	১৬,৩৮৫
অন্য উপায়	১০,৪৮,৭৩৯
মোট	২৩,২৩,৪৫৯

বাঙ্গালার কৃষিকার্য্যে জলসেচন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসিন্যের সম্যক পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর কেনালের আয়ব্যয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য পাঠ করিয়া মনে হয়, বাঙ্গালাদেশে পূর্ত্তবিভাগ হইতে খরচের অনুপাতে শতকরা লাভের হার কম থাকাই ইহার প্রধান কারণ।—

"State irrigation works have never hitherto proved remunerative in Bengal. * * * The three major works which have been constructed are all unremunerative. The Orissa Canals to which reference has already been made, do not pay their working expenses, and the Sone Canals in Southern Behar, which are the most successful, do not on the average yield more than 3 per cent on their capital cost. * * * * until higher rates for water can be obtained from the people, such works are never likely to be remunerative."

"বঙ্গদেশে রাজসরকারের প্রবর্ত্তিত জলসেচন কার্য্য এপর্য্যন্ত লাভজনক হয় নাই। অনুষ্ঠিত তিনটি প্রধান ব্যাপারই লাভশূন্য। উড়িষ্যার খালসমূহ নিজ ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ এবং দক্ষিণ বিহারের শোণাকেনালগুলি চরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও মূল ব্যয়ের উপর গড়ে শতকরা ৩ টাকার অধিক লাভ করিতে সমর্থ হয় না। জলের জন্য লোকসাধারণের নিকট উচ্চহার না পাইলে এরূপ কার্য্য কখনই লাভজনক হইতে পারে না।" *

আমরা এক্ষণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতে নবপ্রবর্ত্তিত পূর্ত্তনীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। আমরা এক্ষণে পূর্ত্তবিভাগ কেবল জলসেচন বিভাগ অর্থে ব্যবহার করিব।

পূর্ত্তবিভাগের সমস্ত কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত—Major Works 'প্রধান ব্যাপার এবং Minor Works 'অপ্রধান ব্যাপার'। 'প্রধান ব্যাপার'গুলির মধ্যে যেগুলি অনুষ্ঠান মাত্রেই লাভজনক হইবে এরূপ আশা করা যায়, সেগুলিকে Productive Public Works, অথবা 'উৎপাদক পূর্ত্তকার্য্য' বলা হয়। লর্ড লরেন্সের শাসনকালে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, এই নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর, ১৯০৩ সালের মধ্যে উক্তরূপ কার্য্যে ৩৮ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ঐ-সকল কার্য্য ঋণলব্ধ অর্থ দ্বারাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ১৮৭৬ সালে এক ভীষণ মন্বন্তর উপস্থিত হয়। তাহার পরও উপর্য্যুপরি অনেকবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ কোন দুর্ভিক্ষ বা অনিশ্চিত অভাব সহজে রোধ করিতে পারিবেন এই বিবেচনায় বাৎসরিক ১॥০ কোটি টাকায় একটি দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার স্থাপন করিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের Famine Commission স্থির করিলেন যে উল্লিখিত Famine Insurance Grant হইতে অর্থ লইয়া প্রতি দুর্ব্বৎসরে

* Imperial Gazetteer Vol III. পৃঃ ৩৪০

Protective Works বা "রক্ষাপ্রদ ব্যাপারের" অনুষ্ঠান করা হইবে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ রক্ষাপ্রদ জলসেচন ব্যাপারে মাত্র ২॥০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। উল্লিখিত Productive ও Protective উভয় প্রকার ব্যাপারই Major Works নামে অভিহিত হয়।

Minor Works বা অপ্রধান ব্যাপার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি দেশী পূর্ব্বপরিচালিত লুপ্ত অনুষ্ঠানের পুনরুদ্ধার করিয়া জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৯০২।০৩ সালে বাঙ্গলায় মূল ব্যয়ের অনুপাতে Major Works হইতে গড়ে শতকরা ১'৬ রাজস্ব আদায় হইয়াছে, এবং Minor Works হইতে গড়ে শতকরা—০'৪ রাজস্ব আদায় হইয়াছে ; ঐ সময়ে পাঞ্জাবে Major Works হইতে গড়ে ৯'৭ এবং কোন বিশেষ পয়ঃপ্রণালী, যথা চেনাবকেনাল, হইতে শতকরা ২৯.৩, রাবি দোয়াব কনাল হইতে ১২'৯ রাজস্ব আদায় হইয়াছে, Minor Works হইতে শতকরা মোট ৮'০ রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছে। মান্দ্রাজে রাজস্বের পরিমাণ পঞ্জাবের অনুরূপ এবং 'কাবেরী ডেণ্টাসিষ্টেম' নামক জলসেচন-ব্যাপার হইতে ঐ বৎসর শতকরা মোট ৮'০ রাজস্ব আদায় হইয়াছে। সিন্ধু প্রদেশে Major Works হইতে গড়ে শতকরা ৫'০ এবং Minor Works হইতে গড়ে শতকরা ২'০৪ রাজস্ব আদায় হইয়াছে। ১৯০২-০৩ সালে যুক্তপ্রদেশে Major Works হইতে গড়ে মোট শতকরা ৭'০ এবং Minor Works হইতে ২'৮ রাজস্ব আদায় হইয়াছে; বোম্বাই প্রদেশের জলসেচন বিভাগের রাজস্ব ঐরূপ যথাক্রমে ১'৯ ও ০'৪। উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে বাঙ্গলার পূর্ত্তবিভাগের রাজস্ব-আয় ভারতবর্ষীয় অপর সকল প্রদেশের রাজস্ব আয় অপেক্ষা অল্প। এত অল্প লাভই বাঙ্গলায় পূর্ত্তকার্য্য বিস্তার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আলস্যের কারণ। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আলস্যের আরও একটি কারণ আছে। বেঙ্গল কাউন্সিল রেগুলেশন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালায় জমিদারদিগকে তাঁহাদের অধিকৃত জমির মালিক proprietors of the soil) বলিয়া স্বীকার করেন। ১৭৯৩ সালে স্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক আইন (Bengal Permanent Settlement Regulation) প্রচারিত হয়। ঐ আইনের ৭ ধারায় এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—

"The Governor General in Council trusts that the proprietors of land, sensible of the benefits conferred upon them by the public assessment being fixed for ever, will exert themselves in the cultivation of their lands, under the certainty that they will enjoy exclusively the fruits of their own good management and industry, and no demand will ever be made upon them, or their heirs or successors, by the present or any future government, for an augmentation of the public assessment in consequence of the improvement of their respective estates."

"ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে, ভূস্বামীগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শুভফল অবগত হইয়া, এবং স্বীয় সুব্যবস্থা ও অধ্যবসায়ের ফল নিজেরাই ভোগ করিবেন ও তাঁহাদের পরস্পরের জমিদারির উন্নতির পরিণামে তাঁহাদের, কিম্বা তাঁহাদের ওয়ারিশ-গণের নিকট হইতে, বর্ত্তমান, অথবা ভবিষ্যত কোন গবর্ণমেণ্ট, কোনকালে রাজস্ব বৃদ্ধির দাবি করিবেন না, ইহা অবধারিত জানিয়া, তাঁহারা কৃষিকার্য্যে বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করিবেন।" এতএব জল সেচনাদি প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভূমির উন্নতি সাধন করিলে তাহার ফল ভূস্বামীই লাভ করিবেন, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব এক কপর্দক বৃদ্ধি হইবে না, সেই কারণেও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট জলসেচন-কার্য্যে উদাসীন; সেই জন্যই গবর্ণমেণ্টের প্রতি রিপোর্ট বা বিবরণে প্রকাশ যে এ বিষয়ে দেশীয় জমিদারগণের চেষ্টা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ডাঃ ভোয়েলকার (Dr. Voelker) তাঁহার Report on the Improvement of Indian Agriculture (১৮৯৭) নামক পুস্তকে, ৮১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—

"It is to assist the people in works which they can carry out themselves and to do what they cannot do, that efforts of Government should be put forward. The initiative must now rest more than ever with Government * * * * "

"যে সকল ব্যাপার জনসাধারণ নিজেরা চালাইতে পারে সেই সকল কার্য্যে সাহায্যার্থে, এবং যে সকল কার্য্যে তাহারা করিতে পারে না, তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত। কার্য্যের সূচনা পূর্ব্বাপেক্ষা এখনও বেশী পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছে।" ঐ পুস্তকের ৮৩ পৃষ্ঠায় ডাক্তার ভোয়েলকার আবার বলিয়াছেন—

"There is no doubt that a great deal can be done to improve the water supply in precarious districts, if Governments are prepared to look on the measures taken as those of a protective and not purely a remunerative nature. This is well-expressed in a note by Colonel Mead, Chief Engineer for Irrigation, Madras. He said in 1887 : 'Much can no doubt be done to improve the existing supply to tanks if Governments are prepared to accept the benefit to the raiyat as a sufficient return for the outlay incurred, and to consider the works as entirely protective in nature.' "

"একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে, যদি গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত উপায়-সকল কেবল মাত্র লাভজনক ব্যবসায় জ্ঞান না করিয়া, রক্ষাপ্রদ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে অনিশ্চিত দেশগুলিতে জলসেচনক্রিয়ার যথেষ্ট উন্নতি করা

যাইতে পারে। মান্দ্রাজের জলসেচন বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়র কর্ণেল মীড তাঁহার এক মন্তব্যে ঐ মত বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ১৮৮৭ সালে বলিয়াছিলেন যে কৃষকের মঙ্গলজনক পরিণামই খরচের যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে গবর্ণমেণ্ট যদি প্রস্তুত থাকেন এবং ঐ-সকল কার্য্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষাপ্রদ বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান জলাশয়গুলির অনেক উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে।”

এই বিষয়ে জনসাধারণের বিশেষ উপকার করিবার আর-একটি পন্থা বা উপায় সরকারের হস্তে আছে। বোম্বাই, পাঞ্জাব, মুলতান, প্রভৃতি স্থানে ইহার বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রদেশে কূপ ও পুষ্করিণী নির্ম্মাণ এবং সংস্কার-কার্য্যে “তাকাবি” প্রথা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহার নিয়মানুসারে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক শতকরা ৬।০ টাকা সুদে চাষীদিগকে কৃষিসম্বন্ধীয় উন্নতি, প্রধানতঃ কূপাদি খনন, নিমিত্ত টাকা ধার দিয়া থাকেন। এই প্রথার প্রচলন বাঙ্গালায় একেবারে নাই। বাঙ্গালায় জমিদারগণের খাজনার সহিত সম্বন্ধ, জমির উৎপন্ন শস্যের আধিক্যের বা হ্রাসের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই; তাঁহারাও অনেকে এত ঋণভারাক্রান্ত যে জলসরবরাহের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে একেবারে অক্ষম। কৃষকগণও এত দরিদ্র যে সাহায্য ব্যতীত ঐ বিষয়ে কিছু করিতে একেবারে অসমর্থ। গবর্ণমেণ্টও জমিদারের সহিত রাজস্ব আদায়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অব্যাহিত লাভ করিয়াছেন, প্রজার অবস্থার উন্নতি হইলে তাঁহাদের যখন অতিরিক্ত অর্থলাভের আশা নাই তখন তাঁহারই বা এ বিষয়ে চেষ্টা করেন কেন?

উল্লিখিত কারণসমুদয়ের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালার কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন-ব্যাপার, মহাসমুদ্রে কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে।

দেশের মধ্যে শস্যাভাব কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট রেল বিস্তার কার্য্যে অনেক অর্থ এবং শক্তি ব্যয় করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ঋণ করিয়া এবং Famine Insurance Grantএর অধিকাংশ অর্থ লইয়া ভারতবর্ষে রেল-বিস্তার করিয়াছেন। কোন্ বৎসর পর্য্যন্ত কত টাকা গবর্ণমেণ্ট উক্ত Loan এবং Grant হইতে গ্রহণ করিয়া রেলবিস্তার কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করি না; তবে মোটামুটি একথা বলা যাইতে পারে যে জলসেচন-কার্য্য অপেক্ষা রেলবিস্তারে অনেক অধিক উদ্যম করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রেলবিস্তারের হেতুবাদ এইরূপ—দেশে রেল বিস্তার হইলে খাদ্যশস্যাদি দেশের মধ্যে সহজে চলাফেরা করিতে পারিবে, এবং কোন মন্বন্তরের সময় অভাবগ্রস্ত প্রদেশের যাবতীয় লোক সকলেই অন্নাভাবে না মরিয়া অন্যদেশ হইতে আগত শস্যের সাহায্যে জীবনধারণে সক্ষম হইবে; অর্থাৎ কোন এক দেশের অভাবের আতিশয্য হ্রাস হইবে। দেশের প্রধান শস্য-বিপণিসকল নিকটবর্ত্তী করিয়া ভূস্বামী এবং কৃষক-দিগকে অর্থলাভে সাহায্য করিবে। তদ্ব্যতীত রেলরোড ব্যবসায়ের জন্মদাতা, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ফলে কি হইয়াছে। রেলরোড অভাবের আতিশয্য দেশময় বিস্তার করিয়াছে, সাধারণলোকে শস্যসঞ্চয়ের অভ্যাস হারাইয়াছে, শস্যবিক্রয়ের ফলস্বরূপ কৃষকের লাভ না হইয়া দালালগণের হস্তে অর্থ যাইতেছে, রেলরোড কেবলমাত্র শস্য-আদান-প্রদানের সুবিধা করে, শস্য-উৎপাদনে ইহার কোন ক্ষমতা নাই; পয়ঃপ্রণালী শস্য উৎপাদন ও বহন উভয় কার্য্যই করিতে সক্ষম। রেলরোড দুর্ভিক্ষভার অপনোদন করিতে কতদূর অক্ষম তাহার দৃষ্টান্ত বর্দ্ধমান বাঁকুড়া। রেলরোড না থাকিলে আরও অধিক লোক মরিত স্বীকার করি, কোন জনসাধারণ বিনামূল্যে শস্য বিতরণ না করিলে এবং

রাজসরকার "Famine declare" না করিলে কোন ব্যক্তিকে বাঁচান যাইত না। দেশে অর্থাভাব এবং শস্যাভাব দুইই আছে, লোকের অর্থ না থাকিলে শস্য আনিয়া লাভ কি? সে শস্য ক্রয় করিবে কে? উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীত রেলরোডের বিপক্ষে দেশের স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতি সম্বন্ধীয় অনেক কথা বলিবার আছে। বর্ত্তমান সরকারি মতে "দেশের মধ্যে রক্ষাপ্রদ প্রধান রেলপথগুলি যতদূর সম্ভব শেষ করা গিয়াছে,এবং ১৮৯৮ ও ১৯১১ সালের Famine Commissions এক্ষণে দেশের মধ্যে রক্ষাপ্রদ জলসেচন-প্রণালীর অধিকতর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।"*

(২) অনাবৃষ্টি নিবারণের উপায়—সংরক্ষিত বনভূমি।

অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত উল্লিখিত প্রত্যক্ষ উপায় ব্যতীত একটি পরোক্ষ উপায় আছে, সেটি সরকারি Reserved Forests বা সংরক্ষিত বনভূমি। উচিত পরিমাণে বনভূমি সংরক্ষণ সেই প্রদেশের বৃষ্টিপাত অতি আশ্চর্য্য উপায়ে সংযত হয়। সংরক্ষিত বনভূমি হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে চাষের সুবিধা হয়। বনভূমিতে বৃষ্টির জল পড়িয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে। সেই সঞ্চিত জল ক্রমে-ক্রমে বহিয়া নিকটস্থ ক্ষেত্র-সকল আর্দ্র করে। বৃক্ষাদির পত্র হইতে বাষ্পাকারে উদ্গত জলকণা চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলকে প্রচুর পরিমাণে শীতল করে। বায়ু শীতল হইলে বায়ুস্থিত জলকণা উড়িয়া না গিয়া সহজে জমিয়া যায় এবং ফলে অল্প-অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে, তদ্ব্যতীত ঐ কারণে বৃক্ষাদিবহুল স্থানের নিকটে যে অধিক পরিমাণে শিশির পড়ে তাহা সকলেরই জানা আছে এবং শিশিরও কৃষিভূমিকে ভিজাইয়া রাখে। ডাঃ ভোয়েলকার বলেন যে ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠে মনে হয় যে কৃষিকার্য্যের বিস্তাতির সহিত ভারতের বনভূমি ও পশুচারণের স্থানাদি অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হওয়ায়, ভারতে জলবায়ুর বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বনভূমি গোমহিষাদির আহার যোগাইয়া অন্নাভাবের বৎসরে তাহাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। বনভূমির সহিত বৃষ্টির এবং চাষের সুবিধার সম্বন্ধ Dr. T. Croumbie Brown লিখিত Forests and Moisture নামক গ্রন্থ অতি সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

অনাবৃষ্টির ক্ষতিপূরণের জন্য গভর্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

অতএব অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টির প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপায়গুলি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১। ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচারের নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী বা সভা বা কমিটি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দেশীয় জলসেচন-বিষয়ে কৃষকদিগের অনুকরণযোগ্য প্রথাগুলি বাঙ্গলার কৃষকদিগের সম্মুখে স্থাপন করিবেন।

২। এগ্রিকাল্চারাল ফার্ম্স্ বা কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্রে এ-সকল ভিন্ন-দেশীয় প্রণালীর উপযুক্ততা এবং উপকারিতা গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিবেন ও কৃষকদিগকে পরীক্ষা-লব্ধ ফল শিক্ষা দিবেন।

৩। জনসাধারণের মধ্যে ঐ-সকল উপায়ের বিবরণ ও তাহাদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল পুস্তিকাকারে প্রচার করিবেন।

৪। জমিদারগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং জলসেচন-প্রণালীর উপায় স্থানবিশেষে প্রচলন করিবেন।

* Imperial Gazetteer Vol, III. পৃঃ ৳৯৬

৫ তাকাবি প্রথা প্রচলন করিয়া দরিদ্র কৃষকদিগকে অর্থ সাহায্য করিবেন এবং সেই অর্থে যাহাতে তাহারা ক্ষেত্রের অভীষ্ট পরিবর্ত্তন করে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

৬। কৃষি-বিভাগ উল্লিখিত উপায়ে বাঙ্গলায় কত পরিমাণ সংরক্ষিত বনভূমি থাকা উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া যদি আবশ্যক হয় তাহার বিস্তার করিবেন এবং রেলপথ কেনাল ও রাজপথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপণ করিবেন।

অনাবৃষ্টির ক্ষতিপূরণের জন্য জমিদারগণের কর্ত্তব্য।

এবিষয়ে জমিদারগণের কর্ত্তব্য এইরূপ—

১। নিজ নিজ জমিদারির মধ্যে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র জলাধার নির্ম্মাণ ও তাহা হইতে কৃষকদিগের ক্ষেত্রে জলসেনের সুবিধা করিয়া দিবেন। Public Demands Recovery Actএর সাহায্যে তাহাদের নিকট হইতে জমিদার তাঁহার ব্যয় আদায় করিয়া লইতে পারেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনেও জমিদারের চেষ্টায় উন্নত জমির উচ্চহারে খাজনা আদায় করার ক্ষমতাও আছে।

অনাবৃষ্টির ক্ষতিপূরণের জন্য জনসাধারণের কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে আমরা, দেশবাসীরা, যে সম্পূর্ণ উদাসীন তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দারিদ্র্য অত্যন্ত অধিক তাহা স্থির, কিন্তু যাহারা সক্ষম তাহারাও একটু খরচ কিম্বা কষ্ট করিয়া ক্ষেত্রের উন্নতি করিতে একেবারে অনিচ্ছুক, আমাদের সেই পুরাতন রীতি চলিয়া আসিবে, তাহার উন্নতির কোন চেষ্টা আমরা করি না। আমাদের সাধ্যমত পুষ্করিণী বা কূপ নির্ম্মাণ করিয়া, নূতন ফসল বপন করিয়া, চাষের উন্নতির সমধিক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র —প্রবাসী।

বাগানের মাসিক কার্য্য

কার্ত্তিক মাস

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সজীবীজ বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ-আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুরী, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবি শস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবিফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত নতুবা বৃষ্টিতে ক্ষতি

হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায় সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্পাদি—সুল্প, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রঁধুনি ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনেরও এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করিতে হয়।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে— ৫ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটোল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কলা বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পিঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এত দিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কাল বিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকাকালে কলিচূণের ছিটা দিলে বা অল্প পরিমাণ গুঁড়া চূণ ছড়াইয়া দিলে বাঙলা দেশে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বাঙলা দেশের মাটি বড় রসা এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার হয়।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৮-শ খণ্ড। | অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩২৪ সাল। | ৮।৯ সংখ্যা।

উদ্ভিদ জগত

শ্রীশশীভূষণ সরকার
গোবিন্দপুর কৃষিক্ষেত্রের তত্বাবধারক লিখিত।

প্রকৃতির কার্য্য।

(১)

সাধারণতঃ প্রাণীজগতই কর্ম্মশাল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, চাকুরী, কল কারখানা, আহার, নিদ্রা, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কত শত কার্য্য আমাদের, মধ্যে চলিতেছে তাহা সকলেই জানে কিন্তু উদ্ভিজ্জগতে যে কি বিচিত্র কার্য্য সততঃ সম্পাদিত হইতেছে তৎপ্রতি অতি অল্প লোকেই বোধ হয় দৃষ্টি করিয়া থাকেন। উদ্ভিদ জগত প্রকৃতির একটী প্রধান কর্ম্মস্থল—এখানে তিনি নানাবিধ কল চালাইতেছেন। তিনি ইহার একমাত্র পরিচালিকা এবং তাহার নিয়ম সর্ব্বত্রই এক প্রকার। অরুণ, বরুণ ও এমন কি পত্রাভ্যন্তরস্থ হরিৎবর্ণ পদার্থসমূহও তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে এতদ্ব্যতীত নানাবিধ উদ্ভিদাণু প্রভৃতি আরও কত শত ভৃত্য ইহার দৃঢ় নিয়ম ও শাসনের অধিন হইয়া অনবরত কার্য্য করিতেছে। বিবিধ ভৌতিক পদার্থ বিভিন্ন যন্ত্র দ্বারা বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে পরিণত হইয়া আমাদের আহার, বসন, উপবেশন ও সুখ সচ্ছন্দতার যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিতেছে। আমাদের কার্য্য করিবার শক্তি নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থে অনবরত সঞ্চিত হইতেছে; শর্করা, শ্বেত সার, তৈলময় ও জৈব পদার্থ, মাদকদ্রব্য, ঔষধ প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি মাত্র কিন্তু এই

সমুদয় সৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। কাষ্ঠ হইতে আমরা নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত করিতে পারি কিন্তু কাষ্ঠ প্রস্তুত করা সুকঠিন। এইরূপ সমগ্র পদার্থের জন্য আমরা এক মাত্র প্রকৃতির অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী।

প্রকৃতির তেজ সঞ্চয়ী যন্ত্র—বর্ণমালার কয়েকটী বর্ণ দ্বারা যেরূপ একটী ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে তদ্রূপ কয়েকটী ভৌতিক পদার্থ দ্বারা যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। অম্লজান ও জলজান যোগে জল সৃষ্টি হইয়াছে; অঙ্গারজান ও অম্লজান যোগে অঙ্গারক অম্ল উৎপন্ন হয়; এই জল ও অঙ্গারক অম্ল ও পত্রাভ্যন্তরস্থ হরিৎবর্ণ পদার্থ সূর্য্যোত্তাপে শর্করায় পরিণত হয়; শর্করা শ্বেতসারে ও শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হইতে পারে; এইরূপ ক্রমান্বয়ে জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে আবার শ্বেতসার, সূত্র, শর্করা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। শর্করা পচিয়া অম্ল হয়; তৎপরে অধিক পচিলে এসেটিক অম্লে পরিণত হয়; এইরূপ দেখা যায় যে যাবতীয় পদার্থ ক্রমান্বয়ে সরল হইতে জটীল ও জটীল হইতে সরল পদার্থে পরিণত হয়। সরল পদার্থ যতই জটিল হইতে থাকে ততই অধিক তাপ সঞ্চয় হইয়া থাকে; শ্বেতসার অথবা শর্করার মধ্যে যেরূপ তাপ থাকে তদপেক্ষা জৈব পদার্থে অধিকতর তাপ থাকে। ঐ তেজ আবার সূর্যোত্তাপ হইতে এই সমুদয় পদার্থে প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। তেজই কার্য্য করিবার মূল শক্তি, ইহা যে পদার্থে অধিক বর্ত্তমান থাকে তাহার কার্য্য করিবার শক্তিও অধিক। শ্বেতসার ভক্ষণে আমাদের যেরূপ কার্য্য করিবার শক্তি হয় তদপেক্ষা জৈব পদার্থ দ্বারা অধিক জন্মে। আবার জল কিম্বা অঙ্গারক অম্লে অত্যল্পই জন্মিতে পারে। এই অন্তর্নিহিত তেজ, পরিচলিত হইলে কোনরূপ কার্য্যে পরিণত হয় অথবা তেজ বিকীর্ণ হইয়া যায়।

একটী বৃক্ষের জীবিতাবস্থায় উহার মধ্যে দ্বিবিধ কার্য্য চলিতে থাকে;—(১) উহার অবয়ব সংগঠন ও তন্মধ্যে তাপ সঞ্চয়।

(১) কোষ মধ্যস্থ জৈব পদার্থের বিশ্লেষণ ও তাপ বিকীরণ কিম্বা তাহার কার্য্য সম্পাদন। বৃক্ষের অন্তর্নিহিত তেজ উহা দাহন কিম্বা অন্য কোন রূপে বিশ্লেষণ করিলে উপলব্ধি হয়। কয়লা ও কাষ্ঠ দাহন করিলে যে তেজঃপুঞ্জ বাহির হয় উহা বৃক্ষ মধ্যে সঞ্চিত ঘনীভূত সূর্য্যোত্তাপ মাত্র। ফল পরিপক হইলে উহা হইতে যে তেজ বাহির হয় তাহা তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরিমিত হইতে পারে। উদ্ভিজ্জ অন্ন খাইয়া আমাদের কার্য্য করিবার শক্তি উৎপাদিত হয়। বৃক্ষ কোষের কার্য্য করিবার শক্তি কমিয়া গেলে উহা পচিতে আরম্ভ করে ও তাপ বিকীর্ণ হয় ইহা নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। শর্করা পচিয়া অম্ল হয়; যে উদ্ভিদাণুর সাহায্যে ইহা পচে সে কেবল তাহার আহারীয় গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু উত্তাপ জন্মায় না। একই জাতীয় উদ্ভিদণুর সাহায্যে একটী দ্রব্য পচে না, বহুবিধ কারণে পচিয়া থাকে। যখন এক জাতীয়

অণুর কার্য্য শেষ হয় তাহারা মরিয়া যায় এবং অন্য একটী জাতি কার্য্য আরম্ভ করে এই রূপ কার্য্য ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকে। কিন্তু ইহারা ইহাদের পোষণার্থ অন্ন গ্রহণ করে; তাহার ফলে অন্তর্নিহিত তাপ বিকীর্ণ হইয়া থাকে। এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে আমাদের কার্য্য করিবার বা করাইবার শক্তি, প্রকৃতি, বিভিন্ন ফলে মূলে, কাণ্ডে প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পদার্থে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন; আমরা এই সমস্ত উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ভোজন, দাহন অথবা অন্য কোনরূপে ব্যবহার দ্বারা তেজপ্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে বা করাইতে সক্ষম হই মাত্র।

(২) প্রকৃতির শর্করা প্রস্তুতের কল—জল ও অঙ্গার সংযোগে শর্করা জন্মে কিন্তু তাই বলিয়া এই উভয় পদার্থ একত্র এক পাত্রে রাখিলে শর্করা হইবে না। এই সম্মিলনের জন্য হরিৎবর্ণ পত্র ও সূর্য্যোত্তাপ একান্ত আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে হরিৎবর্ণ পত্রই শর্করা প্রস্তুতের প্রধান যন্ত্র। আমাদের জলের অভাব নাই; অঙ্গারকাম্লও যথেষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই উভয়ের সম্মিলনে যখন উপাদেয় শর্করা উৎপন্ন হয়, তখন দেখা যাইতেছে যে ইহার মধ্যে মূল্যবান পদার্থ কিছুই নাই। তবে যাহাতে হরিৎবর্ণ পত্রসমন্বিত বৃক্ষ উৎপাদন করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। এইরূপ সকল পত্রেই শর্করা জন্মে বটে কিন্তু বৃক্ষ বিশেষে অল্পাধিক পরিমাণে কাণ্ডে, মূলে, কিম্বা ফলে ইহা সঞ্চিত হইয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ বৃক্ষের পোষণার্থ ব্যয় হইয়া থাকে। ইক্ষু, বিট, খর্জ্জুর, ভুট্টা প্রভৃতিতে অধিক পরিমাণে শর্করা সঞ্চিত থাকে বলিয়া ইহাদের বিস্তৃত চাষ করিলে প্রাকৃতিক কলের দ্বারা বহুল পরিমাণে শর্করা উৎপাদন করা যইতে পারে।

(৩) প্রকৃতির শ্বেতসার প্রস্তুতের কল—

জল ও অঙ্গার হইতে যেরূপ শর্করা জন্মে তদ্রূপ এই উভয় পদার্থ হইতে শ্বেতসারও জন্মিয়া থাকে। শর্করার অবস্থান্তরেই শ্বেতসার হয়; ইহার জন্ম, বৃক্ষের হরিৎবর্ণ পত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। শর্করা জলে দ্রবনীয় কিন্তু শ্বেতসার তদ্রুপ নহে। চাউল, গম, যব, ভুট্টা, আলু, সিমুল আলু প্রভৃতিতে অধিক শ্বেতসার সঞ্চিত থাকে, সুতরাং ইহাদের বিস্তৃত আবাদই শ্বেতসার উৎপাদনের প্রধান উপায়।

এইরূপ দেখা যায় যে প্রকৃতি নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য নানা প্রকার কল খুলিয়া রাখিয়াছেন; প্রকৃতি নিয়মের পক্ষপাতী; তাঁহার কৃপালাভ করিতে হইলে তাঁহার নিয়ম জানা আবশ্যক; ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে তিনি স্বতঃই আমাদের সাহায্য করিয়া থাকেন সুতরাং যাহাতে আমরা ঐ সমস্ত নিয়ম শিক্ষা করিতে পারি তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

উদ্ভিদ বৃত্তান্ত।

(২)

চির-তুষারাবৃত অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ, গভীর সমুদ্রেরতলদেশ, উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি আগ্নেয় গিরির গহ্বর প্রভৃতি কয়েকটী স্থান ব্যতীত ভূমণ্ডলের সর্ব্ব স্থলেই কোন না কোন প্রকারের উদ্ভিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে প্রাণী অপেক্ষা উদ্ভিদের সংখ্যা কম নহে। বস্তুতঃ সমস্ত ক্রিয়াশীল পদার্থ উদ্ভিদ এবং প্রাণী এই দুইটি মূল ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত ক্রিয়াশীল পদার্থেরই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ রহিয়াছে, প্রথমতঃ উহাদের সকলেরই জীবন আছে। দ্বিতীয়তঃ সকলেই নির্দ্দিষ্ট কাল জীবিত থাকে। তৃতীয়তঃ সকলেই জীবন ধারণ করিবার জন্য আহার সংগ্রহ করে এবং আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক করিয়া স্বীয় স্বীয় শরীরের পুষ্টি সাধন করে। কয়লা মৃত্তিকা প্রভৃতি কোন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় পদার্থেই এ সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ইহাদের সাধারণতঃ জড় আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ, প্রাণী জীবনের প্রধান অবলম্বন। সকল প্রাণীকেই জীবন ধারণের জন্য সাক্ষাত অথবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। অনেকের হয়ত মনে হইতে পারে যে, এমন অনেক প্রাণী আছে (যথা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি) যাহারা কখনও উদ্ভিজ্জ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে না। সত্য, কিন্তু তাহারা যে সমস্ত প্রাণী ভক্ষণ করিয়া শরীর পোষণ করে তৎসমুদয় উদ্ভিদ খাইয়া পরিপুষ্ট। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, দেখা যায় যে সমস্ত প্রাণীরই মূল খাদ্য উদ্ভিদ। কারণ কোন প্রাণীই ধাতব পদার্থ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে উদ্ভিদ মৃত্তিকা এবং বায়ু মণ্ডল হইতে ধাতব অধাতব সমস্ত পদার্থই গ্রহণ করিতে পারে এবং তৎসমুদয়ের সাহায্যে প্রাণীদিগের আহারোপযোগী উপাদান প্রস্তুত করিতে পারে।

উদ্ভিদ আমাদের কত উপকারে আইসে, কার্য্যতঃ তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। মানব যখন সভ্য হয় নাই, তখন অরণ্যেই বাস করিত। তখন তাহার গ্রাসাচ্ছাদন এবং শরীর রক্ষণের সমস্ত প্রয়োজনই উদ্ভিদ দ্বারা সাধিত হইত। এখনও কত অসভ্য জাতি পত্র ও বল্কল পরিধান করে, বন্য শস্য আহার করে এবং পত্র কুটীরে অথবা বৃক্ষ শাখায় অবস্থিতি করে। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত উদ্ভিদের একাধিপত্য যেমন কমিয়া গিয়াছে, তেমনই উহার ব্যবহারের প্রকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই তাহা অনুভূত হইবে। আমরা রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য, যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করি তাহার মধ্যে অধিকাংশই উদ্ভিজ্জ্য। পাট, তুলা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদের সূত্র হইতে আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের গৃহ সজ্জা, গৃহের উপকরণ বহুবিধ নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমস্তই

উদ্ভিদ-সম্ভূত। সর্ব্বশেষে আমাদের আহার্য্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি দ্রব্য উদ্ভিজ্জ্য। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমরা উদ্ভিদ হইতে এতৎসমুদয় উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ যে আমাদের কত উপকার সাধন করিয়া থাকে তাহা ভাবিয়া দেখিলে উদ্ভিদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইতে হয়। উদ্ভিদ না থাকিলে পৃথিবীতে প্রাণীর জীবন অসম্ভব হইত। প্রখর রৌদ্রে বৃহৎ বৃক্ষের ছায়া মধুর বলিয়া বোধ হয়। বৃক্ষ স্বীয় শাখা দ্বারা সূর্য্য কিরণ রোধ করিয়া তাহার নিম্নদেশ সুশীতল করিয়া রাখে। যদি বৃক্ষাদি না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবী একটি অসীম সাহারায় পরিণত হইত। অনাবৃষ্টির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইত। উপযুক্ত পরিমাণ শৈত্যের অভাবে এবং অত্যন্ত তাপের প্রভাবে প্রাণীকুল নির্ম্মূল হইত।

এবম্বিধ উপকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞান সংগ্রহ করা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস যে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহকারে উদ্ভিদ বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে অন্য কোন বিদ্যাই উহার ন্যায় চিত্ত-আকর্ষক হইতে পারে না। উদ্ভিদ জীবনে কত অত্যাশ্চর্য্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এক আকৃতিতেই কত বৈচিত্র্য। উদ্ভিদ এবং এমন কি যে কোন চেতন পদার্থই ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট। কোন দুইটি বিভিন্ন জাতীয় গাছ, ঠিক একরূপ আকারের নহে। সকলে বৃহৎ অরণ্য হয়ত না দেখিয়া থাকিতে পারেন, এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন আকৃতি উপলব্ধি করিবার জন্য অরণ্য দেখাও আবশ্যক হয় না। প্রত্যেক নগরে এবং গ্রামে বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট উদ্ভিদের অভাব নাই। এক একটি বট বৃক্ষ কত বৎসর ধরিয়া জীবিত রহিয়াছে। শতাব্দীজীবি বটবৃক্ষ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশাল শাখা-প্রশাখা-শালী বটবৃক্ষের সহিত সামান্য তৃণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে কতই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি উভয়েই উদ্ভিদ। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে উদ্ভিদের অবয়ব এবং আকারের কত বৈচিত্র্য। যে স্থানে বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহারই হয়ত অনতিদূরে কোন লতা বৃক্ষ শাখাকে পরিবেষ্টন করিয়া আলোকের আকাঙ্ক্ষায় উর্দ্ধমুখে উঠিতেছে। লতা বাস্তবিকই পরাশ্রয়পরা। ইহারা পরের সাহায্য না পাইলে সুচারুরূপে জীবন যাপন করিতে পারে না। আবার কোন উদ্ভিদ না লতাইয়া মৃত্তিকার উপর বিছাইয়া যায়, যথা ঘাস প্রভৃতি। তৃণ এবং বট বৃক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ আকারের কত উদ্ভিদ রহিয়াছে। বর্ষ-জীবি, দ্বিবর্ষ-জীবি উদ্ভিদ, গুল্ম, ওষধি, শস্য প্রভৃতি বহুবিধ উদ্ভিদের বিবরণ স্থানাভাবে এস্থলে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা গেল না। এতদ্ভিন্ন এমন উদ্ভিদও আছে যাহা চক্ষুর অগোচর, অর্থাৎ যে সমস্ত উদ্ভিদ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে হইলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক হয়। কোন পুষ্করিণীর এক বিন্দু জল যদি অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে প্রত্যেক বিন্দুতে অন্ততঃ শতাধিক উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপে বৃক্ষাদির কাণ্ডে সবুজ বর্ণ

অথবা ধূসর বর্ণ দাগ, পুষ্করিণীর জলে সবুজ বর্ণ ভাসমান পদার্থ, এবং কোন পচনশীল দ্রব্যের উপর শ্বেত বর্ণ স্তর প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের অণু, অন্য কিছুই নহে।

উদ্ভিদের আকার সম্বন্ধে এবম্বিধ বৈচিত্র থাকিলেও তাহাদিগের জীবনধারণ প্রণালী এক প্রকার—যথা দুই এক শ্রেণীর উদ্ভিদ ভিন্ন অপর কোন উদ্ভিদই জল বায়ু আলোক উত্তাপ এবং ধাতব পদার্থ অভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে না। উক্ত কয়েকটি পদার্থ উদ্ভিদ জীবনের মূল উপাদান। কি কারণে এই সমস্ত পদার্থ উদ্ভিদের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় তাহা আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

উদ্ভিদের আহার্য্য।

(৩)

যেমন প্রাণী মাত্রেরই জীবন ধারণ করিবার জন্য খাদ্য আবশ্যক, উদ্ভিদ জাতিরও সেই প্রকার কিছু না কিছু খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয়। এই খাদ্য উদ্ভিদগণ বায়ুমণ্ডল মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ জাতির আহার্য্য বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে, একটী বৃক্ষ পোড়াইয়া, তাহা হইতে নির্গত বাষ্প, ধূম এবং তাহার দহনাবশিষ্ট ভস্মরাশি পরীক্ষা করিতে হইবে। একটী বৃক্ষ দাহন সময়ে প্রথমতঃ উহার তাপাংশ ২১২° ফাঃ হইলেই, উহা হইতে যাবতীয় জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। জলীয় অংশ নিঃশোষিত হইয়া গেলে, উহা হইতে ধূম নির্গত হইবে। তৎপর দহনীয় পদার্থ নিঃশেষ হইলে, সুধু ভস্মরাশি পড়িয়া থাকিবে। এক্ষণে একে একে এই তিনটী জিনিস লইয়া পরীক্ষা করিলে, প্রথমতঃ বাষ্পের ভিতর জলের উপাদান, হাইড্রোজেন দুই ভাগ এবং অক্সিজেন এক ভাগ ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হইবে না; কারণ বাষ্প, জল ব্যতীত আর কিছুই নহে। দ্বিতীয়তঃ ধূমের ভিতর কার্ব্বণ, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং সাল্‌ফার এই পাঁচটী গ্যাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। উল্লিখিত ধূমের অন্তর্গত এই পাঁচটী গ্যাসই উদ্ভিদ-জীবনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক ও উহাদের অবলম্বনস্বরূপ। তৃতীয়তঃ—ভস্মরাশির মধ্যে পটাশিয়ম্, ম্যাগ্‌নিশিয়ম, ক্যালশিয়ম, আয়রণ, ফস্‌ফরাস এবং সালফার এই ছয়টী প্রধান জিনিসও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতদ্ব্যতীত সোডিয়ম্, ম্যাঙ্গানিস, সিলিকন্, ক্লোরিণ এবং অন্যান্য উপাদান প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা উদ্ভিদ জাতির জীবনধারণ পক্ষে তেমন আবশ্যকীয় নহে।

উপরোক্ত যাবতীয় উপাদানরাশির মধ্যে উদ্ভিদ, কার্ব্বণ মাত্র পত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল হইতে গ্রহণ করে; (জলীয় বাষ্পও কতক পরিমাণে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা

কোন কোন গাছের আছে, যথা—লটা ঘাস।) অন্যান্যগুলি শিকড়ের সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে শোষণ করিয়া লয়।

যাবতীয় মৃত্তিকাতেই উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থগুলি অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তবে কোথাও ঠিক উপযুক্ত মাত্রা দেখা যায়, কোথাও বা তাহা নহে। এমতও অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, মৃত্তিকাভ্যন্তরে উদ্ভিদের আহার্য্য যাবতীয় উপাদান বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করা যায় না। সচরাচর এইরূপ হওয়ার দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থলবিশেষে উপযুক্ত শস্যোৎপাদনের অনুকূল যাবতীয় পদার্থ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, উহার ভিতর এমন কোন জাতীয় তীব্রক্ষার অথবা বিষাক্ত জিনিস মিশ্রিত আছে, যাহার তীব্রতায় অপরাপর উপাদনগুলির ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে এই প্রকার অনেক ভূমি দৃষ্ট হয় যে, যাহাতে শস্যোৎপাদনের অনুকূল যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান আছে এবং উহাদের ক্ষতিকারক কোন প্রকার তীব্র কিম্বা বিষাক্ত পদার্থ বর্ত্তমান নাই, অথচ সেই ভূমিতে বহু আয়াসেও কোন প্রকারের শস্য উৎপাদিত হইতেছে না। ঈদৃশ বিস্ময়কর ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, উক্ত মৃত্তিকা-নিহিত উপাদাননিচয় এমন দৃঢ় ভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে যে উদ্ভিদ তাহা হইতে কোন প্রকারেই আপনার আবশ্যকমত আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না, এতদ্ব্যতীত শিকড় দ্বারা শোষণ করিয়া লইতে পারে না। উক্ত দৃঢ়ীভূত উপাদানগুলিকে ভূমি কর্ষণ দ্বারা রৌদ্রোত্তাপে, শীতের প্রভাবে এবং বারি সংযোগে দ্রবীভূত করিয়া লইয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিতে হইবে। নতুবা এই শ্রেণীর জমিতে শস্যোৎপাদন করা এক প্রকার অসম্ভব।

উপাদান সকলের আপেক্ষিক প্রাবল্য অনুসারে মৃত্তিকার রাসায়নিক শ্রেণী-বিভাগ হইয়া থাকে। নিম্নে উদ্ভিদের আহারীয় নয়টী উপাদানের আপেক্ষিক প্রাবল্য অনুযায়ী মৃত্তিকার নয়টী শ্রেণীর নাম প্রদত্ত হইল।

(১) যে মৃত্তিকাতে জলের অংশ অধিক তাহাকে আর্দ্র মৃত্তিকা (Aqueous or moist soil) কহে।

(২) যে মৃত্তিকাতে সোরার অংশ অধিক তাহাকে সোরা-সঙ্কুল মৃত্তিকা (Nitrogenous soil) কহে।

(৩) যে মৃত্তিকাতে ক্ষারের অংশ অধিফ তাহাকে ক্ষার-বহুল মৃত্তিকা (Potahsic soil) কহে।

(৪) যে মৃত্তিকাতে হাড়ের অংশ অধিক তাহাকে হাড়-প্রধান মৃত্তিকা (Phosphatic soil) কহে।

(৫) যে মৃত্তিকাতে চুণের অংশ অধিক তাহাকে চুণ-বহুল মৃত্তিকা (Calcareous soil) কহে।

(৬) যে মৃত্তিকাতে লোহের অংশ অধিক তাহাকে লৌহ-সমন্বিত মৃত্তিকা (Ferruginous soil) কহে।

(৭) যে মৃত্তিকাতে বালুকার অংশ অধিক তাহাকে বেলে মৃত্তিকা (Sillicoous soil) কহে।

(৮) যে মৃত্তিকাতে গন্ধকের অংশ অধিক তাহাকে গন্ধক-প্রধান মৃত্তিকা (Alkaline soil) কহে।

(৯) যে মৃত্তিকাতে গন্ধকের অংশ অধিক তাহাকে গন্ধক-প্রধান মৃত্তিকা (Sulphurous soil) কহে।

এখন আমরা বিচার করিয়া দেখিব, উদ্ভিদ তাহাদের উল্লিখিত আহার্য্যের মধ্যে কোন্ উপাদান কি পরিমাণ গ্রহণ করে। মাটির ভিতরে উদ্ভিদের আহার্য্য যে পরিমাণে দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক উদ্ভিদের জীবন-ধারণ করিতে তাহার অতি সামান্য অংশ মাত্র ব্যয়িত হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, এক খণ্ড উর্ব্বরা ভূমিতে শতকরা ২ অংশ মাত্র নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরিক এসিড উহার কম পরিমাণ; এবং পটাশ শতকরা ৫ অংশের প্রয়োজন। এক একর পরিমিত এক খণ্ড উর্ব্বরা ভূমির ৫ ইঞ্চি পরিমাণ প্রথম স্তর হইতে যদি উহার আভ্যন্তরীণ জলীয় বাষ্প সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া যায়, অর্থাৎ ঐ মৃত্তিকাস্তর সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হয়, তবে উহার ওজন ১৬০০০০০ লক্ষ পাউণ্ড হইবে এবং উক্ত মৃত্তিকাখণ্ডে উল্লিখিত অনুপাত অনুযায়ী উদ্ভিদের আহার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। উল্লিখিত অনুপাত অনুসারে গণনা করিলে এই ষোল লক্ষ পাউণ্ড মাটির মধ্যে ৩২০০ শত পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৩২০০ পাউণ্ড ফস্‌ফরিক এসিড, এবং ৮০০০ হাজার পাউণ্ড পটাশ বর্ত্তমান থাকিবে। যদি এক এক জমিতে ২০৵০ মণ অথবা ১৬০০ শত পাউণ্ড গম এবং ৩০৵০ মণ অথবা ২৪০০ শত পাউণ্ড খড় জন্মায় তাহা হইলে ইহার জন্য ৪০ পাউণ্ড মাত্র নাইট্রোজেন, ২০ পাউণ্ড ফস্‌ফরিক এসিড্ এবং ২৬ পাউণ্ড পটাশের আবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে এই এতগুলি শস্য তাহাদের জীবন ধারণ করিবার জন্য কত সামান্য উপাদান মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিল।

এই স্থানে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে শুধু রাসায়নিক পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই কোন ভূমির কৃষি-কার্য্যের উপযুক্তানুপযুক্ততা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে না। কারণ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা এই পর্য্যন্ত নির্ণীত হইতে পারে যে মৃত্তিকাতে উদ্ভিদের আহার্য্য বিদ্যমান আছে কি না এবং থাকিলে কি পরিমাণে বিদ্যমান আছে কিন্তু কৃষি-রসায়ন আজিও এতদূর উন্নত হয় নাই যে, তদ্দারা স্পষ্ট নির্ণীত হইয়া যাইবে—মৃত্তিকা নিহিত উদ্ভিদের আহার্য্য-উপাদান সকল এমতাবস্থায় বর্ত্তমান আছে কি না যে উদ্ভিদ, তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়; কাজেই কেবল রাসায়নিক পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়াই কোন কৃষি-ক্ষেত্র শস্য উপযোগী কিনা তাহা নির্দ্ধারণ

করা উচিত নহে। তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে যে রাসায়নিক পরীক্ষা কতকগুলি বিষয়ে অত্যাবশ্যকীয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ মৃত্তিকাতে শস্তের অনিষ্টকারক কোন উপাদান মিশ্রিত থাকিলে অথবা উর্ব্বর ক্ষেত্রের ক্যালসিয়ম্ ক্লোরাইড্, সোডিয়ম্ ক্লোরাইড্, ম্যাগনিসিয়ম ক্লোরাইড্, সোডিয়ম্ সালফেট্, ম্যাগনিশিয়াম সালফেট্ প্রভৃতি লবণাক্ত জিনিসগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় বিদ্যমান থাকিলে রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্ণীত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ভূমিতে শস্তের আহার্য্য কোন উপাদানের অভাব আছে কি না এবং ভূমির কোন স্বভাবজাত স্বাতন্ত্র্য আছে কি না এই সকল বিষয় অবগত হইতে হইলে মৃত্তিকার রাসায়নিক পরীক্ষা একান্ত আবশ্যক কিন্তু মৃত্তিকা-পরীক্ষা-কার্য্য যথাবিধি পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে, রাসায়নিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টীও বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক।

(১) মৃত্তিকার প্রাকৃতিক উৎপত্তি।

(২) মৃত্তিকার নিম্নস্তরের (অন্ততঃ ৪ ফুট পর্য্যন্তের) অবস্থা।

(৩) ইতি পূর্ব্বে এই ভূমিতে কি শস্য জন্মিয়াছিল এবং তাহাতে সার প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে, কি সার কি পরিমাণে দেওয়া হইয়াছিল।

(৪) ইতি পূর্ব্বে এই ভূমি কি পরিমাণ উর্ব্বর ছিল।

উল্লিখিত তত্ত্ব সকল রাসায়নিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নির্ণীত হইলে, সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, উক্ত ক্ষেত্রের অভাব কি কি এবং তাহার জন্য কি কি প্রতিকার আবশ্যক।

ফলতঃ ভূতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিলে মৃত্তিকা সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অতি সহজে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। সাধারণতঃ চূর্ণবহুল (Calcareous) মৃত্তিকাতে ফস্‌ফরিক এসিডের অংশ অধিক এবং উপর্য্যুপরি উদ্ভিদ সকল পচিয়া যে মৃত্তিকাস্তর সৃজিত হইয়াছে তাহাতে নাইট্রোজনের অংশ অধিক। যে সকল মৃত্তিকা "গ্রেনাইট" এবং "লাইম" প্রস্তর হইতে উৎপন্ন তাহাতে পটাশের ভাগ অধিক কিন্তু এই শ্রেণীর মৃত্তিকাতে ফস্‌ফরিক এসিডের অংশ অত্যন্ত অল্প।

উল্লিখিত যাবতীয় উপাদান উদ্ভিদ জাতির আহার্য্য। অবশ্য ইহার ভিতর সকলগুলি সমান প্রয়োজনীয় নহে। যে গুলির প্রয়োজনীয়তা অধিক সেই গুলি যে মৃত্তিকাতে বিদ্যমান নাই তাহার উপর কিছুতেই উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না। জমিতে যদি উদ্ভিদের আহারোপযোগী পদার্থ বর্ত্তমান থাকে এবং উদ্ভিদ যদি সেই ক্ষেত্র হইতে তাহার আহার্য্য নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়;. তবে সেই মৃত্তিকাতে শস্যোৎপাদনের পক্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মে না। আর যে মৃত্তিকাতে উদ্ভিদের আহার্য্য-উপাদানের মধ্যে একটী অথবা কোন একটীর আংশিক অভাব বিদ্যমান থাকে, সেই মৃত্তিকাতে শস্য আশানুরূপ অথবা আদৌ জন্মায় না। অতএব এ স্থলে ক্ষেত্রের অভাব পূরণ করিয়া দিতে হয়।

নাইট্রোজেন, ফসফরিক এসিড, পটাশ এবং লাইম এই চারিটী শস্য-জীবনের পক্ষে

অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ইহার মধ্যে যেটীর অথবা যে দুইটীর অথবা তিনটীর অভাব থাকে, সেই সেই জাতীয় সার মৃত্তিকাতে মিশ্রিত করিয়া দিলে ক্ষেত্র আপনা আপনিই উর্ব্বর হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ যে মৃত্তিকাতে ফস্‌ফরিক এসিড, পটাশ এবং লাইমের অংশ অধিক এবং নাইট্রোজেনের অংশ কম, তাহাতে নাইট্রোজেন গুণবিশিষ্ট সার অধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। পক্ষান্তরে যে মৃত্তিকাতে দুইটীর আধিক্য এবং দুইটীর অল্পতা লক্ষিত হয়, অর্থাৎ নাইট্রোজেন এবং পটাশের ভাগ বেশী ও ফস্‌ফরিক এসিড এবং লাইমের অংশ কম থাকে, তাহাতে ফস্ফরিক এসিড ও চূণ বিশিষ্ট সার সম পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দিলেই ভূমি শস্যশালিনী হইয়া উঠিবে। কোন্ জাতীয় সারে কি উপাদান বর্ত্তমান আছে তাহা প্রবন্ধাকারে (সার প্রকরণে) বর্ণিত হইবে।

উল্লিখিত প্রকারে মৃত্তিকার অবস্থা জানিবার জন্য, ফ্রান্স-দেশীয় কৃষিবিদ্যাবিশারদ মিঃ জর্জ্জ ভাইল একটী অতি সুন্দর এবং সহজসাধ্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন; নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

প্রথমতঃ একখণ্ড ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাকে সমান ছয় ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। এই ছয় খণ্ড জমির মধ্যে প্রথম খণ্ডে কোন প্রকারের সার প্রয়োগ করিবে না। দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত চারিটী অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফস্ ফরিক এসিড, পটাশ এবং লাইম গুণবিশিষ্ট সার একবারে প্রয়োগ করিতে হইবে। তৃতীয় খণ্ডে কেবল নাইট্রোজেন গুণবিশিষ্ট সার ব্যতীত অন্য তিন প্রকারের সার প্রয়োগ করিবে। এই নিয়মে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ট খণ্ডে, পর্য্যায়ক্রমে, ফস্ফরিক এসিড, পটাশ এবং লাইম গুণবিশিষ্ট সার ব্যতীত অপর তিন জাতীয় সার প্রয়োগ করিবে।

মিঃ ভাইল এই চারিজাতীয় সারের একীকরণকে "পূর্ণসার" (complete manure) এবং উহা হইতে কোন একটীর অভাব থাকিলে তাহাকে "অপূর্ণ সার" (incomplete manure) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এইক্ষণে উক্ত ছয় খণ্ড ভূমির উৎপাদিত শস্যের ন্যূনাধিক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে যে সমগ্র ভূমিতে কোন্ জাতীয় সারের প্রয়োজন। বিষয়টী বিশদ করিবার নিমিত্ত নিম্নে একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

সার	...	প্রতি একর জমিতে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ।		
পূর্ণসার	...	...	...	৩২/০
চূর্ণ ব্যতীত	...	...	...	৩০/০
পটাশ ব্যতীত	...	...	...	২৭/০
ফস্ফরিক এসিড ব্যতীত		...	...	২০/০
নাইট্রোজেন ব্যতীত		...	...	১৫/০
কোন সার প্রয়োগ ব্যতীত		...	...	১৩/০

উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে যে, যে খণ্ডে পূর্ণসার প্রয়োগ করা হইয়াছিল, সেই খণ্ডেই শস্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মিয়াছে। অতএব উক্ত ভূমিতে পূর্ণসার প্রয়োগ করা আবশ্যক।

উল্লিখিতরূপে মৃত্তিকা পরীক্ষা ব্যতীত অনেক সময়ে কোন মৃত্তিকার বর্ণ ও উহার বাহ্যিক অবয়ব দেখিয়া উহা উর্ব্বরা কি অনুর্ব্বর ঠিক করা যাইতে পারে। যে মৃত্তিকা স্বভাবতঃ কৃষ্ণাভ, তাহাতে নাইট্রোজেন ও পটাসের ভাগ অধিক, এই প্রকার মৃত্তিকাতে ধান, গম, যব ভুট্টা প্রভৃতি ভাল জন্মে। যাহার রং হরিদ্রাভ তাহাতে ক্যলসিয়াম, চূণ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের অংশ বেশী, এই শ্রেণীর মৃত্তিকাতে আলু, সালগম ও নানা জাতীয় ফল মূল উত্তম জন্মে। ধূসর বর্ণ জমিতে বালুকার ভাগ বেশী, ইহাতে সরিষা কলাই ইত্যাদি ভাল জন্মে। যে জমিতে বিবিধ প্রকার আগাছা, লতা-গুল্ম, মটর জাতীয় শস্য জন্মে, এবং যে মাটি খনন করিলে কেঁচোর গর্ত্ত দৃষ্ট হয় ও মরা ঝিনুক শম্বুক ইত্যাদির খোলা দেখিতে পাওয়া যায় সেই জমি স্বভাবতঃই উর্ব্বরা।

উদ্ভিদের অবয়ব ও পোষণ-প্রণালী।

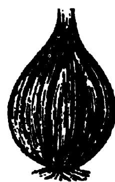
(৪)

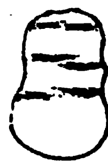
পূর্ব্ব অধ্যায়ে উদ্ভিদ-জীবনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে উহারা ঐ সমস্ত উপাদান কি প্রকারে আহরণ করিতে সমর্থ হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। উদ্ভিদের আহার আহরণ প্রণালী সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমে উদ্ভিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গঠন প্রণালী সম্বন্ধে কিংং পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চয় করা প্রয়োজনীয়।

[এস্থলে কোন একটি সাধারণ গাছ ছাত্রদিগকে দেখাইয়া উহার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি রূপে মূল কণ্ড হইতে বাহির হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দিলে ছাত্রদিগের উদ্ভিদের গঠন প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করার বিশেষ সুবিধা হয়।]

তোমরা একটি গাছ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখ। ইহার এক অংশ পত্রাদি লইয়া মাটি হইতে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধদিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার নাম কি ?—ডাঁটা। ভাল কথায় ইহাকে কাণ্ড বলা যায়। কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড নরম এবং সরু যেমন ডেঙ্গো, আবার কোন কোন গাছের কাণ্ড কঠিন ও স্থূল যেমন আম, কাঁটাল প্রভৃতি। এরূপ কাণ্ডকে গুঁড়ি বলা যায়। কাণ্ড কখন কখন মৃত্তিকার নিম্নভাগেও অবস্থান করে, যেমন আদা, হলুদ, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি। সকল কাণ্ড মাটির উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। লাউ, কুমড়া প্রভৃতির কাণ্ড মাটির উপর লতাইয়া যায়। অপরাজিতার কাণ্ড কোন বৃক্ষ পরিবেষ্টন করিয়া উঠে। কাণ্ডের

পার্শ্ব হইতে যে সমস্ত অপেক্ষাকৃত সরু সরু ডাঁটা বাহির হয় আমরা তৎসমুদকে কি বলিয়া থাকি? ডাল অথবা শাখা। ইহাদের গাত্র হইতে পত্র বাহির হইয়া থাকে।


পিঁয়াজ


আলু

তোমরা যদি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, কাণ্ড এবং শাখার গায় স্থানে স্থানে সবুজবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকাকার ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগকে কুঁড়ি অথবা মুকুল বলা যায়। এই সমস্ত মুকুল হইতেই শাখা এবং পত্র বহির্গত হয়।

তোমরা এক্ষনে কাণ্ড, শাখা, মুকুল ও পত্র চিনিয়াছ—কিন্তু এই সমুদয় ভিন্ন উদ্ভিদের এমন কোন অংশ আছে, যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না?

মূল। মূল উদ্ভিদের একটি প্রধান অংশ। ইহা মৃত্তিকার মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদের খাদ্য আহরণ করে এবং মানুষ যেমন পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়ায় ইহারাও তদ্রূপ মৃত্তিকায় শিকড় বিস্তৃত করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। পা দ্বারা পান (রসাহরণ) করে বলিয়া ইহাদিগকে পাদপ বলে।

উদ্ভিদের জীবন রক্ষা, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত, কাণ্ড, শাখা, পত্র, মূল এ সমস্তই আবশ্যক। কিন্তু এতদ্ভিন্ন উদ্ভিদের আরও কয়েকটি অংশ আছে। তদসমুদয় কেবল কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তোমরা বলিতে পার সে সমুদয় অংশ কি?

ফুল, ফল এবং বীজ। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের ফুল হইয়া থাকে। ফুল, ফল না হইলেও গাছ মরিয়া যায় না। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বৃক্ষের জীবনধারণের জন্য ফুল অথবা ফল আবশ্যকীয় নহে। তাহা হইলে ইহাদের প্রয়োজন কি?—উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি। ফুল হইতে ফল হয়, ফলের ভিতরে বীজ থাকে এবং ঐ বীজ হইতে আবার নূতন গাছ উৎপাদিত হয়।

এক্ষণে আমরা উদ্ভিদের অঙ্গ প্রতঙ্গ সম্বন্ধে কি শিক্ষা করিলাম দেখা যাউক।

১। উদ্ভিদের শরীরের কতকগুলি অংশ আছে এবং প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

২। মূল, কাণ্ড, শাখা এবং মুকুল বৃক্ষকে সজীব রাখিবার ও উহার বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। এইগুলি বৃক্ষের এক একটী অঙ্গ প্রতঙ্গ সুতরাং উহারা সকল সময়েই বৃক্ষ শরীরে অবস্থান করে।

৩। উদ্ভিদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত কিন্তু ফুল ফল অথবা বীজের কোন সম্বন্ধ নাই। উদ্ভিদের বংশ রক্ষাই তাহাদের কার্য্য।

এক্ষণে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্য বিশদরূপে সমালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।



মূলা।

মূল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উদ্ভিদকে মৃত্তিকায় দৃঢ়ভাবে রাখা এবং উহার খাদ্য আহরণ মূলের প্রধান কার্য্য। এক্ষণে একটি ভুট্টার ও মূলার গাছ প্রদর্শিত হইতেছে, লক্ষ্য করিয়া দেখ। ভুট্টার শিকড় গুচ্ছাকৃতি এবং মূলার শিকড় স্থূল ও লম্বা। উভয়ের গাত্রেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুতার ন্যায় সূক্ষ্ম শিকড়াংশ সংলগ্ন আছে, দেখিতে পাইতেছ। এই সমস্ত শিকড়াংশ মৃত্তিকার সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন থাকে যে, উদ্ভিদ উৎপাটন করিলে উহার সহিত মৃত্তিকা কণাও উঠিয়া আইসে। এই সমস্ত শিকড়াংশের বহিরাবরণ ছিদ্রময় ও শোষণ শক্তি বিশিষ্ট। এই সমস্ত ছিদ্র দ্বারা উহারা মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিয়া লয়।

(একটী গ্লাসে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল রাখিয়া তাহাতে পত্রাদি সমেত একটী গাছের মূল নিমজ্জিত করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ আলোকযুক্ত স্থানে রাখিয়া দাও। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইবে যে জল কমিয়া গিয়াছে। এই জল মূল দ্বারা শোষিত হইয়াছে।)



ভুট্টা।

গ্লাসে যেরূপ ভাবে জল শোষিত হইল, আমাদের ক্ষেত্র ও উদ্যানে ঠিক সেই ভাবেই রস শোষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে তরল অবস্থায় না থাকিলে উদ্ভিদ কোন আহারই গ্রহণ করিতে পারে না। কোন প্রকার কঠিন পদার্থ, উদ্ভিদ শিকড় আকর্ষণ দ্বারা তাহার দেহে প্রবেশ করাইতে পারে না। সুতরাং বৃক্ষ জন্মাইতে হইলে উদ্ভিদের আহার্য্য পদার্থ গুলি দ্রব করিবার নিমিত্ত জল একান্ত আবশ্যক।

কাণ্ড। কাণ্ডের কার্য্য প্রধানতঃ তিন প্রকার। উহা উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ যথা পত্র, পুষ্প, শাখা, পল্লব প্রভৃতি বহন করিয়া থাকে। মূল দ্বারা শোষিত রস ইহার দ্বারা ঊর্দ্ধে নীত হয় এবং পত্র হইতে পরিপাক-প্রাপ্ত রস অধোদিকে চালিত হয়। যে কোন কোমল কাণ্ডবিশিষ্ট ডাঁটার ছাল তুলিয়া ফেলিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছালের নিচে আঠাবৎ এক প্রকার ঘন রস রহিয়াছে। উহাই উদ্ভিদ-রস এবং উহারই মধ্যে উদ্ভিদের যাবতীয় আহার্য্য পদার্থ নিহিত আছে।

পত্র। পত্র উদ্ভিদের এক প্রকার পাকস্থলী স্বরূপ। মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে যে জল কাণ্ডে প্রবেশ করে, তাহা কাণ্ডের মধ্যস্থিত নলাকার তন্তুসমূহ দ্বারা সম্বাহিত হইয়া পত্রে উপস্থিত হয়। উক্তস্থানে আলোক সাহায্যে অপক্ক রস পরিপক্ক হইয়া আবার কাণ্ড মধ্যে ফিরিয়া আইসে এবং তথায় সঞ্চিত হয়। আমাদের গাত্রে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, উদ্ভিদ পাত্রেও সেইরূপ বহুসংখ্যক ছিদ্র রহিয়াছে। যে জল কাণ্ড হইতে পত্রে প্রবেশ করে, তাহার অধিকাংশ এই সমুদয় ছিদ্রপথে বাষ্পাকারে বহিষ্কৃত হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এই ছিদ্র দ্বারা উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলস্থ বাষ্পাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। পত্রের নিম্নভাগ অপেক্ষা উপরি ভাগে ছিদ্রের সংখ্যা অধিক।

বস্তুতঃ এস্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে মূল কাণ্ড এবং পত্র উদ্ভিদের পরিপুষ্টির জন্য এবং ফুল ফল ও বীজ উদ্ভিদের বংশ রক্ষার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। মূল, কাণ্ড এবং পত্রের একত্র সহযোগে উদ্ভিদের পরিপোষণ হয়। এই পরিপোষণ ক্রিয়া সম্যক্ রূপে বুঝিতে হইলে জানা আবশ্যক যে, উদ্ভিদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কতকগুলি বিভিন্নাকার অতি ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি বিশেষ। এই সমস্ত কোষ স্তরে স্তরে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রণালীতে সজ্জিত রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে যে সূক্ষ্ম শিকড়াংশের কথা বলিয়াছি তাহাও এইরূপ কোষ বিরচিত। এই সমস্ত কোষ মৃত্তিকার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায় ইহারা মৃত্তিকার রস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। উদ্ভিদ দেহান্তর্গত কোষসমূহের মধ্যেও এইরূপ ক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ায় শোষিত তরল পদার্থ কোষ হইতে কোষান্তরে গমনপূর্ব্বক ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে নীত হইতে থাকে। পত্র গাত্র হইতে যেমন রস বাষ্পাকারে বহির্গত হইতে থাকে অমনি তাহার স্থান পূরণ করিবার জন্য আবার নূতন রস উপস্থিত হয়। এইরূপে যতক্ষণ পত্রের কার্য্য চলিতে থাকে ততক্ষণ কাণ্ড মধ্যেও রস প্রবাহিত হইতে থাকে। মনুষ্য দেহে রক্ত প্রবাহের ন্যায় উদ্ভিদ দেহে রস প্রবাহই জীবনের মূল। এতদ্ভিন্ন উদ্ভিদের যে আত্মরক্ষা সংস্কার নাই তাহা নহে। উদ্ভিদ যে রস মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করে তৎসমুদই যে সঙ্গে সঙ্গে দেহ নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়া ফেলে তাহা নহে। শোষিত রসের কিয়দংশ, সময়ে সময়ে অর্দ্ধাংশ, সঞ্চিত হয়। কাণ্ড, ফল এবং বীজই উদ্ভিদের সংস্থানের স্থান। সাগু, বালি, আরারুট প্রভৃতি আমরা যে শ্বেতসার ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা উদ্ভিদের সঞ্চিত দ্রব্য। অধিকাংশ সারাংশ ফল এবং

বীজে সঞ্চিত থাকে বলিয়া উদ্ভিদের ঐ সমস্ত অংশ এত পুষ্টিকর এবং এত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধান, গম, যব, মুগ, কলাই, খেসারি, মশুরী, আম, কাঁটাল প্রভৃতি উদ্ভিদের ফল ও বীজই সঞ্চয়ের প্রধান স্থান সুতরাং উহাদের ফল ও বীজই ব্যবহৃত হয়। ইক্ষুর কাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। এতভিন্ন মূলে (যথা রাঙ্গা আলু, মূলা, গাজর, সালগম প্রভৃতি) এবং পত্রেও (যথা শাক, কপি, পেঁয়াজ প্রভৃতির পত্রে) যথেষ্ট সার পদার্থ সঞ্চিত থাকে।

ফল উৎপাদনে পতঙ্গের কার্য্য

(৫)

পতঙ্গগণের দ্বারা কি প্রকারে ফল বা বীজ উৎপাদনের সহায়তা হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে হইলে ফুলের আকৃতি ও অবয়বের বিষয় একটু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ফুলের সাধারণতঃ চারিটি অঙ্গ থাকে। এই অঙ্গগুলি ফুলের বৃন্তের উপর একটির ভিতর আর একটি, থাকে থাকে, গোলাকারে সজ্জিত থাকে। (ক) বেষ্টন পত্র Calyx and Sepals (খ) তাহার ভিতর সুন্দর বর্ণের পাপড়ি Corola and petals (গ) ষ্টামেন (Stamens) পরাগ কেশর দণ্ড, (Filament) ও পরাগ কেশর বিশিষ্ট পরাগ কোষ (Anther) এই পরাগ কেশরের মধ্যে পরাগ রেণু (Pollen) থাকে.; (ঘ) স্ত্রী স্তবক (Pistle) ইহার মধ্যে গর্ভকেশর (Style) ও কেশরাগে কিঞ্জল্ক (Stigma) থাকে। ফুলের অঙ্গ অঙ্গা বলি।

বেষ্টন পত্র (Sepals)
পাপড়ি (Petals)
পরাগ কেশর দন্ত (Filament) ; পঃ কোঃ
পরাগ কোষ (Anther)
স্ত্রী স্তবক (Pistle) ; গর্ভ কেশর ;
তাহার কিঞ্জল্ক বা কেশরাগ্র (Stigma) ;
স্ত্রী স্তবকের মধ্যে অণ্ডাণু (Ovule) থাকে।

এই ফুলের কিঞ্জল্কাগ্রে পরাগপাতন না হইলে বীজের উৎপত্তি হয় না। পরাগ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরাগ কেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং তখন পরাগ রেণু বাহির হইয়া পড়ে। পরাগ কোষের মাঝখানে রেখা চিহ্ন করিলে দেখিবে যে, কোষটি এই রেখায় রেখায় বিছিন্ন হয়। এই পরাগ রেণু না হইলে কোন কাজই হইবে না। পরাগ কোষ উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বে যদি ইহা ছিঁড়িয়া ফেলা যায়, তবে ফল বা বীজ উৎপন্নই হইবে না।

পুষ্পের মধ্যেও স্ত্রী ও পুরুষ আছে। যাহাতে স্ত্রী স্তবক যন্ত্রটি থাকে সেইটি স্ত্রী পুষ্প, যাহাতে পুং যন্ত্রটি থাকে সেইটি পুং পুষ্প। ফুলের বিচিত্র বর্ণের পাপড়ি, বেষ্টনী উভয় ফুলেই থাকে। ফুলের পাপড়ির মধ্যে মধু সকল ফুলেই থাকে এবং ফুলের গন্ধ থাকে। এই গুলিই পতঙ্গগণকে ডাকিয়া আনে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে একই ফুলে স্ত্রী ও পুং উভয় যন্ত্র বিদ্যমান। এরূপ স্থলে স্বপুষ্পের পরাগ রেণু গর্ভকেশরে পতিত হইয়া ফল উৎপাদিত হইতে পারে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে এই প্রকারে উৎপন্ন ফল বা বীজ ভাল হয় না কিম্বা অকালে শুকাইয়া যায়। ভিন্ন ফুল হইতে পরাগ নিষেক হওয়া আবশ্যক। পতঙ্গগণ এই কার্য্যের সহায়।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা এস্থলে আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঘেটকুলের কাহিনীটি বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি—





চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, (ক) মৌমাছি ফুলের পাপড়ির উপর বসিয়াছে, তাহার শৃঙ্গ ফুলের পরাগ আধার স্পর্শ করিতেছে, (খ) মৌমাছির শৃঙ্গে পরাগ কেশর রেণু লাগিয়া গিয়াছে এবং সে শৃঙ্গ দুইটি উঁচু করিয়া রাখিয়াছে।

"আমি বলিতেছিলাম যে, উদ্ভিদ্‌গণ মৌমাছিদিগকে ডাকিবার নিমিত্ত বায়ুভরে পুষ্পগন্ধ প্রেরণ করিয়া চারিদিক্ সৌরভে আমোদিত করে। মৌমাছিগণ ফুলের গন্ধ পাইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়। তাহার পর উজ্জ্বলবর্ণ বিশিষ্ট সুন্দর ফুলটী সম্মুখে দেখিয়া তাহার উপর উপবিষ্ট হয়, মধু পান ও মধু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ফুলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিয়দংশ মধু তাহাদের গায়ে লাগিয়া যায়। পরাগ-কেশরের রেণু সেই মধুতে জড়াইয়া যায়; মৌমাছি তাহার পর অন্য ফুলে গমন করে। মৌমাছির দেহ হইতে রেণু এই ফুলের গর্ভকেশরে পতিত হয়। তখন ফল দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে। গর্ভকেশরের নিম্নে যে অণ্ডাণু থাকে, তাহা ক্রমে বীজে পরিণত হয়। রেণু সংযোগে ফুলে যখন ফল হয়, তখন আর ফুলের পাপড়ি ও পরাগ কেশরের আবশ্যক হয় না।

সেগুলি তখন শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া যায়। গর্ভকেশরে রেণু না পতিত হইলে, ফুলে ফল হয় না। ফুটন্ত আম মুকুলের উপর বৃষ্টির জল পতিত হইলে, লোকে বলে "ফুলের মধু ধুইয়া গেল, এবার আর আম হইবে না।" মধু যত ধৌত হউক, আর না হউক রেণু ধুইয়া যায়। সে জন্য সে বৎসর আম ভাল হয় না। যে কলসীর খেজুর আরব প্রভৃতি দেশ হইতে কলিকাতায় আমদানি হয়, ইহার চাষ করিতে গিয়া আরব-বাসীরা কখন কখন বিপন্ন হয়। খেজুরের এক গাছে কেবল রেণু বিশিষ্ট ফুল হয়, আর অন্য গাছে কেবল গর্ভকেশর বিশিষ্ট ফুল হয়। পিণ্ড খেজুরের বীজ হইতে লোকে বড় কেহ গাছ করিতে চেষ্টা করে না। যেমন কলার গোড়া হইতে তেড় বা চারা বাহির হয়, ইহারও সেইরূপ হয়। চারা দেখিয়া বলিতে পারা যায় না যে, কোন্ চারাটী বড় হইয়া রেণুবিশিষ্ট ফুল প্রসব করিবে, কোন্‌টী গর্ভকেশরবিশিষ্ট ফুল প্রসব করিবে। বলা বাহুল্য যে, যে গাছে খেজুর হয় না। বাগানটী তুমি করিলে অনেক যত্ন করিয়া অনেক জল সেচন করিয়া গাছগুলি বড় করিলে, তাহার পর যখন ফুল হইল তখন দেখিলে যে, অধিকাংশ রেণুবিশিষ্ট ফুলের গাছ। এক আধটী এরূপ গাছ চাই বটে, কিন্তু এত রাঁড়া গাছ লইয়া সে কি করিবে? সুতরাং রাঁড়া গাছগুলিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়। অনেক সময় পেঁপের ক্ষেতে এইপ্রকার রাঁড়া পেঁপে গাছ হইয়া কৃষকের সমুদয় পরিশ্রম বিফল করে, সাধ্যানুসারে সে স্থানে লোকে গর্ভকেশর ফুল বিশিষ্ট গাছের চাষ করে। তাহার সঙ্গে একটী কি দুইটী রাঁড়া গাছ রাখিয়া দেয়। গর্ভকেশরবিশিষ্ট খেজুর গাছ দূরে থাকিলে, রেণুবিশিষ্ট গাছ হইতে ফুল লইয়া সে গাছে বাঁধিয়া দিতে হয়। তাহা হইতে রেণু পতিত হইলে তবে সে গাছে খেজুর হয়। আমাদের এখানেও মাঝে মাঝে রাঁড়া তাল গাছ আছে। বিলাত প্রভৃতি দেশে লোকে এক গাছের রেণু অন্য গাছে দিয়া অনেক ফল ও ফসলের উন্নতি করিয়াছে। আমেরিকায় একজন সাহেব এই উপায় অবলম্বন করিয়া অনেক নূতন সুমিষ্ট ফলের সৃষ্টি করিয়াছেন। গত বৎসর আমি একজনকে আম সম্বন্ধে এইরূপ পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু অগাধ ধৈর্য্য ও নিরীক্ষণ-শক্তি ব্যতীত কেহ এরূপ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারে না।

ঘেটকুলের গাছ মূল হইতে উৎপন্ন হয়; বীজ হইতেও হয়। শীতকাল গত হইলে প্রথমে ইহার একটি পত্র বাহির হয়, তাহার পর আর একটী পত্র বাহির হয়, তাহার পর আর একটী পত্র বাহির হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ইহাতে তিনটী পত্র হয়। সেই কোষের ভিতর হইতে ফুল বাহির হয় ফুলটী এক লোহিত পীত বর্ণের দণ্ড স্বরূপ। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ঘেটকুলের ফুল ফুটিলে ইহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। এত দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, নিকটে বসিতে পারা যায় না। কিন্তু তোমার আমার পক্ষে যাহা দুর্গন্ধ, সকল বীজের পক্ষে তাহা নহে। মৌমাছিদিগকে ডাকিবার নিমিত্ত ঘেটকুল এরূপ দুর্গন্ধ বাহির করে না। এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গ আছে, ঘেটকুলের কাজ

তাহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। সে তাহাদিগকেই সাদরে আহ্বান করে। এ পতঙ্গ এত ক্ষুদ্র যে, সূক্ষ্ম সূচের অগ্রভাগে তাহাদের স্থান হয় কি না সন্দেহ। ইহাদিগকে আমরা এক প্রকার ওন্‌কি বলি। অনেকে একত্র হইয়া সূর্য্যকিরণে উড়িয়া ইহারা খেলা করিতে ভাল বাসে। যতক্ষণ সূর্য্যকিরণের ভিতর উড়িতে থাকে, ততক্ষণ ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মদের নাম গন্ধ নাই। মদ অন্বেষণ করিতে করিতে দণ্ড পথে তাহারা নীচে নামিতে লাগিল। সে স্থানে সেই আঁশের ভিতর দিয়া তাহারা ফুলের ভিতর প্রবেশ করিল। সে স্থানেও মদ দেখিতে পাইল না। ফুলের ভিতর যে স্থানে পরাগকেশর ও গর্ভকেশর আছে, সেই ঘরের ভিতর ক্ষুদ্র পতঙ্গগণ মদের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘেটকুল ফুলের মাঝখানে যে লোহিত-পীতবর্ণের দণ্ড থাকে, তাহাই ইহার সাইনবোর্ড। এ দোকানে অন্যান্য ফুলের ন্যায় মিষ্ট মধু বিক্রীত হয় না।

মৌমাছিরা মাতাল নহে। সুতরাং তাহারা এ মধু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ঘেটকুল ফুলের নিকট আগমন করে না।

উপরে যে ক্ষুদ্র পতঙ্গের কথা বলিয়াছি, এক দল সেই পতঙ্গ অন্য এক ঘেটকুল ফুলে গিয়াছিল। সেই ফুল হইতে উড়িয়া বায়ুর উপরে টলিতে টলিতে তাহারা আমাদের এই ঘেটকুল ফুলের সাইনবোর্ড দেখিতে পাইল। আপনা আপনি তাহারা বলাবলি করিল;—"ওহে; এখানে আবার এক মদের দোকান! চল, দুই এক ঢোক এখানেও খাওয়া যাউক।" নিকটে আসিয়া সাইনবোর্ডে অর্থাৎ ঘেটকুলফুলের সেই রঞ্জিত দণ্ডে কি লেখা আছে, তাহা পড়িয়া দেখিল। দেখিল যে তাহাতে লেখা আছে—

এ স্থানে খাঁটি মদ বিক্রীত হয়।

ঘেঁটকুল এক প্রকার ওলের জাতি। সাইন-বোর্ড পাঠ করিয়া মাতালের দল আরও একটু স্ফূর্ত্তি করিবার নিমিত্ত ফুলের ভিতর প্রবেশ করিল।

অন্যান্য ফুলের ন্যায় ঘেঁটকুল ফুলে সবুজ পাপড়ি ও রঞ্জিত পাপড়ি নাই। ইহার পরাগকেশর ও গর্ভ-কেশর অন্যান্য ফুলের ন্যায় নহে। ইহার ফুলে প্রথম একটি কোষ আছে, যাহার ভিতর সাইন-বোর্ড স্বরূপ লোহিত-পীত বর্ণের দণ্ড দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার নিম্নে অনেক গুলি সূক্ষ্ম শোঁ বা আঁশ আছে। ইহাদের উপর দিক্ ঈষৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে, নিম্ন মুখ পরস্পরে ছুঁইয়া আছে। তাহার নিম্নে কতকগুলি গোল গোল পদার্থ রহিয়াছে। এ ফুলের পরাগ-কেশর দেখিতে এইরূপ। ইহার ভিতর রেণু আছে। পরাগ-কেশর পরিপক্ব হইলে ঢাকিয়া যায় ও ইহার ভিতর রেণু বাহির হয়। সেই রেণু গর্ভকেশরে পতিত হইলে ফুলে ফল বীজ জন্মে। সর্ব্ব নিম্নে যে গোলাকার পদার্থগুলি রহিয়াছে, তাহাই গর্ভকেশর। এই গর্ভকেশর প্রস্ফুটিত হইলে ইহাতে পরাগকেশরের রেণু পতিত হইয়া ফল জন্মে। কিন্তু স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ

বলিয়া ঘেঁটকুল নিজের রেণু হইতে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করে না। অন্য ফুলের রেণু আপনি লইবে ও আপনার রেণু অন্য ফুলে প্রেরণ করিবে, সেই জন্য এই মাতালের দলকে মদের লোভ দেখাইয়া সে আহ্বান করিয়াছে।

মাতালগণ প্রথম সাইন-বোর্ড স্বরূপ সেই দণ্ডে উপবিষ্ট হইল। সে স্থানে উপাদেয় সৌরভ (আমাদের পক্ষে দুর্গন্ধ) আছে বটে, কিন্তু মৎস্যগণ যেমন অনায়াসে ঘুনির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে? কিন্তু পুনরায় বাহির হইতে পারে না। ঘেঁটকুলের এই চক্রব্যূহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারা যায়, কিন্তু ইহা হইতে বাহির হইতে পারা যায় না। পতঙ্গ ধরিবার নিমিত্ত ঘেঁটকুল মহাশয় এই ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন। দণ্ডের নিম্নে ও পরাগ কেশরের উপরের সেই যে আঁশগুলির কথা বলিয়াছি, তাহাদের উপর দিকে ঈষৎ পথ আছে, কিন্তু নীচের দিকে মুখে মুখে যোড়া। পতঙ্গগণ উপরের পথ দিয়া আসিয়া নিম্ন দিকের দুই পাশ ঠেলিয়া অনায়াসে ফুলের ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু বাহিরে যাইবার সময় সেই আঁশের অগ্রভাগ তাহাদের মুখে ফুটিয়া যাইতে লাগিল, কিছুতেই তাহারা বাহির হইতে পারিল না।

যাহা হউক, দুই তিন দিন পরে ফুলের গর্ভকেশরগুলি প্রস্ফুটিত হইল। পতঙ্গগণ সেই কারাগারে অনাহারে রাগে দুঃখে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্য ঘেঁটকুলের ফুল হইতে তাহারা যে রেণু আনিয়াছিল, এক্ষণে এই ঘেঁটকুলের প্রস্ফুটিত গর্ভকেশরে তাহা লাগিয়া গেল। গর্ভকেশরের নিম্নদেশে অবস্থিত অতি সূক্ষ্ম অণ্ডাণুগুলি তখন ফল ও বীজে পরিণত হইবার নিমিত্ত উন্মুখ হইল। গর্ভকেশরের কাজ যখন হইয়া গেল তখন উপরের পরাগকেশরগুলি প্রস্ফুটিত হইল। তাহা হইতে ঝর্ ঝর্ শব্দে এখন রেণু পতিত হইতে লাগিল। পতঙ্গগণ সেই রেণুতে কতক পরিমাণে চাপা পড়িল। এই রেণুতেই পতঙ্গগণের আহারীয় ও পানীয় পদার্থ থাকে। যে মধুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহাতেই সেই মধু থাকে।

পতঙ্গদিগের পিঠে রেণু বোঝাই দিয়া ঘেঁটকুল মহাশয় এখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। উপরের সেই শোঁ বা আঁশগুলি এখন তিনি গুটাইয়া লইলেন। কতক শুষ্ক হইয়া গেল, কতক পাশে সরিয়া পড়িল। বাহিরে যাইবার পথ পরিষ্কার হইল। পেট ভরিয়া মদ খাইয়া পিঠের উপর রেণু লইয়া টলিতে টলিতে পতঙ্গগণ বাহির হইল। বায়ুভরে অল্পদূর উড়িতে না উড়িতে তাহাদের নেশা কিয়ৎ পরিমাণে ছুটিয়া গেল। তখন আর একটী ঘেঁটকুল ফুলের গন্ধ পাইয়া, আর একটী মদের দোকানের সাইন-বোর্ড দেখিয়া, তাহার ভিতর তাহারা প্রবেশ করিল। সে স্থানে পুনরায় পূর্ব্বরূপ ঘটনা হইল।"

সুগন্ধী ফুল হইতে মধু আহরণ করা প্রায়ই মৌমাছিগণের কার্য্য। এ কার্য্যে তাহারা বিশেষ পারদর্শী (ক) চিত্রে দেখিতে পাইবেন সুগন্ধে বহুদূর হইতে আকৃষ্ট

হইয়া আসিয়া মধুমক্ষিকা কি প্রকারে ফুলের পাপড়ির উপর বসিয়াছে এবং মধু আহার জন্য কিরূপে ফুলের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। (খ) চিত্রে দেখিবেন যে মধুমক্ষিকা পরাগরেণু মাথায় মাখিয়া ফিরিয়াছে; মধু লোভে দ্বিতীয় পুষ্পে প্রবেশ করিয়া, সে এই পরাগরেণু গর্ভকেশরের উপর লাগাইয়া দিবে। ফুলগুলি মধুমক্ষিকার কার্য্যের সুবিধার জন্য এরূপ বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত যে, বোধ হয় যেন পতঙ্গের এই কার্য্য বিধাতার অভিপ্রেত।

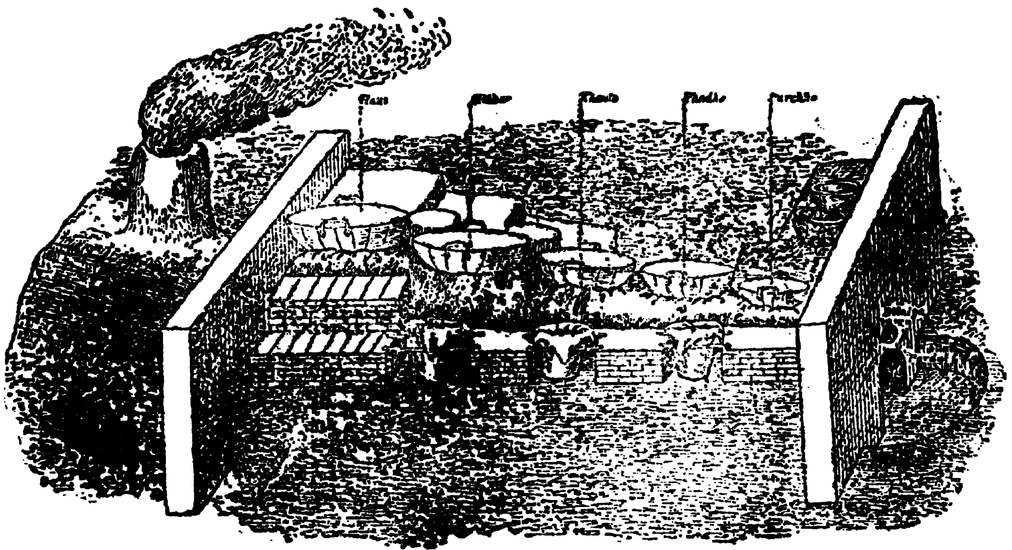
মধুমক্ষিকা নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে মধু বা পরাগ আহরণে নিযুক্ত নহে। মধু লইতে গেলে তাহাকে এক ফুল হইতে পরাগ মাখিয়া অন্য ফুলের ভিতর লাগাইয়া দিতে হয়। সমস্ত পরাগ কিন্তু তাহারা ফেলিয়া যায়। এই পরাগ রেণু মৌমাছি শিশুগণের খাদ্য। মধু তাহারা উদরস্থ করে না, কারণ উদরস্থ হইলেই তাহা হজম হইয়া যাইবে। এত মধুই বা উদরস্থ কি প্রকারে করিবে। মধু আহরণের জন্য তাহাদের একটি স্বতন্ত্র থলী আছে। ভবিষ্যতে আহারের জন্য তাহারা ঐ মধু মধুচক্রে সঞ্চিত করিয়া রাখে, যাহা রাখে সমস্ত তাহাদের আবশ্যক হয় না। মানুষে তাহার ভাগ লয়।

আমেরিকা ও ইউরোপের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ফল কিম্বা সব্জী বাগানের আশে পাশে কতিপয় সংখ্যক মৌচাক থাকা চাই, তাঁহারা বলেন "No Bees, no Fruit." স্বভাবতঃ মৌমাছি কোথাও আছে কোথাও নাই, কখন আছে কখন নাই। কৃত্রিম মৌচাক করিয়া দিয়া মৌমাছি পুষিয়া তাঁহারা ফলের বাগানের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন এবং মধু ও মোম হইতেও অনেক লাভ করিতেছেন। আমাদের দেশে ফলের বাগানে এরূপ উন্নতি কত দিনে হইবে তাহা ঠিক বলা যায় না।

চিনি মিছরি প্রস্তুত প্রণালী ও তাহার সাজসরঞ্জাম

—:*:—

সচরাচর কটাহে রস জ্বাল দিয়া চিনি প্রস্তুত করিতে হয়। কড়াটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। পরে ঐ কড়া চুলাতে বসাইয়া তাহাতে ৪/০ মণ আন্দাজ জল দিয়া অগ্নি সংযোগে জল ফুটাইতে হইবে। ঐ জল ভালরূপ ফুটিতে আরম্ভ হইলে উক্ত কড়ার জলে আন্দাজ চৌদ্দ মণ গুড় মিশ্রিত করিয়া দিবে। গুড়



জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবার জন্য এক প্রকার কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করা হয়। ইহার লম্বা হাতল আছে এবং অগ্রভাগে একটি কাষ্ঠখণ্ড আড়ভাবে সংযুক্ত আছে। পশ্চিমে ইহাকে গর্দ্দাম বলে। (চিত্র ২৯)।

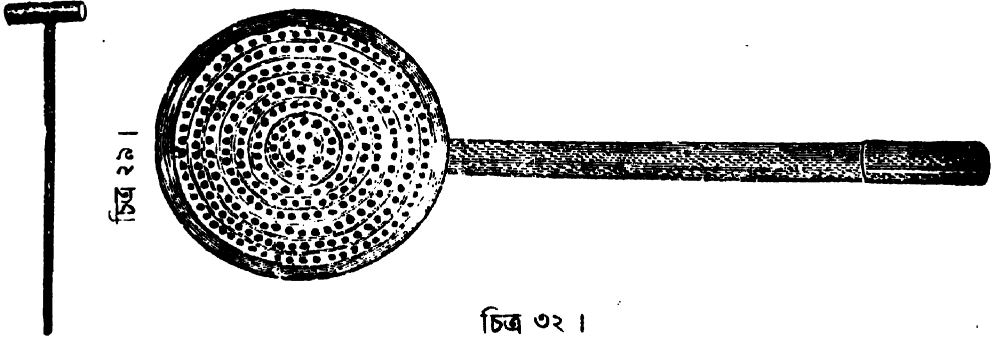
গুড় সম্পূর্ণরূপে জলে গুলিয়া গেলে ইহাতে জল মিশ্রিত দুগ্ধের প্রক্ষেপ দিয়া গাদ কাটাইতে হয়। এক ভাগ দুধে আশি ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া গাদ কাটাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

কিছুক্ষণ যাবৎ গুড় জলে সিদ্ধ হইয়া আসিলে তাহাতে পুনরায় ৪০ ঘড়া আন্দাজ প্রায় আট মণ জল সংযোগ করিয়া ঐ গুড়ের রসটিকে আরও তরল করিয়া লইয়া, দুই ঘণ্টা কাল অধিক জ্বাল সহযোগে ফুটাইবার পর জ্বাল অপেক্ষাকৃত কমাইতে হইবে। ইতিমধ্যে দেখা যাইবে যে গুড়ের সমস্ত গাদ বা ময়লা উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে আরও দুই ঘড়া জল ঐ রসে ঢালিয়া দিলে রস হইতে গাদ একেবারে পৃথক হইয়া পড়িবে। তখন উহা তুলিয়া ফেলিবার বিশেষ সুবিধা হয়। এক্ষণে হাতলযুক্ত

একটি মাটির জগ দ্বারা (চিত্র ৩০) কড়া হইতে রস উত্তোলন করিয়া বেতের বা কঞ্চির ঝুড়ির (চিত্র ৩১) উপর এক খণ্ড বস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি ঢালিয়া দিতে হয়।



চিত্র ৩১।



চিত্র ৩২।

ঐ ঝুড়িটি একটি মাটীর গামলার উপর একখানি সিঁড়ি রাখিয়া তদুপরি স্থাপন করিতে হয়। ক্রমে ঐ গামলার পরিস্রুত রস বা সিরা সঞ্চিত হইলে তাহা হইতে ছয় ঘড়া রস কড়াতে চাপাইয়া পুনরায় জাল দিতে হয়। এই রস জাল দিবার জন্য যে কোন কড়া ব্যবহার করা হউক তাহা মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। রস ফুটাইবার জন্য এক্ষনে তীব্র জালের প্রয়োজন। এই সময়ে গাদ পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য চারি দিন পূর্ব্বে দুই গ্যালন জলে এক পাউণ্ড চূর্ণ রেড়ির দানা ভিজাইয়া রাখিয়া একটি মিশ্র জল প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। উক্ত মিশ্রজল যদি সম্পূর্ণভাবে মাতিয়া না উঠে তবে উহার তেজবৃদ্ধি করিবার জন্য উহাতে আরও এক পাউণ্ড রেড়ির বীজ চূর্ণ ফেলিয়া দিতে হইবে। এই আরকের দ্বারা গাদ কাটা হইলে চিনির দানাগুলি সহজে পৃথক হইয়া পড়ে। গুড়ের রসে এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ থাকে। রস দানা বাঁধিবার সময় এই আঠাবৎ পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলে দানাগুলি পৃথক হইতে না পাইয়া একত্র ডেলা বাঁধিতে থাকে। এই আরকের দ্বারা উক্ত আঠাবৎ পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়। গুড়ের রসে ইহার প্রক্ষেপ দিলে গাদ উপরে ভাসিয়া উঠিতে থাকে। তখন ঝাঁঝরা দ্বারা (চিত্র ৩২) উঠাইয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে ঐ রস কটাহ হইতে তুলিয়া মাটীর গামলায় পূর্ণ করিয়া রাখা হয়। মাটির গামলাগুলি ভাঙ্গিবার ভয়ে অনেক সময়ে মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বসান থাকে। পরিত্যক্ত গাদও ফেলিয়া দেওয়া হয় না। উহা বস্ত্র খণ্ডের মধ্যে বাঁধিয়া তাহার উপর ভার চাপাইয়া দিলে উহা হইতে রসাবশেষটুকু নিঃসৃত হইয়া আসে। কটাহ হইতে যে পাত্র দ্বারা রস উত্তোলন করা হয় তাহাকে টানা বলে (চিত্র)। বঙ্গদেশে ঐরূপ এক প্রকার নারিকেলের উড়্‌কি মালার ব্যবহার দেখা যায়। নারিকেলের মালার (বাটীতে) হাতল লাগাইয়া উহা

প্রস্তুত করা হয়। পূর্ব্বকথিত মাটির ভারগুলিকে ঐ প্রদেশে ভিড়া বলে (চিত্র ৩৪)। ভার চাপাইয়া যে রসটুকু বাহির হয়, সে টুকু পুনরায় নূতন গুড়ের সহিত মিশাইয়া জালে



চিত্র ৩৩

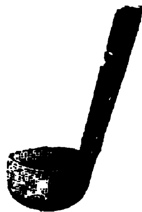


চিত্র ৩৪।

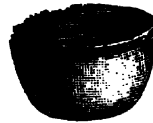
চড়ান হয়। বস্ত্রের মধ্যস্থ অবশিষ্ট গাদ পরে জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। সচরাচর ঐ রসের জল কারখানার লোকজনে খাইয়া ফেলে। গাদ জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবার পরও যাহা কিছু আখের খোয়া বা ছিবড়া পড়িয়া থাকে সেগুলি গোময়ের সহিত মিশাইয়া রন্ধনোপযোগী ঘুঁটে (কাণ্ডা) প্রস্তুত পূর্ব্বক জ্বালান হয়। বাস্তবিকই ইক্ষুশালের কোন দ্রব্যই নষ্ট হইতে দেওয়া হয় না।

গুড় জ্বাল দিতে দিতে ক্রমশঃ রসের পরিমাণ কমিয়া আসিতে থাকে। যখন দেখা যায় যে, উহা সমগ্র রসের এক তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছে, তখন কটাহ হইতে একটু রস বৃদ্ধ ও মধ্যাঙ্গুলী মধ্যে লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, রস আঠাবৎ হইয়াছে ও অঙ্গুলীদ্বয় পৃথক করিতে গেলে উহা সঙ্গে সঙ্গেই সূত্রবৎ হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ হইলে রসের পাক সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে। পাক পূর্ণ হইবার সময় আরও দেখা যায় যে রসে বড় বড় ফুট হইতেছে।

এইবার উক্ত রস টামা দ্বারা মৃত্তিকা নিহিত গামলায় পূর্ণ করিতে হয়। এক্ষণে লৌহ নির্ম্মিত ও হাতলযুক্ত টামা ব্যবহার করা হইয়া থাকে (চিত্র ৩৫)। যে গামলায়



চিত্র ৩৫।



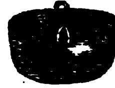
চিত্র ৩৬।

রস সঞ্চয় করা হইয়া থাকে তাহাকে খাজানা বলে। পরে উক্ত খাজানা হইতে ক্রমশঃ পর্য্যায়ক্রমে পাত্র হইতে পাত্রান্তরে উঠাইয়া অপর তিনটি গামলায় ঐ রস পূর্ণ করিতে হয় প্রত্যেক বারেই গামলাস্থিত রস উত্তমরূপে বিলোড়িত করিতে হয়। ইহাতে রস ক্রমসঃ শীতল হইয়া আসিতে থাকে। রস বিলোড়নের জন্য দুই হস্তে দুইটি টামাও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যে তিনটি গামলায় শেষকালে রস ঢালা হয় তাহাকে

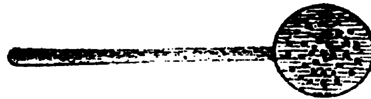
তাগাড়ি বা কাট্‌নি বলে। এই খাজানা ও তিনটি কাট্‌নি কটাহের সন্নিকটেই ক্রমনিম্ন করিয়া মাটীতে পুঁতিয়া রাখা হয়। শেষ গামলা বা কাটনি হইতে রস উঠাইয়া অপর একটি মৃণ্ময় পাত্রে রস সঞ্চয় করা হয়। ইহাও কাটনির সন্নিহিত নিম্ন ভুমিতে প্রোথিত থাকে। পরে উক্ত পাত্র হইতে রস উঠাইয়া সন্নিহিত কতকগুলি নাদায় (চিত্র ৩৬) পূর্ণ করিয়া প্রায় এক সপ্তাহ কাল রাখিয়া দেওয়া হয়। নাদায় পূর্ণ হইবার পুর্ব্বেই রস শীতল হইয়া আসিয়াছিল। এইরূপে এক সপ্তাহ কাল রাখিয়া দিলেই নাদাস্থিত রস দানা বাঁধিবে। তখন উহাকে দানা বা মাল বলে।

প্রতাপগড় পরগণার মিছরি প্রস্তুত প্রণালী।

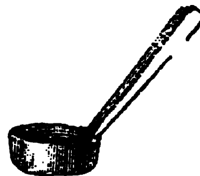
সাধারণতঃ ভাল চিনিতে মিছরি প্রস্তুত হয় না। মিছরির জন্য ২নং পাকী চিনিই ব্যবহার হইয়া থাকে। লৌহ কটাহে এক ভাগ জল ও দুই ভাগ চিনি দিয়া, জলের



সহিত চিনি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া জ্বালে চড়ান হয়। এই চিনির জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে উহা হইতে ময়লা পরিস্কার করিয়া লইবার জন্য উহাতে দুগ্ধ মিশ্রিত জলের প্রক্ষেপ দিতে হয়। দুধের জল দিয়া গাদ কাটাইবার প্রথা অনেক দেশেই প্রচলিত আছে। দুধের জলে দুধ সামান্যই থাকে, এক ভাগ দুধে প্রায় ৫০ ভাগ মিশান হয় চিনির রসে দুধের জলের প্রক্ষেপ দিতে দিতে এই রসের সমস্ত ময়লা গাদ উপরে ভাসিয়া উঠে, তখন উহা ঝাজ্‌রা দ্বারা উঠাইয়া ফেলা হয়। এইরূপ জ্বাল দিতে



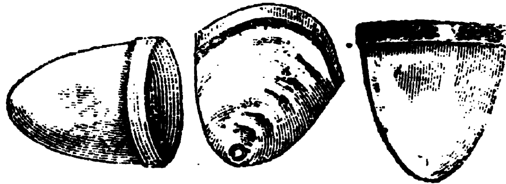
দিতে যখন রস একটু ঘন হইয়া আইসে, তখন কটাহটী উনান হইতে নামাইয়া স্থানান্তরে রাখিয়া ডাব্ব দ্বারা উক্ত রসকে অনবরত নাড়িতে হইবে। ক্রমে রস ঘন হইয়া দানা



বাঁধিতে থাকিবে। বঙ্গদেশে এই কার্য্যের জন্য নারকেল মালা নির্ম্মিত এক প্রকার উড়কি মালা ব্যবহার করা হয়। ইহাও প্রায় ডাব্বুর মত। পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রস ঘন্ হইতে আরম্ভ হইলে কটাহটী জ্বাল হইতে নামাইতে হইবে। ঠিক কোন সময়

জ্বাল হইতে স্থানান্তর করা আবশ্যক, তাহা রসে অঙ্গুলি দিয়া দেখিলে জানা যায়। বৃদ্ধ ও মধ্যম অঙ্গুলির মধ্যে একটু রস লইয়া যদি দেখা যায় যে, রসটী বেশ চিটু মত হইয়াছে, অঙ্গুলি দুইটী ফাঁক করিলে যদি তাহা সূত্রবৎ লম্বা হইয়া উঠে, তবেই জানিতে হইবে রসের পাক ঠিক হইয়াছে। তখনই উহা জ্বাল হইতে নামাইতে হইবে।

তৎপরে রস অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া আসিলে ডাবু দ্বারা সেই রস মাটীর খুজাতে (আমাদের দেশে ইঁহাকে কুঁদো বলে) ঢালিতে হয়। খুজাগুলির আকৃতি মোচার



অগ্রভাগের ন্যায় তলা সরু, মুখটী চওড়া গোলাকার। তলায় অনেকগুলি ছিদ্র আছে। এই পাত্রগুলি সচরাচর দৈর্ঘ্যে ৭½ ইঞ্চি ও মুখের পরিধি প্রায় ২ ফিট। এই পাত্রগুলির তলার ছিদ্র প্রথমতঃ কাগজে আটা মাখাইয়া তাহার দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সময়ে সময়ে ছিদ্র দৃঢ় বদ্ধ করিবার জন্য এইরূপ অনেকগুলি কাগজের পাত উপরে বসান হইয়া থাকে। তৎপরে এই পাত্রগুলি সোজা ভাবে রাখিবার জন্য মাটির কলস



বা মেটিয়ার উপর বসান হয়। এইরূপ ভাবে বসাইয়া পাত্রগুলির তলায় কিঞ্চিৎ শুষ্ক চিনি ছড়াইয়া দিয়া উক্ত প্রকারে প্রস্তুত রস ঢালিয়া দেওয়া হয়। পাত্রগুলি রস পূর্ণ হইলে এবং রস অল্প গরম থাকিতে থাকিতে উহাতে কিঞ্চিত দোবরা চিনি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে রস শীঘ্র দানা বাঁধিয়া আইসে। বাকী চিনি জল মিশাইয়া অগ্নি সংযোগে পাক করিয়া লইয়া পরে তাহা ক্রমাগত ডাড়ু বা কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে শুষ্ক ও শুক্ল বর্ণ হইয়া আসিলে তাহা গুঁড়াইয়া বীজ চিনি প্রস্তুত করা হয়। ২৪ ঘণ্টা পরে উক্ত পাত্রের তলায় কাগজগুলি খুলিয়া লইয়া ২৪ ঘণ্টা কাল রৌদ্রে রাখিতে হইবে। কিন্তু সেগুলিকে রাত্রে ঘরে উঠাইয়া রাখা উচিত। এইরূপ ভাবে কিছু কাল রাখিলে তলাস্থিত ছিদ্র দ্বারা শিরা বা অবশিষ্ট তরল রস বাহির হইয়া যাইবে। কুঁদাস্থিত দানাবদ্ধ চিনি সুপরিস্কৃত করিবার জন্য কুঁদার মুখে ১ এক ইঞ্চি পুরু গাঁজ চাপাইয়া রাখিতে হয়। গাঁজগুলি চাপিয়া রাখিবার জন্য তদুপরি প্রস্তর বা অন্য কোন ভারি বস্তু স্থাপিত করিতে হয়। ৪৮ ঘণ্টা পরে ঐ গাঁজগুলি আবার বদলাইয়া দিতে

হয়। দ্বিতীয় বার গাঁজ দিবার ২৪ ঘণ্টা পরে খুঞ্জা বা কুঁদা হইতে দানা বদ্ধ চিনি খুরপি



দ্বারা চাঁচিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। পরে আবার উহার উপর গাঁজ চাপাইয়া কিছু কাল রাখিলে যে চিনি প্রস্তুত হইবে, তাহাকে তদ্দেশে গাঁদ বা লোফা সুগার বলে। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে কুঁদা হইতে সমস্ত তরল রস নিষ্কাশিত হইয়া গিয়াছে। প্রতাপগড়ে যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছে ৵৬ ছয় সের চিনি হইতে ৵২॥৵ দুই সের নয় ছটাক গাঁদ এবং ৵৩।৶ তিন সের ছয় ছটাক তরল রস প্রস্তুত হইয়াছিল এই তরল রস হালুইকরেরা মেটাই প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

এই রূপে যে গাঁদ প্রস্তুত হইল তাহা আবার জলে গুলিয়া জ্বাল সংযোগে মিশ্রি প্রস্তুত হইবে। এই মিশ্রি প্রস্তুতের জন্য কাটরা আব্বাসপুরের রাণীতালাও হইতে জল আনাইয়া ব্যবহার করা হয়। এই জল ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে মিশ্রি অতি সুপরিষ্কৃত হয় এবং সেই জন্যই বাজারে প্রতাপগড়ের মিশ্রির এত আদর হইয়া থাকে।

গাঁদ জলে গুলিয়া কটাহে চড়াইয়া জ্বাল দেওয়া হয়। তৎপরে পূর্ব্ববৎ দুধের জল দিয়া গাঁদ কাটাইতে থাকে। এইবারে দুধের মাত্রা কিছু অধিক থাকে, অর্থাৎ ১ ভাগ দুধে ৩০ ভাগ মাত্রা জল মিশান হইয়া থাকে। কতকটা গাঁদ পরিষ্কার হইয়া গেলে, রসটী কড়া হইতে একটী গামলার মুখে কাপড় বাঁধিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিয়া কড়াটী দুধের জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। কড়া ধোয়া জলও ঐ রসে মিশ্রিত করিয়া দিলে মন্দ হয় না। রস আবার জ্বালে চাপাইয়া আবশ্যক মত ঘন হইয়া আসিলে তাহা থালীতে ঢালিয়া মিশ্রি প্রস্তুত করা হয়। থালিগুলি পিত্তল নির্ম্মিত ও কানা বিশিষ্ট।

চিনির রস জ্বাল দিবার জন্য যে কটাহ ব্যবহার হয় তাহা প্রায় হাতলওয়ালা। (চিত্র ৪৯)।

রস ঢালিবার পূর্ব্বে থালিগুলি অল্প গরম করিয়া কাঠের গরম ছাইয়ের উপর বসাইতে হয়। থালিতে রস ঢালার অব্যবহিত পরেই, থালিগুলি বেতের ঝুড়ি বা মাটীর নাদ বা গামলার দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয় এবং বায়ু গমনাগমনের পথ একবারে বন্ধ করিবার জন্য তদুপরি কম্বল দিয়া মুড়িয়া দিলে ভাল হয়। এইরূপে ১৮ হইতে ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিলে মিশ্রির সম্পূর্ণ দানা বাঁধিবে। মিশ্রি প্রস্তুত হইয়া গেলে থালিস্থিত মিশ্রির এক পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া দিয়া থালিগুলি কটাহের উপরিস্থিত ঝুড়ির

উপর কাত ভাবে রাখিয়া দিতে হয়। ইহাতে থালার যে অবশিষ্ট রস দানা বাঁধে নাই ঝুড়ি দিয়া ছাকিয়া কটাহে পড়িয়া যাইবে। প্রতাপগড়ে যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে /২৷৷/ দুই সের নয় ছটাক গাঁদ হইতে /২ সের মিশ্রি এবং ।/ পাঁচ ছটাক রস পাওয়া গিয়াছে, বাকি যেটুকু ওজনে কম হইয়াছে তাহা নানা প্রকারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

প্রতাপগড়ে কেবল প্রথমে চিনি হইতে গাঁদ প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহা হইতে মিশ্রি প্রস্তুত করা হয়। এইরূপ করা হয় বলিয়াই, প্রতাপগড়ের মিশ্রির বর্ণ এত পরিষ্কার, দানা বড়, সুসম্বদ্ধ ও চাকচিক্যশালী। অন্যত্র কিন্তু এরূপ না করিয়া একবারে চিনি হইতে মিশ্রি তৈয়ারি করা হয়, যদিও প্রতাপগড়ের মিশ্রির মত না হউক, তাহাও তাদৃশ মন্দ নহে। বেণারস, জৌনপুর, সুলতানপুর, প্রভৃতি স্থানে বীট চিনির মিশ্রি প্রস্তুত করা হয় না। মিশ্রির জন্য সাধারণ চিনিই ব্যবহার করা হয়, সুতরাং তাহা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

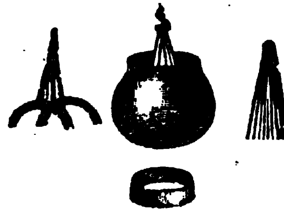
দুই প্রকারে মিশ্রি প্রস্তুত হইতে পারে। ১ম থালিতে ঢালিয়া, ২য় কুঁদায় ফেলিয়া প্রস্তুত করা হয়।

১। থালির মিশ্রি।

প্রথমতঃ চিনি জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। পরে ঐ চিনির জল কটাহে চাপাইয়া জাল দিয়া রস ঠিক মিশ্রির পাক হইলে, থালিতে ঢালিয়া কি প্রকারে মিশ্রি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। থালি হইতে বাকি রস নিঃসৃত হইয়া গেলে দানা সম্বদ্ধ মিশ্রির চাপ থালি হইতে উঠাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই থালির মিশ্রি প্রস্তুত কার্য্য শেষ হইল। এই মিশ্রি প্রস্তুত করিবার সময় যে গাঁদ বাহির হয়, বা কটাহাদি ধৌত করিয়া যে রসাবশিষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পুনরায় কটাহে জ্বাল দিয়া দুধের জল দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইলে, তাহাতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাকে ভুরি চিনি কহে।

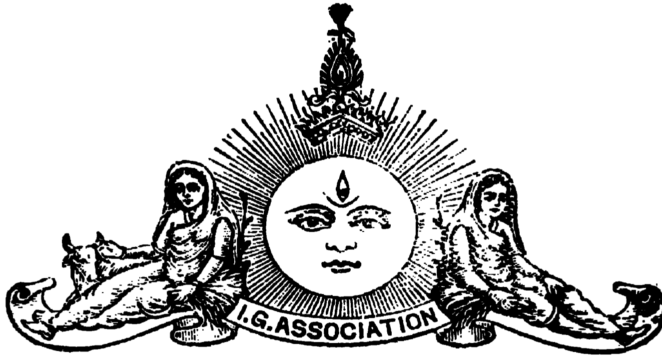
২। কুঁদার মিশ্রি।

চিনি বা গাঁদ প্রস্তুত করিবার জন্য যে কুঁদা ব্যবহার করা হয়, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মিশ্রির জন্যও সেই আকারের ছোট বড় নানা পরিমাণের কুঁদা ব্যবহার করা



হয়, কিন্তু এগুলির তলায় ছিদ্র থাকে না। চিনির রস পরিপাক করিয়া লইয়া পুর্ব্ব প্রথাবৎ কুঁদার মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। মিশ্রি প্রস্তুত হইলে সেইটী কুঁদা হইতে বাহির করিবার সুবিধার জন্য কুঁদার মধ্যে ৪।৫ গাছি বাঁশের পাতলা বাখারির এক দিকের অগ্রভাগ বাঁধিয়া রস ঢালিবার পূর্ব্বেই কুঁদার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। বাখারিগুলির এক প্রান্তভাগ বিস্তৃত ও অন্য প্রান্ত সম্বদ্ধ থাকায় তাহারা স্বভাবতঃ কোণাকারে থাকে। তৎপরে ঐ মৃৎভাণ্ডগুলিতে মাটীর লেপ দিয়া কম্বল দ্বারা ২৪ ঘণ্টাকাল মুড়িয়া রাখিয়া দিলে রস দানা বাঁধিয়া মিশ্রি প্রস্তুত হইয়া যাইবে। এইরূপে দানা বাঁধিলে লৌহ শলাকা দ্বারা ঐ মৃৎভাণ্ডগুলির তলায় ছিদ্র করিয়া দিলে রসাবশেষ নিঃসৃত হইয়া যাইবে।

সরকারী কৃষি সমিতি—এবার বিগতবর্ষের ১০ হইতে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে পুনায় কৃষি সমিতির (Board agriculture) দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আলোচিত বিষয় সমুদয় তালিকা নিম্নরূপ ; (১) কৃষি ও জীবানু তত্ত্ব বিভাগের কার্য্যাবলী (২) প্রাদেশিক কৃষি ও পশু চিকিৎসা বিভাগ সমুদয়ের ও সমস্ত রাজ্যাদির কৃষি বিভাগের কার্য্য ; (৩) যে বৎসর কৃষি সমিতির পূর্ণ অধিবেশন হইবে না তদ্রূপ বৎসরে আংশিক অধিবেশনের প্রস্তাবনা (৪) পশু চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা (৫) কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রাদির সার সঙ্কলন ও সূচী প্রস্তুত (৬) ভারতীয় শর্করা শিল্প (৭) ফস্ফরাস ঘটিত সারের উপকারিতা ও এতদ্দেশে বৃহত্তর মাত্রায় সুপারফসফেট্ প্রস্তুতের সম্ভবপরতা (৮) উন্নত কৃষি প্রণালীর প্রতি কৃষকের মনোযোগ আকর্ষণ করার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। (৯) ভারতের অনেকস্থলে কৃষক প্রতি চাযের জমি এত সামান্য যে তাহা লাভজনক হয় না। ইহা প্রতিকারের কোন উপায় সম্ভব কি না (১০) প্রাদেশিক ও ভারতীয় কৃষি বিভাগের গ্রন্থাবলী প্রকাশের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা (১১) পরীক্ষায় ভ্রমভ্রান্তি নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়; ইহার অন্য একটি স্থায়ী অভিজ্ঞ সমিতি নিয়োগের সম্ভবপরতা ; (১২) কৃষিজাত ফসলে ভেজাল নিবারণোদ্দেশ্যে সরকার কিছু করিতে পারেন কি না ? (১৩) কৃষিবিভাগের আয়ত্তাধীন উপায়ে খাদ্য শস্যের সত্বরে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় (১৪) সার বিক্রয় সম্বন্ধীয় আইনের প্রয়োজনীয়তা (১৫) বিভিন্ন কৃষি বিভাগ সমূহে সার ও চাষ সম্বন্ধে যে সমুদয় আবশ্যকীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তৎসমুদয় সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশের ব্যবস্থা ও তজ্জন্য একটি কমিটি নিয়োগ (১৬) ফসল সমূহের জলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিকতর অনুসন্ধান ও দেশ বিশেষে বিশেষ ব্যবস্থা (১৭) কৃষি বিষয়ক শিক্ষা।



অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩২৪ সাল।

বিলাতী পানা।

ইতিপূর্ব্বে 'কৃষকে' বিলাতী পানা সম্বন্ধে ২।১ বার সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন পাঠক এ সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবার ইচ্ছা প্রার্থনা করায় আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিলাতী পানা বিষয়ক সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত করিলাম।

বিলাতী পানার বৈজ্ঞানিক নাম Eichornia Crassipes Solms. মূলতঃ ইহা দক্ষিণ আমেরিকার উদ্ভিদ। কিন্তু নানা প্রকারে প্রসার লাভ করিয়া ইহা এক্ষণে ফ্লোরিডা, অষ্ট্রেলিয়া, যবদ্বীপ ও এতদ্দেশে বন্য অবস্থায় জন্মাইতেছে। উদ্ভিদগুলি মূল বিভাগ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহার পত্রবৃন্ত ফাঁপা ও বায়ুপূর্ণ এবং চওড়া পাতাও পালোর কাজ করে। সেই জন্য এই উদ্ভিদ অতি শীঘ্র স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। বস্তুতঃ এইরূপে অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিলাতী পানা এক্ষণে ব্রহ্মদেশ পূর্ব্ববঙ্গ ও মান্দ্রাজ প্রদেশের অনেক নদী নালা বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের সওদাগরগণ এই উদ্ভিদের উচ্ছেদ সাধনের প্রতীকার উপায় কল্পে বঙ্গ দেশের তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলের নিকট আবেদন করেন। তাহার ফলে বিলাতী পানা সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইতে আরম্ভ হয়। কোন বস্তু দ্রব্য কোনরূপ ব্যবহারে না অসিলে লোকের মনযোগ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় না। সেই জন্য বিলাতী পানাও কি কাজে লাগিতে পারে তাহারও আলোচনা চলিতে থাকে। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে উহা হইতে যে সার প্রস্তুত হয় তাহা ক্ষেত্রজ

সারের সমকক্ষ। এতদ্ভিন্ন ইহাতে পটাশ ঘটিত উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় ইহা পাটের পক্ষে অতি উত্তম সার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা ব্যবহারে এমন কি বিঘা প্রতি প্রায় ২ মন অধিক পাট পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা ব্যবহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিয়া রাখা উচিত।

(১) বিলাতী পানার জলের মাত্রা অত্যন্ত অধিক। শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ। কাঁচা পানা সুকাইলে ওজন ২০ ভাগের এক ভাগ হইয়া যায়। আবার পোড়াইয়া ফেলিলে ১০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র ছাই পাওয়া যায়।

(২) বিলাতী পানার ভস্মে সারের মাত্রা নিম্ন রূপ:—১০০ ভাগে ২৮·৭ পটাস, ১·৮ সোডা ১২·৮ চূণ. ৭·০ ফসফরিক অম্ল ও ২১·০ ক্লোরিন।

(৩) জলের মাত্রা অধিক বলিয়া পানা অন্যত্র লইয়া যাওয়া অসুবিধা। পচাইয়া সারে পরিণত করিলেও ওজনে বিশেষ কমেনা। সেই জন্য ইহার স্থানীয় ব্যবহারই প্রসস্ত। সার প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ গাছগুলি কতক পরিমাণে শুকাইয়া লইয়া তৎপরে গাদি দিতে হয়। তাহা না হইলে অনেক পরিমাণে জল বাহির হইয়া সার পদার্থ ধুইয়া যায়।

(৪) গাছ পোড়াইয়া ফেলিলে ধাতব পদার্থ সমূহ থাকে বটে কিন্তু সমস্ত জান্তব পদার্থই নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য সার প্রস্তুতের পক্ষে না পোড়ানই ভাল।

(৫) কলিকাতার স, ওয়ালেস্ কোম্পানী ৮৪৲ হইতে ১২০৲ টাকা টন দরে বিলাতী পানার ভস্ম ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন।

(৬) সার ব্যতীত বিলাতী পানা হইতে ক্লোরাইড অব্ পটাস নামক মূল্যবান ধাতব পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে। উদ্ভিদে উহার মাত্রা শুষ্ক অবস্থায় প্রায় ৫০ ভাগ।

(৭) পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় এবং বারেন্দ্র অঞ্চলে রাজসাহী, বগুড়া দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায়, যে সকল স্থানে জমিতে বালি পড়ে না, সেইরূপ স্থানের পক্ষে বিলাতী পানা উপযুক্ত সার।

আপাততঃ ঢাকা জেলায় স্থানে স্থানে বিলাতী পানা সাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার অধিকতর প্রসার বাঞ্ছনীয়; তাহা হইলে একই উপায়ে জমিতেও সার দাওয়া চলিবে এবং একটি অনিষ্টকর আগাছারও উচ্ছেদ সাধন হইবে।

(Editorial Note.)

কৃষকের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশাত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ চেধুরী লিখিত "মোকামা-টাল্ এবং পোকার উপদ্রব" প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই প্রতিবাদের লেখক বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারিক কীট তত্ত্ববিৎ। তাঁহার বিস্তৃত পত্র স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল ও ইংরাজি অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে

উহার সারাংশ অনুবাদিত হইল। এতদ সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য বারান্তরে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে সরকারী কর্ম্মচারীবর্গ দেশীয় লোকজনগণের সহিত তখনও থাকিবার ব্যবস্থা ছাড়িয়া কৃষি সম্বন্ধীয় রহস্যাদি সাধারণকে সম্যকরূপে বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছেন তাহা দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে ভ্রান্ত সংস্কার অপেক্ষা কৃষি বিষয়ক ভ্রম প্রমাদ বিশেষে বিপদজনক। কারণ ইহাতে বিপুল জন সংখের ক্ষতি হইয়া থাকে। অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক কৃষি আমাদিগের দেশে নূতন জিনিষ। এই বৈজ্ঞানিক কৃষি সম্বন্ধে কৃষকের মনে একবার ভ্রান্ত ধারণা জন্মিলে তাহা উন্মুল করা কঠিন হইবে এবং ঐরূপ ধারণার ফলে কৃষির উন্নতিও সম্ভবপর হইবে না। আমরা সেই জন্য সাদরে সরকারী কীটতত্ত্ববিদের পত্র প্রকাশিত করিলাম। সত্যানুসন্ধানে যতদূর বাদানুবাদ ও আলোচনা হয় ততই ভাল। উভয় পক্ষের যুক্তি তর্ক হইতে অবশেষে খাঁটি সত্য বাহির হইয়া আসে। পাঠকবর্গ এক্ষণে প্রবাদ ও প্রতিবাদ লেখকের উক্তি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

নারিকেলের ব্যবসায়ঃ—মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রায় ২৪ লক্ষ বিঘা পরিমিত জমিতে নারিকেলের চাষ হইয়া থাকে। পশ্চিম উপকূলই নারিকেল চাষের প্রধান কেন্দ্র। দেশীয় রাজ্যাদি সমেত দাক্ষিণাত্যে বৎসরে প্রায় এক শত কোটি নারিকেল জন্মাইয়া থাকে। সাধারণতঃ শুধু মান্দ্রাজ অঞ্চলের বন্দর সমূহ হইতে ২২৪ লক্ষ টাকার কম নারিকেল রপ্তানি হয় না। এতদ্ভিন্ন নারিকেলের স্থানীয় কাটতিও কম নহে। এই সমুদয় কারণে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মনস্থ করিয়াছেন যে নারিকেল চাষের উন্নতির জন্য কতিপয় পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপনা করিবেন। এই পরীক্ষা ক্ষেত্রগুলি দক্ষিণ কানাড়ায় যে তিন প্রকার জমিতে সাধারণতঃ নারিকেল উৎপাদিত হয় সেইরূপ জমিতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। যথা বালু জমি, বালু দোঁয়াশ মিশ্রিত জমি ও পাথুরে লাল মাটি। অধিকন্তু এই কার্য্যের জন্য দুইটি নারিকেল বাগান আপাততঃ খাজনায় লওয়া হইয়াছে।

রেশম শিল্পঃ—রেশম শিল্প সম্প্রতি স্যালভেসন্ আর্ম্মি হস্তপ্রদান করিয়াছেন। ইহারা ক্রমশঃ ক্রমশঃ একদল লোক তৈয়ারী করিয়াছেন যাঁহারা শিক্ষা দিতে সক্ষম এবং রেশম সম্বন্ধে যাবতীয় অসুবিধা বিষয়েও অভিজ্ঞ। এই মুক্তি ফৌজ দলের ভারত ও সিংহলে রেশম চাষের কেন্দ্র সমূহ বিষয়ক বিবরনীতে প্রকাশ যে মহীশূরে ২, পঞ্জাবে ৫, যুক্ত প্রদেশে ১০, বোম্বাইয়ে ২, বঙ্গে ১, বিহার ও উড়িষ্যায় ১, মান্দ্রাজে ৫, ত্রিবাঙ্কুরে ১, ও সিংহলে ১, মোট ২৮টি কেন্দ্র ১৯১৬ সালে স্থাপিত হইয়াছে। এই সমুদয় কেন্দ্রের মধ্যে ৮টি স্কুল, ২৫টি পোলু জননাগার ২৫টি রেশমসূত্র প্রস্তুতের কারখানা এবং ৯টি

বয়নাগার আছে। বর্ত্তমান বৎসরে ফ্রান্স হইতে আনিত ৩৫০ আউন্স রেশম বীজ সিমলা পাহাড়ে প্রতি পালিত হইয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে বিতরিত হইয়াছে। আপাততঃ যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে মাসে ৪ টন গুটি হইতে ১ টন সূত্র প্রস্তুত হইতে পারিবে। কিন্তু সম্ভবতঃ এত গুটি পাওয়া যাইবে না এবং গুটি আমদানি করা আবশ্যক হইবে। বস্তুতঃ মুক্তি ফৌজ এ সম্বন্ধে যে সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা প্রশংসা যোগ্য।

গুয়ানো সার—গুয়ানো সার যে বিশেষ তেজস্কর তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ইহার উৎপত্তি স্থানের মধ্যে সিচিলিম্ দ্বীপপুঞ্জ অন্যতম। আবার সিচিলিমের মধ্যে আসানসন দ্বীপই গুয়ানের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা প্রবাল দ্বীপ। মনুষ্য বসতির বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে পুঞ্জীভূত পক্ষী মলই গুয়ানো সার। এখনও এস্থলে পক্ষীর সংখ্যা কম নহে। পক্ষীর মল অবশ্য প্রথমতঃ ভুমির উপরেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ জল বৃষ্টির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠস্থ গর্ত্ত ও গুহায় এই সমুদয় গিয়া সঞ্চিত হয় এবং গুহায় সঞ্চিত গুয়ানো অপেক্ষাকৃত অধিক সারবান। গুয়ানোকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় (১) গুহাস্থ গুয়ানো (২) ভূপৃষ্ঠস্থ গুয়ানো—১ম শ্রেণীর গুয়ানো স্থল বিশেষে একত্রে ৫০০ টন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে সম পরিমাণ গুয়ানো ভূপৃষ্ঠে পাইতে পারিবেন ও ইহাতে ৩০ বিঘা জমি অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহা অনুমান করা যায় যে সমস্ত দ্বীপে গুহায় ১০৬,০০০ টন ও ভূপৃষ্ঠে ২৭০,০০০ টন গুয়ানো আছে। এই দুই শ্রেণীর গুয়ানোর রাসায়নিক উপাদান নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

উপাদান	গুহা	ভূপৃষ্ঠ
ক্যালসিয় ফসফেট্	৬১·০৪	৭২·৮৩
ঐ কার্ব্বনেট	০	৬০·০০
আয়রণ অক্সাইড ও অ্যালুমিনা	৩·৬৭	০·৫০
জল	১৯·৫৭	১০·০০

গুহার গুয়ানোতে লোহ ঘটিত দ্রব্য ও অ্যালুমিনা অধিক থাকায় অনেক ব্যবসায়ী উহা সুপারফস্‌ফেট্ প্রস্তুতের জন্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সুপারফস্‌ফেট্ প্রস্তুত অনুপযুক্ত হইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট সার। ইহার লবণগুলি দ্রবনীয় ও ফসলের পক্ষে আশু ফলদায়ী। পক্ষান্তরে ভূপৃষ্ঠস্থ গুয়ানোর গুণাগুণ নিম্নস্থ জমির উপর নির্ভর করে এবং উহা পাহাড়ে কিম্বা বেলেহইলে সার অধিক অথবা অল্প হইয়া থাকে। বেলে জমিতে ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেট বেশী হয় এবং সারের মূল্য কমিয়া যায়। আপাততঃ আমালসন দ্বীপের গুয়ানো তেমন অধিক পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে না। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় রপ্তানি হইলে ৪৬,০০০ টন উৎকৃষ্ট

ও ৫০০০০ টন অপকৃষ্ট গুয়ানো প্রত্যেক বৎসর এই স্থান হইতে চালান যাইতে পারে। শীঘ্রই এই গুয়ানো রপ্তানির বন্দোবস্ত হইতেছে।

ইক্ষু-চাষ। "ট্রপিকাল লাইফ" নামক পত্রিকার সম্পাদক মিঃ হ্যামেল স্মিথ সম্প্রতি সুলভে শরকরা উৎপাদন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান চিনির মহার্ঘতার সময় পুস্তকটী যে কালোপযোগী হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বৃটিশ সম্রাজ্যে ভারতে ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে যে বিস্তৃত শরকরা উৎপাদনের ক্ষেত্র আছে তাহা সকলেই জানেন। তদভিন্ন বিদেশে কুলি চালান নিবারণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে। তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে এই সমুদয় কুলী দ্বারা বড় বড় ইক্ষু ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মিঃ স্মিথের পুস্তক কাজের কথায় পরিপূর্ণ, অনাবশ্যকীয় তথ্যাদির বাহুল্যতা ইহাতে নাই। মিঃ স্মিথের মতে অন্ততঃ ৫,০০০,০০০ টন পরিমিত শর্করা উৎপাদিত হইলেও আপাততঃ চলিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ না আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইক্ষু চাষ ও শর্করা উৎপাদন হইতেছে, ততক্ষণ ইহা হইবার আশা নাই। শুধু চিনির জন্যই দেশ হইতে বৎসরে ১২ কোটি টাকা বাহির হইয়া যায়। আধুনিক প্রথায় চিনি শোধনের কথা ছাড়িয়া দিলেও আপাততঃ যে প্রথায় গুড় প্রস্তুত হয় তাহাই কত ক্ষতিকর। প্রায় ১ বৎসর দেড় বৎসর প্রাণপণ খাটিয়া কৃষকের অবশেষে অন্ন সংস্থান হয় না। তাহার কারণ এই যে, যে প্রথায় গুড় তৈয়ারী হয় তাহাতে শতকরা ৩৫ হইতে ৫০ ভাগ শর্করা অপচয় হয়। প্রথমতঃ পশু চালিত মাড়াই কলে শতকরা ২০ ভাগ চিনি নষ্ট হয়, তাহার পর আবার কড়ায় জাল দিবার সময় কতক শর্করা পুড়িয়া লোকসান হয়। সর্ব্ব সমেত যে ইক্ষু হইতে যে পরিমাণ শর্করা উৎপাদিত হওয়া সম্ভব তাহার দুয়ের তৃতীয়াংশ মাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে প্রচলিত প্রথায় সংস্কার আবশ্যক।

কাগজ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার M.R.A.S., M.B.D.F.A.H & C. লিখিত।

(১)

কাগজ আমাদের একটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। ইহা বিলাতি সভ্যতার একটি নব আমদানী কৃত পদার্থ। ইহার প্রসার ভারতে আর্য্যযুগে ছিল না। ঐ কালে তালপত্র, গাছের ছাল এবং ভূর্জ্জপত্রে লেখার কাজ চলিত। বৈজ্ঞানিকগণ সভ্য পাশ্চাত্য দেশে নানা প্রকার গাছের ছাল, কাঠের গুঁড়া ঘাস, কলার বাসনা ও উদ্ভিদ্ পদার্থ হইতে উত্তম কাগজ প্রস্তুত করিবার উপাদান ও নবাবিষ্কৃত বিধি অনুসন্ধান করিতেছেন। আমেরিকা ও জার্ম্মেণী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্কেণ্ডিনেভিয়া দেশেও কম কাগজ ও দেশলাই তৈয়ার হয় না। আমাদের দেশের বিহার অঞ্চল হইতে এবং মির্জ্জাপুর ও আরা জেলা হইতে বেশী পরিমাণ "সাবে" ঘাস কাগজ তৈয়ার জন্য প্রতি বৎসর হোসেনাবাদ, উটারি রোড, ডিহরী, গুর্পা প্রভৃতি ষ্টেশান হইতে কলিকাতায় এবং টিটাগড়ে আসিয়া থাকে। জার্ম্মেণী আমাদের দেশে বহু কোটী টাকার কাগজ ভারতে প্রতি বৎসর পাঠাইতেন বলিয়া আমরা অগ্রে জানিতাম না, কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণের দেশ হইতে কাগজের আমদানী একরূপ বন্ধ হওয়ায় আমরা জানিতে পারিয়াছি যে সমগ্র শিল্প ও পণ্য দ্রব্যের বাজার কাহার হাতে? আজ কাল এই মহাসমরোপলক্ষে কাগজের দাম কলিকাতায় বাজারে আড়াই গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের দেশে অনেক "র মেটীরিয়েল" আছে যাহা হতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, অর্থ ও আছে, দেশে ধনীর অভাব নাই, তাঁহারা মন করিলে সহজেই ২।৪ খানা কাগজের কল কারখানা খুলিতে পারেন কিন্তু নানা কারণে তাহা কাজে পরিণত হয় না ইহাই আমাদের আক্ষেপ ও বাঙ্গালী চরিত্রের উপর চির কালিমা!!! বিগত কয় বৎসরের ইওরোপীয় যুদ্ধের ফলে আমাদের নিত্য আবশ্যকীয় পণ্য জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে কাগজও দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কাগজ সমস্যা সমন্বয় জন্য আমাদের শাসকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ আমাদের দেশে ইকনমিক চিন্তক বা একস্‌পার্ট নাই। আমাদের দেশের বহু সংখ্যক বালকগণ নানা শিল্প ও ব্যবসা শিখিতে পাশ্চাত্য দেশে গিয়া ব্যবহারিক শিল্প কারখানায় হাতে কলমে শিখিয়া আসেন নাই বলিয়া আমাদের এই দুঃসময়ে সকল প্রকারের দ্রব্যের জন্য কষ্ট পাইতে হইতেছে। এসব দিকে দেশের সহানুভূতি আদৌ নাই। যশোরের চিরুনীর কারখানায়, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, ন্যাশন্যাল সোপ ফ্যাক্‌টারি আদি বঙ্গের আদরের জিনিস গুলির শোচনীয় অবস্থা। দেশের তুলা, কাপড়, চিনি খেঁজুর গুড়, বাসন, মশলীন তসর, রেশমের চাষ ইত্যাদি সবই গিয়াছে,

তাহার পুনরুত্থানের ও সজীব করিবার কেহই চেষ্টা করেন না এই বিশেষ পরিতাপের বিষয় !!!

কাগজ আমাদের আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান উপাদান স্বরূপ; এবং আপনি আবার শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে ইহা আমাদের সভ্যতার একটী অন্তরায়। ইহা আমাদের সুন্দর পৃথিবীকে বৃক্ষশূন্য করিবার ভয় দেখাইতেছে। পৃথিবী বৃক্ষশূন্য হইলে সমস্ত স্রোতস্বতী শুকাইতে আরম্ভ করিবে; পৃথিবী বৃষ্টিশূন্য হইলে এবং ইহা একটি মরুভূমিতে পরিণত হইবে।

আপনি বলিতে পারেন যে পৃথিবীর এই অবস্থায় পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত আপনি বাঁচিবেন না, সমস্ত পৃথিবী এই অবস্থায় পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত আপনি না'ও পারিতে পারেন। কিন্তু এইন একটী দেশের বিষয় আলোচনা করা যাক্। তাহা হইলে আপনার এই ভ্রম বিদূরিত হইবে। মার্কিন দেশের কাগজের কলগুলি রেজ যে পরিমাণে করিতে থাকে তাহা হইলে আপনি আপনার জীবদ্দশায়ই এই দেশকে জঙ্গলশূন্য দেখিয়া যাইতে পারিবেন।

আপনার এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে এই দেশের জঙ্গলবিভাগের বড় কর্ত্তার মন্তব্য শ্রবণ করিলেই আপনার যে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের এখন কেবল মাত্র দুই হাজার বিলিয়ন ফুট (Two thousand billion feet), গাছ অবশিষ্ট আছে। যে পরিমাণে এতকাল এই গাছ ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে, এখনও যদি সে পরিমাণে ব্যয়িত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই অবশিষ্ট কাঠ গুলিতে ২০ বৎসর মাত্র চলিতে পারে। নিউইয়র্কের (New York) জঙ্গল এবং মৎস্য বিভাগের কমিশনার (Commissioner) মিঃ হুইপল্ Whipple আর'ও কি বলিয়াছেন শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছেন "আধুনিক সময়ে নিউইয়র্ক New York সহরে ৪১ বিলিয়ন ফুট কাঠ অবশিষ্ট আছে এবং প্রতি বৎসর ১২ বিলিয়ন ফুট করিয়া ব্যয়িত হইতেছে।" এবং তিনি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন "যদি আরও কএক বৎসর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না হইয়া এই প্রকারে কাঠ ব্যয়িত হইতে থাকে, তাহা হইলে এই কাঠ ২২ বৎসর মধ্যে নিঃশেষ হইবে।" এবং এত কাঠ কি প্রকারে ব্যয় হইতেছে তাঁহাকে এই প্রশ্ন করায় তিনি উত্তরে বলিয়াছেন "একমাত্র খবরের কাগজের জন্যই প্রতি বৎসর দুই বিলিয়ন ফুট কাঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।"

মার্কিন দেশের কৃষি বিভাগীয় রিপোর্টে প্রকাশ প্রতি বৎসর পাঁচশত ছাব্বিশ মাইল ব্যাপী কাঠ একমাত্র কাগজ প্রস্তুতের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে;

প্রতি বৎসর ৩৫০০,০০০ কর্ডের (Cord) অধিক কাঠ ব্যয় হইয়া থাকে।

গত বৎসর একমাত্র নিউ ইয়র্কের (New York) ওয়ারল্ড (World) নামক পত্রিকার জন্য ৭৭৩৮৭৫ পাউণ্ড শাদা কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে।

একমাত্র রবিবারের সংস্করণের জন্য দৈনিক খবরের কাগজের এক সপ্তাহে ব্যবহৃত কাগজের শতকরা ৩০ ভাগ করিয়া লাগে, অবশিষ্ট ৭০ ভাগ সপ্তাহের অন্যান্য বারের জন্য ব্যয়িত হয়।

কাগজের যৌগিক পদার্থ ৮০ ভাগ কাঠ এবং ২০ ভাগ অন্য পদার্থ যাহা পরে বলা হইবে। ইহা হইতেই ঐ বিভাগীয় বহুদর্শী লোকগণ স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে এই কাগজের একমাত্র রবিবারের সংস্করণের জন্য ২৯,৭ একর জমির কাঠ লাগিয়া থাকে, সপ্তাহের অন্যান্য দিনের জন্য ১১,৫ একর জমির কাঠ লাগে। এস্থানে রবিবারের সংস্করণের ১৫৬টী পত্রিকা বিদ্যমান।

গত নবেম্বর মাসে যুক্ত রাজ্যের Census Burçau যে বুলেটিন (Bullotin) প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল। "১৯০৫ সনে যুক্তরাজ্যে মোট যত কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে, তন্মধ্যে নয় হাজার টন ton কেবল মাত্র সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রের জন্য ব্যয় হইয়াছে। ইহা ঐ সনের মোট প্রস্তুত কাগজের এক তৃতীয়াংশ এই সমস্ত কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য ১৫০০০ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং নয় কোটী সাতাইশ লক্ষ দুই হাজার আট শত টাকা বেতন দিতে হইয়াছে। এই সমস্ত কাগজের কল ১০ দশ লক্ষ তিন শত কর্ড (cord) কাঠ ব্যবহার করিয়াছে, যাহা এক হাজার একর জমির উদ্ভূত পদার্থ। ইহার কতকাংশ কানাড়া হইতেও আমদানি হইয়াছে। ইহা হইতেই দেখা যায় যে একমাত্র যুক্তরাজ্যে এক মিলিয়ন সাত শত আট হাজার ফুট কাঠ প্রতি বৎসর সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রে পরিণত হইতেছে।" এই বুলেটিনে আরো প্রকাশ ১৯০৫ সালে মোট সাতান্নকোটি বিশলক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার নয় শত ষোল টাকা মূল্যের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সংবাদ পত্রের কাগজ দশ কোটী আটাত্তর লক্ষ এক চল্লিশ হাজার চারি শত ছাপান্ন টাকার; পুস্তকের কাগজ এগার কোটি তেত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার তিন শত বাষট্টি টাকার; উৎকৃষ্ট কাগজ ছয় কোটী চুয়াত্তর লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত ছিয়ানব্বই টাকার; দোকানের জিনিষ পত্রাদি বাঁধিবার কাগজ নয় কোটি বাইশ লক্ষ সাতান্ন হাজার আট শত অষ্টাশি টাকার; বোর্ড বা পাটা পাঁচ কোটি চৌদ্দ লক্ষ আট হাজার ছয় শত সাতান্ন টাকার।"

কেবল একমাত্র নিউইয়র্ক সহরের সংবাদ পত্রগুলির জন্যই সমস্ত যুক্তরাজ্যের প্রস্তুত কাগজের এক অষ্টমাংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই সকল সংবাদপত্রের সংখ্যা এতই অধিক যে যদি একদিনের প্রকাশিত সংবাদপত্র পাঁচ ফুট প্রশস্ত টুকরা করিয়া বিস্তৃত করা যায়, তাহা হইলে ইহা নিউইয়র্ক হইতে তিন হাজার মাইল দূরবর্ত্তী সেনফ্রানসিস্কো পৌঁছিবে। এক সপ্তাহের কাগজ বিস্তৃত করিলে বিষুবরেখা দিয়া সমস্ত পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে পারে। দশ সপ্তাহে ইহা চন্দ্রমণ্ডলে পৌঁছিতে পারে।

এবং যদি এক বৎসরের সংবাদ পত্র পাঁচ ইঞ্চি টুক্‌রা করিয়া বিস্তৃত করা যায় তবে বোধ হয় ইহা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের সহিত পৃথিবীর সংযোগ করা যাইতে পারে।

ইহা বলাই বাহুল্য যে এই সমস্ত কাগজ কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কল এমন সুন্দর ভাবে প্রস্তুত যে এই বৃহতোদর কলের এক প্রান্ত দিয়া কাষ্ঠ প্রদান করিলেই অপর প্রান্ত দিয়া ইহা ছাপিবার উপযোগী কাগজ বাহির হয়। এই বৃহতোদর কলের একটী বৃক্ষ কে কাগজে পরিণত করিতে ১০।১২ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে বিশেষ দক্ষতার সহিত চালাইতে পারিলে ইহাপেক্ষাও অল্প সময়ে করিতে পারা যায়।

একটী জীবন্ত গাছকে কত সত্বর সংবাদ পত্রে পরিণত করা যাইতে পারে, এ বিষয় নিয়া সম্প্রতি জার্ম্মন দেশের ইসেনথল সহরে একটী পরীক্ষা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার সম্পূর্ণ বিবরণ এই:—একটী কলের নিকটস্থ তিনটী বৃক্ষকে সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় কাটা হইয়াছিল, এবং তৎক্ষণাৎই বৃক্ষত্রয়কে বৃহতোদর কলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, এবং প্রথম কাগজ ঠিক নয়টা চৌত্রিশ মিনিটের সময় প্রেসে যাইবার উপযুক্ত হইয়া বাহির হইয়াছিল, এবং তৎক্ষণাৎই কাগজগুলিকে একখানা অটোমোবাইল করিয়া নিকটস্থ সংবাদপত্র আফিসে পাঠান হইয়াছিল, এবং দশ ঘটিকায় সে সংবাদ পত্র রাস্তায় বিক্রয় হইতে থাকে। এই বৃক্ষত্রয়কে খবরের কাগজে পরিণত করিতে ঠিক দুই ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমতি হইবে যে কত সত্বর একটী কলে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কাগজের কলে প্রথমে কাষ্ঠগুলিকে করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলে এবং পিশিয়া ছাতুর ন্যায় করে। এই পেষণ কার্য্য কোন প্রকার ছুরি কিম্বা করাত দ্বারা হয় না, অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন জাঁতা দ্বারা হইয়া থাকে। এই জাঁতা এত ক্ষমতাপন্ন যে ইহাতে পাঁচ শত কিম্বা ছয় শত ঘোড়ার ক্ষমতা থাকে। এই সকল কল এমন কৌশলে প্রস্তুত যে এই ছাতুগুলি আপনিই জল মিশ্রিত হইয়া কর্দ্দমাকারে পরিণত হয়। এই কর্দ্দম আকার কাষ্ঠ হইতে আঁশ নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য উহাকে ফুটন্ত গন্ধক দ্রাবকে দেওয়া হইয়া থাকে। উহাকে কিঞ্চিৎকাল এই দ্রাবক মধ্যে রাখিয়া, জল দ্বারা ধুইয়া ফেলা হয়।

অবশেষে কর্দ্দমাকার পদার্থকে মসৃণ কাগজে পরিণত করিবার জন্য অল্প পরিমাণ কর্দ্দম, কাগজে কালী বিস্তৃত না হইবার জন্য অল্প পরিমাণ রজন ও সাদা করিবার জন্য কিছু নীল মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। ইহা এখন দেখিতে পায়সের মত সাদা হইল। এই পায়সকে অধিক মিশ্রিত ও কাগজাকারে বিস্তৃত করিবার জন্য, ইহার উপর দিয়া জল প্রবাহিত করা হইয়া থাকে। জল ঠিক একটী প্রশস্ত ফিতার আকার ধারণ করিয়া একটী তারের জালের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং ঐ পদার্থগুলি জালের দুই পার্শ্ব দিয়া পড়িয়া না যাইবার জন্য, ঐ জালের দুই পার্শ্ব রবারের ফিতা দ্বারা আটকান থাকে। ইহা এখন ঠিক কাগজের ন্যায় বিস্তৃত হইল।

কাগজ

(২)

ঐ জলগুলি জালের ছিদ্র মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পড়িয়া যায় এবং কাগজগুলি শুকাইতে থাকে। তারপর এই গুলিকে একটী রোলারের (roller) ভিতর প্রবেশ করান হয় এবং রোলারের চাপদ্বারা ইহার জল্ বাহির করিয়া দেয়। তদনন্তর এইগুলিকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিবার জন্য একটী গরম সিলিণ্ডারের (cylinder) ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হইয়া থাকে। অবশেষে এই কাগজগুলিকে মসৃণ করিবার জন্য ধারাবাহিকরূপে ঠাণ্ডা লোহার রোলারের মধ্য দিয়া পরিচালিত করা হইয়া থাকে। এখন ইহা ছাপাইবার উপযোগী কাগজে পরিণত হইল এই গুলিকে অতি পরিপাটীরূপে রোল করিয়া, ফরমাইস্ অনুযায়ী আকারে পরিণত করা হয়।

খুব ভাল রোলিং মেশিনে এক মিনিটে পাঁচশত ফুট করিয়া কাগজ গুটাইতে পারে। যুক্ত রাজ্যের রামফোর্ড ফলস্ (Rumford Falls) নামক স্থানে একটী কলে চব্বিশ (২৪) ঘণ্টায় আশি (৮০) মাইল করিয়া কাগজ বাহির করিয়া থাকে। প্রতি মাইল কাগজ ওজনে অর্দ্ধ টন (ton) করিয়া। পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে যে প্রতি দিনে যুক্ত রাজ্যের সমস্ত কলগুলিতে চারি হাজার টন্ করিয়া কাগজ উৎপন্ন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে একমাত্র নিউইয়র্ক সহরের পত্রিকাগুলির জন্যই পাঁচ শত টন্ করিয়া ব্যয়িত হয়।

যুক্তরাজ্যে অত্যন্ত অধিক কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন বিষয়ে এদেশে কাগজ প্রস্তুত শিল্পই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯০৫ সনের সেন্সাস রিপোর্টে প্রকাশ যে উক্ত বৎসর এই রাজ্যে ছত্রিশ হাজার চারি শত বাইশটি ছাপাখানা ছিল এবং এই সকল ছাপাখানায় এক শত ষোল কোটী সত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার দুই শত পাচ টাকা মুলধন খাটিত এবং প্রতি বৎসর দেড়শত কোটী ছত্রিশ লক্ষ পচাশি হাজার নয় শত অষ্টাশি টাকা মুল্যের পুস্তকাদি বাহির হইত। ইহার এক তৃতীয় ভাগ ছাপাখানা কেবলমাত্র পুস্তক এবং বিজ্ঞাপনাদি ছাপার জন্য ব্যাপৃত ছিল এবং এক ষষ্ঠভাগ কেবলমাত্র মাসিক পত্র এবং সংবাদ পত্রাদি ছাপিবার জন্যই ব্যাপৃত থাকিত অবশিষ্ট অন্যান্য কার্য্য করিত। এখন বোধ হয় ছাপাখানার সংখ্যা এবং পত্রিকার সংখ্যা পূর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে।

গত ১৯০৫ সনে যুক্তরাজ্যে মোট একহাজার বত্রিশ কোটী একান্ন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার এক শত অষ্টাশীখানা সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রিকা ছাপা হইয়াছিল। দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবারিক সংস্করণ প্রতি রবিবার এক কোটী পনর লক্ষ উনচল্লিশ হাজার একুশ খানা করিয়া হইয়াছিল, এবং অন্যান্য দিনের কাগজ প্রতিদিন দু'কোটী

দশ লক্ষ উন আশী হাজার এক শত ত্রিশখানা করিয়া হইয়াছিল এবং মাসিক পত্রিকা প্রতি মাসে ছয় কোটী তেতাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার এক শত পঞ্চান্নখানা করিয়া হইয়াছিল, এবং সাপ্তাহিক প্রতি সপ্তাহে দুই কোটী সাতাত্তর লক্ষ বত্রিশ হাজার সাঁইত্রিশখানা করিয়া হইয়াছিল।

নিউইয়র্ক ষ্টেট্‌স্‌ঝিটাঙ (New York Staats Zeitung) নামক পত্রের সম্পাদক এবং প্রকাশক মিঃ হারম্যান রিডার ()Hermann ridder গত অক্টোবর মাসে জাতীয় পৌর-সম্মিলনীতে (National Civic Federation) বলিয়াছেন যে, এস্থানের সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রগুলি প্রতি মাসে কেবলমাত্র কাগজের জন্যই সতের কোটী পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। কেবলমাত্র একটী কাগজ প্রস্তুতের কারখানাতেই প্রতি বৎসর ছয় কোটী ছত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচ শত টাকার ব্যবসা হইয়া থাকে, পনর হাজার লোক খাটে, এবং উহা ২৫৯৭ বর্গ মাইল কাঠের জমির অধিকারী।

সংবাদপত্র এবং মাসিক পত্রের পরই এ স্থানের ট্রাম গাড়ির কোম্পানি এবং টেলিফোন কোম্পানি (telephone Co.) অধিক মাত্রায় কাগজ ব্যয় করিয়া থাকে। একমাত্র ট্রাম কোম্পানির পরিবর্ত্তনের (transfer) জন্যই প্রতি বৎসর তিন কোটী টুকরা কাগজ ব্যবহার হইয়া থাকে, যাহার জন্য মোটামুটী তিন শত তা কাগজ ছাপাইবার প্রয়োজন হয়। টেলিফোন কোম্পানির কেবল মাত্র নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া ও চিকাগোর জন্য চৌদ্দ লক্ষ খানা গ্রাহক তালিকার আবশ্যক হয়, যাহার জন্য দুই কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড কাগজের আবশ্যক হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই সমস্ত কাগজ পুরাতন কাপড়ে প্রস্তুত হইত। সেই সময়ে কাগজের মূল্যও অধিক ছিল, এখনো অনেক ভাল কাগজ পুরাতন কাপড় দ্বারা, প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যুক্তরাজ্যে কাঠ দ্বারা কাগজ প্রস্তুতের প্রথা প্রথমে ১৮৬৭ সালে মাসাচুসেট্ (Massachusset) প্রদেশের ষ্টক্‌ব্রিজ (Stock Bridge) সহরের মিঃ আলবার্টো পাগেনষ্টেবার (Alberto Pagenstebor) দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। সে সময়ে কেবলমাত্র যাঁতা দ্বারা কাঠ পেষণ করিয়াই কাগজ প্রস্তুত করা হইত। সেই জন্য তখন এই উপায়ে উৎকৃষ্ট কাগজ পাওয়া যাইত না। এখন পেষিত কাষ্ঠগুলিকে ফুটন্ত গন্ধক দ্রাবকের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া উত্তমরূপে আঁশ নির্ম্মুক্ত করা হয়, সেই জন্যই এখন উত্তম কাগজ পাওয়া যাইতেছে।

খৃষ্ট জন্মিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লুন (Ts'ai lun) দ্বারা চীন দেশে প্রথমে কাগজ আবিষ্কৃত হয়। এই চীন পণ্ডিত অনেক গবেষণার পর রেশম দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। অবশেষে তিনি ধানের খড় এবং পুরাতন কাপড় দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

ইজিপ্‌সিয়ানরা (Egyptians) রশ Rush নামক ঘাস দ্বারা প্রস্তুত কাগজে লিখিত। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দে (Samarcand). চীনবাসীদের প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুতের জন্য এক কারখানা খোলা হইয়াছিল।

৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা নগরের আরব পণ্ডিত যোজেফ্‌ আমরু (Joseph Amru) স্বাধীন ভাবে কাগজ প্রস্তুত করেন। শিক্ষিত আরবগণ শীঘ্রই ইহার ব্যবহার আরম্ভ করেন। আমরুর কাগজ প্রথমে তুলা দ্বারা প্রস্তুত হইত। অবশেষে তুলার পরিবর্ত্তে পাট ব্যবহার হইত। এই আরবীয় কাগজ একাদশ শতাব্দিতে মুরদের (Moor) দ্বারায় স্পেইনে যায়, এবং স্পেইন হইতে ফ্রান্সে যায় এবং এই প্রকারে সমস্ত ইউরোপে যাইতে আরম্ভ করে।

এখনও ইউরোপীয় অনেক দেশে হস্ত পরিচালিত প্রথায় কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। যুক্তরাজ্যের মাসাচুসেট (Massachusset) প্রদেশের অ্যাডাম (Adam) নামক স্থানে একটী মাত্র কলে এখনও হস্ত পরিচালিত প্রথায় কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। এই হস্ত প্রস্তুত কাগজ অত্যন্ত শক্ত ও সুন্দর এবং অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। হস্ত পরিচালিত প্রথায় পাঁচ জন লোক এক দিনে তিন রিমের অধিক কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে না।

যে সমস্ত হস্ত প্রস্তুত কাগজ এ রাজ্যে ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই জাপান হইতে আমদানি হয়। কিঞ্চিৎ পরিমাণ ফ্রান্স ও ইটালী হইতেও আমদানি হয়। আধুনিক সময়ে ইম্পিরিয়াল জাপানিজ ভেলাম (Imperial Japanese Vellum) নামক হস্ত প্রস্তুত কাগজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। ইহার এক রিম্ (৫০০ পাঁচ শত তা) চারি শত বায়াত্তর টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। প্রকৃত ইম্পিরিয়াল জাপানিজ ভেলাম (Imperial Japanese Vellum) কাগজের পরীক্ষা অতি সহজেই করা যায়। যদি ইহা প্রকৃত উক্ত কাগজ হয়, অত্যন্ত মসৃণ থাকা সত্ত্বেও, কোন প্রদীপের শিখার বিপরীত দিকে ধরিলে, পশমী কাপড়ের ন্যায় দেখাইবে। অন্য উপায়েও এ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একটুকরা ঐ কাগজ জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে যদি বিস্তৃত থাকে তাহা হইলে ইহা প্রকৃত, আর যদি কোঁকড়াইয়া যায় তবেই জানা যায় ইহা নকল।

অনেক সময় কাগজে জলছাপা দেওয়া যায়। কাগজ ভিজা থাকিতে থাকিতে ইস্পাতের ছাঁচ দ্বারা (Steel die) এই ছাপা দেওয়া হইয়া থাকে।

নষ্ট কাগজ হইতে আবার কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ফেলা যায় না।

এই যুক্তরাজ্যে একব্যক্তি কাগজ দ্বারা রাঁধিবার কড়া ডেক্‌চি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। তিনি এই সমস্ত পদার্থ, কাগজের উপর তাঁহার আবিষ্কৃত অদাহ্য এনামেলের প্রলেপ দান দ্বারাই করিতেছেন।

রসায়নের গুণে কাগজ দ্বারা কি না হইতেছে ? ইহা দ্বারা গাড়ীর চাকা, অদাহ্য ছাত কৃত্রিম দন্ত, ঘরের মেঝে জলের বাল্তি, জানালার জাল, খড়খড়ি, ফিল্টার সূতা, পোষাকের লাইনিং প্রভৃতি আরও অনেক পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে।

পুরাতন কাগজের কালী উঠাইতে পারিলে কাগজের মূল্য অনেক হ্রাস হইবে, সেই জন্যই খবরের কাগজ ও পুস্তকের মূল্য অনেক কমিবে। যে পণ্ডিত ইহা করিতে সমর্থ হইবেন তিনি সাধারণের অত্যন্ত ধন্যবাদার্হ হইবেন। ছাপার কালিতে তিসির তৈল এবং রঞ্জন থাকার দরুন কোন রাসায়নিক পদার্থই এ পর্য্যন্ত ইহা উঠাইয়া ফেলিতে সমর্থ হয় নাই। কালিফর্ণিয়া।

কৃষি ও গো-ধন।

কিছু দিন হইল কোন সংবাদপত্রে এইরূপ একটী কথা পাঠ করিয়াছিলাম যে কৃষি-কথা বঙ্গালার কৃষ্ণ-কথা ; কথাটী যথার্থ। বাঙ্গালী যতদিন কৃষিজীবী ছিল, গোপালক ছিল, ততদিন তাহারা সুখে ছিল, যে দিন হইতে বাঙ্গালী চাকুরীজীবী হইয়াছে, গোপালনে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, সেদিন হইতেই বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রকারে কাবু হইতে বসিয়াছে। যে পথে বাঙ্গালী চলিয়াছে, সে পথ ত্যাগ না করিলে বাঙ্গালীর পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর।

জ্ঞানোজ্জ্বল আর্য্য ঋষিগণ জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে,—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"।

তথাপি আমরা সেই ভিক্ষা ও চাকুরীকেই ইদানীং জীবনের সারসর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতেছি। আমাদের ন্যায় এমন মোহান্ধ জাতি জগতে আর কয়জন আছে জানি না! ভাই বাঙ্গালী, এখনও সাবধান হও, এখনও সতর্ক হও, এখনও ঋষিবাক্যের অনুসরণ করিয়া পৃথিবীতে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চেষ্টা কর; নতুবা নিশ্চয় জানিও, তোমার সেই ভয়ঙ্কর পরিণামের আর বড় বিলম্ব নাই।

বাঙ্গালী কৃষি ও গোজাতির প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া আজ যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃই শোচনীয়। যে দেশে টাকায় আট মন চাউল বিক্রয় হইত, সে দেশে আজ টাকায় আট সের মোটা চাউল মিলে না ; যে দেশে টাকায় এক মণ খাঁটি দুগ্ধ মিলিত, সে স্থানে আজ টাকায় জলমিশ্রিত দুগ্ধও চারি সের মিলে না। অন্নাভাবে আজ দেশের বার আনা লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, দুগ্ধাভাবে আজ দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল চৌদ্দ আনা শিশু সাগু বার্লি এরারুট

বা ভাতের মাড় খাইয়া নিতান্ত পরমায়ুর জোরে কোন রকমে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে! দেশের অধঃপতনের আর বাকী কি? বলিয়াছি বাবু হইয়াই বাঙ্গালীর এ সর্ব্বনাশ, বিলাসী হইয়াই বাঙ্গালীর এই দুরবস্থা, কৃষি ও গোজাতির প্রতি উপেক্ষাতেই বাঙ্গালী এত কাবু।

আমরা পাঁচ টাকার একটা কেরাণীর পদ খালি হইলে পাঁচ শত লোকে সেই পদপ্রার্থী হইয়া আবেদন করিব—তথাপি কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিব না; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া একটী বেগুন কিনিবার পয়সা মাত্র উপার্জ্জন করিব, তথাপি বাড়ীতে দুইটা তরী-তরকারীর গাছ রোপন করিব না; জানিয়া শুনিয়া আড়াই পোয়া জল মিশ্রিত এক সের দুগ্ধ চারি আনায় ক্রয় করিব এবং তাহাও না পারিলে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইব, তথাপি বাটীতে শক্তিসত্ত্বেও একটী গাভী পুষিব না; এমতাবস্থায় আমাদের ন্যায় বাবুরা কাবু হইবে না ত কাবু হইবে কে?

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের অপেক্ষা যে বহু গুণে সুখী ছিলেন, ইহার এক মাত্র কারণ কৃষিকার্য্যে ও গোপালনে তাঁহাদের অনুরাগ ছিল। কৃষি ও গোধন তাঁহাদের চক্ষে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া প্রতিভাত হইত। তাঁহাদের সেই মহান্ আদর্শ ত্যাগ করিয়াই আজ আমাদের এ সর্ব্বনাশ! আজ আমরা লক্ষ্মীছাড়া!!

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে দেশে গোপালক, বলরাম যে দেশে হলধর, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক যে দেশে স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ আমরা গোপালন ও গোরক্ষণে উদাসীন, কৃষির প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং হাল-চালনে একান্ত কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত! এ জাতির অধঃপতন হইবে নাত হইবে আর কাহার?

যে যাহাই বলুক আমাদের মনে হয় আমরা কৃষিজীবি জাতী। কৃষিই আমাদের একমাত্র উপজীবিকা। কৃষি আমাদের প্রকৃতিরও একান্ত অনুকুল। চাকুরী ছাড়িলে আমরা বাঁচিতে পারি, কিন্তু কৃষি ছাড়িলে আমরা বাঁচিতে পারি না। তবে কৃষি ছাড়িয়া আজও যে অনেকে বাঁচিয়া আছেন দেখা যায়, সে বাঁচাকে আমরা মরণের অধিক বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। চাকুরীজীবী বাবু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই সম্ভবতঃ আমাদের এ কথায় সায় দিবেন। আমরা যে অবস্থায় আজ আসিয়া পৌছিয়াছি, এখনও যদি সাবধান না হই, তাহা হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই আরও ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। তাই বলি, এখনও আমাদের ফিরিবার সময় আছে, এখনও সাবধান হওয়ার সময় আছে; সময় থাকিতে সাবধান না হইলে হয়ত এমন দিন আসিবে, যে দিন আমরা আত্মদোষে সবংশে ধ্বংশ হইব,—ইচ্ছা সত্তেও হয় ত তখন আর সেই দোষ সংশোধনের সময় পাইব না। উদ্ধৃত।

কৃষি ও গো-ধন

(২)

আমরা গতবারে বলিয়াছি যে কৃষিকথা শুধু কথার কথা নহে,—কৃষিকথা বাঙ্গালার প্রাণের কথা,—কৃষিকথা বাঙ্গালীর জীবন-মরণের কথা ; কৃষিকথা কেবল চাষার কথাও নহে, কৃষিকথা কৃষ্ণকথা,—কৃষিকথা সেই হলধর বলরামের কথা। আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে, আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড ঠিক রাখিতে হইলে কৃষিকথা ভুলিলে আমাদিগের চলিবে না। কৃষিকথার সঙ্গে সঙ্গে গোজাতির কথাও আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। গরুর কথাও আমাদের কদাচ উপেক্ষনীয় নহে,—গরুর কথা হিন্দুর নিকট দেবতার কথা। হায়, হিন্দু আজ নিজের দোষেই লক্ষ্মীছাড়া ! কৃষিকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দু আজ কৃষ্ণকেই উপেক্ষা করিতেছে ! গোজাতিকে তুচ্ছ করিয়া হিন্দু আজ দেবতাকেই তুচ্ছ করিতেছে ! মানুষ যখন মোহান্ধ হয় তখন সে রজ্জুকে সর্প জ্ঞান করে, কাঞ্চনকে কাচ জ্ঞান করে, দেবতার অঙ্গে ধূলি কর্দ্দম মাখিয়া পিশাচ ও প্রেতের পদধূলি মস্তকে লইয়া গৌরব করে। হতভাগ্য হিন্দু জাতিরও আজ সেই মোহের অবস্থা ; মোহের অবস্থা না হইলে কৃষিজীবি হিন্দু আজ বিলাসজীবি বাবু হইত না ; মোহের অবস্থা না হইলে হিন্দু জাতি অমৃতবৎ এক বাটী দুগ্ধ পান করিতে চেষ্টা না করিয়া বিষবৎ এক পেয়ালা 'চা' পানের জন্য অধীর হইত না ! সেই জন্যই বলিয়াছি,—আত্মদোষেই আজ আমরা প্রায় সর্ব্বস্বান্ত !

কৃষি ও গো-ধন ভারতের এক অমূল্য বিভব বলিয়া পরিগণিত ছিল। অযত্নে ও উপেক্ষায় আজ হিন্দু জাতি এই দুইটী বিভব হইতেই প্রায় বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে। এখনও যদি এই মহা সম্পত্তিদ্বয়ের পুনরুদ্ধারে আমরা ধৃতব্রত না হই তাহা হইলে আমাদের আর কল্যাণ নাই। কৃষি ভারতের প্রকৃতিরও অনুকূল। ভারতভূমির স্তরে স্তরে যে কত অর্থ বিধাতা আমাদিগের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটু পরিশ্রম করিলেই আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি। কিন্তু আমরা এত বাবু হইয়াছি, চাকুরীকে এত সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি যে মাটী ছুঁইলেই আজ আমাদিগের জাতি যাওয়ার উপক্রম হয়। বস্তুতঃ এ ভাব যত দিন না দূরীভূত হইতেছে, ততদিন আমাদের আর উন্নতির কোন আশাই নাই। সহযোগী "স্বরাজ" বলেন,—"চাকুরীকে অতি মাত্রায় আদর করিতে গিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এই দাসত্বের লালসায় ব্রাহ্মণ সন্তান নীচসংসর্গে যেখানে সেখানে পাচকের কাজ করিতেছে। কায়স্থ সন্তান স্থান অবস্থান জ্ঞান না করিয়া ভাণ্ডারী খানসামা ইত্যাদির কার্য্যেও লজ্জা বোধ করিতেছে না। 'ভাল মানুষ' মুসলমান তনয় পেয়াদা, চাপরাসী প্রভৃতি কার্য্যে কুণ্ঠিত নহেন। এখনও

বঙ্গে ১৫।২০ বিঘা জমিতে চাষ আবাদ করিলে একটী ক্ষুদ্র পরিবারের অন্ন চিন্তা করিতে হয় না। অধিকাংশ ভদ্র সন্তানেরই কিন্তু ঐ সংস্থান টুকু আছে। থাকিলে হইবে কি ? ওটী যে চাষার কাজ ! তাই সেগুলি বর্গদারের হাতে দিয়া "ঋণী ও প্রবাসী" হইয়া মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে পাচক, ভাণ্ডারী, সর্দ্দার, পেয়াদা, প্রভৃতির কার্য্যেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে।" কৃষিকার্য্য কি ইহা অপেক্ষাও নীচ কার্য্য ?

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ণাশ্রমকে পালন পূর্ব্বক স্বহস্তে কৃষি ও অন্যান্য পরিশ্রমজনক কার্য্য সম্পাদন করতঃ স্বাধীনভাবে সুখে কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পরিচ্ছদাদির আড়ম্বরে এত অর্থনষ্ট করিতেন না ; তাঁহারা শ্রমনিপুণ ও মিতব্যয়ী ছিলেন এবং মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেই ভালবাসিতেন। আমাদের অপেক্ষা তাঁহারা যে সহস্র গুণে সুখী ছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা এখন নব্যসভ্যতার স্রোতে পড়িয়া বিলাস দ্রব্য ও পরিচ্ছদাদিতে অপরিমিত ব্যয় করতঃ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছি। এখন সুচিকণ বিদেশী পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়া কৃষিলব্ধ তুলা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করা ভুলিয়া গিয়াছি। ধন রত্ন প্রসবিনী ভারতে বাস করিয়াও অলসতা দোষে জুতা ছাতা কাপড় ইত্যাদি এদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করি না। অনেকেই সামান্যরূপ লেখাপড়া শিখিয়া পরিশ্রমজনিত কার্য্যকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া অতি সামান্য মাত্র বেতনের চাকুরীতে সারা জীবনটা উন্নতির পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখিয়াছি। দেশের মধ্যে যেমন চাকুরীপ্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেইরূপ বিলাসিতার স্রোতের সহিত অলস ও শ্রমকুণ্ঠ লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সকল বিষয়ে আমি আলোচনা নব্যভারত এবং উল্লিখিত গোপাল বান্ধব দ্বিতীয় ভাগে সবিশেষ ও সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গের প্রতি কোন সমগ্র ভারতের পক্ষে ইহা একটা সুদিন বলিতে হইবে যে আমার বিগত ৮।৯ বৎসরের কলিকাতায় বাঙ্গালা ও ইংরাজি সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রিকায় এই ইকনমিক বিষয়ে বহুল প্রবন্ধাদি লিখার পর দেশের লোকের মন জেগে এই দিকে আকর্ষিত হইতেছে। মাননীয় ভারত সচিবের নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি কৃষি শিক্ষা, গোপালন শুল্ক সমীকরণ, দুগ্ধ ননী মাখম পরীক্ষাগার স্থাপন, অবাধ গোহনন নিয়ন্ত্রিত করণ, ভ্রমণশীল কৃষি লেক্‌চার প্রবর্ত্তন করণ, কউন্সিলে কৃষি সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া আদায় প্রদানে কৃষি প্রতিনিধিত্ব প্রদান, এবং পাশ্চাত্য অনুকরণে আমাদের দেশের কৃষিবিভাগকে পুনঃ সংস্কার ও পুনঃ গঠন করণ যাহাতে নিঃস্ব কৃষককুলের প্রকৃত হিতসাধিত হয় সেইজন্য আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। অখিল ভারতীয় গো-কন্‌ফারেন্সের প্রবর্ত্তন কারীদেরও এই সকল বিষয়ে তৎপর কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকট অভাব অভিযোগ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। সংবাদ পত্রে তীব্র আন্দোলনের ফলে ফুতশংকট নিবারণ জন্য ফুত আইন পাস হইয়াছে এবং এই নববিধি অপরাপর প্রদেশেও সাদরে গৃহীত হইয়াছে। অখিল ভারতীয়

গো-কন্‌ফারেন্সের প্রবর্ত্তয়িতাদের আশু অবাধ গোহননাদি নিয়ন্ত্রিত করণ জন্য মাননীয় ভারত সচিবের নিকট শীঘ্রই পৌছান প্রয়োজন। আমরা ঐ কন ফারেন্সের সম্পাদক সারজন উডরোফ্ মহোদয়ের নিকট অনেক নূতন কথা শুনিব আশা করি। তাঁহার সঙ্কেতগুলি আমাদের শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করিলে দেশের মরনোন্মুখ কৃষির মহীয়সী হিত সাধিত হইবে !!! উপসংহারে বক্তব্য যে এখন প্রত্যেক বঙ্গবাসীর উল্লিখিত গোপাল বান্ধব পুস্তক সাদরে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার M.R.A.S,
M.M.D.A. &C. &C. ৩১ নং এলগীন রোড কলিকাতা উকীল গয়া।

পত্রাদি

FROM

THE ECONOMIC BOTANIST TO THE
GOVERNMENT OF BIHAR AND ORISSA.
SABOUR, E. I. R. (LOOP.)

TO

The Editer,
"Krishak"

SIR,

As the article on "Mokameh tal and its caterpillar pest", written by Babu U. N. Chowdhury in the Bhadra number of "Krishak" is very misleading and is likely to spread a wrong idea of the work done by the Agricultural Department in this connection, I think it my duty to give here a short history of the campaigns conducted against this pest and also a brief life history of the insect, for a clear and correct understanding of the subject by your readers. The work at Mokameh has been so successful that if the article had been written in a scientific spirit and with due regard to the facts and figures which appeared from time to time in government publications on the subject, it would have done a distinct service to Science in making it clear to the public how scientific methods have, at a very little cost, satisfactorily checked, for several successive

seasons, a serious insect pest of about 20 years standing, at Mokameh and other similar areas.

It is necessary to begin with the life history of the insect so as to enable the readers of this magazine to follow the methods adopted for its control. As usual with other insects of its kind, this insect (Agrotis ypsilon) has four stages in its life—egg, caterpillar, pupa and adult (moth). It is destructive in the caterpillar stage, while the abult stage is chiefly intended for reproduction. In August and September when the tal lands at Mokameh or similar areas are still under water, the adult moths both male and female come over there in small numbers and begin to lay eggs in scattered places on high lands round the submerged tal. The eggs hatch within a week and the minute caterpillars on emergence feed on what available crop there may be on these areas, till at the end of a month they become full grown when they are about 2″ inches long. Then they pupate in earthen cells in the soil from which adult moths both male and female come out in course of a week or ten days. The flood water having, by this time, receded from the tal, the exposed areas receive cultivation and the sowing operation is hurried on all over the areas so as to be finished before the soil dries up and hardens. It is on this area, *i. e.* the tal proper, with a very stiff heavy clay soil, that the newly emerged female months lay their eggs and give rise to the destructive second brood of caterpillars. In the first brood on the high lands the number of caterpilars being small and restricted in distribution, the damage done is inappreciable and generally remains unnoticed. But as each female moth lays from 2000 to 3000 eggs the number of second brood caterpillars is tremendously large and they completely destroy the young seeelings on the tal proper, extending over several thousands bighas, in course of a week or two. The damage is intensified by the mischievous habit of the caterpillar which cuts a considerably larger number of plants in one night than is sufficient for its food for the day. This general attack takes place in November and sometimes in December, depending on the season, after which for various reasons the number of caterpillars decreases and the later broods become small and insignificant. The moths can be found in these localities upto April or May. From then onwards the insect can not be traced in any one of

its stages in the plains until the middle of August. From what has been said above about the life history of the insect, it should be evident that the caterpillar is not produced from the "bad smelling gases" of the tal lands as stated in the article in question. The laws of reproduotion are the same in insects (except in a few parthenogenetic ones) as in higher animals.

The whereabouts of the insect during the period May to August, is still unknown. The two alternative hypotheses regarding this disappearance of the insect are that they either aestivate in sheltered places in the plains or migrate to cooler regions in the hills. There is nothing new in these phenomena in insect life; most of our insects either hibernate or aestivate during the wintor or summer months to avoid the extremes of temperature and a few are definitely known to migarate to hills. In August or September the parent moths come out of their aestivating place or migrate back from the hllls and lay eggs near the tal lands. There is no foundation for the statement made by the writer of the article in question to the effect that "the eggs are either blown away by wind or are washed down by flood water from the hills and are lodged in the tal land, where they retain their vitality for months together and hatch in August." As regards the enquiry as to why the tal lands only are attacked by the insects and not the high lands in other parts of the province, the explanation is that the smell of the newly exposed soil of tal land has a strong attraction for this particular insect and it has been verified for sveral successive seasons. Besides the parent moths are fairly common in high lands, during their period of activity (winter), where their caterpillars aitack Tobacco, potato, cabbage, cauliflowers etc. But here the texture of the soil being unsuitable for the movements of this soil-living caterpillar, they do not fare well and their number does not increase abnormally as in the tal lands where the soil condnitions are ideal for them. (For fuller informations on this and other points, the reader is referred to the article on "Greasy surface caterpillar; its life history and seasonal history" in Bihar Agricultural Journal Vol. V. No. 2, in the press.)

So far as regards the life history of the insect. Let us now review the action taken by the Agricultural Department and its results. The insect attack at Mokameh was first brought

to the notice of the department in 1909. In 1910-11 the work was taken in hand and a special grant was obtained from the Government for the purpose. In that season, several chemical and mechanical methods were tried to control the pest but none was effective. Even the method of poison baiting, the best remedy against this particular pest in Europe and America, proved unsuitable under conditions prevailing at Mokameh. But the most important work of the season was the field study of the pest and the discovery of the relation between its first and the destructive second brood, on which hinges the method of control adopted in later years.

In 1911-12, advantage was taken of our knowledge gained in the previous season, of the appearance of early first brood caterpillars on high lands and these first attacked areas were systematically searched for and 62,700 first brood caterpillars were collected and destroyed from these areas. It will be evident how considerably the second was reduced by this early picking when it is considered that each of these caterpillars would have developed into a moth in a few weeks and each of the female moths would have laid about 3000 eggs. The result of the seasons work was that 10,000 bighas were saved, the damage being reduced from 15,000 bighas to 5000 bighas. In this season trial was also given to the Andres Maire trap obtained from Egypt. As it showed much promise it was decided to use it on a larger scale in future years. The use of the trap is one step in advance of hand picking. Since the destruction of the moths early in the season prevents the occurence of the first brood caterpillars and consequently that of the destructive second brood. By the way, this trap is not a "kerosine lamp, lighted at night, which kills a few crickets, grasshoppers etc." as stated in the article. It is an iron structure, about 10 ft. high and costs about Rs. 100/- each when obtained from Egypt. It is so ingeniously made that when it is charged in the evening with a particular liquid, the Agrotis moths along with some other moths are attracted by the smell from a distance, enter the trap at night to feed on the attractive liquid but can not get out. They are mechanically killed, once inside the trap. With a few structural additions and alterations made here, the trap has now been made perfect.

In 1912-13 the work was conducted with 24 traps. 152,622 Agrotis moths were destroyed by the traps during the season besides sevral hundred thousands of other kinds of moths. Hand picking of the first brood caterpillars accounted for 107,439 caterpillars. In this season the whole crop on 15,000 bighas of land was saved, there being only a nominal damage of 102 bighas.

In 1913-14—35 traps were used and hand picking was done as usual. 893,320 Agrotis moths and 45,000 first brood Agrotis caterpillars were destroyed. About 11,000 bighas were saved, the damage due to Agrotis being 3750 bighas.

In 1914-15—34 traps were used and hand picking done as usual. 434,736 Agrotis moths were destroyed by the traps. In this season 13,000 bighas were saved, the damage due to Agrotis being about 2000 bighas.

The work at mokameh was stopped in 1915 as the Zeminders and cultivators were unwilling to contribute towards the cost of the next campaign amounting to only -/2/- per bigha and which had for the previous 5 seasons been met by tho Government. It would thus appear that the work was conducted for 5 years only and not "20 years" and the result was always satisfactory. For the last four seasons campaigns are being conducted against the same pest in similar areas at Colgong and Ghogha with very satisfactory results. One of its immediate effect has been the reclamation of those areas that had gone out of cultivation on account of agrotis attack. These areas now being cropped successfully by the raiyats and the intrinsic value of these once abandoned areas is gradually going up. 55 Andres Maire traps are being worked at present at Colgong and Ghogha where the campaign will be over by the end of January next.

It is hoped that this letter will give your readers a fair and clear idea of the work done by the Government against Agrotis at Mokameh and also of the usefulness of scientific methods in combating insect pests.

Yours faithfully,
H. L. Dutt. M.Sc. A. (Cornell.)
Assistant Professor of Entomology,
for: Economic Botanist, Bihar & Orissa.

(উক্ত পত্রের সারাংশ)

মোকামা টাল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী লিখিত—

"মোকামা টাল ও পোকার উপদ্রব" প্রবন্ধ কৃষি বিভাগের কার্য্যাদি সম্বন্ধে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইতে পারে বলিয়া বর্ত্তমান প্রতিবাদ লিখিত হইল।

প্রবন্ধোক্ত পোকার নাম Agrotis ypsilon। উহার জীবণ বৃত্তান্ত নিম্নরূপ—

আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে যখন টাল জল পূর্ণ থাকে সেই সময় অল্প অল্প সংখ্যায় কীটের প্রজাপতি আসিয়া টালের চতুর্দ্দিকস্থ ঊর্দ্ধ জমিতে ডিম্ব প্রসব করে। সপ্তাহ মধ্যেই কীড়া বাহির হইয়া ঐ সকল জমিতে যে ফসল থাকে তাহা ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রায় এক মাসের মধ্যেই ২ ইঞ্চি পরিমিত হয়। তাহার পর উহারা পুত্তলিকা অবস্থায় জমিতে ৮।১০ দিন থাকে এবং এই সময়ের পরই স্ত্রী ও পুং প্রজাপতি বাহির হয়। টালের জলও ঐই সময়ে শুকাইয়া যাওয়ার চাষ আরম্ভ হয় ও সত্বরে চাষের কাজ শেষ করিবার জন্য বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র সমূহ এক কালে আবাদ হয়। এই নব কর্ষিত ক্ষেত্রে গিয়াই উক্ত প্রজাপতি সমুহ ডিম্ব প্রসব করে এবং এই দ্বিতীয় পুরুষের ডিম্বোৎপন্ন কীড়াই মোকামা টালের শস্য ধ্বংসের প্রধান কারণ। প্রথম পুরুষের সামান্য সংখ্যক কীড়া ঊর্দ্ধ জমির ফসলের তেমন অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু এক একটি স্ত্রী প্রজাপতি ২০০০ হইতে ৩০০০ ডিম্ব প্রসব করে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে দ্বিতীয় পুরুষে কত অগণ্য কীড়া জন্মে এবং উহারা টালের চারা গাছের কিরূপ বিপুল পরিমাণে ক্ষতি করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ২।১ সপ্তাহের মধ্যেই হাজার হাজার বিঘার ফসল নষ্ট হইয়া যায়। অধিকন্তু এই কীড়া যাহা খায় তাহার চতুর্গুণ চারা কাটিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। নবেম্বর ডিসেম্বর মাসেই পোকার উপদ্রব হইয়া থাকে। তৎপরে নানা কারণে পোকার বংশ কমিয়া আসে। এপ্রিল মে মাসে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক প্রজাপতিই এতদঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় হইতে আবার আগষ্ট মাসের মধ্য পর্য্যন্ত পোকার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই জীবন বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রবন্ধের "পাঁচ মাস যাবত বদ্ধ জলে ক্ষুদ্র কীটানুর জন্ম" সম্বন্ধীয় উক্তির কোন ভিত্তি নাই।

মে হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কীট বংশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতে কীটগুলি হয় এই সময় নির্জীব অবস্থায় মাটিতেই থাকে অথবা পাহাড়ের অধিকতর শৈত্যে চলিয়া যায়। প্রবন্ধের লেখক যে জল অথবা হাওয়া দ্বারা কীট বীজ আনায়নের কথা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। আর পার্শ্ববর্ত্তী অপর স্থানে পোকার উপদ্রব অধিক না হইয়া কেবল টালের জমিই কেন সমধিক রূপে আক্রান্ত হয় তাহার কারণ এই যে টালের নব কর্ষিত জমির গঠন ও গন্ধ এই জাতীয় পোকার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ও লোভনীয়। ঊর্দ্ধ জমিতে যে কীট নাই তাহা নহে—কারণ এই জাতীয় কীড়াই তামাক, আলু, বাঁধা ও ফুল কপি প্রভৃতি ফসল নষ্ট করিতে দেখা যায়।

মোকামা টালের কীটের উপদ্রবের উপর গবর্ণমেণ্টের নজর প্রথমতঃ ১৯০৯ সালে আকৃষ্ট হয়। ১৯১০-১১ সালে নানাবিধ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া কোন ফল হয় নাই। কিন্তু প্রতিকারের মূল ভিত্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষের কীড়া যে শস্য ধ্বংসের প্রধান কারণ সেই তথ্য আবিষ্কৃত হয়। তৎপরে প্রতি বৎসরের ফলাফল নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

সাল—	বিনষ্ট প্রথম পুরুষের কীড়ার সংখ্যা	রোগ নিবারিত জমির পরিমাণ
১৯১১-১২—	৬২,৭০০	১০,০০০ বিঘা
১৯১২-১৩—	১৫২,৬২২ (প্রজাপতি)	১৫,০০০ বিঘা
	১,০৭,৪৩৯	
১৯১৩-১৪—	৪৫,০০০	
	৮৯৩,৩২০ (প্রজাপতি)	১১,০৭০ বিঘা
১৯১৪-১৫—	৪৩৪,৭৩৬ ঐ	১৩,০০০ বিঘা

মোকামা টালের মোট জমি প্রায় ১৫০০০ বিঘা। পূর্ব্বোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে যে এক বৎসর প্রায় সমস্ত জমিই এবং অন্যান্য বৎসরে আন্দাজ শতকরা ৭৫ ভাগ জমি সরকারী ব্যবস্থায় রক্ষা পাইয়াছিল। প্রবন্ধের লেখক সরকারী পরীক্ষার কাল বিশ বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বস্তুতঃ উহা পাঁচ বৎসর মাত্র। এই কয় বৎসর গবর্ণমেণ্ট প্রতিকারের সমস্ত খরচই নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালে প্রতীকারের ব্যবস্থার জন্য বিঘা প্রতি ৵০ আনা হিসবে চাঁদা চাওয়া হয়। জমীদার ও প্রজাগণেরা তাহা দিতে অস্বীকার করায় গবর্ণমেণ্ট মোকামা টাল এই কার্য্যে নিবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কলগঙ ও গোঘায় মোকামা টালের অনুরূপ জমিতে পরীক্ষা চলিতেছে। এই সমুদয় ব্যবস্থার ফলে অনেক পতিত জমির উদ্ধার সাধন হইয়াছে।

প্রতিকারের প্রধান উপায় প্রথম পুরুষের যত দূর সম্ভব কীড়া ও প্রজাপতি বিনষ্ট করা। কারণ তাহা হইলেই দ্বিতীয় পুরুষের উৎপত্তির লাঘব হইয়া আসে। কীড়া নাশ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হস্ত দ্বারা বাছিয়া লওয়া। কিন্তু প্রজাপতি নষ্ট করিবার জন্য একরূপ আলোকযুক্ত ফাঁদ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা মিশর দেশ হইতে প্রথমতঃ আনিত হয়; এমন কিন্তু পরিবর্ত্তন করিয়া ঠিক এতদ্দেশে উপযোগী হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক যে ইহাকে যে কেরোশিন ল্যাম্প বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। ইহা একটি লৌহ নির্ম্মিত প্রায় ১০ ফুট উচ্চ যন্ত্র। মূল্য প্রায় প্রত্যেকটির ১০০৲ টাকা। যে পদার্থের সাহায্যে ইহা প্রচলিত হয় উহা কীটের পক্ষে এতই চিত্তাকর্ষক যে প্রজাপতি উহার গন্ধ পাইলেই যন্ত্রে প্রবেশ করে এবং একবার প্রবেশ করিলেই মৃত্যু অনিবার্য্য। ইহার নাম এণ্ড্রু মেন্নার ফাঁদ। প্রথমতঃ এই প্রকার তিনটি কল আমদানি করা হয়। এক্ষণে ৫৪টি কল দ্বারা কার্য্য চলিতেছে। যন্ত্রগুলি যে কিরূপ কার্য্যকরী তাহা পূর্ব্ব প্রদত্ত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

সাময়িক কৃষি-সংবাদ

সবুজ পোকা।

[শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত]

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে কলিকাতায় এক প্রকার সবুজ পোকা হয়। এ বৎসর অধিক হয় নাই। কিন্তু অন্য বৎসর কোটি কোটি পোকা সন্ধ্যার পর গ্যাসের লণ্ঠনে আসিয়া পড়ে। অন্যান্য পোকা মাকড়ের যেরূপ স্বভাব, আলোক দেখিলেই ইহারাও সেইরূপ তাহার উপর পড়ে। মাছি ও মশার যদি এইরূপ স্বভাব হইত, তাহা হইলে মানুষের উপকার হইত।

শরৎকালের অবসানে সকল স্থানেই পোকা মাকড় বৃদ্ধি হয়। সন্ধ্যার পর নানা জাতীয় পতঙ্গ প্রদীপের আলোকে আসিয়া পড়ে। কিন্তু অনেক জীবাণু আছে, যাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। এই সকল জীবাণু বিসূচিকা, জ্বর, বিকার প্রভৃতি রোগের কারণ। ইহাদের সংখ্যা কমাইবার নিমিত্ত বোধ হয়, উল্কাদান, দীপাবলী, আকাশ প্রদীপ, আঁজু পুজু, প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে।

পরিচিত সবুজ পোকার চিত্র প্রদত্ত হইল না। সকল সময়ে ইহাদের পক্ষ থাকে না। বিবাহের সময় ইহাদের পক্ষ বাহির হয়। পিপীলিকারও এইরূপ হয়।

সচরাচর কীট পতঙ্গদিগের জীবনে চারি অবস্থা হয়। প্রথম অণ্ড, দ্বিতীয় কীট, তৃতীয় কীড়া, চতুর্থ পক্ষবিশিষ্ট পতঙ্গ। রেশম পোকা ইহার দৃষ্টান্ত। আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, সবুজ কীটের সকল সময়ে এ চারি অবস্থা হয় না। শীতের পূর্ব্বে সবুজ পোকাগণ পক্ষযুক্ত হইয়া উড্ডীয়মান অবস্থায় ইহাদের স্ত্রী-পুরুষে সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর স্ত্রী-পতঙ্গগণ ছোট ছোট গাছের সরল শাখায় অথবা পাতার ভিতর ডিম্ব প্রসব করে।

সবুজ পোকার ডিম্ব প্রসব—শীতকালে সমস্ত সবুজ পোকা মরিয়া যায়। বসন্তকালে ডিম্ব ফুটিয়া পক্ষহীন কীট বাহির হয়। কোমল বৃক্ষপল্লবে শুঁড় প্রবিষ্ট করিয়া ইহারা বৃক্ষরস শোষণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। যত দিন পল্লবে রস থাকে, ততদিন ইহারা এক স্থানেই বাস করে। কোমল উদ্ভিদের ইহা পরম শত্রু। অনেক স্থানে গোলাপ গাছকে ইহারা নীরস ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে। এ অবস্থায় পুরুষ পোকার সহিত স্ত্রী পোকার সাক্ষাৎ হয়না। বলিতে গেলে এ অবস্থায় ইহাদের পুরুষ ও স্ত্রী স্বতন্ত্র থাকে না। সকলেই সন্তান প্রসব করে। ইহাদের শরীর ছিন্ন হইয়া নূতন পোকার উৎপত্তি হয়।

নূতন কীটের উৎপত্তি—পোকাটী পূর্ণবয়স্ক হইলে মাঝে মাঝে ইহারা খোলশ পরিত্যাগ করে। ক্ষেত খামারে পরিত্যক্ত খোলশ প্রায়ই

দেখা যায়। খোলশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পোকার শরীর ছিন্ন হইয়া নূতন কীট বাহির হইতেছে। এক দিনে এক একটী কীট হইতে শত শত নূতন কীটের জন্ম হয়। চারি পাঁচ দিন পরে সেই সমুদয় নূতন কীট সন্তান উৎপাদন করিতে থাকে। চিঁড়ের বাইশ ফের হইয়া এক বৎসরে এক একটী পোকার বংশ এত বৃদ্ধি হয় যে, তাহারা সকলেই যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী এই পোকাতেই পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। উদ্ভিদ, কীট, মৎস্য প্রভৃতি নানা জীবের অংশ এই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। সেই জন্য পঙ্গপাল মেঘের ন্যায় আকাশ অন্ধকার করিয়া উড্ডীয়মান হয়। নানা স্থানে দিনে মাছি ও রাত্রিতে মশার জ্বালায় মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

বর্ষাকালে সবুজ পোকার স্ত্রী পুরুষ স্বতন্ত্রভাবে জন্মে। কিন্তু স্ত্রীর ভাগ অধিক। অনেকের এই সময় পক্ষও হয়। সেই পক্ষযুক্ত পতঙ্গগণ এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া নূতন নূতন স্থানে বাস করে। এই সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। সকল জাতীয় কীটের অণ্ড হয়। কিন্তু বর্ষাকালে অনেক পক্ষযুক্ত সবুজ পোকা জীয়ন্ত সন্তান প্রসব করে। যতদূর আমি জানি, অন্য কোন কীট জীয়ন্ত সন্তান প্রসব করে না। শরৎকালের শেষে কোটি কোটি কীট পক্ষবিশিষ্ট হইয়া উড্ডীয়মান হয়।

সবুজ পোকার বংশ এত বৃদ্ধি হয় যে, ইহাদের অধিকাংশ যদি মরিয়া না যাইত, তাহা হইলে আবশ্যকীয় উদ্ভিদ্ নষ্ট করিয়া মানুষের বড়ই ক্ষতি করিত। বৃহৎকায় শত্রুর সহিত মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে। ব্যাঘ্র ভল্লুককে মানুষ নির্ম্মূল করিতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রুর নিকট মানুষকে পরাভব মানিতে হয়। আজকাল অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে মূষিকের উপদ্রব হইয়াছে। সহস্র সহস্র মূষিক শস্য খাইয়া ফেলিতেছে। মানুষে অনেক মারিতেছে। কিন্তু তবুও তাহাদের সংখ্যা কমিতেছে না। যখন পতঙ্গপাল উড্ডীয়মান হয়, তখন দেশের সমুদয় হরিদবর্ণের পদার্থ খাইয়া ফেলে। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অসংখ্য জীবাণুর প্রাদুর্ভাব হইয়া বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগে মহামারী উপস্থিত হয়। মানুষ তাহার বিশেষরূপ কোন প্রতিকার করিতে পারে না।

কিন্তু অসম্ভব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের উপায় বর্ত্তমান থাকে। সবুজ পোকার নানা শত্রু। এক প্রকার ডাঁস মাছি আছে, তাহারা ইহার গায়ে হুল ফুটাইয়া সেই ছিদ্রে অণ্ড প্রসব করে। ডিম ফুটিয়া শিশু ডাঁশ মাছি সবুজ পোকার রক্ত মাংস খাইয়া তাহার শরীরের ভিতর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে, সবুজ পোকার যাহাতে মৃত্যু হয়, সেরূপ কোন আবশ্যকীয় আভ্যন্তরিক যন্ত্র মাছি-শিশু ভক্ষণ করে না। কিন্তু ক্রমে সবুজ পোকাকে ফোঁপরা করিয়া ডাঁশ মাছি বাহির হয়। যেরূপে বাহির হয়, তাহার অতি চমৎকার। তেলা-পোকা বা আরসোলার শরীরের ভিতর কাঁচ পোকার শিশু এইরূপে প্রতিপালিত হয়। সে জন্য লোকে বলে যে আরসোলা কাঁচ পোকাতে পরিণত হয়। ডাঁশ মাছি রেশম পোকারও পরম শত্রু।

আরও অনেক প্রকার কীট পতঙ্গ সবুজ পোকার পরম শত্রু। এক প্রকার কীট ইহাদের শরীরে হুল ফুটাইয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়ায়। তাহার পর মুখ অবনত করিয়া সবুজ পোকার রস পোষণ করে।

সবুজ পোকার শত্রু—সবুজ পোকা উদ্ভিদের রস শোষণ করে। সেই রসের অধিকাংশ তাহার শরীরে মিষ্ট রসে পরিণত হয়। যত টুকু আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক মিষ্টরস তাহার শরীরের ভিতর সঞ্চিত হয়। সে জন্য কতক বাহির করিয়া দিতে হয়। বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত সে তাহার পশ্চাৎ দিকে দুইটী নল করিয়াছে। এই নলপথে অতিরিক্ত মিষ্টরস বাহির হইয়া যায়। রস উদ্ভিদের গায়ে লাগিয়া যায়। চটচটে রসে সবুজ পোকার বড় অসুবিধা হয়। এখন পিপীলিকা সবুজ পোকার সহায় হয়। ডেওপিপ্‌ড়ের ন্যায় এক জাতীয় কৃষ্ণবর্ণের পিপীলিকা আসিয়া এই মিষ্ট রস ভক্ষণ করে। কেবল তাহা নহে। আমরা যেরূপ গাভি দোহন করি, পিপালিকাগণ সেইরূপ সবুজ পোকাকে দোহন করে। পিপালিকা আসিয়া তাহার পশ্চাৎ দিকের নলে ঠোকর মারে। ঠোকরের আঘাতে নল হইতে মিষ্টরস নির্গত হয়। মিষ্টরসের নিমিত্ত পিপীলিকাগণ অনেক জাতীয় কীট গৃহপালিত করিয়াছে। তাহাদের অণ্ড আপনাদিগের গর্ত্তে লইয়া যায়। অণ্ড ফুটিলে শিশু কীটদিগকে অতি যত্নে প্রতিপালন করে। তাহার পর দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় তাহাদিগকে দোহন করিয়া পরম সুখে মিষ্টরস পান করে। আমরা কেবল গুটিকত জীবকে গৃহপালিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। লবক নামক সাহেব পিপালিকাদিগের আহার ব্যবহার সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ভাবে দর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে পিপীলিকাগণ পাঁচ শত চোরাশীটী জীব গৃহপালিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বঙ্গবাসী।

প্যালেষ্টাইন দেশে কমলা—ভূমধ্যসাগরের কুলে জাফা নামক নগর আছে। ইহাই প্যালেষ্টাইন দেশের প্রধান বন্দর; এস্থানে অতি সুস্বাদু কমলা লেবু জন্মে। প্রতি বৎসর প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কমলা লেবু এ স্থান হইতে বিদেশে প্রেরিত হয়।

জাফা নগরে মদ্য ও মধু—জাফা নগরের নিকট লোকে প্রচুর পরিমাণে মদ্যও প্রস্তুত করে। সে মদ্য নানা দেশে প্রেরিত হয়। এ স্থানের মধুও প্রসিদ্ধ। গৃহ পালিত মধুমক্ষিকা দ্বারা এই মধু সংগৃহীত হয়। আমাদের হিমালয় এদেশেও লোকে মৌমাছি প্রতিপালন করে। সে দিন দারজিলিং হইতে আমি এইরূপ দুই বোতল মধু আনিয়াছিলাম। এ মধু দেখিতে ঠিক ঘৃতের ন্যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মধু প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত জাফার লোক এক কৌশল বাহির করিয়াছে। নিম্নদেশে যখন কমলা লেবুর ফুল হয়, তখন তাহারা সেই স্থানে চাক রাখিয়া দেয়। তাহাতে কমলা লেবুর মধু হয়। তাহার পর উটের পৃষ্ঠে তাহারা

চাক পাহাড়ের নিম্নে লইয়া যায়। সে স্থানে ফুলের মধু স্বতন্ত্র প্রকার হয়। তাহার পর আরও উচ্চ স্থানে লইয়া যায়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফুলের মধু তাহাদের চাক হইতে উৎপন্ন হয়! মধু বাহির করিবার নিমিত্ত চাক নষ্ট করিতে হয় না। এক প্রকার কল আছে, যাহাতে ধীরে ধীরে চাক হইতে মধু বাহির করিতে পারা যায়। তাহার পর সেই চাকে মধুমক্ষিকা পুনরায় মধু সঞ্চয় করে। সচরাচর এক শত চাক হইতে লোকে দেড় শত মণ মধু প্রাপ্ত হয়। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,

(বঙ্গবাসী।)

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ ও মাঘ।

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভুঁইয়ে শসা, করলা ঝিঙ্গা, প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমানে ধরিবে ও ফুল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া—গোময়, ছাই ও পাঁক মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুণ দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহতভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত

গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটি গুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্তভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি আঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পূরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম ১৫ দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কালে একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সব ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিয়াছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যূথিকা ইত্যাদি ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস, ফ্লক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমীর ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সজী যথা,—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, যুই মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবহার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৮শ খণ্ড।	মাঘ, ১৩২৪ সাল।	১০ম সংখ্যা।

আম্র—আম—Mango.

উদ্যানতত্ত্ববিদ্—শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আম্রের ব্যবসা, আম্রের বিভিন্ন ব্যবহার, আম্র কাষ্ঠাদির গুণাগুণ

ব্যবসায়ের জন্য আমের শ্রেণী বিভাগ—সাধারণতঃ আমাদের দেশে ল্যাঙড়া, ফজলী, বোম্বাই, দোফলা, তেফলা প্রভৃতি আম গাছগুলি বাগানের যথেচ্ছা বসান হইয়া থাকে। এমন কি আম, পেয়ারা, লিচু, লেবু প্রভৃতি সকল ফল-গাছ একত্র বসান হয়। ফল বৃক্ষগুলি এরূপ যথেচ্ছা রোপণে অশেষ প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্বতন্ত্র জাতীয় বৃক্ষাবলির, বাগানে স্বতন্ত্রস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং স্বতন্ত্র জাতীয় বৃক্ষগণেরও শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন চৌকায় রোপণ বিধেয়। শ্রেণী বিভাগ করিয়া রোপণ করিলে তাহাদের পাইট কারকিতের এবং ফলগুলি স্বতন্ত্রভাবে আহরণের সুবিধা হয়। সমস্ত আম এক সময় পাকে না। বিভিন্ন শ্রেণীর আম বাগানের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে রোপণ করা থাকিলে ফল পাকিবার উপক্রম হইলে আহরণের জন্য বাগানের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে হয়। ব্যবসায়ের জন্য আম বাগান কিম্বা যে কোন ফলের বাগান রচনা করিতে হইলে ফলের জাতি বিচার ও শ্রেণী বিভাগ করিয়া উদ্যান রচনা নিতান্ত প্রয়োজন।

স্বভাবতঃ আমগাছগুলি ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। জলদী আমগুলি বৈশাখ হইতে পাকিতে আরম্ভ করে, জৈষ্ঠ আষাঢ়ের প্রথমেই ফল শেষ হইয়া যায়।

যাবতীয় দেশী আম, পিয়ারা ফুলি ও দেশী বোম্বাই প্রভৃতি সকল আমই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মধ্যম শ্রেণীর আম আষাঢ়ের শেষভাগে পাকিতে আরম্ভ করে এবং শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত থাকে। পশ্চিমা বোম্বাই, ল্যাঙড়া প্রভৃতি এই শ্রেণীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত। নাবী শ্রেণীর আম ভাদ্রের শেষে পাকিতে আরম্ভ করে এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত সে আম থাকে। ইহাদিগকে ভাদুই আম বলে। ভাদুরিয়া, ফজলী, দোফলা প্রভৃতি আম এই শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে।

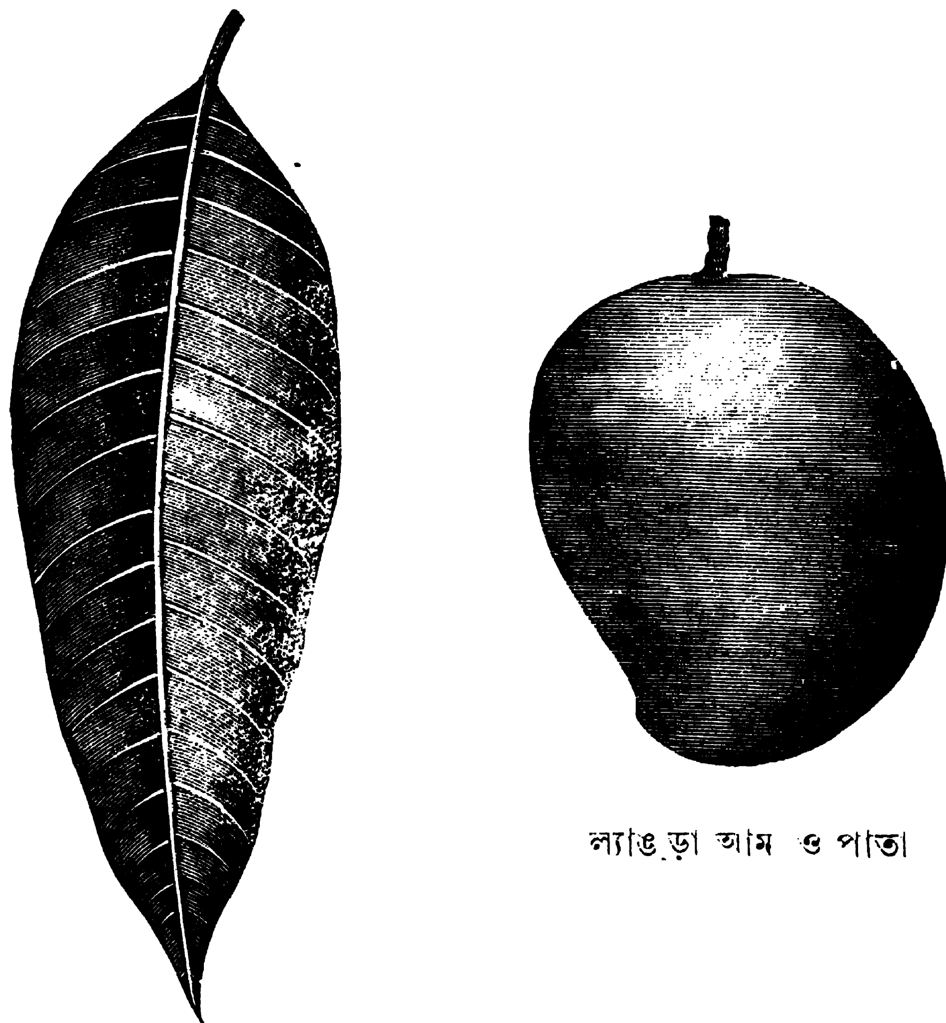


ফজলী আম ও পাতা

আম আহরণ ও ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত করা—

গাছ হইতে আম আহরণেরও নিয়ম আছে। আমগুলি গাছে সুপক্ক হইতে না পাইলে তাহাদের স্বাদ গন্ধ ভাল থাকে না। অনেক দূরদেশে ব্যবসায়ার্থ আম প্রেরণ কালে কচি, কাঁচা ডাঁসা সকল প্রকার আম এক সঙ্গে ভাঙ্গিয়া টুকরি বোঝাই করিয়া বাজারে

পাঠান হয়। তাহার মধ্যে অনেক শুকাইয়া পক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুপুষ্ট আমগুলি ভালরূপ পাকে এবং কচি আম থাকিলে পচিয়া নষ্ট হয়। এই সকল ব্যবসাদার নিতান্ত অদূরদর্শী। অবশ্য খুব সুপক্ক আম দূরদেশে চালান দেওয়া চলে না। সেইজন্য কাঁচা আম ভাঙ্গিয়া পাঠান ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ছোট বড় আম বাছিয়া এক এক



ল্যাঙড়া আম ও পাতা

সাইজের আম এক একটি টুক্‌রিতে যত্ন পূর্ব্বক প্যাক করিয়া বাজারে পাঠাইলে আম দরে বিক্রয় হয়। খুব সুপক্ক না হউক সুপুষ্ট আমই বাজারে বিক্রয় জন্য পাঠাইতে হয়। আম ভাঙ্গিবার কালে বোঁটা হইতে আঠা নির্গত হয়, ঐ আঠা পরস্পরের গায়ে লাগিয়া আম দাগি হইয়া যায়। ইহার প্রতিকারার্থ আম ভাঙ্গিয়া আঠা ঝরাইয়া জলে

ধৌত করিয়া মুছিয়া পাতলা টিসু কাগজে মুড়িয়া চালান দেওয়া যাইতে পারে। বিচক্ষণ ব্যবসায়ীমাত্রেই এতটা সতর্কতা অবলম্বন করেন। ইহার ফলে তাহারা অধিকতর লাভবান হন এবং বাজারে তাঁহাদের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ফল উৎপাদনে ও দূরদেশে ফলের ব্যবসা পরিচালনে এমেরিকাবাসী সর্ব্বাগ্রগণ্য। তাঁহারা ফল সংরক্ষণের নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। দূরদেশে ফল পাঠাইতে হইলে ফল সংরক্ষণের উপায় না জানিলে চলে না।

আম আহরণকালে আমগুলি অযথা আঘাত প্রাপ্ত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। উচ্চ শাখা হইতে আমগুলি ভূমিতে ফেলিয়া দিলে আম দাগী হয় এবং উহার স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়। যতদূর সম্ভব আমগুলি হস্তদ্বারা পাড়িয়া থলে পূর্ণ করিয়া নীচে নামান উচিত। যাহা হাতে পাড়া যায় না তাহা জাল সংযুক্ত আঁকুষি দ্বারা পাড়া উচিত।

আম পাড়া শেষ হইলে আমগুলি শীতল জলে উত্তমরূপ ধৌত করিয়া পুঁছিয়া গুদামে পাটাতনের উপর পাতার বিছানায় শোয়াইয়া রাখা হয়। স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ার্থ তাহাদিগকে শীঘ্র পাকাইবার নিমিত্ত পাতা ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে চলিত কথায় "জাকান" বলে। আমগুলিতে রঙ ধরিলে বাজারে পাঠান হয়। দূরদেশে আম পাঠাইতে হইলে গাছ হইতে ভাঙ্গিয়াই পাঠাইতে হইবে। টুকরির মধ্যে পত্রের স্তরে স্তরে আবৃত থাকিয়া আমগুলি জাঁকিয়া উঠে এবং তৈয়ারি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বাজারে পৌঁছিয়া থাকে। ঝুড়িতে কিম্বা গুদামে বিছাইবার জন্য, ঢাকা দিবার জন্য আম পাতাই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অভাবে সেওড়া পাতা কিম্বা দেবদারুর পাতাও ব্যবহার হয়।

গুদামে ফল রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। মাঝে মাঝে আম বাছাই করিয়া ফেলিতে হইবে। পচা দাগী আম পৃথক করিয়া না ফেলিলে ভাল আমও ঐ সঙ্গে খারাপ হইয়া যাইবে। দূর দেশে বাজারে আমের টুকরি পৌঁছিলে আমগুলি ঢালিয়া বাছিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। গুদামে আমগুলি অধিকক্ষণ একভাবে রাখিলেও অনিষ্ট হয়। একভাবে শোয়াইয়া রাখিলে ফলের নিম্নদিকেই অধিক রস সঞ্চিত হয় এবং ফল সমানভাবে পাকিবার ব্যাঘাত হয় এবং নিচুদিকটা শীঘ্র পাকিবার ও পচিবার উপক্রম হয়। ফলগুলি খাড়াভাবে সাজাইয়া রাখিতে পারিলে ভাল নতুবা মাঝে মাঝে এ পিঠ ও পিঠ বদলাইয়া সাজাইতে হইবে।

ভারতে আমের হাট বাজার—কলিকাতা আম খরিদ বিক্রয়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, মালদা, মুর্শীদাবাদ, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি নানা দিক্ দেশে হইতে আম কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়। জ্যৈষ্ঠ

হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত কলিকাতায় বড়বাজার পোস্তা, বাগবাজার, উল্টাডাঙ্গা, বেলেঘাটা, বউবাজার, নূতন বাজার, ধর্ম্মতলার বাজার রাশি রাশি আমে সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে।

কলিকাতার নিকট রাজহাট উলুবেড়ে প্রভৃতি স্থানে বহু টাকার আম খরিদ বিক্রয় হয়। আমের মরসুমে, রেলে, নৌকায়, ষ্টীমারে, গো-জানে নানা দিক হইতে আম কলিকাতায় আসিতেছে ও যাইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মুর্শীদাবাদ জেলায় খাগড়া ও ভগবানগোলায়, দ্বারবঙ্গে, বোম্বে ও পুনায় ও মান্দ্রাজে আমের খুব প্রশস্থ হাট বসে।

কলিকাতার বাজারে আমের মরসুমে ন্যূন্যাধিক ২০ লক্ষ টাকার আম খরিদ বিক্রয় হয়। আম বাজারে আসিলে অবিক্রি থাকে না। কিন্তু সময়ে সময়ে অধিক আমদানীহেতু দর খুব নামিয়া যায়। লেঙড়া আম কোন কোন বৎসর ২৫টা টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাতে পাইকারগণকে বিলক্ষণ ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। জলদী ও নাবী ফসল উৎপন্ন করিতে না পারিলে এবং ফল সংরক্ষণের উপায় করিতে না পারিলে আমের বাজার দর নিয়ন্ত্রিত করা সুকঠিন।

আমের ব্যবহার—আঁশরহিত আম ছাড়াইয়া খাইবার উপযুক্ত। সাহেবী ভাষায় উহাদিগকে Table Mango বলে। ঐ সকল আম ছুরি দ্বারা স্লাইস করিয়া কাটিয়া কিম্বা চাম্‌চে-দ্বারা শাঁস তুলিয়া লইয়া আহার করা হয়। ল্যাঙড়া, ফজলী, বোম্বাই জাতীয় আম মাত্রেই আঁশ শূন্য। কলিকাতার বাজারে যাহা দেশী বা রাঢ়ী আম নামে অভিহিত সেগুলি প্রায়ই আঁশযুক্ত। ঐ সকল আম মিষ্ট হইলে রস ছাঁকিয়া লইয়া দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ শর্করা সংযোগ আহার করা চলে। বোম্বাই, ল্যাঙড়া, ফজলী, দেশী সর্ব্বপ্রকার আমের রস থাল, পাটি, চেটাই কিম্বা লেকড়ার উপর জমাইয়া শুকাইয়া আমসত্ত্ব প্রস্তুত করা হয়।

আমসত্ত্ব—যখন পাকা আম পাওয়া যায় না তখন আম খাইতে হইলে আমসত্ত্বই ভরসা। আমসত্ত্ব জলে বা দুধে ভিজাইলে নরম হইয়া ব্যবহার উপযোগী হইয়া থাকে। আমসত্ত্ব নরম করিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিলে আস্বাদ ভাল হয়। মালদহ ও মুর্শীদাবাদের আমসত্ত্ব ভাল। পাকা আস্ত আমও অসময়ের ব্যবহারের জন্য চিনির রসে অথবা মধুতে ফেলিয়া রাখা হয়। এই প্রকারে সংরক্ষিত পাকা আম অপেক্ষা আমসত্ত্ব অধিকতর সুখাস্বাদযুক্ত। আমসত্ত্ব ছুরি দ্বারা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ও মুখে ফেলিয়া খাওয়া যায়।

যে আমের রস গাঢ় ও মিষ্ট তাহারই আমসত্ত্ব ভাল হয়। রস পাতলা হইলে ক্রমাগত রসের উপর রস ঢালিয়া অনেক ছোব লাগাইলে তবে সন্তমত পুরু আমসত্ত্ব

হয়। ২৪ পরগণায় দেশী আমের সত্ব প্রায়ই পাতলা কিন্তু মালদা, মুর্শীদাবাদ মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বেশ পুরু আমসত্ব কলিকাতার বাজারে আমদানী হয়। অনেক সময় অতিলোভী ব্যবসায়ীগণ পাকা ও আধপচা আম চটকাইয়া লইয়া আমসত্ব প্রস্তুত করে এবং টক আম হইলে মিষ্ট করিবার জন্য তাহাতে কিছু চিনি মিশ্রিত করে। এ সকল আমসত্ব বাজারে কম দরে বিক্রয় হয়। আঁশ শূন্য খাঁটি রসের আমসত্ব ভাল এবং তাহারই দর অধিক এবং তাহা অধিক কাল অবিকৃত থাকে। খারাপ আমসত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহাকে আমের জ্যাম (Jam) বলা যায়, কিন্তু ইহা বিলাতী Jam এর মত অগ্নিপক্ক নহে—সূর্য্য পক্ক। জেলী অগ্নিতে পাক করা ছাড়া হয় না।

কাঁচা ও ডাঁসা আমেরও বিবিধ প্রকার আচার চাট্নি প্রস্তুত হয় যথা :—

আমচুর, আমসী—কাঁচা আম, যখন তাহার আঠি শক্ত হয় নাই, ছাড়াইয়া আমের কসি (কচি আঠি) গুলি ফেলিয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে আমসী তৈয়ার হয়। আমসীতে হলুদ লঙ্কা বাটা লবন মাখাইয়া শুকাইলে আমচুর তৈয়ারি হয়। আমসী বা আমচুরের ভাল অম্ল রাঁধা যায়। ভারতবাসীগণ বিশেষতঃ হিন্দুগণ একাসনে এককালে ক্রমান্বয়ে তিক্ত, কটু, অম্ল, মিষ্ট এই চতুর্ব্বিধ রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এই হেতু নানা প্রকার অম্ল রন্ধনের তাঁহারা এত আয়োজন করিয়া রাখেন। কচি আমের অম্ল, অসময়ে আমসীর অম্ল অতি মুখরোচক। আমের অম্লের, তেঁতুলের অম্লের মত এত তীক্ষ্ণতা নাই।

আমের চাট্নি—কাঁচা ও ডাঁসা আম ফালা ফালা করিয়া তাহা খাঁটি সরিষার তৈলে ফেলিয়া তাহাতে লঙ্কা, জীরা, লবন, মিষ্টাস্বাদ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ চিনি সংযোগে সূর্য্যপক্ক করিয়া চাটনি প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে আদার রস, আদার কুচা এবং কেহ কেহ পেঁয়াজ কিম্বা রসুন সংযোগ করিয়া থাকেন। আমের চাট্নির আস্ত লঙ্কা, আস্ত পেঁয়াজ বা রসুন ও আদার কুচি বড়ই মুখরোচক।

আমের জেলী—চিনির রসের সহিত আমের ফালাগুলি পাক করিয়া তাহাতে জীরা, মৌরি, সরিষার গুড়া, যৎকিঞ্চিৎ লঙ্কা ও এলাচ গুড়া সংযোগ করিলে আমের অতি উত্তম জেলী প্রস্তুত হয়।

আমের আচার—আমের ফলাগুলি কিঞ্চিৎ থেঁতো করিয়া লইলে তাহাতে সরিষা লঙ্কাদি মশালা ও মিষ্ট আস্বাদ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ চিনি সংযোগ করিয়া রৌদ্রে পক্ক করিয়া লইলে আমের আচার প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য ইহাতেও

প্রচুর সরিষা তৈল মাখাইবার আবশ্যক হয়। আচার মাত্রেই সূর্য্যপক্ক করিতে হইবে। আচারে কটু অম্ল এবং সামান্য মিষ্ট ও লবনাস্বাদ থাকিবে। চাট্‌নিতে অম্ল ও মিষ্টের আস্বাদ অধিক, জেলী ও জ্যাম আরও অধিক মিষ্টাস্বাদযুক্ত। খোসা সমেত আস্ত ও ফালা কাটা আমেরও সুন্দর আচার প্রস্তুত হয়।

কাসুন্দী—আমাদের দেশে কাঁচা আম আঁঠি খোসা বাদ দিয়া ঢেঁকি কিম্বা উদখলে কুটিয়া তাহার সহিত তেঁতুলের শাঁস এবং হলুদ, সরিষা, লঙ্কা, জীরা, মৌরি প্রভৃতি মশালার গুঁড়া মিশাইয়া সরিষার তৈল ও লবন সংযোগ করিয়া ক্রমান্বয়ে ১৫।২০ দিন সূর্য্যপক্ক করিতে হয়। ইহা অতিশয় মুখরোচক চাট্‌নি। ইহাতে ঝাল অম্লের স্বাদই অধিক। ঝাল অম্লের তীক্ষ্ণতা কমাইবার জন্য কেহ কেহ যৎকিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া থাকেন। তিনি ভাগ আম কোচার সহিত এক ভাগ মাত্র তেঁতুল ও আবশ্যকমত ঝাল মশালা লবন মিশাইতে হয়। তৈল সংযোগে ভালরূপ সূর্য্য পক্ক না হইলে ইহার আস্বাদ রিতিমত মুখরোচক হয় না। আগেকার কালে পল্লিগ্রামে কাসুন্দি প্রস্তুতের জন্য আম কোটার সময় ও কাসুন্দি মাখার সময় শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি কত মাঙ্গলিক আচরণ করা হইত। ফুল দুর্ব্বা দিয়া কাসুন্দি ভালগুলির পূজা হইত। কয়েক ঘর গৃহস্থ মিলিয়া কাসুন্দি কোটা হইত। সমস্ত জিনিষগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লেপা, পোঁচা পরিষ্কার ঢেঁকিশাল, হাত, পা ধুইয়া, কাচা কাপড় পরিয়া তবে ঢেঁকিশালে যাওয়া। পাত্রগুলি পাথরের অথবা মাটির—তাহাও ধোয়া, পোঁচা। এতদূর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইলে, এতদূর সতর্ক না হইলে সকলের বিশ্বাস কাসুন্দি খারাপ হইয়া যাইবে, কাসুন্দি অধিক দিন ভাল থাকিবে না, কাসুন্দিতে পোকা লাগিবে। ইহাতে মনে হয় ভারতবাসী বিশেষতঃ হিন্দুগণ বহুকাল যাবত পোকার উপদ্রবের কথা জানেন এবং তাহার প্রতিরোধ ও প্রতিকারার্থ নানা কৌশল অবলম্বনও করিয়া থাকেন। শাঁক ঘণ্টা কাঁসর বাজাইয়া রোগের জীবাণু ও ফসলের কীটাণু তাড়ান যায় ইহা গল্প কথা নহে। হিন্দুগণ জ্যাম জেলী চাট্‌নি বা আচার বা খাদ্য যাহা কিছু প্রস্তুত করুক সেগুলিকে পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতত যত্নবান।

আমের সরবত—কাঁচা আম পোড়াইয়া তাহা হইতে রস নিঙড়াইয়া লইয়া ঈষৎ লবন ও আবশ্যকানুযায়ী চিনি সংযোগে অতি সুপেয় পানীয় প্রস্তুত হয়। ইহা আরও সুস্বাদু ও সুঘ্রাণ করিবার নিমিত্ত ইহার সহিত গোলাপজল ও কেওড়ার জল মিশান হইয়া থাকে। পোড়া আমের সরবত "সর্দ্দি গর্ম্মির" উত্তম ঔষধ। আম পোড়া বা উহার সরবত ব্যবহারে দারুণ গ্রীষ্মজনিত প্রদাহ প্রশমিত হয়। কচি আমের ঝোল রাঁধিয়া খাইতেও গ্রীষ্মের সময় শরীর ঠাণ্ডা থাকে। সরিষা ফোড়ন দিয়া যে ঝোল তৈয়ারি হয় তাহা সাতিশয় মুখরোচক। ইহাতে অরুচি সারে এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

পাকা আমের সর্ব্বত—পাকা আমের গাছের আঁশশূন্য রসের সহিত চিনি ও সুগন্ধী মশালা মিশাইয়া সুপেয় পানীয় প্রস্তুত হয়। ইহা বলকারক, মেদবৃদ্ধি কারক, সুপথ্য। আমের আঁশ সহজে হজম হয় না, ইহাতে পেটের পীড়া উপস্থিত হয়।

আমের ভেষজগুণ—পাকা আম, কাঁচা আমের ভেষজগুণের কথা আমরা কিছু কিছু বলিয়াছি। আমের মুকুল, আমের কসি, আমের ছাল ভিজান জলও উদরাময় রোগের ঔষধ। ইহার শীতল ও ধারক গুণ চির প্রসিদ্ধ। কাঁচা আম পোড়ার শাঁস চিনি মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইয়া ও গায়ে মাখাইয়া প্লেগের ও কলেরার চিকিৎসার কথাও শুনা যায়। গাল ফুলা ও গলা বেথায় আম আঁঠি পোড়ার ধোঁয়া বড়ই হিতকারী। আম্র পল্লবের দাঁতন করিলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় ও মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয়। আম পাতার মূলদেশ থেঁতো করিয়া ঘসিলে চখের পাতার ও মুখের ব্রণ, মেছেতা ও আঁচিল সারিয়া যায়।

আমের আঠা—আমের গাছের প্রচুর আঠা নির্গত হয়। ইহা সাধারণতঃ বাজারে আরবী গঁদ বলিয়া বিক্রিত হয়। আরবী গঁদের ন্যায় ইহার কতকটা ভেষজ-গুণ আছে।

আমের ছাল—ইহার কষে চামড়া প্রভৃতি কষ হয়। আমছাল, হলুদ ও চুণ সংযোগে এক প্রকার রঞ্জন প্রস্তুত হয়। তাহাতে তুলা ও তুলাজাত দ্রব্য রঙ করা হয়, রঙ—লালাভাযুক্ত গোলাপী।

আমের কসি—কচি আম আঠি বা আম আঠির শাস চুর্ণ করিয়া ময়দা প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে শরীর পোষণ হইতে পারে। অন্নকষ্ট হইলে অন্য খাদ্যের পরিবর্ত্তে দরিদ্রলোকে ইহা খাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারে এবং অন্য খাদ্যাভাবে ইহা খাইয়া প্রাণ বাঁচাইতেও দেখা গিয়াছে। ইহাতে তৈলের ভাগও আছে।

আমের কাষ্ঠ—কাঠের রঙ ধুসর বর্ণ, কাঠ খুব শক্ত নহে তথাপি ইহাতে মোটামুটি গৃহ সজ্জা প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ কিন্তু চায়ের বাক্স, নীলের বাক্স, টাকা পয়সা প্রভৃতি পাঠাইবার প্যাকিং বাক্সের জন্যই ইহার ব্যবহার অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

আমের পল্লব—হিন্দুগণ মাঙ্গলিক কার্য্যে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা পঞ্চ পল্লবের একটি পল্লব। অশ্বথ, বট, পাকুড়, যজ্ঞডম্বুর, আম এই কয়টির পল্লবই পঞ্চ পল্লব নামে অভিহিত। পূজাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে ও উৎসবাদির সময় আম্র পল্লব দ্বারা

গৃহদ্বার ও তোরণদ্বার সজ্জিত করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। গৃহদ্বারে জলপূর্ণ কলসের মুখে আম্রপল্লব ও তদুপরি বোঁটা সমেত নারিকেল স্থাপন করা হয়। গলা ব্যথাতে আমের পাতার ধোঁয়া দিলে ব্যথা প্রশমিত হয়।

আম্র মুকুল—সরস্বতী পূজার সময় পূজার উপকরণে আম্র মুকুল ব্যবহার করিতে হয়। আম্রমুকুল ও আমড়ার মুকুল, কুলের অম্ল রন্ধনকালে তাহাতে সংযোগ করিলে অম্ল অতিশয় সুঘ্রাণ হয়। খলিসা মৎস্যের সহিত আম্রমুকুলের অম্ল অতি মুখরোচক হয়।

আয়ুর্ব্বেদে আমছালের রসের, আঠার, পাতার রসের, মুকুলের, আঠির শাঁসের অনেক গুণ বর্ণিত আছে। ফল হিসাবে কচি, কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা আমের বহুবিধ গুণ ও ব্যবহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আম এই হেতু শ্রেষ্ঠ ফল, ফলের রাজা। আম্র বৃক্ষের ন্যায় অন্য কোন বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ফলের এতাদৃশ বহু ব্যবহার প্রায় সাধারণতঃ দেখা যায় না।

খোসা ছাড়ান শুষ্ক আমের রাসায়নিক বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। *

জল	৬১·৪০
তন্তু	৪·৭৭
অদ্রবনীয় ছাই	১·৪৩
দ্রবনীয়	১·৯১
পটাসাদি	·৩১
অম্ল ও অন্যান্য পদার্থ	৩০·৮
	১০০·০০

ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান ও য়ুরোপীয়গণ সকলেরই আম্র অতিশয় প্রিয়খাদ্য। আমের সময় এতদ্দেশে অনেকেই আম খাইয়া একবেলা কাটাইয়া দেয়। ইহা পুষ্টিকর ও সুখাদ্য। এতদ্দেশীয় লোকে যেমন খাদ্যের জন্য ধান গমের উপর নির্ভর করে তেমনি আমের উপরও নির্ভর করিয়া থাকে। আমি অতঃপর কতকগুলি ভাল আমের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবনা শেষ করিব।

মুর্শিদাবাদের কয়েকটি প্রধান আম

আলিবক্স—ইহার বাগানের মালিকের নামের অনুকরণে নাম হইয়াছে। ইহার ফলন প্রচুর, ফলের আকার গোল, ওজন প্রায় ২০ তোলা, অম্লমধুর স্বাদযুক্ত, নবাবদের পছন্দসই আম; মধ্যম শ্রেণীর আম—ভাদ্র আশ্বিন মাসেও ফল পাওয়া যায়।

* Pharmacographia Indica—Watts Dictonay of the Economic Products of India.

আতাই—দুর্লভ আম—অত্যন্ত মিষ্ট এবং কোমল।

বীরা—ইহা কেবল ইচ্ছাগঞ্জের শিতলা বিবির বাগানেই ছিল। এখন অনেক জায়গায় হইয়াছে এই আম খুব উৎকৃষ্ট। মুর্শিদাবাদে ইহা ১৬্ টাকা শতকরা বিক্রয় হয়।

বিজনোর সফেদা—ইহার রঙ শ্বেতাভ সবুজ বর্ণের, ভিতরের রঙ লাল, আকার মধ্যম, উপাদেয় আম।

কালাপাহাড়—ওজনে ১ পোয়া হইতে ১৷৷০ পোয়া ও অম্ল মিষ্ট আস্বাদযুক্ত, সুগন্ধ, ভিতরের শাঁস শীতল, শাঁসের রং জরদা। এই আম সুপক্ক অবস্থায়ই উৎকৃষ্ট। একটু কাঁচা থাকিলে টক এবং ঈষৎ অধিক পাকিয়া গেলে পান্‌সে হইয়া যায়। উপরের ত্বক পক্ক অবস্থায়ও গাঢ় সবুজ থাকে। ঈষৎ লম্বা আম। আঠী খুব পাতলা।

মির্জ্জা পসন্দ—ঈষৎ চেপ্টা ধরণের আম। সুমিষ্ট, অম্লমধুর, ত্বক সাতিশয় পাতলা, আঠী অতি ক্ষুদ্র, সুগন্ধযুক্ত।

সাদা উল্লা—ওজন দেড় পোয়া হইতে অর্দ্ধ সের, আকৃতি গোল, ত্বকের রং কৃষ্ণাভ, আঁশ শূন্য শাঁস, আঠী ছোট, স্বাদ অম্লমধুর।

ভবানী চৌরাস—আকৃতি লম্বা, নাকওয়ালা, অম্লমধুর, আঁঠীর সন্নিকটবর্ত্তী শাস ঈষৎ টক, আঠী পাতলা, ত্বক পাতলা হরিদ্রাভ, শাস আঁশ শূন্য। আম ছোট।

চিনি শক্কর—পক্কাবস্থায় ইহার উপরের রং গোলাপী, ভিতরের রং লাল, আঁশ শূন্য রসাল, এবং চন্দনের ন্যায় সৌগন্ধযুক্ত।

চরকী চাঁপা—ইহা আশযুক্ত রসাল, চাঁপা ফুলের ন্যায় ইহার গন্ধ, দুর্লভ (আজিম গঞ্জের এস, সি, নহর বাহাদুরের বাগানে আছে)।

দু আঁাটি—অদ্ভুত রকমের আম, প্রত্যেক আমে দুইটি করিয়া আটি থাকে, একটি ভিতরে অপরটি আবের মত বাহিরে থাকে, ইহার অন্য কোন গুণ নাই। উক্ত এস সি নহর বাহাদুরের বাগানে আছে।

দাউদ ভোগ—ইহার প্রধান গাছ দারাবালি খাঁ বাহাদুরের বাগানে আছে। ফল লম্বা, ওজনে আট আউন্স, হরিদ্রাবর্ণ এবং উপাদেয়, আশ্বিনে পাকে, শতকরা ৮্ টাকা হইতে ১০্ টাকা দরে বিক্রয় হয়।

দুধিয়া—আম শাদা, আঁশযুক্ত সুমিষ্ট, রসাল। মিয়া আমিরের বাগানের দুধিয়াই উৎকৃষ্ট, ইহা শীঘ্র পাকে।

গুলগুকরি—অগ্রভাগ শর আপেলের স্থায় বর্ণ সুমিষ্ট গোলাপ গন্ধ আঁশ নাই আঁটি ছোট।

কোহিতুর—ইহা মুর্শিদাবাদের গৌরব; হোসেন আলি মির্জা বাহাদুরের বাগানে আছে। এই আম সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে।

কালাপাহাড়—আদত গাছ মৃত সৈয়েদ দরাব আলি খাঁ বাহাদুরের বাগানে আছে; মিরজা পছন্দ আমের অনুরূপ। মালদহে যে কালাপাহাড় আম আছে তাহা মুরশিদাবাদের কালাপাহাড় হইতে ভিন্নরূপ—ইহার পাতা সরু বোঁটা কাল, আমের ওজন প্রায় ৪০ তোলা, খোলা পাতলা, সুমিষ্ট, রসাল এবং আঁশশূন্য, আঁটি ছোট এবং পাতলা, পাকিলেও রঙের পরিবর্ত্তন হয় না, গন্ধ খুব ভাল।

খরমুজা—এই জাতীয় আমের গাছ মুরশিদাবাদে অধিক নাই, আম পাকিলে খরমুজার মত গন্ধ বাহির হয়, আদত গাছ মুর্শিদাবাদের চুনাখালীতে আছে। ঐ গাছের আম প্রতি বৎসর বাজারে ২৫০৲ হইতে ৩০০৲ টাকার বিক্রয় হয়। প্রতি শত ৫৲ টাকা, ফলের প্রত্যেকটির ওজন প্রায় ৩০ তোলা।

খাসাপাতী—প্রথম মালদহ হইতে আমদানী হয় কিন্তু স্থানান্তরে আসিয়া মুরশিদাবাদের মাটির গুণে খুব ভাল হইয়াছে। আকৃতি লম্বা নাকওয়ালা, কাল, সুমিষ্ট ও বড় হয়, প্রত্যেকটির ওজন প্রায় ৪০ তোলা। ইহা অনেকদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে এজন্য ভিন্ন দেশে পাঠাইবার সুবিধা হয়, শ্রাবণ মাসে পাকে।

খানাম পছন্দ—ইহা ভাল জাতীয় আম।

মেজিদি—মিষ্ট এবং রসাল কিন্তু আঁশ আছে অনেক দিন রাখা যায়, ভিন্ন দেশে পাঠাইবার উপযুক্ত।

মিছরি কুন্দ—ফল চেপটা এবং লম্বা, আটি পাতলা আশশূন্য সুমিষ্ট আঘ্রাণ লোভনীয়। ওজন প্রত্যেকটি ৭ তোলা হইতে ১০ তোলা।

লাজুকবদন—ইহা এত নরম যে হাত দিয়া টিপিলে দাগ বসিয়া যায় এই জন্ত ইহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। আম লম্বা রং হরিদ্রাভ, ওজন প্রত্যেকটির ২০ হইতে ৩০ তোলা।

সাজিম পছন্দ—এই আমের গাছ সোজা ধরণের হয়। ইহা মৃত নবাব হুমাউন সা এবং বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার মৃত নবাবের পছন্দসহি আম ছিল। ইহাতে উৎকৃষ্ট পোলাও তৈয়ারি হয়। ফল বড়, প্রত্যেকটির ওজন প্রায় ২০ তোলা ২৫ তোলা

হয়। আকৃতি গোল, বর্ণ হরিদ্রাভ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পাকে। নবাব [illegible] ইহা এখন স্থান অধিকার করিয়াছিল।

শীষ্ম গাছো—খুব বড় জাতির আম, সবুজবর্ণের, আশশূন্য, সুমিষ্ট, ওজন প্রায় ১ সের।

খাজা পছন্দ—বড় জাতীয় আম, আটি ছোট, শাঁস লাল ও সুমিষ্ট।

সরদা—ফল ছোট, অধিক ফলে, পাকিলে উপরের রং হরিদ্রাবর্ণের মিষ্ট রসাল এবং ঠাণ্ডা। ইহা খুব উৎকৃষ্ট আম। নসিপুরের রঞ্জিৎ সিং বাহাদুরের বাগানে আছে।

সরবতী—বড় জাতীয় আম, সুমিষ্ট আশশূন্য রসাল ঠাণ্ডা এবং মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট।

তালাবী—বড় জাতীয় আম রং হরিদ্রাভ, শাঁস হরিদ্রাভ সুমিষ্ট এবং রসাল সুগন্ধযুক্ত, ছাড়াইয়া খাইবার উপযুক্ত।

তোতা—এই আম দুই রকম আছে বড় এবং ছোট, দেখিতে সুন্দর, পাকিলে গন্ধকের মত রং হয়, সুমিষ্ট, খোলা পাতলা, আটি ছোট, আঁশ নাই, আষাঢ় মাসে পাকে।

মুর্শীদাবাদের আমের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তদ্ব্যতীত অনেক মুর্শীদাবাদের আম আছে যথা—তরমুজা, সবজা, সিদুরিয়া, সিপিয়া, কমদা খাসা, রতন কেওয়া, গঙ্গাপ্রসাদ, গোলাবি, লাড়ুয়া, এলাইচদানা, পেপিয়া, পাত্তা, তোতামুখী, লালদরমা ইত্যাদি। মুর্শীদাবাদের আম সংখ্যায় ১০০ শতের কম হইবে না। সকল রকম কলিকাতার বাজারে আইসে না এবং সকলগুলির বিবরণ ঠিকমত পাওয়া যায় না।

মুর্শীদাবাদে দাদ মুঙ্গো নামে একটি আম আছে উহার ওজন ৩০ তোলা হইবে আষাঢ় মাসে পাকে, রঙ হল্‌দে, শাঁস সাদা, খুব রসাল ও মিষ্ট। ফলন অধিক, থলো থলো ফলে।

লাল দরমা—ওজন ৬০ তোলা, ইহাকে ফজলীর শ্রেণীতে ফেলা যায়। ইহা প্রকৃত পক্ষে দারবঙ্গের আম। দারবঙ্গ হইতে মুর্শীদাবাদে আসিয়াছে। ইহা জলদী জাতীয় আম, খোলো বড়, গন্ধ মনোহর, শাস সুমিষ্ট।

দয়াল সিং—আম ছোট, ওজন ২০ তোলা, লম্বা, বিলম্বে পাকে, কার্ত্তিক মাসেও আম পাওয়া যায়। খোসা পাতলা।

ল্যাংড়া—দারবঙ্গের ল্যাংড়া ও মুর্শীদাবাদের ল্যাংড়ার আকারগত বিশেষ পার্থক্য নাই। স্বাদগন্ধ প্রভৃতি প্রায় অনুরূপ। ইহাও দারবঙ্গ হইতে এখানে আসিয়াছে। আর একটি আমের উল্লেখ করিয়া আমরা মুর্শীদাবাদের আমের তালিকা শেষ করিব।

ক্ষীরাড়ী—লম্বা ও চেপ্টা, শাস মিষ্ট ও শাদা, বিলম্বে পাকে।

দ্বারবঙ্গের আম

সফেদা—ফল মোচার মত গোল ওজন ৩০।৪০ তোলা, সম্পূর্ণ আশশূন্য, শাস মিষ্ট ও মনোহর গন্ধ। পাকিলে হলদে রঙ হয়। শাসের রঙ ঈষৎ গোলাপী আভাযুক্ত শাদা। আঠি পাতলা, পাকিলেও কয়েক দিন অবিকৃত থাকে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পাকে। স্থানীয় দর ৪।৫৲ টাকা প্রতি শত।

মুর্শিদাবাদের সবজা ও সফেদা—আম আকারে ও গুণে প্রায়ই ইহারই মত।

বেরোয়া—ওজন ৩০।৪০ তোলা সুমিষ্ট কিন্তু সফেদার মত এত মনোহর গন্ধ নহে। আশশূন্য (বে-রোয়া-নাই আশ) রস পাতলা, আটি পাতলা। স্থানীয় দর ৩৲ হইতে ৩॥০ টাকা একশত। সবজা কিম্বা সফেদা অপেক্ষা কিছু আগে পাকে।

সফেদ—ইহা সফেদা আম হইতে পৃথক। ইহাও লম্বা ছাঁদের। শাস লাল, আশ আছে, মিষ্ট, দুধের সহিত খাওয়া চলে। আটি তত পাতলা নহে। অনুমান হয় সফেদা আম অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া এই আকার ধারণ করিয়াছে। আটির চারা ও অযত্ন পালন হেতু গুণের অপকর্ষ ঘটিয়াছে।

কিষণভোগ—বাঙ্গালা দেশে কিষণভোগ আম আছে, ফলের ওজন ৪০ তোলা গোল, বোঁটার দিক ভারি, রঙ পাকিলে গোলাপী লাল, শাস মিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত, আশশূন্য, আটি খুব পাতালা এখানে বেলা নামে একটি আম আছে যাহা প্রায়ই কিষণভোগের অনুরূপ আকারে কিছু বড়, শ্রাবণ ভাদ্রে পাকে। স্থানীয় দর ৩৲ হইতে ৪৲ টাকা শত।

দরমা—গোল আম, বোঁটার দিকে ভারি বড় আম, ওজনে কখন কখন এক সের পর্য্যন্ত হয়। ফলে বেলের গন্ধ আছে, শাস মিষ্ট ও মধুর। বাঙ্গালার বেলগন্ধি আমও এই রকম। স্থানীয় দর ৩॥০ টাকা হইতে ৪৲ টাকা শত।

লাড়ুয়া—ছোট গোল লাড়ুর মত। আশ আছে, শাস মিষ্ট কিন্তু বিশেষ সুগন্ধ নহে।

খরবুজা—ফলের আকার খরবুজের মত এবং খরবুজের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত, শাস ঘন সবদ্ধ ফল মাঝারি। অতি মিষ্ট।

কপুরিখাস—ফল ছোট, কতকটা লম্বাকৃতি; আশ নাই, মিষ্ট, কর্পূরের গন্ধবিশিষ্ট, অতি সুস্বাদু, আটি ছোট, শাস ঘণ সবদ্ধ, ছাড়াইয়া খাইবার উপযুক্ত।

দ্বারবঙ্গের ভাদুই—আম আছে; নাবী আমের মধ্যে কটকি, মাড়ি মোহন ঠাকুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত গাছে ফল থাকে।

সা পসন্দ—আম বড়, শাস মিষ্ট আঁশশূন্য কিন্তু এই আমের প্রধান দোষ এই যে গাছে পাকিলে ভিতরে পোকা হয়। এই কারণে ইহা দেখিতে সুন্দর হইলেও বাজারে দরে বিক্রয় হয় না।

মালদহের আম

মালদহ ফজলী ও ভাদুই আমের জন্য বিখ্যাত।

ফজলী—ইহা অপেক্ষা বড় আম নাই। ছোট বড় অনেক রকম ফজলী আছে। ফজলী আমের ওজন আধ সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত হয়। আকৃতি লাল চেপ্টা, খুব শাঁসল। ছাড়াইয়া খাইবার উপযুক্ত, আঁশাশূন্য। ফজলী আমের বিশেষ কোন সুগন্ধ নাই। নাবী জাতীয় আম কর্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। প্রথম গাছটি একমুসলমানের বাটিতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এক মুসলমান কন্যার নামে ইহার নাম করণ হয়। বাজারে ফজলী আমের দর অধিক। ৪টা কিম্বা ৬টা, বড় জোর ১০টা এক টাকায় পাওয়া যায়। ফজলী আম পাকিলে ঘোর সবুজ হয় মাত্র।

দুর্গাভোগ—ইহাও এক প্রকার ফজলী। ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এই আম থাকে। পাকিলে ইহার ঈষৎ লাল রঙ হয়। অন্য সকল বিষয়ে ফজলীর সহিত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

দারিকা, দিলসাজ—ইহারও ফজলী শ্রেণীভুক্ত; আম বড় বিলম্বে পাকে।

শরত ভোগ, সফেদা—ইহারাও ফজলী শ্রেণীর আম এবং ফজলীর সহিত ইহাদের সৌসাদৃশ্য সমধিক।

সিদুরিয়া, সীতাভোগ—ইহারাও ফজলী শ্রেণীর অন্তর্গত। ফল ফজলীর মত তাদৃশ বড় নহে। সিঁদুরিয়ার সিঁদুরের মত লাল রঙ হয়।

মালদহ গোল—খুব বড় আমও আছে কুমড়াজালি খুব বড় আম—১ সের হইতে ৩ সের পর্য্যন্ত ওজনে হয়। আঁশ নাই, ছাড়াইয়া খাইবার উপযুক্ত। আর খুব সুতার নহে।

জালি খাহুদা—বড় গোল ওজনে আধ সের অর্য্যন্ত হয়। খুব সু-তার, গন্ধ মনোহর। খুব নাবী নহে। ইহা বাজারে ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা শত দরে বিক্রয় হয়।

অমৃত ভোগ, গোপাল ভোগ, কালাচাঁদ ভোগ, গোপিনাথ ভোগ, মিশ্রি ভোগ, মোহন ভোগ—প্রভৃতি নাম

দহের আমগুলি মধ্যমাকৃতি। ইহাদের মধ্যে মোহন ভোগ বড় ওজনে আধ সের পর্য্যন্ত হয়। আমগুলি সুমিষ্ট, সুতার এবং প্রায়ই শ্রাবণ ভাদ্রে পাকে।

ভাদুরিয়া লম্বা, ভাদুরিয়া গোল—ইহারাও মালদহের আম ইহাদের ওজন ১ সের পর্য্যন্ত হয়। ভাদুরিয়া লম্বার আকৃতি মোচার মত, দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ গোল, ইহার খোসা কিছু পুরু। ইহা সুমিষ্ট ও সুগন্ধী আম। আকার যত কিছু পার্থক্য থাকিলেও গুণে ফজলীর অনুরূপ। মধ্যম সময় পাকে।

আশ্বিনা—ইহা ফজলীর নামান্তর মাত্র, ওজনে ১।১৶০ সের হয়। শাঁস মিষ্ট ও সুতার। বিলম্বে পাকে।

বারমেসে—দুইবার ফলে এক বার জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকে, দ্বিতীয় বার কার্ত্তিকের শেষ ও অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত পাকা আম পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনী—চেপ্টা আকারের আম বেশ সুমিষ্ট ও সু-তার। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকে। ওজন এক পোয়া।

গোলাব বাস—ফল ছোট ও মিষ্ট। বাজারে ৫৲।৬৲ শত দরে বিক্রয় হয়। ইহা বাঙলার নবাব বাড়ীর গোলাপ খাস আমের সমতুল্য। ফলে গোলাপ গন্ধ আছে।

ফুলী—চেপ্টা আকারের আম। ওজন অর্দ্ধ সের। শ্রাবণ ভাদ্রে পাকে।

পেয়ারা ফুলী—বাঙলার 'পিয়ার' ফুলীর মত আম। সম্ভবতঃ মালদা হইতে ঐ আম বাঙলায় আসিয়াছে। ফল ছোট; ফলন সমধিক।

বড় বাহার—মালদার বিখ্যাত আম; প্রায় ১ সের ওজন। অতি সুন্দর দেখিতে ও খাইতেও সুন্দর। দরও অধিক ২টা কিম্বা ১টা ১ টাকায় বিক্রয় হয়।

কো-পাহাড়িয়া—লম্বা আম ফল এক পোয়ার মধ্যে ওজন। আঁশ শূন্য বোম্বাই আমের মত শ্রাবণ মাসে পাকে।

বোম্বাই আম

আলফান্সো, সফেদ বোম্বাই, ভুতো বোম্বাই, পিটার্স, পিয়ারি, আপুজ।

আলফান্সো, আপুজ—ওজন ২০ হইতে ৩০ তোলা। রঙ পাকিলে হলদে হয়। আঁশ শূন্য, সুমিষ্ট ও সু-তার। আলফান্সো অপেক্ষা আপুজের স্বাদ গন্ধ ভাল।

পিয়ারি, পিটার্স—পাকিলে লাল আভা হয়। দেখিতে মনোহর। শাঁস হলদে। ওজনে আলফান্সো কিম্বা আপুজের মত।

ভুতো বোম্বাই (Black Bombay)—রঙ গাঢ় সবুজ, পাকিলে ঈষৎ ফিকে রঙ হয়। শাঁস লাল রঙের।

সুরত বোম্বাই (Surat Bombay) রঙ শাদা, আকৃতি আস্বাদ সকল বোম্বাই আমের প্রায় একই রূপ।

সিন্ধা বোম্বাই—লম্বা, আস্বদে সাধ্যরণ বোম্বাই আমের মত। ওজন ১।১।।০ পোয়া।

দেশী বোম্বাই ধরের বোম্বাই—রঙ সবুজ, পাকিলে ঈষৎ হল্‌দে হয়। ঈষৎ অম্লস্বাদ যুক্ত বলিয়া ইহা খাস বোম্বাই অপেক্ষা অধিক সুতার। বোম্বাই আমের চারা বা কলম হইতে বাঙলায় এই দুইটি আমের উৎপত্তি হইয়াছে।

রায় এস, সি, লাহার বাহাদুরের তালিকায় আরও কতকগুলি বোম্বাই আমের নাম দৃষ্ট হয়,—

কাল আলফান্সো, কাওয়াসজি পেটেল, হিমসাগর, লং বটল, (বোতলাকৃতি লম্বা) সালেম পসন্দ, মাজগাওন, মালাবার বোম্বাই, জেট বোম্বাই।

হিমসাগর—ইহার আকার মাঝারি, গোল, মাথার দিক ভারি, আশশূন্য, স্বাদগন্ধ উৎকৃষ্ট, শাঁস লাল, শীতল আস্বাদ। ইহা এখন বাঙলা দেশের আম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

মাজাগাওন—ইহাই বোম্বাই আমের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়—রঙ পাকিলেও সবুজ থাকে—শাঁস ঈষৎ হল্‌দে হয়। খুব মিষ্ট নহে।

মালাবার বোম্বাই—লম্বা, আম, খোচাকৃতি, খোসা পুরু, খুব রসাল, রসও মিষ্ট। শাঁস পাকিলে ঈষৎ হল্‌দে হয়। আম খুব বড় নহে, লম্বা ৯ ইঞ্চ হয়।

গোয়া আম

কোষ্টা, দিজু, ফার্ণান্ ডিনলা, ফ্রেড্রিকো, টিমার,—ইহাদের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। উড্রোর গার্ডেনিং নামক পুস্তকে ইহাদের নাম মাত্র উল্লেখ আছে।

মহীশূর আম

আমরা এতদঞ্চলের কতকগুলি আমের নাম শুনিয়াছি মাত্র। ঐ সকল আমের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

মহীশুর ও কুর্গ গেজেটে নিম্নলিখিত আমগুলির উল্লেখ আছে—

বাদামী	ক্লিনি-মাভু
চিতুর	কারিকাই
চিটকাই	মাঞ্জমাভু
গোলকেরী	পিচকাই
	সি-মাভু

এতদ্ব্যতীত আমিনা নামে একটি আম আছে যাহা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর আম বলিয়া পরিচিত। চিতুর আমেরও আমরা কিছু পরিচয় জানি। উহা লম্বা ধরণের আম, শাস শাদা। আমের স্বাদ গন্ধও ভাল।

আজিম গঞ্জের এ, সি নাহার রায় বাহাদুর তাঁহার আমের তালিকায় আমিনা আমের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত মান্দ্রাজী আমেরও একটি তালিকা আছে।

মান্দ্রাজী আম

চিতুর—ইহা মহীশূরের চিতুর আম বলিয়াই বোধ হয়।

গোভা	ওথাডা-মাভু
মাল-গোভা	রাপ্প-বেরী
হাথুডা	ওলাজা-পসন্দ
	আসে-পসন্দ

উপরি উক্ত আমগুলির বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

পিটার—ইহা বোম্বাই পিটার আম হইতে বিভিন্ন। ইহা দেখিতে সুন্দর এবং খাইতেও সুমিষ্ট। ইহার ফলন খুব বেশী।

পুভু—মোচা আকৃতি আম, খোসা পুরু, পাকিলেও সবুজ রঙ থাকে। গন্ধ তত ভাল নহে।

বারুইপুর বা জয়নগরের আম

বারুইপুর কলিকাতার দক্ষিণ ২০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত, জয়নগর এখান হইতে আরও ১০ মাইল দক্ষিণে।

গোপাল ধোবা—এতদঞ্চলের মধ্যে এই আমের খ্যাতি যথেষ্ট। গোপাল নামক রজকের বাটিতে এই গাছ প্রথম দেখা গিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম গোপাল

খোবা হইয়াছে। ইহার বড় আকারের লম্বা সাইজের আম। ফজলীর মতই গঠন। লম্বা ফজলী হইতে ইহার সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান।

নিম-চৌধুরি—ইহা বোম্বাই ধরণের আম, পাকিলে খোসা ঈষৎ হলদে আভাযুক্ত হয়। স্বাদ গন্ধ ভাল। বারুইপুরের সন্নিকট ময়দা গ্রামে নিমাই চৌধুরীর বাটীতে এই আমের প্রথম গাছটি জন্মিয়া ছিল বলিয়া ইহা এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

পদ্মজোলা—গোল আম, পাকিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়। সুমিষ্ট ভাল আম।

ধুমো—গোল বড় আম, খুব মিষ্ট না হইলেও আস্বাদ ভাল। ধরমপুর গ্রামে ইহার প্রথম জন্ম। ধরমপুর হইতে ধুনো নাম হইয়াছে।

মান্দ্রাজী, বোম্বাই, মলদা, দারবঙ্গ, মুর্শীদাবাদ আম ব্যতীত আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে বোম্বাই, ফজলী, ল্যাঙড়া, দেশী এই কয়টির যে কোন শ্রেণীতে ফেলা যায়। দেশী আম যাহা ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, হুগলী, যশোহর প্রভৃতি স্থানে জন্মিয়া থাকে তাহারা প্রায়ই বোম্বাই মাল্দা, ল্যাঙড়া এই কয়টি আমের পরস্পর সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। কোন কোন আমের উৎকর্ষ, কাহারও বা অবনতি হইয়াছে। দেশী আম কথন বা নিকৃষ্ট দশাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ আশ বহুল, টক ও বিস্বাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার দেশী আম এমন আছে যে লোকে বোম্বাই, ল্যাঙড়া বা ফজলী ফেলিয়া তাহা খাইতে চাহিবে। দেশী আশ বহুল টক আম আচার, আম্সী ও চাটনি প্রস্তুতেই অধিক ব্যবহার হয়।

আমি অতঃপর কয়েকটি বিশিষ্ট গুণযুক্ত আমের নামোল্লেখ করিতেছি—

চন্দনী বা চন্দন খাস—সাইজ মাঝারী, সুমিষ্ট, চন্দনগন্ধযুক্ত আশশূন্য, আটি ছোট, রস গাঢ়।

গোপাল লাড়ু—আম গোল, পাকিলে আপেলের মত রঙ হয়। আমও বড়—ওজনে এক সের পর্য্যন্ত হয়। প্রতি শত ১০৲ কিম্বা ১২৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতে দেখা যায়।

আম্বির গোলা—মান্দ্রাজী আম ওজন ২৫ তোলা, খোসা খস্খসে, রঙ কমলালেবুর মত, শ্রাবণ মাসে পাকে।

লাড্ডু বা লাড়ু—আম ছোট, দেখিতে বড় মনোহর, পাকিলে হলদে, লাল ও সবুজ রঙের মিশ্রণ ফলের গায়ে দেখা যায়, এবং তখন দেখিতে আপেলের মত বোধ হয়। শ্রাবণ মাসে পাকে।

দস্মিয়া—লনির তালিকায় ইহার নাম আছে। ইহা ত্রিহুতের আম। আমের

ওজন এক পোয়া হইতে আধসের পর্য্যন্ত হয়। গোল হলদে রঙের আম। শাস শক্ত বোধ হইলেও মুখে দিলে মিলাইয়া যায়। এই নামে এক লাল রঙের আম আছে যাহা প্রথম দৃশ্যেই আপেল বলিয়া ভ্রম হইবে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পাকে।

গৌড়িয়া মালদা—বর্কলির পুস্তকে ইহার নাম আছে। উৎকৃষ্ট বড় জাতীয় আম, ফজলী শ্রেণীতে স্থান পাইবার উপযুক্ত। একটু বিশেষত্ব এই যে সাধারণতঃ বড় আমের আটি পুরু হয় কিন্তু ইহার আটি অতিশয় পাতলা এবং ইহার খোসাও কাগজের মত পাতলা। ইহার আস্বাদ ও গন্ধ অতি মনোহর।

ভুপালী—ডাঃ ওয়াটের অভিধানে ইহার উল্লেখ আছে। তাঁহার মতে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট আম। আকার ছোট ও গোল—রঙ ফিকে লাল বা হলদে হয়। ইহা ত্রিহুতের আম। ওজন ১৫ তোলা, শ্রাবণ মাসে পাকে। ইহাকে বোম্বাই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

নরসিং ভোগ—ফিকে নীল বর্ণের আম, আকারে বড় ও লম্বা, ওজন তিন পোয়া। ইহার গাছ দেখিলেই চেনা যায়। ইহা ফজলী জাতীয় আম, পাতা লাল প্রায় ১ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়।

তারস্ বা তাল—তালাকৃতি আম, ওজন তিন পোয়া পর্য্যন্ত হয়। শ্রাবণ ভাদ্রে পাকে।

শসা খাস—ডাঃ ওয়াটের অভিধানে ইহার কাকুরিয়া (Kakoria—Cucamber-plantain) নাম দেওয়া হইয়াছে। আকৃতি শসার মত, লম্বা ৮।১০ ইঞ্চ, ২॥ ইঞ্চ মোটা। খুব রসাল ও সুস্বাদু। ওজন দেড় পোয়া হইতে আধ সের পর্য্যন্ত। ফজলী শ্রেণীর আম।

কপাট ভাঙ্গা—মাঝারি গোল। **বাটা জোড়া**—গোল বড়।

তোয়াসেক্—ঈষৎ লম্বাকৃতি হইলেও অনেকটা গোলাকৃতিই দেখায়। এই তিনটি আমই সুমিষ্ট ও সুগন্ধ। ইহারা ফজলী শ্রেণী ভুক্ত আম।

মোয়া খাস—ছোট গোল, আম মোচার মত আকৃতি, আস্বাদ বোম্বাই আমের মত।

মৌটুসী, ক্ষিরপুলী, বৃন্দাবনী—এই তিনটি আমই ছোট। মৌটুসী আম ঈষৎ লম্বাকৃতি গোল। ক্ষিরপুলী ও বৃন্দাবনী চেপ্টা ধরণের। [illegible]ার রস মধুর মত, খুব রসাল বলিয়া চুষিয়া খাওয়া যায়।

মিছরিকুঁদো—বোম্বাই ও ল্যাংড়া আমের সংমিশ্রণে যেরূপ আস্বাদ হয়

অরূপ আস্বাদ মনে হয়। ফল চেপ্টা গোল, আকৃতি মাঝারি। খুব সুতার সুমিষ্ট।

বিশ্বনাথ মুখুর্য্যে—ইহা বোম্বাই শ্রেণীর আম স্বাদ গন্ধ বোম্বাই আমেরই মত। আকারও বোম্বাইয়ের মত ঈষৎ লম্বাকৃতি গোল। ইহা বোম্বাই অপেক্ষা কিছু বড়।

চায়না ম্যাডাম—ইহা কোন দেশের আম ঠিক জানা নাই। বাঙলায় এখন ইহার অনেক গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। গাছ ১০।১৫ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। গাছ লতানিয়া স্বভাবের। চারিদিকে মার্শাল নীল গোলাপের মত মাচা বাঁধিয়া দিলে ভাল হয়। ফল ছোট, গোলাকার। আস্বাদ বোম্বাই আমের মত। কেহ বলেন যে ইহা গোয়া আম।

বাটাজোড়া, কপাটভাঙ্গা, চাঁদদাখাস প্রভৃতি দেশী আমগুলি বড় জাতের এবং ফজলী শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

সরীখাস—ইহা বোম্বাই ও ল্যাঙড়া আমের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। আকার ল্যাঙরার মত ঈষৎ চেপ্টা ও গোল এবং ল্যাঙড়া অপেক্ষা সাইজে কথঞ্চিৎ বড়, খাইতে সুতার ও সুমিষ্ট, আঁশ অতি কম।

এতদ্ব্যতীত দেশী আমের কত যে নাম আছে তাহার সংখ্যা নাই। দুধে, ধলে, সিঁদুরে, কালমেঘা, সুন্দর প্রভৃতি বর্ণানুসারে এবং ছোট বড় ও আকার হিসাবে চাঁদা, লাড্ডু, নাকি, বাঁকা, ঝিনুকে, চড়ুকে ও মিষ্টতানুযায়ী মিছরে, মোয়াখাস, ক্ষীরপুলী, ক্ষীরলাড্ডু, গুড়ে প্রভৃতি নানা আখ্যা পাইয়াছে।

দেশী আম কোনটি টক, কোনটি মিষ্ট, কোনটি অম্লমধুর, অধিকাংশই আশবহুল কতকগুলি ফজলী, ল্যাঙড়া, বোম্বাই ইহাদের মধ্যে কোন একটি শ্রেণীভুক্ত অথবা ইহাদের পরস্পর সংমিলনে নানা প্রকার স্বাদ গন্ধ ও আকারের আম উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রায় সকল আমই কাঁচাকালে অম্লাস্বাদযুক্ত কিন্তু পাকিলে মিষ্ট হইয়া থাকে। পাকিলেও মিষ্ট হয় না এমন আমও আছে।

কাঁচামিঠা—কাঁচাবেলা মিষ্ট এমন দুই রকম আম আছে—একটি গোল, একটি লম্বা আকারের আম। কাঁচা খাইতে শসার মত না হইলেও অম্লাস্বাদ ইহাতে অতি সামান্যই পাওয়া যায়। ইহার স্বাদ গন্ধ ভাল। ওজন ১। ১৷৹ পোয়া পর্য্যন্ত হয়। পাকিলে পান্‌সে হয়।

বাঙলায় যত রকম ধান আছে প্রায় তত রকম আমও আছে এবং পরস্পর সংমিশ্রণে

কত কত রকম ধান ও আমের সৃষ্টি প্রতিনিয়তই হইতেছে। বারমিশেলী আমের আবাদ না করিয়া আবশ্যকানুযায়ী ভাল আমগুলির আবাদ করিলে লাভের মাত্রা অধিক হইবার সম্ভাবনা।

কলম ও আঁঠির আম

কলমের আম শীঘ্র ফলে, আঠির গাছ বিলম্বে ফলবান হয়। কিন্তু উপযুক্ত জমি না হইলে বা রীতিমত চাষ কারকিত না করিলে কলমের গাছ ফলিতেও বিলম্ব হয়; আবার স্থানবিশেষে এবং পাইটের গুণে ৪ বৎসর মধ্যেই আঠির গাছও ফলিয়া থাকে। আঠির গাছ কলমের গাছ অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হয় এবং ইহার লম্বা গুড়ি হইয়া ভবিষ্যতে কাষ্ঠ হিসাবে অধিক মূল্যের গাছ হয়। পরিণত বয়সে আঠির গাছ কলমের গাছ অপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে। আঠির গাছ, কলম অপেক্ষা অধিক দৃঢ়ও হয়। ঝড়ে কলমের গাছ যত ভাঙ্গে আঠির গাছ তত ভাঙ্গে না। বিস্তৃতক্ষেত্রে আমের বাগান করিতে হইলে এবং ভাল আমের আঁটি পাইবার সুবিধা থাকিলে আঁটির চারা রোপণ মন্দ নহে। কলম অপেক্ষা আঁটি কিম্বা আঁটির চারা স্থানান্তরে লইয়া যাইবার সুবিধা হয় ও খরচে অনেক কম পড়ে।

বাঙলাদেশে নানা শ্রেণীর আম একসঙ্গে জন্মে বলিয়া এখানকার আঠির চারার সঠিক গাছ উৎপন্ন হওয়া কঠিন। কিন্তু মালদহ, দ্বারবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ, বোম্বাই হইতে আমদানী সুপুষ্ট, সুপক আম হইতে আঠি লইয়া ল্যাঙড়া, বোম্বাই, ফজলী ও অন্য সঙ্করোৎপন্ন ভাল জাতীয় আমের গাছ করিয়া আবাদ করিলে ভাল আমই উৎপন্ন হইবে এবং সযত্নে কারকিত মেরামত করিলে তাহারা শীঘ্র ফলবান হইয়া লাভজনক বাগানে পরিণত হইবে।



মাঘ, ১৩২৪ সাল।

ফল ব্যবসায়ের ভবিষ্যত

ও

বাঙ্গালীর নব আবিষ্কার

ভারত নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফলের জন্মভূমি। আনারস, কলা, কাঁটাল, পেঁপে, নাসপাতি, পীচ, বেদানা, আম লিচু প্রভৃতি কত প্রকার ফল ভারতের স্থান বিশেষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। স্থানান্তরে চালান দেওয়ার সুযোগ অভাবে অনেক স্থানে অতিরিক্ত ফসল পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। আবার চালানের সুবিধা থাকিলেও বাজারের দূরত্ব, প্যাক করিবার অপকৃষ্ট প্রথা, রেল অথবা ষ্টীমারের অধিক ভাড়া, ও ফল বহনোপযোগী যানাদির ব্যবস্থার অভাবেও অনেক ফল বৃথায় যায়। অধিক কাট্‌তি এবং উপযুক্ত মূল্য না থাকিলে কৃষকের যে কোন উৎকৃষ্ট ফসল জন্মাইবার আগ্রহ হয় না, তাহা সকলেই জানেন। ২।৪টি বড় বড় সহর ব্যতীত অন্যান্য স্থানে উৎকৃষ্ট ফলের আদর কম ; সেজন্য এতদ্দেশে নানাবিধ ফল জাতির ক্রমশঃ অবনতিও দৃষ্ট হইতেছে।

পক্ষান্তরে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের নানাস্থানে, অষ্ট্রেলিয়া, ও ওয়েষ্টইণ্ডিজ দ্বীপ সমূহে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমীতে ফল চাষ হইয়া উৎপাদিত ফল পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরিত হইতেছে। এক লণ্ডনের বাজারেই লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশীয় ফল প্রতি বৎসরেই বিক্রয় হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই সমুদয় ফলের চাষ ও ব্যবসায় করিয়া বর্ত্তমান সময়ে অনেক ব্যক্তি ধনকুবের হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কিন্তু এই বিশাল ফল ব্যবসায়ের একটি গুরুতর প্রতিবন্ধক আছে। আমাদিগের দেশের উত্তাপে ২।৪ দিনের মধ্যেই অধিকাংশ দ্রব্য পচিতে আরম্ভ করে। বিলাত

প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে পচন ক্রিয়া আরম্ভ হইতে একটু দেরী হয় বটে, কিন্তু সহজ অবস্থায় থাকিলে পচনক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী, কেবল কিছু অধিক কাল অপেক্ষা মাত্র। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দূরদেশ হইতে বিলাতে ফল আসিতে অনেক সময় লাগে। সুতরাং পচিয়া অনেক ফল একেবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং একেবারে পচিয়া না গেলেও স্বাদ গন্ধ প্রভৃতির এরূপ বিকৃতি হইয়া যায় যে, সে সমুদয় ফলকে টাটকা ফলের সহিত আদৌ তুলনা করা যায় না। আবার বহু পরিমাণ ভাল ফলের সহিত যদি একটামাত্র পচনশীল ফল অতর্কিতে থাকিয়া যায় তাহা হইলেও সে তাহার দোষ সকল পার্শ্ববর্ত্তী ফল সমূহে সঞ্চার করে ও তাহার ফলে সমস্ত ফলগুলি খারাপ হইয়া যায়।

ফল, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি সত্বর পচনশীল দ্রব্যাদি দূরদেশে চালান দেওয়ায় এই সমুদয় অসুবিধা নিরাকরণের জন্য কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক Cold storage system অথবা শৈত্য দ্বারা রক্ষণপ্রণালী প্রবর্ত্তন করেন। অধিক তাপে যেমন অধিকাংশ জীবাণু মরিয়া যায় অথবা তাহাদের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া থাকে, অধিক শৈত্যেও সেইরূপ হয়। এই ফরাসী প্রথার প্রধান ভিত্তি এই যে, যে জাহাজ অথবা রেলে এমন প্রথায় বিশেষরূপে নির্ম্মিত কামরা রাখা, যাহার তাপ পারিপার্শ্বিক স্থানের তাপ অপেক্ষা অনেক কম হইবে। সাধারণ ভাষায় ইহাকে 'ঠাণ্ডা গুদাম' বলিয়া থাকে এবং ইংরাজীতে Refrigerating Chamber বলে। আজ কাল রেল ও ষ্টীমারে আশু পচনশীল দ্রব্যাদি চালান দিবার জন্য এইরূপ Refrigerating chamberএর ব্যবস্থা হইয়াছে। কার্য্যতঃ কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে নানা কারণে এইরূপ ঠাণ্ডা গুদামেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ইহাতেও সময়ে সময়ে স্বাদ গন্ধ ও বর্ণের বিকৃতি হয়, পচনশীল ফল তাহার ব্যাধি অপর ফলে সংক্রামিত করে এবং এই সংসর্গে ভাল ফলও পচিয়া যায়। সুতরাং ফল চালানের অসুবিধা বহু পরিমাণে নিরাকৃত হইলেও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

কিরূপে পরিপক্ক ফল সম্পূর্ণরূপ অবিকৃত অবস্থায় দূর দেশে চালান দিতে পারা যায় তাহা লইয়া অনেক ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞ বহু দিবস হইতে আন্দোলন করিতেছেন ফলে ইতি পূর্ব্বে বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু এখন একটি ভারতবাসী ইঞ্জিনিয়ার ও রসায়ন বিদের চেষ্টার এই সমস্যায় সমাধান হইবার সম্ভবনা হইয়াছে।

এই ভারতবাসীর নাম শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ দাস। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাধান করিয়া কিছু দিবস শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে বিলাতে গিয়া এ, এম, আই, সি, ই নামক সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা পাশ করেন। এই সময়ে বিলাতী ইঞ্জিনিয়ারগণ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় এতদূর তুষ্ট হন যে, Rochesterএর পুল নির্ম্মাণকালে তাঁহার হস্তে পর্য্যবেক্ষণের কার্য্য ন্যস্ত করেন। তাহার পরেই অন্যান্য দায়িত্ব পূর্ণ কাজে তাঁহারই উপর সমস্ত তত্বাবধারণের কার্য্য অর্পিত

হন। এইরূপে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি ডাক্তার এম, এ, কাপাডিয়ার লণ্ডনস্থ Laboratery তে যোগদান করেন। বর্ত্তমান ফল রক্ষণের নব প্রণালী এই কারখানা হইতেই আবিস্কৃত হইয়াছে এবং তথায় ডাঃ কাপাডিয়া, দাস মহাশয়ের নবাবিস্কৃত যন্ত্র ও প্রণালীর জন্য পেটেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। দাস মহাশয়ের প্রণালীতে ফল রক্ষার জন্য এক প্রকার বিশেষ ক্রিয়ায় ষ্টিম বাষ্প নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে কোন জীবাণু ক্রীয়াশীল অবস্থায় থাকিতে পারে না এবং সেইজন্য ঠাণ্ডা গুদামে ফল সমূহ এই কারণে অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়। এই বাষ্প প্রস্তুতের জন্য বিশেষ কলও নির্ম্মিত হইয়াছে।

বিদেশীয় ফল ব্যবসায়ীগণের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া অন্যতম এবং লণ্ডনের কভেণ্ট গার্ডেন ফল বিক্রয়ের জন্য পৃথিবীর অন্যতম বাজার। দাস মহাশয় অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যের ও কভেণ্ট-গার্ডেন বাজারের প্রতিনিধি সমূহের সাক্ষাতে যে সমুদয় পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সুপক্ক ফল ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় চালান দেওয়া আর অসম্ভব নহে।

বিলাতের 'Cold storage' নামক সুবিখ্যাত ব্যবসায়ীক পত্র এই আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে ২০শে জুলাই তারিখের সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম :—

The system has been recently demonostrated at Featherstone Buildings, High Holborn, London. The results of a very severe test in connection with apple storage have been made known. The Common wealth Government of Australia and the Dominion Producers' Agency stored some boxes of apples for periods of 7 and 4½ weeks respectively. These apples had ordinarily come from Australia and had probably been off the trees for 14 weeks * * not only had the sound fruits been kept in practically the identical condition in which they were before the storage but that all incipient troubles such as "black spot" and "bitter pit" had been arrested. Most remarkable however was the thorough arrestation of the severe bruises on several apples, pencil mark round these bruises before storage showing that no extension of the trouble had taken place."

অর্থাৎ লণ্ডনের হাই হলবরণ, ফেদার ষ্টোন বিল্ডিংস ঠিকানায় সম্প্রতি এই প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। আপেল সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় একটি কঠিন পরীক্ষার ফলাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার রাজ সরকার ও তথাকার ফল উৎপাদক সভা যথাক্রমে ৭ ও ৪॥০ সপ্তাহের জন্য কয়েক বাক্স আপেল গুদামে রাখেন। এই সমুদয় আপেল অষ্ট্রেলিয়া

হইতে আসিয়াছে এবং সম্ভবতঃ গাছ হইতে ১৪ সপ্তাহ আগে তোলা হইয়াছে। (গুদাম খোলার পর দেখা যায়) * * * যে শুধু গুদামে আসার পূর্ব্বে ভাল ফলগুলি যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় রহিয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু 'ব্লাক স্পট' ও 'বিটার পিট' ব্যাধি সমূহ যে স্থলে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহাও হয় নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই যে কতকগুলি ফল গুদামে আসিবার আগে স্থানে স্থানে গুরুতর আঘাতে ক্ষত হইয়া যায়। এই ক্ষতস্থান সমূহের চারিদিকে পেনসিল দ্বারা দাগ দেওয়া ছিল গুদাম খুলিবার পর দেখা যায় যে ক্ষত স্থান পেনসিলের দাগ ছাড়াইয়া আদৌ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই।"

বলা বাহুল্য যে এই পরীক্ষায় Cold Strange কোম্পানীর প্রতিনিধি, কভেণ্ট গার্ডেনের বিখ্যাত ব্যবসায়ী পাচমনস্ কোম্পানীর মিঃ কোল্টন, অষ্ট্রেলিয়ার ব্যবসায়ীগণের প্রতিনিধিরূপে ও কভেণ্ট গার্ডেনের মিঃ এল, বি, ক্লার্ক বিশেষজ্ঞরূপে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নব প্রণালীর কার্য্যকারিতা দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

এই পরীক্ষার আবার সংবাদ আসিয়াছে যে রাস্প বেরি, ষ্ট্রবেরি, বেরি প্রভৃতি অত্যন্ত নরম ও সহজ পচনশীল ফলও এই প্রকার সুচারুরূপে পরিরক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং দাস মহাশয়ের প্রথা যে অচিরে ফল ব্যবসায়ে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারত হইতে এখন ফল রপ্তানির ব্যবসা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এই ভারতবাসীর উদ্ভাবিত প্রথা ভারতীয় ফলের ব্যবসায়েরও যে পরিসর বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতের উদ্বৃত্ত উৎকৃষ্ট ফল সমূহ আর পচিয়া নষ্ট হইয়া না গিয়া যাহাতে বিদেশে নীত হইয়া উচিত মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইবে এবং কাটতি অধিক হওয়ায় ফল চাষীগণের ফলের উৎকর্ষ সাধন করিবারও আগ্রহ অনেকটা অধিক হইবে। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দেশের মঙ্গলার্থ আরও নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ায় সময় সংযোগে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুণ।

পশম শিল্প—মহীশূর গবর্ণমেণ্ট স্বরাজ্যে পশম শিল্পের উন্নতিবিধান প্রয়াসী হইয়াছেন। বাঙ্গালোরের ডিষ্ট্রীক্ট ইকনমিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অনন্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার বি,এ বি-এল ইহার তথ্যসংগ্রহের এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার ভার পাইয়াছেন। কাপাসের উন্নতিবিধান এক্ষণে যেমন আবশ্যক,—রেশম-পশমের উন্নতিও সেইরূপ আবশ্যক। এ পক্ষে এদেশের লোকের এখন যত অধিক দৃষ্টি পড়িবে ততই ভাল।

কংগ্রেসে কৃষি-সম্মিলন

বাঙ্গালার পনর আনা অধিবাসী সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কৃষিজীবী। এদেশে কোন বৎসর ভাল ফসল না জন্মিলে, কেবল যে কৃষকেরা কষ্ট পায় তাহা নহে; পরন্তু উকীলের দপ্তরে মামলার আরজি কমিয়া যায়, ব্যবসাদারের খরিদ-বিক্রয় হ্রাস হইয়া পড়ে, জমিদারের খাজনা ষোল আনা উশুল হয় না, এমন কি শ্বেতাঙ্গ সওদাগরগণের বিশ্বগ্রাসী গুদামগুলি খালি পড়িয়া থাকে। কাজেই কৃষির সাফল্যের দিকে সকলকেই সচকিত দৃষ্টি রাখিতে হয়। যাহারা প্রচণ্ড রৌদ্রে, দারুণ বর্ষায় অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমি চাষ করে, যাহাদের পরিশ্রমে বহুমূল্য ফসল উৎপাদিত হয়, তাহারা প্রায়ই চির দুঃখী। অনেক অর্থবান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে 'চাষা' বলিয়া উপেক্ষা করেন; কিন্তু তাহারাই যে দেশের মূল! মূল শিকড় নষ্ট হইলে যেমন বৃক্ষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ বাঙ্গালার কৃষকসম্প্রদায় শক্তিহীন হইয়া পড়িলে অন্যান্য শ্রেণীরও পতন অবশ্যম্ভাবী।

গত ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় মোসলেম লিগের অধিবেশনে বেঙ্গল এগ্রিকালচারিষ্টস্ কনফারেন্স' বা বঙ্গীয় কৃষক সম্মিলনের প্রথম বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠকের সভাপতি হইয়াছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস। দাস মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আগাগোড়া সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই; তাঁহার অনুপস্থিতি কালে অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন কর্ণেল ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য চালাইয়াছিলেন। মনস্বী গান্ধি ও পণ্ডিত মালব্য সভার কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। স্যার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই, পত্র দ্বারা সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন। সভার কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে জানাইয়াছিলেন যে, ঐ বৈঠকে রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা হইবে না। ফলে বহু হিন্দু ও মুসলমান ভূস্বামী সভার কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকেও সভাস্থলে দেখা গিয়াছিল।

সভারম্ভে হাইকোর্টের উকীল মিঃ ওয়াহেদ হোসেন বলিলেন,—

"পূর্ব্বে মৈমনসিংহ জেলার কৃষকেরা আলুর চাষে তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই; তাহাদের আলু ছোট হইত। তখন সরকারী কৃষিবিভাগের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। সরকারী কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারিগণ দেখাইয়া দিলেন যে, ময়মনসিংহে বড় আলু জন্মান যাইতে পারে। তদবধি তথায় বড় আলুর চাষ চলিতেছে।"

দিনাজপুরের ডাক্তার হরকালী সেন বলিলেন,—কৃষকেরা পুলীশকে ও জমিদারের আমলাদিগকে অত্যন্ত ভয় করে। কেহ যদি সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও তাহাদের ভাল

করিতে যান, তাহা হইলে তাহারা সেই সাধু ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে না—তাহারা মনে করে, এব্যক্তি নিশ্চয়ই পুলীশের কিংবা জমিদারের লোক।"

সেন মহাশয়ের এ উক্তি একেবারে ভিত্তিহীন নহে। পুলীশের পেষণ ও কোন কোন জমিদারের উৎপীড়ন, স্থানে স্থানে নিরীহ পল্লীবাসীর প্রাণে এমনই ভীতি সঞ্চার করিয়াছে যে, তাহারা আর কাহাকেও বিশ্বাস পর্য্যন্ত করিতে চায় না। অবশ্য শিক্ষার অভাব ইহার অন্যতম হেতু। কিন্তু কৃষকসম্প্রদায়ের এই দুরবস্থা অপনয়নের উপায় কি? সভাপতি দাস মহাশয় বলেন,—"কৃষক সম্প্রদায়ের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না।" বেশ কথা, কিন্তু কৃষকের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে কিসে? কে তাহাদের অন্তরে জ্ঞানের দীপ জ্বালাইবে? কেমন করিয়া তাহাদিগকে পুলীশের পীড়ন ও অত্যাচারী জমিদারের করাল কবল হইতে রক্ষা করা যাইবে, ইহাই ত সমস্যা। এ সম্বন্ধে মনস্বী গান্ধী যাহা বলিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তিনি বলেন,—

"কৃষকের বৃত্তি অতি মহৎ। আমি কৃষকসম্প্রদায়ের সঙ্গে অনেক মিলামিশা করিয়াছি। তাহাদের অভাব অভিযোগ আমি জানি। আমি নিজে শীঘ্রই কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিব এবং কৃষকসম্প্রদায়ের দুরবস্থা দূর করিতে সচেষ্ট হইব। এদেশে কৃষকের অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইবে।"

এই আশার বাণী কৃষকের হৃদয়ে অমৃত-বর্ষণ করিবে। ভুক্তভোগী না হইলে কি কেহ মরমের বেদনা বুঝিতে পারে? অদ্ভুতকর্ম্মা গান্ধী কৃষকের দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া তাহাদের হিতসাধনোদ্দেশে স্বয়ং কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, এ সংবাদ তাঁহারই মত বিশ্ব-প্রেমিকের যোগ্য। জগদম্বা তাঁহার সহায় হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় পরিগৃহীত হয়,—

(১) বাঙ্গলার প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায় ও জনবহুল সহরে কৃষি সমিতির এক একটী শাখা প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। (২) এই সম্মিলন গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র সম্ভব, এইরূপ আইন গঠন করুন যাহার বলে কৃষকের প্রজাসত্ব চিরস্থায়ী ও হস্তান্তরযোগ্য হইতে পারে। (৩) মহাজনেরা কৃষকগণের নিকট অতিমাত্রায় সুদ আদায় করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন। এ জন্য এই সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, যাহাতে সুদের হার শতকরা মাসিক বার আনার অধিক না হয় এবং যাহাতে সুদের পরিমাণ আসল ঋণকে অতিক্রম না করে এই মর্ম্মে একটী কঠোর আইন গবর্ণমেণ্ট পাশ করুন। ইহা ছাড়া খাতকেরা যাহাতে ঋণ ও সুদের টাকা জমির খাজনার ন্যায় আদালতে আমানত রাখিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) বঙ্গীয় কৃষকগণ অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদিগকে নানাবিধ অসুবিধা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হয়. এ জন্য এই সম্মিলনী প্রস্তাব করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এদেশে বাধ্যতামুলক অবৈতনিক নিম্নশিক্ষা ও কার্য্যকরী কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা

করুন। (৫) বলদ ক্রয়, বীজসংগ্রহ ও আবশ্যকীয় অভাব মোচন জন্য কৃষকেরা যাহাতে অল্প সুদে টাকা পাইতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক পল্লীতে 'কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক' ও 'কৃষি ব্যাঙ্ক' স্থাপনে অবহিত হউন। (৬) প্রত্যেক গ্রামে গো-চারণার্থ প্রচুর ভূমি গবর্ণমেণ্ট রাখুন এবং জমিদারদের ঐরূপ জমি রাখিতে বাধ্য করুন। (৭) জমিদারেরা প্রজা সাধারণের নিকট হইতে ন্যায্য খাজনা ব্যতীত বৃত্তি, বাট্টা, রোজ, নজর, পার্ব্বণী, ডাক বেতন, বিবাহের মারোচা, আঁলঘুরাণি, ধুলল ডাক বেতন, দাখিলা, হিসাবানা প্রভৃতি বাবদ আবোয়াব আদায় করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহাতে এইরূপ বাজে আদায় করিতে না পারেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট কঠোর আইন প্রবর্ত্তন করুন। (৮) ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হউক। (৯) ছোট ছোট ফৌজদারী ও দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি যাহাতে গ্রামবাসিগণ আপনা আপনি করিয়া লইতে পারে, তজ্জন্য গ্রামে গ্রামে এক একটী পঞ্চায়েত গঠিত হউক। (১০) বাঙ্গালায় প্রজাসাধারণের স্বার্থরক্ষাকল্পে যে সকল সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে গুলি কেন্দ্রীভূত হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা কৃষক-সম্প্রদায়ের উন্নতি চেষ্টা করুন। (১১) অধুনা হাটবাজার লুঠ সম্পর্কে ধৃত আসামীগণের বিচার ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে স্পেশাল আদালতে না হইয়া যেন সাধারণ আইন অনুসারে হয়, ইহাই এই সম্মিলনীর অভিপ্রায়। (১২) অধুনা বাঙ্গালায় এত লুঠ তরাজ কেন হইতেছে, ইহার কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সরকারী ও বে-সরকারী সভ্যগণের সমবায়ে এক তদন্ত কমিটী নিয়োগ করুন। (১৩) এই সম্মিলনে পরিগৃহীত প্রস্তাবগুলি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইবে।

একাদশ ও দ্বাদশ প্রস্তাব রাজনীতি সংসৃষ্ট বলিয়া অনেকে আপত্তি তুলিয়াছিলেন; কিন্তু সে আপত্তি টিকে নাই। মিঃ ওয়াহেদ হোসেন বলিলেন,—'এই দুই প্রস্তাবে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছি মাত্র; সুতরাং ইহাতে রাজনৈতিক গন্ধ নাই।' উপসংহারে উপ-সভাপতি মিঃ ইউ-এন মুখোপাধ্যায় এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন,—

"বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর পনর লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মরে। এদেশে এমন এক-জনও নাই যাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণের মধ্যে কেহ ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ করে নাই। কাহারও নিজের দোষে ম্যালেরিয়া হয় না। শুনিয়াছি সেকালে বসন্ত রোগীর শরীর হইতে বীজ লইয়া টীকা দেওয়া হইত। ফলে সুস্থ লোকের শরীরে প্রবল জ্বর ও বসন্ত দেখা দিত, আজকাল ম্যালেরিয়া বীজও ঐরূপে চালিত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া রোগীর শরীর হইতে বিষ লইয়া মশক সুস্থ লোকের শরীরে তাহা প্রবেশ করাইয়া দেয়। শুধু বাঙ্গালায় নহে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক স্থানে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছিল; কিন্তু তথা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া এখনও প্রবল রহিয়াছে। বর্ষাকালে উহার আধিক্য দেখা যায়। বর্ষাকালে পল্লী অঞ্চলে ঘাস জঙ্গল পচিয়া মশকের উৎপত্তি

হয়। গ্রামের ভিতরও চতুঃপার্শ্ব হইতে পচা জল বাহির করিয়া দিতে পারিলেই ম্যালেরিয়ার অত্যাচার কমিবে ; কিন্তু তাহা করিতে হইলে গ্রামবাসীর সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন। সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না। অগুকার সভায় আপনারা চাহিয়াছেন,—গবর্ণমেণ্ট ইহা করুন, উহা করুন ইত্যাদি ; কিন্তু আপনারা রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কি করিতেছেন? এজন্য পরস্পরের একতা, সহানুভূতি ও সমবেদনা চাই। নিজের চেষ্টার পর তাহা ব্যর্থ হইলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। মামলা ও ম্যালেরিয়া এই দুইটী অনর্থে পল্লীবাসী উৎসন্ন যাইতেছে। আশা করি আপনারা এই দুয়ের প্রতিকারে অবহিত হইবেন।'

ইহার পর সাভাপতিকে ধন্যবাদ করা হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

অনারেবল মিঃ আসরফ আলি এই কৃষি-সম্মিলনকে আগামী বারে নাটোরে আহ্বান করিয়াছেন।

পত্রাদি

ধানের জমিতে ঘাস—

হরিভূষণ বাগচি, শিবতলা ; হাওড়া।

প্রশ্ন। আমার এমন অনেকগুলি জমি আছে যাহা গ্রীষ্মে শুকাইয়া যায় এবং তাহাতে ঘাস এত অধিক জন্মে যে তাহা সহজে মরিতে চায় না। বারম্বার চষিয়া ধান রোপণ করিলেও ধানের ভিতর ঘাস জন্মে ও বারম্বার ধান নিড়াইবার আবশ্যক হয়। ইহার প্রতিকার কি? এমন কোন সার আছে যাহা দিলে ঘাস মরিয়া যায়?

উত্তর—অধিক পরিমাণে চুণ সার দিলে ঘাস মরিবে বটে কিন্তু তাহাতে ধান বা অন্য ফসলও হইবে না। গ্রীষ্মকালে বারংবার চষাই ও ঘাস বাছিয়া ফেলাই একমাত্র উপায়। জমিটি পরবর্ত্তী ধান চাষের জন্য ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। ঐ সকল জমিতে পাটের চাষ করিবেন। যত পাট হউক বা না হউক পাট গাছগুলি যাহাতে ঘণ বাহির হয় এরূপ করিবেন। তাহারই আওতায় ও চাপে ঘাষ শিকড় সমেত মরিয়া যাইবে। পাট, জমির একটি উত্তম সার। ইহা শুঁটিধারী গাছ বলিয়া হইার শিকড়ে নাইট্রোজেন সঞ্চিত হয়। আবার পাতা পচিয়া জমিটি সারবান হইয়া উঠে। পাট কাটিয়া জলে জাগ দিবার পূর্ব্বে ২।১ দিন জমিতে পাট গাছগুলি ফেলিয়া রাখিলে অনেক

পাতা ঝরিয়া পড়ে। বর্ষায় ঐ সকল জমিতে অধিক মাত্রায় জল জমিলেই অল্পমাত্রায় কিছু চুণ ছিটাইয়া একবার পচান চাষ দিতে পারিলে ঘাস মরিয়া যাইবে এবং নিড়াইবার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। ঘাস বড় হইতে দিলেও পরে ঘাস সমেত চষিয়া কাদায় জলে গোময়সারে কিঞ্চিৎ চুণ মিশাইয়া পচান চাষ দিলে ঘাস মরিয়া জমিটি সারবান হয়।

মানকচু—

শ্রীভূতনাথ সেপাই, বারুইপুর ; ২৪ পরগণা।

পত্রান্তরে পাঠ করিলাম যে মানকচু ৪।৫ বৎসর ক্ষেত্রে রাখিয়া বড় করিতে পারিলে ১০।১২ হাত লম্বা ও ২ হাত স্থুল হইয়া থাকে। আমাদের বারুইপুর অঞ্চলের কচু চাষ স্বতন্ত্র। সদ্য বৎসর ক্ষেতে তেউড় বা চারা কিম্বা পূর্ণায়তন কচুর অগ্রভাগ ডাঁটা, পাতা ও ২।৩ ইঞ্চ কচু সমেত বসাইলে সেই বৎসরেই কচুর ফসল তৈয়ারি হইয়া যায়। এই প্রকারে চাষ করিলে কচুগুলি বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ ২। ২॥০ ফুট লম্বা এবং ১॥০ ফুট বেড় বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এখানে পুরাতন কচু ক্ষেতে রাখে না। রাখিলে পর বৎসর আরও বাড়ে বটে কিন্তু পুরাতন অংশ অপেক্ষা নূতন অংশ সুসিদ্ধ হয় ও খাইতে সুস্বাদু বলিয়া এবং নূতন কচু, পুরাতন কচু অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় বলিয়া কচুর আকার বাড়াইবার জন্য এক বৎসরের অধিক ক্ষেত জোড়া করিয়া কেহ রাখিতে চেষ্টা করে না। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে যাহা ৪।৫ বৎসর ক্ষেতে রাখা চলে এমন ভিন্ন জাতীয় কোন কচু আছে কি না? আমাদের এখানে সদ্য বৎসরের একটা কচু ওজনে ১০ সের পর্য্যন্ত হয় এবং তাহার দাম ।৵০ আনার কম নহে। ছোট কচু দুই আনা হইতে চারি আনা দরে বিক্রয় হয়। ৪।৫ বৎসর ক্ষেত্রে কচু বাড়াইয়া যদি আমি॥০ কিম্বা ৸০ আনা দরও পাই তাহাতে আমার লাভ কি?

পূর্ব্ববঙ্গের অনেক কৃষক ৪।৫ বৎসর যাবত ক্ষেত্রে কচু রাখিয়া দিয়া থাকে। প্রতি বৎসর নূতন ফসল উৎপন্ন করাই ভাল এবং তাহাতেই লাভ অধিক। পুরাতন কচুর কিন্তু তরকারি রাধিয়া খাওয়া ব্যতীত অন্য একটী বিশেষ ব্যবহার আছে। ইহা লঘু পথ্য ও পিত্ত ও রক্ত দোষ নাশক। উদরাময় ও শোথ রোগে বৈদ্যগণ মাণ মণ্ড ব্যবস্থা করেন। পুরাতন মাণেই মাণ মণ্ড প্রস্তুত হয়। পুরাতন মাণকচু চূর্ণ, পুরাতন চাউল চূর্ণ ও দুগ্ধ জলে সিদ্ধ করিয়া মাণ মণ্ড প্রস্তুত হয়। ইহা পরম হিতকর পথ্য লঘু পাচ্য ও পুষ্টিকর। কিন্তু ইহার জন্য বহুসংখ্যক মাণের আবশ্যক হইতে দেখা যায় না। তরকারির জন্যই মাণের চাষ সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। আসাম প্রদেশে এক প্রকার মাণ আছে যাহাকে গিরিমাণ বলে। উহা সদ্য বৎসরে ২।২॥ হাত লম্বা হইয়া

উঠে। রাখিলে বৎসর বৎসর খুব বাড়িয়া যায়। এই কচু খাইতে কিন্তু তাদৃশ সুস্বাদু নহে। বারুই পুরের কচু সুস্বাদু এবং বৎসরে ইহার বাড় মন্দ নহে এই হেতু প্রতি বৎসর ইহার চাষই আয়কর। ইচ্ছা করিলে বাটীর আশেপাশে ১৫।২০টী কচু বসাইয়া বৎসরাধিক রাখিলে ভবিষ্যতে অনেক উপকার হয়।

উদ্ভিদ দেহে সূর্য্য শক্তির প্রভাব—সূর্য্যশক্তির প্রভাবে উদ্ভিদ্ আপনার শরীর গঠন করে। বায়ুতে ও মেঘে যেরূপ সূর্য্যশক্তি সঞ্চিত থাকে ও পরে যাহা স্রোতরূপে পুনরায় ফিরিয়া দিতে হয়, উদ্ভিদ্ শরীরেও সেইরূপ সূর্য্যশক্তি সঞ্চিত থাকে। কাঠ পোড়াইয়া যখন আমরা অগ্নি প্রজ্বলিত করি, তখন সে উত্তাপ সে আলোক সূর্য্যশক্তির পুনরায় আবির্ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে পাথুরে কয়লার বলে নানারূপ কল ও রেলগাড়ী পরিচালিত হয়, তাহাও সূর্য্যশক্তি, কারণ পাথুরে কয়লা বহুকালের উদ্ভিদ্ শরীর ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কেবল তাহা নহে। উদ্ভিদ্‌জাত নানা দ্রব্য খাইয়া আমরা জীবন ধারণ করি। সেই বস্তু আমাদের শরীরে পরিপাক পাইয়া যে অগ্নি উৎপাদন করে, সেই বলেই আমরা নানা কার্য্য সম্পাদন করি। বলিতে গেলে, আমরা সূর্য্যশক্তি আহার করিয়া জীবিত থাকি। পৃথিবীতে যাবতীয় বস্তু, শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ। শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্র গ্রহা ধ্রুবম্। শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী।

উদ্ভিদ্ শরীরে সূর্য্যশক্তি সঞ্চিত হইলে তাহাই আমরা ভক্ষণ করি। সোজাসুজি মানুষ কি সূর্য্যশক্তি ভক্ষণ করিতে পারে না? প্রতিদিন কিছুক্ষণের নিমিত্ত রৌদ্রে বসিয়া থাকিয়া মানুষ কি আপনার শরীর পোষণ করিতে পারে না? তাহা যদি করিতে পারে, তাহা হইলে আর চাষ করিতে হয় না, রন্ধন করিতে হয় না, মুখ দিয়া কোন বস্তু আহার করিতে হয় না। কিছুক্ষণের নিমিত্ত রৌদ্রে বসিয়া থাকিলেই সোজা-সুজি সূর্য্যবলে শরীর সবল হয়। এরূপ আবিষ্কার একদিন হইলেও হইতে পারে। নাইট্রোজেন তাহার দৃষ্টান্ত। আমাদের বায়ুর অধিক ভাগ নাইট্রোজেন নামক এক প্রকার বাষ্পীয় পদার্থ। জীবশরীরেও ইহা অনেক আছে। নানারূপ বিপ্লব উৎপাদক বস্তু ইহা দিয়া প্রস্তুত হয়। নাইট্রোজেন ভূমির উত্তম সার। বায়ুতে ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে, কিন্তু লোকে সোজা-সুজি ইহা বায়ু হইতে লইতে পারিত না। নিষেদল, সোরা প্রভৃতি বস্তুতে ইহা আছে। লোকে তাহা হইতে নাইট্রোজেন বাহির করিত। বায়ু হইতে ইহা লইবার উপায় এক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইরূপ সূর্য্য কিরণ দ্বারা শরীর পোষণের উপায়ও একদিন আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, সশা, ঝিঙ্গা, প্রভৃতি যে সকল দেশী সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় সমস্তই আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র—ছোলা, মটর, যব, শরিসা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র সকল চষিয়া ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে। আদা, হলুদ এই সময় জমি হইতে উঠান হয়। হলুদ ও আদার মুখীগুলি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বসাইবার জন্য বাছাই করিয়া রাখিয়া, বাকী ঘর খরচ অথবা বিক্রয় হয়।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই। গোলাপ জামের গাছে যাহাতে ফলের চাকি বাঁধিয়াছে সেই গুলি চট দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। চট মুড়িয়া না দিলে গোলাপ জামের ফল উৎকৃষ্ট হয় না।

ফুলের বাগান—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলগাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিলে জল্‌দি ফুল ফুটিবে না। জল্‌দি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এই সময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মুলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতার এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে, এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুণ দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

১৮শ খণ্ড। ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৪ সাল। ১১।১২ সংখ্যা

আম্র—আম—Mango.

উদ্যানতত্ত্ববিদ্—শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমের পোকা ও তাহার প্রতিকার—আমের একটি নাম রসাল। এরূপ রসাল ফলে পোকা এবং অন্য জীব জন্তুর উপদ্রব হইবে তাহা আর বিচিত্র নহে। জগতের ভোগ্য বস্তুতে সকলের যে সমান অধিকার কিন্তু সমভাবে বণ্টন করে কে এবং তাহাতে কেই তুষ্ট :—যাহার ছল, বল, কৌশল অধিক তাহারই ভাগ্যে বাড়ার ভাগ মিলে। আম গাছে পাকিলে পাখি, কাঠবিড়াল ও বাদুড়ে খাইয়া থাকে, পাকিয়া তলায় পড়িলে শৃগাল, কুকুর, শুকর, পিপীলিকা, উই প্রভৃতি কাহারও হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। মানুষ সকলকে বঞ্চিত করিয়া নিজে ভোগ করিতে চায়—কখন পারে, কখন পারে না—যে পারে সেই খুব দক্ষ, সেই খুব কৌশলী। গাছ জাল দিয়া ঘিরিলে বা পাকিবার উপক্রম হইলেই সমুদয় আম ভাঙ্গিয়া লইলে এবং আম তলায় পড়িতে না দিলে এই সকল বড় শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বাগানের কোন একটি গাছে ঠকঠকি কল বাঁধিয়া মাঝে মাঝে বাজাইলে পাখি বাদুড় প্রভৃতি তাড়ান যায়। কিন্তু মানুষেও মানুষের শত্রু হয়। চোর রাত জাগে অবসর খোঁজে চুরি করিবার জন্য, উদ্যান রক্ষককে রাত জাগিতে হয়, সতর্ক থাকিতে হয়, চোরকে বাধা দিবার জন্য। বড় বড় আম বাগানে দুই দিকে দুইটি টং বাঁধিয়া সর্ব্বদাই লোক পাহারায় নিযুক্ত থাকে। মানুষ কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রুর আক্রমণে বড়ই

ব্যাকুল হইয়া পড়ে। খাইবার জন্য আম কাটিয়া দেখ যে তাহার ভিতর মুড়ীর মত পোকা নড়িতেছে, কোনটাতে বা সুতার মত সুতুলী পোকা চলিয়া বেড়াইতেছে। এই গুলি আমের মাছি পোকা। মাছি আসিয়া ফলে বসিতে পারিলেই ডিম পাড়ে এবং তাহা হইতে পোকা জন্মে। আম বাগানে ফলের সময় ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ইহার কতকটা প্রতিকার হয়। আমের আর একটি শত্রু ভোঁ-পোকা। আম কাটিলে ঐ ভোঁ শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়—এই জন্য ভোঁ-পোকা নাম হইয়াছে। পক্ষধারী ভোঁ-পোকা উড়িয়া আসিয়া কচি আমের উপর ডিম পাড়ে, ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হয়। সে গুলি অতিশয় ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া আমের ভিতরে প্রবেশ করে। আম ক্রমশঃ বাড়িলে ছিদ্র বুজিয়া যায়। কীড়া ভিতরে আমের শাঁস খায় এবং আঁটির শাঁস পর্য্যন্ত খাইতে চেষ্টা করে। কীড়া হইতে পক্ষ যুক্ত পতঙ্গ হইয়া বাহির হইয়া গাছের গুড়ির ও ডালের ফাটালে, ও গোড়ায় আশ্রয় লয়। গাছে কেরোসিনের পিচকারী দিলে এবং গোড়ায় মাটি কোপাইয়া নাড়া চাড়া করিলে এই পোকার উপদ্রব কমিতে পারে। কেবল ফলে শত্রু কেন গাছের ডাল পাতায় শত্রুও আছে। আম মাছি একটি পরম শত্রু। আম গাছের তলায় গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় এই পোকা আসিয়া মুখে চোখে পড়িতেছে। ইহা এক প্রকার খুব ছোট মাছি বিশেষ ইহারা গান্ধি জাতের পোকা। ইহারা কচি কচি ডালের ও মুকুলের ডাঁটা চুষিয়া খায়। গাছের গোড়ায় ধোঁয়া দিলে প্রতিকার সম্ভাবনা। গাছের ডালে পাতায় এক প্রকার ছত্রক রোগ হইতে দেখা যায়। গাছের গুড়িতে ও ডালে কখন বা সুড়ঙ্গকারী পোকা গাছ কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। এই সকল পোকা ক্ষতস্থান চিরিয়া বাহির করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ফিনাইল জলে গুলিয়া মাঝে মাঝে গাছ গুলি ধৌত করিয়া দিতে পারিলে পোকার উপদ্রব অনেক পরিমাণ প্রশমিত হয়। কিন্তু তাহা খুব ব্যয়সাধ্য। হাত পিচকারী দ্বারা বড় গাছে জল ছিটাইবার সম্পূর্ণ সুবিধা হয় না; এই কার্য্যের জন্য এমেরিকাবাসীগণ এক প্রকার ছোটে দমকল ব্যবহার করেন।

গাছে বা ফলে পোকা লাগিলে প্রতিকার করা অপেক্ষা পোকা যাহাতে না লাগিতে পায় তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নিম্ন বঙ্গের সেঁতান মাটিতে এবং নিতান্ত জলো আবহাওয়ায় পোকার আক্রমণ অধিকতর অনুভূত হয়। বাগানে যাহাতে গাছগুলি শ্রেণীবদ্ধ বসান হয়, যাহাতে রোদ বাতাস অবাধে প্রবেশ করিতে পায়, গাছের তলায় কোন ঝুপী জঙ্গল জন্মিতে না পায় এরূপ সাবধানতায় বিশেষ প্রয়োজন। বাগানের জল নিষ্কাষের সুব্যবস্থা ও বাগানটি বৎসরে দুই এক বার কোপাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। গাছগুলির পাইট কারকিত, সার প্রয়োগ ব্যবস্থামত করিতে পারিলে এবং তাহাদের বাড় বৃদ্ধি ভাল রকম হইলে তাহারা সহজে পোকা বা রোগে আক্রান্ত হয় না। কেবল নিজে আত্মরক্ষা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে চলে না পার্শ্ববর্ত্তী

উদ্যান পালককেও আপন মতানুবর্ত্তী করিতে হইবে! এই প্রকার সমবেত চেষ্টা ও সকল কার্য্যে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন ও সময় মত আবশ্যক মত সকল কার্য্য করাই উদ্যান রক্ষার সু-কৌশল।

পশ্চিমাঞ্চলে শুষ্ক জায়গায় আম বাগানে ঝুপী জঙ্গল হয় না বা আমে সহজে কোন পোকা লাগে না। তথায় কিন্তু আমের গাছের একটি দারুণ উপদ্রব আছে সেটি উই। উইয়ের হাত হইতে এখানে গাছ রক্ষা করা সুকঠিন। ডাঃ ওয়াটের পুস্তকে আমরা উই হইতে প্রতিকারের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেখিতে পাই—

রজন	...	...	১ ভাগ।
হিঙ	...	...	২ „
গুগুল	...	...	২ „
রেঢ়ী তৈল	...	...	২ „

এই কয়টী পদার্থ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কয়েক দিবস অল্প জলে পচান হইয়া থাকে। অতঃপর উহাতে আবশ্যক মত জল মিশাইয়া লোসন উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। মাটি হইতে ২ ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত গুঁড়ির চারিদিকে লাগাইয়া দিলে সেই গাছে আর উই ধরিতে পারে না। প্রলেপ লাগাইবার পূর্ব্বে গাছের গুঁড়িটি ব্রুস দ্বারা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লও ও প্রলেপ যাহাতে গাছের ফাটার ভিতর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে দেখা আবশ্যক। এই প্রলেপের সহিত একটু গিরি মাটি মিশাইয়া রঙ করিয়া লইলে একটু সুবিধা হয় এই যে কোন গাছে প্রলেপ লাগান হইল তাহা সহজেই চেনা যায়।

"ফসলের পোকা" নামক পুস্তকে পোকার উপদ্রব ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। উদ্যান পালকের নিকট এরূপ একখানি পুস্তক থাকা প্রয়োজন। আর তাহার প্রয়োজন—

উদ্যানের কার্য্য পরিচালনার্থ নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি

১। ছোট বড় কোদাল—হাত কোদাল, দাঁড়া কোদাল।

২। লম্বা হাতলওয়ালা হাক কোদালী।

৩। ছোট ফর্ক, লম্বা হাতলওয়ালা ফর্ক।

৪। ডালছাঁটা ছুরী, কাঁচি, সিয়ার, লম্বা হাতলওয়ালা সিয়ার (লম্বা ফলা কাঁচি), করাত।

৫। কলম বাঁধা ছোট বড় ছুরি।

৬। জল সেচন ও গাছ ধৌত করণ জন্য সিউনি, পম্প, ঝারকল, পিচকারী ন্যাপসাক স্প্রেয়ার।

৭। জাল, জাল আঁকুষী, ।

৮। সারাদি বহনের সুবিধার জন্য এক চাকাওয়ালা ঠেলা গাড়ী (Wheel Barrow), ঝুড়ি ।

৯। নিড়ান, কাস্তে, কুড়ুল, খোন্তা এতদ্ব্যতীত—

১০। গামলা, ফিতে, দড়ি, মাপকাটি, চালনা, প্রভৃতি ৬৪ রকমের দ্রব্যাদির নিয়তই আবশ্যক ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে আম্রের গুণাগুণ

বালা আম্র ফল গুণ—বায়ুপিত্ত কারিত্ব ও কষায় গুণযুক্ত অম্লরস, সুগন্ধী, কফাময়নাশী, পিত্ত প্রকোপ বায়ু রক্ত দোষ পটুত্তাদি রুচিপ্রদত্বক—রাজনির্ঘণ্ট ।

পক্ক আম্র গুণ—শুক্র বলকারিত্ব, পিত্তাবিরোধিত্ব, বায়ু নাশিত্ব, হৃদ্যত্ব, গুরুত্ব, অনুলোমনত্ব ইতি রাজ বল্লভঃ । আরও ত্রিদোশসমতা কারিত্ব স্বাদুত্ব, পুষ্টিজনকত্ব, অধিক ধাতু প্রচয় কারিত্ব, তৃপ্তিকান্তিকারিত্ব, তৃষ্ণাশ্রমশমনত্ব ইতি রাজনির্ঘণ্ট ইতি ।

মধুযুক্ত আম্র গুণ—ক্ষয় রোগ প্লীহা বাত শ্লেষ্ম রোগ নাশিত্ব ।

ঘৃতযুক্ত আম্র গুণ—বাত পিত্ত নাশিত্ব অগ্নি বল বর্ণ কারিত্ব ।

দুগ্ধযুক্ত আম্র গুণ—শীতলত্ব, স্বাদুত্ব, গুরুত্ব, স্নিগ্ধত্ব, ভেদত্ব ।

আম্রফলের কষির গুণ—তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিমেহাতিসার নাশিত্ব ।

আম্রফল ত্বগ গুণ—কষায়ত্ব ।

আম্র বৃক্ষ মুল গুণ—সুগন্ধী, কষায়, রুচিকারিত্ব, সংগ্রাহিত্ব, শীতলত্ব ।

অম্র মুকুল গুণ—রুচিকারিত্ব, অগ্নিদীপক ।

আম্রপেশী গুণ—কষায়, অম্লত্ব, ভেদকত্ব, কফ, বাত নাশিত্ব । আম্রপেশী—আমষী ।

কৃত্রিম পকাম্র গুণ—অম্লরসহানের্মধুরত্ব, পিত্ব নাশিত্ব ।

চুষিতাম্র গুণ—পরম রুচি বলবীর্য্য কারিত্ব, লঘুত্ব, শীতল, শীঘ্রপাকিত্ব, বাত পিত্তহার সারকত্ব ।

গলিতাম্র গুণ—বলকারিত্ব, গুরুত্ব, বাতহরত্ব, সারকত্ব, হৃদ্যত্ব, তৃপ্তিজনকত্ব, অতিশয় বৃংহণত্ব, হৃদ্যত্ব, কফ বর্দ্ধকত্ব ।

আম্রখণ্ড গুণ (আমসত্ব গুণ)—গুরুত্ব, রোচকত্ব, গুরুপাকত্ব, মধুরত্ব, বৃংহণত্ব, বলকারিত্ব, শীতলত্ব, বাত নাশিত্ব ।

অতিশয় আম্র ভক্ষণ গুণ—মন্দাগ্নি বিষম জ্বর রক্তাময়বর্দ্ধগুদোদয়নাময়কারিত্ব । অম্লাম্র ভক্ষণে রক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে মধুরাম্র ভক্ষণে এতাদৃশ দোষ ঘটে না । মধুরাম্র ভক্ষণে বরং নেত্রহিতত্ব গুণ দর্শে ।

অতিশয় আম্র ভক্ষণে দোষ প্রতিকার—শুঁঠের জল পান অথবা ক্ষীর সংযোগে আম্র রস পান।

আম্র পল্লবের গুণ—রুচিকারিতা, কফ পিত্ত নাশিত্ব। রাজ নির্ঘণ্টে আছে—

আম্রমামং জলং স্বিন্নং মর্দ্দিতং দৃঢ় পাণিনা
সীতাশীতাম্বু সংযুক্তং কর্পূর মরিচান্বিতম
প্রপানকমিদং শ্রেষ্ঠং ভীমসেনেন নির্ম্মিতং
সদ্যোরুচিকরং বল্যং শীঘ্রমিন্দ্রিয় তর্পণম্।

সাধারণ খাদ্য হিসাবে আম্রের স্থান—আমের মত এমন সুখাদ্য ফল খুব কমই দেখা যায়। ইহা সকল ফলের শ্রেষ্ঠ ফল—ফলের রাজা। ভারতের সর্ব্বত্র ইহা সুলভ ও সহজ প্রাপ্য। খাদ্য হিসাবে ইহা সাতিশয় মূল্যবান। আমের মরসুমে ইহা ইতর ভদ্র, ধনী, দরিদ্র সকলেরই আহার্য্যে প্রধান অংশ হইয়া দাঁড়ায়। গরীব লোকে অনেক সময়ে এক বেলা আম খাইয়া কাটাইতে পারে। ইহা পুষ্টিকারিতা গুণে সকল ফলের অগ্রগণ্য। ইহা সারক এবং মৃদুরোচক। আঁশ সমেত খাইলে কখন কখন পেটের পীড়া উৎপাদন করে কিন্তু আঁশ বাদ দিলে অসুখের কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার আঁঠি খোসা ছোবড়া (তন্তু) গবাদির প্রিয় খাদ্য। অম্লমধুর পাকা আম কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগে গবাদিকে খাওয়াইতে পারিলে গরুর স্বাস্থ্যোন্নতি হয় ও গাভীর দুধ বাড়ে। সুখাদ্য বলিয়া অসময়ে আম্র রক্ষার নানা প্রকার ব্যবস্থা করা হয়। আমের বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে এবং এক্ষণে নিম্নে উহার তালিকা দেওয়া গেল—

১। কাঁচা আমের আঁটি খোসা ছাড়াইয়া বা খোসা সমেত ঝোল, অম্ল রন্ধন করা হয়।

২। কাঁচা আম আঁটি ফেলিয়া খোসা সমেত ফালা ফালা কাটিয়া লবণ সংযোগে নুন আম, আমসী, বা তৈল মশালা সংযোগে আমচুর প্রস্তুত হয়।

৩। কাঁচা আমের ফালা কাটিয়া চিনির রসে পাক করিয়া মশালা সংযোগে জেলী বা চাট্‌নী প্রস্তুত হয়।

৪। কাঁচা আম ফালা কাটিয়া অল্প শুকাইয়া লইয়া গরম গুড়ে ফেলিয়া মশালা সংযোগে অনবরত কয়েক দিন সূর্য্য পক করিলে গুড় আম প্রস্তুত হয়।

৫। পাকা আম খোসা ছাড়াইয়া আঁটি ফেলিয়া পেঁপের মত ফালা করিয়া খাওয়া যায়।

৬। পাকা আম আঁশ ও রস বহুল হইলে নিঙড়াইয়া আঁটি, খোসা, আঁশ বাদ দিয়া কিঞ্চিৎ শর্করা সংযোগে ব্যবহার করা হয়।

৭। পাকা আম যদি রস বহুল হয় তাহার রস ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে দুধ চিনি মিশাইলে অতিশয় সুপেয় হয়।

৮। পাকা আম টক রস হইলে তাহা আটি খোসা সমেত সিদ্ধ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ ও চিনি সংযোগ করিলে সুখাদ্য হয় এবং তাহা ভাতের ব্যঞ্জনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৯। পাকা আমের রস ছাকিয়া লইয়া তাহা চিনি ও মশালা সংযোগে পাক করিলে উত্তম জেলী প্রস্তুত হয়।

১০। পাকা আমের রস ছাঁকিয়া কাঠের বা কাপড়ের আধারের উপর জমাইয়া সূর্য্যতাপে শুকাইয়া লইলে আম সত্ব প্রস্তুত হয়।

১১। আমের আটি খোসায় উত্তম ক্ষার প্রস্তুত হয়। আটির শাসে আটা ময়দা প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা অসময়ের খাদ্য রূপে ব্যবহার হইতে পারে এবং ইহা নিতান্ত অপুষ্টিকর খাদ্য নহে।

গোরক্ষা ও আমাদের কৃষি

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার লিখিত।

(৩)

এই সম্বন্ধে বিগত দুই খানি পত্রে অনেক কথা বলিয়াছি। এখন আমাদের তীব্র জীবন সংগ্রামের দিন আসিয়াছে। ইউরোপের মহাসমর আমাদের নানারূপ ঘোরতর অর্থ নৈতিক সমস্যায় নীত করিয়াছে, আমরা আমাদের কৃষি ও গৃহশিল্পাদি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়াদির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া সামান্য পাশ্চাত্য শিক্ষার আবর্ত্তনে পড়িয়া বিলাসিতার উচ্চশিখরে উঠিলে যে দুর্দ্দশা হয়, তাহা আমাদের হইয়াছে, এখন কৃষি বিনা আমাদের জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই। তাহার প্রবর্ত্তন ও প্রসার জন্য আমাদের দেশের বিশাল মাহিষ্য জাতির পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট তথা মাননীয় মিঃ মণ্টেগু ভারতসচিবের সদনে আবেদন পত্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের নিকট বঙ্গের কৃষকদের ভাবিহিতার্থে ঐরূপ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও কৃষি-শিক্ষা এদেশে প্রবর্ত্তন জন্য দরখাস্ত প্রেরিত হইয়াছে, বঙ্গের

কৃষক সম্মিলনীর পক্ষ হতে এই লেখক ঐ মর্ম্মের প্রস্তাব সমূহ ভারতসচিব সদনে পাঠাইয়াছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে প্রবর্ত্তন জন্য দেশের লোক চিন্তা করিতেছেন; ঐ জন্য উপরোক্ত সম্প্রদায় ও সম্মিলনী সকল এক এক করিয়া রাজ সদনে এই জটিল অর্থ নৈতিক প্রশ্ন সকল উত্থাপিত করিয়া আশু তৎ মিমাংসার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। যুদ্ধের অবস্থা দিনদিন ঘোরতর হইয়া আসিতেছে, কবে যে মিটিবে তাহা বলা যায় না। এখন আর আমাদের বসিয়া থাকিবার সময় নাই। দেশের শিক্ষিত লোক সমূহ স্বায়ত্বশাসনরূপ মৃগমরিচিকাবৎ আশা লইয়া বসিয়া দেশে তুমুল মিথ্যা আন্দোলন করিতেছেন। কি খাইয়া যে স্বায়ত্ত্ব-শাসন করিবেন তাহা একবার ভাবেন না। সেই জন্য বিগত বড় দিনের সময় অখিল ভারতীয় গো কন্ ফারেন্সের অধিবেশনে সম্পাদক মাননীয় সারজন উডরোফ্ মহোদয়ের নিকট আমারা অনেক নূতন কথা শুনিব ও প্রকৃত কাজ দেখিব মনে করিয়া ছিলাম কিন্তু আমাদের সে আশা তৃপ্তিলাভ করে নাই। মাননীয় সারজন অনেক নূতন কথা বলিয়া সুসুপ্ত অঙ্গ ভারতবাসীকে গোরক্ষণে, গোপালনে উদ্বোধিত করিলেও কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভিভূত ভারতবাসীর এখনও যে সাড়া হয় না। কৃষির উন্নতির জন্য আমাদের গোরক্ষা করা সর্ব্বতো প্রয়োজন কিন্তু কতকগুলি কাজ যাহা আমাদের আগে করা চাই, তাহা করে কে এবং তাহার সহায় কই বা কে দাঁড়ায়? এই সকলের সাফল্যের জন্য শাসকগণের সহানুভূতি চাহি তাহার জন্য মাথা কে ঘামায়? মাননীয় উড্‌রোফ বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণে কৃষি-শিক্ষা বিস্তার, চারণ রক্ষা ও উদ্ধার, গোপালন শিক্ষাদির বিষয় বলিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা কর্য্যে পরিণত হয় কৈ? ১০ নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট স্থিত গোকন্‌ফারেন্স বা ৫৬ নং মির্জ্জাপুর স্থিত বঙ্গীয় কৃষক সমিতিতে দেশের কেই বা যোগ দেয়, কেই বা অর্থ দেয় এবং গোরক্ষণে কেই বা মনোযোগ দেয়। কাগজে কলমে ও রঙ্গমঞ্চে গলাবাজি আমরা করিতে খুব পারি। কার্য্যকারী লোকের দেশে খুবই অভাব। গোকন্‌ফারেন্সের মাননীয় উড্‌রোফ সাহেব কর্ণধার বটে, কিন্তু তাঁহার আফিসে আত্মীয় পোষণ ও লোভী স্বার্থপর লোকের সমাবেশ ক্রমশঃ হইলে গো কন্‌ফারেন্সের পরিণাম কি হইবে। এ বিষয়ে কেহই যত্ন বা আগ্রহ লয় না!!! তাঁহার অনিষ্ট সম্বন্ধে ও আমরা বহু অভিযোগ শুনিতে পাই। আশা করি তিনি এগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাড়িত করিতে ক্রটী করিবেন না। বঙ্গীয় কৃষক সমিতিও লেঃ কঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কর্ত্তৃত্বে ৫৬নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে বঙ্গের কৃষকদের স্বত্ব সংরক্ষণ জমিদার পুলীশ ও উত্তমর্ণের অত্যাচার হইতে রক্ষা ও অব্যাহতি প্রদান জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহারও অস্থায়ী সেক্রেটারী এই লেখক নিযুক্ত হইয়াছেন। সডাক পত্রাদি তাঁহার নিকট পাঠাইলে সকল বিষয়ের উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমরা আশা করি যে

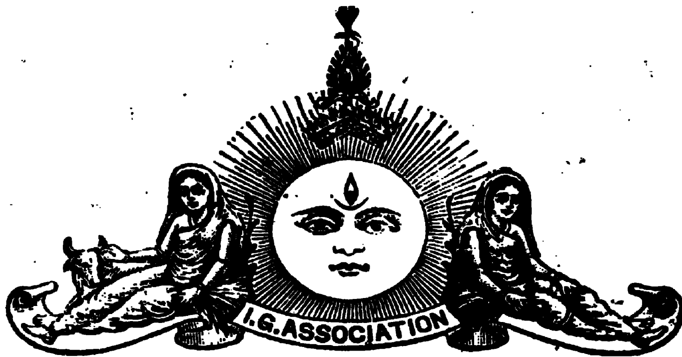
বঙ্গের কৃষক মাত্রই ১৲ বাৎসরিক চাঁদা দিয়া এই সমিতির সভ্যশ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইবেন। দেশের চারণ রক্ষণ, গোরক্ষা গো জাতির উন্নতি সাধন ও কৃষক কুলের অভাব অভিযোগ মোচন ও দপ্তরে প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করণ এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য !! কৃষির প্রধান সহায় আমাদের দেশে "গো-বল।" সেই গো-বলের নানা অভাবনীয় কারণে অবাধ ধ্বংস হওয়ায় দেশের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় সুলভ সামগ্রীর অভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; হল বৃষের মূল্য বিগত ৪০।৫০ বৎসরে ১০।১২ গুণ বাড়িয়াছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধ দেশে একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের বড় বড় নগরে দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন বিশুদ্ধ ও সুলভ দুগ্ধ নগরে সরবরাহ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, যশোর জিলার মধ্যে একটি আদর্শ গো শালাও স্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টিত আছেন। সে সম্বন্ধে কতকটা বিবরণ বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারির ডেলি নিউস পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বিগত ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় মিঃ মোরিনো এবং মিঃ বার্জ্জেস ঐ বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশিত করেন। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই মাত্র যে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত দেশে গো শালা না স্থাপিত করিয়া হাবড়ার হুগলীর মধ্যে কোন সুবিধা জনক স্থানে ইহা স্থাপিত করিলে মন্দ হয় না।

পাশ্চাত্য জগতের ডাঃ ব্যাঙ্গ হেরিং, পালগুপুলী ও অষ্ট রট্যাগাদির মতে গো-জাতি ম্যালিরিয়ার বিষ হইতে অব্যাহত নহে। সেই জন্য ই, আই, আর লাইনে এইরূপ কোন স্থানে গোশালা নির্ব্বাচিত করিয়া অথবা চুঁচড়া মিউনিসিপ্যালিটির কাছ হইতে লব্ধ ভূমি হইতে ৫০০ বিঘা জমি লইয়া এই আদর্শ গোশালার দুগ্ধ সরবরাহ শালা ও গয়া বা পালামুর আসল পার্ব্বত্য ঘাস বাহুল দেশে গো-উৎপাদনশালা ও গোবীমা কোম্পানীর গোরক্ষণশালা স্থাপিত করিলে বেশ লাভজনক হইবে বলিয়া আমার মনে হয়; কিন্তু ইহার জন্য সুলভ গোনয়ন শুল্ক বিধি আশু দেশে রাজার সাহায্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া চাহি। মাননীয় সার জন উড্‌রোফ্ তাঁহার অভিভাষণে যে সব কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে ১৯১৪ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্তের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, এম্পায়ার, ষ্টেটস্‌ম্যান্, এক্‌সপ্রেস্ আদি প্রত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের লোকেরা সেই সকল পাঠ করেন না। দুগ্ধের ও হল বৃষের লাঙ্গল সুলভে এ দেশে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে গো-কুল রক্ষা করিতে হইবে। ইহার সার্থকতা মিঃ পেইন সাহেব তাঁহার আদর্শ গোশালার মন্তব্যে যাহা প্রকটিত করিয়াছেন তাহা বিগত ১৯১২।১৮ সালের ডেলি নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে বাহু কর্ত্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাহা চেয়ারম্যান সাহেবের জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। এ দেশে গোশালা করিতে হইলে দেশী লোকেরই পরামর্শে ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া আমরা মিঃ পেইন সাহেবকে করিতে বলি !!! গোদুগ্ধ, ঘৃত দধি দেশে সস্তা করিতে

হইলে গোকুলের সংরক্ষণ বিধির ধারা করা চাই, দণ্ড বিধি আইনের ২৯৫ ধারার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ঐ ধারায় "বস্তু" শব্দটির পূর্ব্বে "মৃত বা জীবিত" শব্দ তিনটি সংযোগ করিলে আমাদের দেশের তিন ভাগ হিন্দু মুসলমান জনিত অশান্তি চিরতরে দুরীভূত হয়। তাহার পর দেশে অবাধ ধর্ম্মবৃষের বিচরণ প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে গোপ্রচার সকল অর্থগৃধ্ন জমিদার ও প্রজাদের কবল হইতে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। তজ্জন্য নব বিধি প্রবর্ত্তনের আবশ্যক। সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় জমীদার সভার নিকট মতামত চাহিয়া পাঠান, কিন্তু জমীদার সভা তাঁহাদের স্বার্থে হানি হয় বলিয়া এক বক্র ও কুটিল উত্তর প্রদান করেন তাহা বিগত ১৯১৫ সালের ৭ই জানুয়ারি তারিখে অমৃত বাজার পত্রিকায় মাননীয় মহারাজা সার হৃষিকেশ লাহা মহাশয়ের পত্রে প্রকাশিত হয়। বঙ্গের মধ্যে গোপ্রচার আত্মসাৎকারী ভূম্যাধীকারীগণের রাণাঘাটের জমিদারগণের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

আর চারণ রক্ষকদের মধ্যে তেলিনী পাড়া ও উত্তর পাড়ার জমিদার বাবুদের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন!! গো প্রচার ভাঙ্গিয়া যে জমীদারগণ আয় করেন তাঁহারা শাস্ত্রমতে নৃশংসপদ বাচ্য !!! ১৯১৫ সালে বিলাতে গোবলের হ্রাস হওয়ায় পার্লিয়ামেণ্ট হইতে বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া অষ্টম হেনরীর বিধিটি নব ভাবে প্রবর্ত্তিত করিয়া এক বৎসর বয়স্ক বৎসের হননত বৎসরের জন্য বারিত করা হয়; সম্প্রতি মিশর দেশে গো বলের অবাধ হত্যার কারণ হ্রাস হওয়ার দুই বৎসরের জন্য তথায় গো হত্যা রহিতের সংবাদ এদেশে বিগত ২রা মার্চ্চের বেঙ্গলি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যদি গো ভক্ষক মিশর দেশের কৃষির রক্ষা ও দুগ্ধের সরবরাহের জন্য এরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা হইলে হিন্দু প্রধান ভারতে সহৃদয় ইংরাজ রাজ এরূপ বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন না কি?

গোবিমা কি, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বিগত ১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যা আলোচনা পত্রিকায়, গো হত্যা সম্বন্ধে মুশলমান সম্প্রদায়ের অনুশাসন ও ধর্ম্ম ঐ পত্রিকায় ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, গো প্রচার সম্বন্ধে ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যায় আমুল আলোচনা করিয়াছি, তাহা বঙ্গবাসী মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য; আর এ সম্বন্ধে অমৃত বাজার পত্রিকা ও এক্স্প্রেস পত্রিকায় বহুবার আলোচনা করিয়াছি তাহাও যত্নে পাঠ করা কর্ত্তব্য। ভারত সম্রাট আকবরের সময়েও গোহত্যা ভারতে করিতেছিল। আজ সমুদয় ইংরাজরাজ পঞ্চম জর্জ্জের শাসনাধীনে বাস করিয়া অর্থ নৈতিক হিসাবে ভারতে প্রজার ভাবি হিতকল্পে প্রজার আবেদন অবধি গোহত্যা নিয়ন্ত্রিত ও বারিত হয় না, ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য ভারতীয় প্রজার আর অপর কি হইতে পারে?



ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৪ সাল।

সরকারী কৃষি

১৯১৬-১৭ সালে ভারতে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে যে বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে সর্ব্বাপেক্ষা ভারতীয় কৃষি বিভাগের কার্য্যাদি অনেক প্রকার লাভ করিয়াছে। কৃষির প্রধান অঙ্গ বীজ। ভাল বীজের অভাব এতদিনে কৃষির উন্নতির একটি প্রধান অন্তরায় ছিল। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে এ বিষয়ে রাজ সরকারের মনযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বিশুদ্ধ জাতি নির্ব্বাচন ও সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা অনেক ফসলের উত্তমবীজ উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে ও এই প্রকারে উৎপাদিত বীজ হইতেই অনেক স্থানে অধিক মাত্রায় ফসল পাওয়া যাইতেছে। সরকারী তত্ত্বাবধারণে যে সমুদয় কৃষি কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা সমালোচনা করিতে গেলে কয়েকটি প্রধান প্রধান ফসলের অবস্থার বিষয় উল্লেখ রাখিলেই পাঠক বর্গেরা কৃষির সাধারণ অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

গোধুম। চাষের জমি ১৯১৫-১৬ সালে ৩০৩ লক্ষ একর হইতে ১৯১৬-১৭ ফসলের ৩২৯ লক্ষ একর দাঁড়াইয়াছে। উৎপাদিত ফসলও ৮৬ লক্ষ টন হইতে ১০১ লক্ষ টন হইয়াছে। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং তৎপরে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও মধ্য প্রদেশে গোধুমের চাষ হইয়া থাকে। গোধুম রপ্তানির অন্যতম দ্রব্য। গত বৎসর ৭ লক্ষ মণেরও অধিক গোধুম রপ্তানি হইয়াছিল। পুষা নং ১২ নামক উন্নত জাতির আদর ক্রমে বাড়িতেছে। ইহা জলদী জাতীয় এবং সাধারণ গোধুম অপেক্ষা ইহাতে সিকি ভাগ অধিক ফসল হয়। এতদ্ভিন্ন এই জাতীয় গোধুম মণ করা ৵০ আনা অধিক দামে বিক্রয় হয়। ভারতের অন্যত্র নিম্নলিখিত

কয়েকটি উন্নত জাতির চাষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :—পুষা নং ৪ বুন্দেল খণ্ড ও মধ্যভারত ; পাঞ্জাব ১১—পঞ্জাবের বর্ত্তমান উপনিবেশ সমূহে ; 'কানপুর নং ১৩ যুক্ত প্রদেশের নানা স্থানে ; মধ্যপ্রদেশেও কয়েকটি নূতন জাতির প্রবর্ত্তন হইতেছে। বিহার ও অযোধ্যায় স্থানে স্থানে রোপণের অল্প কাল পরেই যে গোধুম চারা সমূহ মরিয়া যায় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে বর্ষার নূতন ও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বারি জমিতে সঞ্চিত হইয়া থাকার জন্যই এই রূপ হইয়া থাকে। রোপণের সময় পিছাইয়া অক্টোবর মাসে আসিলে ও রোপণের তিন চারি দিন পূর্ব্বে ক্ষেত্রে দাঁড়াগুলি আলগা করিয়া দিলে চারা মরিয়া যাইবার অল্পই সম্ভাবনা থাকে। এই উপায়ে চারাগুলি রক্ষা হইলে বহুসংখ্যক চাষীর যে প্রভূত উপকার হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ধান্য :—ধান্যই ভারতের প্রধান ফসল। সমস্ত কর্ষিত জমির মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগে ধান্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। ধান্যের জমি ১৯১৫-১৬ সালে ৭৮১ লক্ষ প্রকার ছিল, ১৯১৬-১৯১৭ সালে ৭৯৭ লক্ষ একর হইয়াছে। উৎপাদনও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৩২৮ লক্ষ টন হইতে ৩৪০ লক্ষ টন হইয়াছে। ইহা যে শুধু জমির পরিমাণাধিক্যের জন্য বৃদ্ধি তাহা নহে। একর প্রতি উতপাদনের হারও বেশী হইয়াছে। ১৯১৫-১৬ সালে অপেক্ষা বিগত বৎসর একর প্রতি ১৭ পাউণ্ড অধিক ধান হইয়াছে। ইহা শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। ধান্য সম্বন্ধে যে সমুদয় গবেষণা চলিতেছে তন্মধ্যে বিশুদ্ধ জাতি নির্ব্বাচন দ্বারা অধিকতর ফসল প্রসবী বংশ নির্দ্ধারণ করাই প্রধানতম কার্য্য হইয়াছে। এতদ্দেশে ধান্যের জাতি অসংখ্য। তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ জাতি নির্দ্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার। মান্দ্রাজে মিঃ পার্ণেল এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। বঙ্গদেশের পক্ষে ধান্যের উন্নতি সাধন যে কত অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য তাহা এতদ্দেশে শতকরা তিনভাগ জমিতে ধান্য হয় বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিবরণীতে ইন্দ্রসাল ধান্যেরই বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। বিগত বৎসর ২০ হাজার একরে চাষের উপযুক্ত এই জাতির বীজ বিতরণ হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান বৎসরে ১২ লক্ষ একর জমির উপযুক্ত বীজ বিতরিত হইবে। বিহার ও আসামেও নাকি ইন্দ্রসাল জাতির উৎকর্ষতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাহা হউক যত অধিক পরিমাণে চাষ হইবে ততই ইহার গুণাগুণ বুঝিতে পারা যাইবে। মধ্য প্রদেশে ডাক্তার গ্রেহামের নির্ব্বাচিত ১২ ও ১৭ নং ধান্য ক্রমশঃ অধিক প্রসার লাভ করিতেছে। বীজ নির্ব্বাচন ভিন্ন রোপণ ও সার প্রয়োগ সম্বন্ধেও কয়েকটি অভিনব প্রথা কৃষি-বিভাগ চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

তুলা—তুলার জমি ১৭৭ লক্ষ একর হইতে ২১২ লক্ষ একর হইয়াছে। উৎপাদনও শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তবে উৎপাদনের হার কিছু কম হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই, সিন্ধু, মধ্য প্রদেশ, মান্দ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশের কয়েক স্থান তুলা চাষের প্রধান কেন্দ্র। এই সমুদয় স্থান নানা প্রকার নূতন জাতির প্রবর্ত্তন

চলিতেছে এবং তাহার ফলে মোটের মাথায় তুলা চাষের প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা স্থানান্তরে তুলা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে অধিক লেখা বাহুল্য।

ইক্ষু—ইক্ষু চাষের জমি ২৩ লক্ষ একর হইতে ২৪ লক্ষ একর হইয়াছে কিন্তু গুড় উৎপাদনের মাত্রা কিছু কম হইয়াছে দেখা যায়; ২৬,২৬০০০ টন গুড় এতদ্দেশে উৎপাদিত হইলেও ইহাতে ভারতবাসীর সংকুলান হয় না। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৎসরে প্রায় ১৪ কোটি টাকার চিনি বিদেশ হইতে আমদানি হইত। অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশীয় চিনির আমদানি আর ততটা হইতে পারে না বটে, তবুও গত বৎসর ৪৪০০০০ টন চিনি এদেশে আসিয়া ছিল। পূর্ব্বে লোকে শর্করাকে একটা সখের খাদ্য বলিয়া মনে করিত। আজ কাল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে শরীর সত্বরে বলবান করিতে শর্করার মত দ্রব্য আর নাই। বিশেষতঃ শিশু শরীর পোষণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযুক্ত। সুতরাং ইক্ষুর চাষ বিস্তার হওয়া যে কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। ইক্ষু সম্বন্ধীয় যাবতীয় পরীক্ষার মধ্যে কইম্বাটোরের ইক্ষু জননন ক্ষেত্রের পরীক্ষাবলই অন্যতম। যাহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মৃত্তিকা ও জল হাওয়ায় উপযোগী উৎকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষু জাতি জন্মাইতে পারা যায় এস্থলে সেই চেষ্টাই চলিতেছে। বলা আবশ্যক এই সমুদয় জাতি কলমের পরিবর্ত্তে বীজ হইতে প্রজনন করা হইতেছে। এই ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার চারা প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে অন্ততঃ ১০০০ সংখ্যক উত্তম সঙ্কর পাওয়া গিয়াছে। আজ কাল গুড়ের যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে ইক্ষু চাষের প্রসার সম্ভবপর। কৃষি-বিভাগও খৈল, সলফেট্ অব্ অ্যামোনিয়া প্রভৃতি সারের উপকারিতা দেখাইয়া এবং চাষের উন্নত প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়া ইক্ষু চাষের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আক মাড়া ও গুড় প্রস্তুতেরও সুলভ অথচ অধিক কার্য্যকর কল কব্জারও প্রবর্ত্তন হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা শর্করা প্রস্তুত কারক কোম্পানি সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজ সরকার বিদেশীয় চিনির আমদানির উপর শতকরা ১০ ভাগ শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শর্করা উৎপাদনের অনেকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ফলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে বর্ত্তমান সময় প্রায় ১ লক্ষ টন শ্বেত শর্করা দেশ মধ্যে উৎপাদিত হইতেছে। যুক্ত প্রদেশের উত্তর পশ্চিমাংশ, বিহার, আসাম, ব্রহ্মদেশ, মহীশূর ও বোম্বাইয়ের কতিপয় স্থান—প্রভৃতি যে সমুদয় স্থানে প্রভূত পরিমাণে ইক্ষু চাষ হইয়া থাকে সে সমুদয় স্থলে অধিক সংখ্যক চিনির কারখানার সত্বরে প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবপর।

শর্করা বীট; জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া হঙ্গারি হইতে আগে যে চিনি আসিত তাহা সমস্তই বীট হইতে উৎপন্ন। এ দেশের অধিকাংশ স্থান বীট চাষের উপযোগী নহে;

কিন্তু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও কাশ্মীরে যথেষ্ট পরিমাণে বীট চাষ হইতে পারে। বস্তুতঃ পেশওয়ার কৃষি ক্ষেত্রে গত ছয় বৎসর ধরিয়া বীট চাষ সম্বন্ধে যে পরীক্ষা চলিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে একর প্রতি ১৬।১৭ টন বীট উৎপাদিত হয় এবং উহার শতকরা ১৫ অংশ শর্করা। ইক্ষুর সহিত তুলনা করিলে বীটের কয়েকটি বিশেষ গুণ দৃষ্ট হয়। ইক্ষুর ফসলে ৯ মাস ও বীটে ৬ মাস সময় লাগে। ১৫ টন বীটে ও ২০ টন ইক্ষুতে একই পরিমাণ শ্বেত শর্করা পাওয়া যায়। ইক্ষু অপেক্ষা বীটে এক পঞ্চমাংস কম জল সেচন আবশ্যক হয়। এই সমুদয় ভিন্ন ইহার পাইটও কম। পেশওয়ারে মার্চ্চ হইতে জুন পর্য্যন্ত বীট হইতে পারে এবং নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ইক্ষু হয়। সুতরাং চিনির কল বসাইলে ছয় মাস অর্থাৎ চিনির কলের নির্দ্ধারিত সময় উত্তমরূপেই চলিতে পারে। কাশ্মীর হইতে বীজও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সীমান্ত প্রদেশে বীট চিনির ব্যবসায় স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর।

পাট—ভারতীয় কৃষিতে পাটের প্রাধান্য সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ১৯১৬।১৭ সালে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের যে রপ্তানি হইয়াছিল তাহার মূল্য ৫৭ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। ইহা সমস্ত রপ্তানির দ্রব্যের মূল্যের এক চতুর্থাংশ। সুতরাং ইহার ন্যায় লাভবান কৃষিজাত দ্রব্য আর নাই বলিলেই হয়। অবশ্য বঙ্গ বিহারের কতিপয় স্থান এবং আসামেই পাটের চাষ হইয়া থাকে। বিগত বৎসর তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পাটের জমি শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পাটের উৎপাদনও শতকরা ১৩ ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গত বৎসর ৮৩ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়াইয়াছে। পাটের অভিনব জাতির মধ্যে কাকিয়া বোম্বাই জাতিই এক মাত্র। ইহা রোপণে বিঘা প্রতি ৩ হইতে ৪ মণ অধিক তন্তু পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট ইহার বীজ বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন।

নীল—বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে যেমন নানাদিকে সাধারণের ক্ষতি হইয়াছে, তেমন দুই এক দিকে লাভও হইয়াছে। নীল তাহার একটি উদাহরণ। নীল চাষ আগে যে কত লাভের ব্যবসায় ছিল তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু ১৮৯৫ সালে যখন জর্ম্মণি বাজারে প্রথম কৃত্রিম নীল প্রবর্ত্তন করেন সেই সময় হইতেই স্বাভাবিক নীলের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হয়। এখন কৃত্রিম নীলের আমদানি বন্ধ। সুতরাং নীল চাষ আবার জাগিয়া উঠিতেছে! যুদ্ধের সময়ের মধ্যেই নীল চাষ ৭ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৭,৫৬,৪০০ একরে দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে উৎপাদনের মাত্রা মান্দ্রাজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যুদ্ধাবসানে স্বাভাবিক নীল প্রতিযোগিতায় কৃত্রিম নীলের সমকক্ষ হইতে পারিবে কি না সন্দেহের বিষয়। তবে যাহাতে নীলের ব্যবসায় আবার স্থায়ী ভাবে চলিতে পারে তজ্জন্য সরকার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নীলের রসায়ন তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং পুষায় পরীক্ষার্থ একটি ছোট নীলকুঠি স্থাপিত হইয়াছে।

ব্যবসায়ের স্থায়ীত্ব প্রধাণতঃ ৫টি কারণের উপর নির্ভর করে (১) উত্তম ও যথেষ্ট পরিমাণে বীজ সংগ্রহ (২) অধিক মাত্রায় পত্র উৎপাদন (৩) নীল প্রস্তুতের উন্নত উপায় (৪) বিক্রয়ের সুব্যবস্থা ও (৫) ভেজাল দেওয়া কুপ্রথা রহিত করা এই সমুদয় বিষয় কার্য্যে পরিণত করা গুরুতর সমস্যা সন্দেহ নাই তবে কোন কোন বিষয়ে ইতি মধ্যেই কিছু কার্য্য হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ মিঃ ডেভিস্ দেখাইছেন যে নীল প্রস্তুতের সময় জলে কিয়ৎ পরিমাণ পলাস গঁদ দিলে প্রায় সমস্ত নিলই অধস্থ হইয়া যায় এবং মিটে জলের সঙ্গে নীল লালা সমূহ বাহির হইয়া গিয় উৎপাদনের মাত্রা কমিয়া যায় না। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে প্রতি ১০০ মণ গাছে পূর্ব্বাপেক্ষা ৩ হইতে ৬ সের অধিক নীল পাওয়া গিয়াছে। নীলের উৎসেচন ক্রিয়ার সহিত জীবাণুর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এসম্বন্ধে যথেচ্ছা অনুসন্ধান চলিয়াছে এবং ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে চৌবাচ্ছায় অধিক পরিমাণে নীল উৎপাদিত হয় তাহার জল লইয়া গিয়া অন্য চৌবাচ্ছায় দিলে তাহারও নীল উৎপাদনের মাত্রা অধিক হয়। বিশেষ বিশেষ জীবাণু পৃথক করিয়া টীকা দেওয়ারও ব্যবস্থা হইতেছে।

তামাক—এদেশীয় এবং বর্ম্মা চুরুট কতক পরিমাণে রপ্তানি হয় এবং বিদেশ হইতে সিগারেট ও সিগারেট প্রস্তুতের তামাক অনেক পরিমাণে আসে। সিগারেট প্রস্তুতের জন্য পুষার ৮নং তামাক বিশেষ উপযোগী বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং উহার প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বঙ্গ দেশে উৎপাদিত সুমাত্রা জাতীয় তামাক ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। তাহাতে বোধ হয় যে ক্রমশঃ উৎকর্ষ শ্রেণীর চুরুট ও সিগারেট এতদ্দেশে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারিবে।

তৈল বীজ—১৯১৫।১৬ সালে ১০ কোটি ১২ লক্ষ টাকার তৈল বীজ রপ্তানি হয়। গত বৎসর ১৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার বীজ রপ্তানি হইয়াছে। মূল্য ও পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তৈল বীজের মধ্যে তিসি, চিনার বাদাম তিল, ও নারিকেলই অন্যতম। কুসুম ফুলের বীজের তৈল আপাততঃ ঘৃতে ভেজাল দেওয়ার জন্যই প্রধাণতঃ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাতে ভাল বর্ষাতি "water proof" হইতে পারে। তাহা হইলে ইহার আদর খুবই বাড়িয়া যাইবে।

ফল চাষ—হাওয়ার্ড দম্পতির চেষ্টায় কোয়েটার ফলচাষ যে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন। ইহার ফলে বেলুচিস্থানে ফল চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কলম প্রস্তুতেরও যথেষ্ট সুব্যবস্থা হওয়ায় কুমায়ণ, কুলু এবং কাশ্মীরে অধিক পরিমাণে ফল উৎপাদন সম্ভবপর। উত্তর পশ্চিম-সীমান্তে পীচ, আলুবোখরা ও খোবানির অনেক বিদেশীয় চারা আমদানি করিয়া দেশ মধ্যে বিতরিত হইতেছে। তাহাতে ফসলের সময় বাড়িয়া গিয়াছে এবং উৎকর্ষতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুখের বিষয় যে বিলাতী জলপাই (olive) পেশওয়ার উপত্যকায় উত্তম রূপ জন্মাইতেছে।

ভারতের অন্তত্র বোম্বাই প্রদেশে আম, কমলা লেবু, পেয়ারা ও আঙ্গুর সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা হইয়া সম্প্রতি ঐ সমুদয় ফল চাষের উন্নতি সাধিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মধ্য প্রদেশেও ডাক্তার গ্রেহাম অভিনব প্রণালীতে উৎকৃষ্ট জাতীয় কমলা লেবু ও কদলী উৎপাদন করিতেছেন। ফল চাষ সম্বন্ধে এ স্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। মেশোপোটেমিয়ায় যখন সৈন্যগণের জন্য উদ্ভিজ্জ খাদ্য সরবরাহের সমস্যা গুরুতর হইয়া পড়ে তখন গবর্ণমেণ্ট হাওয়ার্ড দম্পতিকে এ সম্বন্ধে সু-ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহারা অনেক পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে চালানের পূর্ব্বে ফল মূলাদি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপে প্যাক করিয়া চালান দিলে উদ্ভিজ্জ খাদ্য অবিকৃত অবস্থায় থাকে এবং চালানের খরচ ও অসুবিধা অনেক কমিয়া যায়। এখন কোয়েটায় প্রথমে ফল ও সব্জী প্রভৃতি প্রথমে উত্তমরূপে সূর্য্যতাপে শুষ্ক করা হয় তৎপরে বাক্সে প্রয়োগে তৎসমুদয়কে চাপ দিয়া অর্দ্ধ সের ওজনের এক একখানি ইটের ন্যায় আকারে পরিণত করা হয়। এই ইটগুলি এক একটী কেরোশিন টিনে প্যাক করিয়া টিন ঝালিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রকার ১২টি টিন হইলে ১ বাটালিয়নের ১ সপ্তাহের সব্জীর অভাব পূরণ হয়। একটা মটরে ১২টা টিন আনায়াসে বহন করিতে পারে। ইহাতে মেসোপোটেমিয়ার সৈন্যবর্গের যে কত সুবিধা হইয়ছে তাহা সকলের অনুমান করিতে পারেন। কালক্রমে এই প্রথায় দেশেরও নানা স্থানে সব্জী সরবরাহ হইতে পারিবে।

গোপালন সম্বন্ধীয় আন্দোলন

বিগত জাতীয় মহাসম্মিলনীর অধিবেশনের সময় কলিকাতায় অনেক সভা সমিতির আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বভারতীয় গো-সমিতির বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ধর্ম্মে গোরুকে দেবতার স্থান দেওয়া হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক কর্ম্মের সময় দেখা যায় যে গোপালন বিষয়ে আধুনিক হিন্দুর যত্ন খুবই কম। এই দেশ ব্যাপী এবং বহুদিনের অযত্নের ফলে একদিকে চাষের গরু কম ও হীন জাতীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং অন্য দিকে ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা, ক্ষীর, মাখন প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকিবার উপায় নাই। তাই ভারতের নানা প্রদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিত হইয়া এ বৎসর একটি গো-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষির উন্নতি সাধনের উপায় বিধান ও গোজাতির বংশ বৃদ্ধি করিয়া ঘৃত দুগ্ধাদির উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি করা।

এবারে সমিতির অধিবেশনে কতকগুলি প্রস্তাব হইয়াছিল তন্মধ্যে দুইটি প্রস্তাবে সমিতির উদ্দেশ্য বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে যথা :—(১) সমিতি অনুমোদন করেন যে রাজসরকার আইন পাশ করিয়া জেলা বোর্ড প্রভৃতিকে আদর্শ গোশালাদির প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন। এই ব্যবস্থায় লোকে গোশালা স্থাপন করিতে ও তৎসঙ্গে বৈজ্ঞানিক কৃষি আলোচনা করিতে উৎসাহিত হইবে : (২) আপাততঃ যে সমুদয় পিজরা পোল ও গোরক্ষিণী সভা আছে সেগুলি প্রায়ই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট ;—উহাদের উদ্দেশ্য সাধু হইলেও ঐ সমুদয় ঠিক জনসাধারণের হিত কার্য্যে পরিচালিত হয় না সমিতি অনুমোদন করেন যে উক্ত সভা সকল অতঃপর এরূপ ভাবে পরিচালিত হউক যে ঐ সমুদয় হইতে কৃষকেরা অধিক পরিমাণে চাষের গরু পায় এবং সাধারণে শিশু পালনের জন্য অধিক দুগ্ধ পায়।

এই দুইটি প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য হইলে ভারতীয় গোজাতির উন্নতি সাধনের পথ সুগম হইয়া আসিবে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এই দুইটি প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করাও সামান্য ব্যাপার নহে। সমিতিতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছেন ; তাঁহাদের সমবেত উদ্যমে অনেক কাজ হইতে পারে। বিশেষতঃ সমিতির সভাপতি প্রসিদ্ধ বিচারপতি সার জন্ উড্রফ্ তাঁহার সম্ভাষণে যেরূপে আগ্রহ দেখাইয়াছেন সেরূপ আগ্রহে দেশের লোকে অনুপ্রাণিত হইলে গব্যজাত দ্রব্যাদি আব পূর্ব্বের ন্যায় সুলভ হইবে।

সভাপতি মহাশয় অভিভাষণের প্রারম্ভে যথার্থ বলিয়াছেন যে "In my opinion a fundmental problem for India at present to solve in the material one namely how to feed its people," অর্থাৎ আমার মতে বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অন্য প্রধান সমস্যা এই যে কিরূপে লোকের খাদ্য যোগাইতে পারা যায়। যাঁহারা বলেন যে জল বায়ুর দোষে ভারতবাসী দুর্ব্বল ও উদ্যমহীন হইয়া পড়িতেছে তাঁহারা ভাবেন না যে এই প্রকার জল বায়ু যুগ যুগান্তর হইতে আছে কিন্তু দুর্ব্বলতা চিরকাল ছিল না। আহার্য্যের স্বচ্ছল হইলে আবার দেহে ও মনে স্ফুর্ত্তি আসিবে। ভারতবাসী আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সর্ব্বকার্য্যে যোগদান করিতে সক্ষম হইবে। ভারতের ন্যায় প্রধানতঃ নিরামিষাহারীদেশে দুগ্ধ অন্যতম খাদ্য। দুগ্ধ সমস্যা একাধিক কারণে একটি গুরুতর সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত ব্যাধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া ক্রমশঃই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। তৃতীয়তঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এতদ্দেশে দুগ্ধ খারাপ হইয়া যায়। এই সমুদয় কারণে দুগ্ধ উৎপাদন ও সরবরাহ একটি জটিল ব্যপার হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে শুনিলে বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবেন যে ভাল দুগ্ধ মার্কিন অথবা ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরে এতদ্দেশে অপেক্ষাও সুলভ অর্থাৎ প্রতি সের চারি আনার কম মুল্যে বিক্রয় হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রধানতঃ দুইটি কারণে এইরূপ

অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, গবাদির সংখ্যা হ্রাস ও তাহাদের দুগ্ধ উৎপাদনের শক্তির ন্যূনতা। যথেচ্ছ ভাবে গো হনন, অল্প মাত্রায় ও অনুপযুক্ত আহার প্রদান পালনের অবন্দোবস্ত এবং রোগ ও অকালমৃত্যু, গোবৎসই রুগী গাই হত্যা এই সমুদয় কারণেই গবাদি বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই সমুদয়ের প্রতিকার করিতে হইলে জন্য সাধারণের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। যতক্ষণ পরস্পরে মিলিয়া পরস্পরের উন্নতির জন্য কার্য্য করিতে লোকজন শিক্ষিত না হয় ততক্ষণ কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। এক্ষেত্রেও সেই জন-গণ-একতা বিষয়ক ভারত ভাগ্য বিধাতার অনুকম্পা একান্ত আবশ্যক।

তার পর জ্ঞান বিস্তারের আবশ্যক। আমাদের দেশেও গো পালন-জনন-চিকিৎসা বিষয়ক অনেক তথ্য বহু শতাব্দী হইতে সঞ্চিত হইয়া আছে। সেগুলি পুরাতন বলিয়াই যে অকিঞ্চিৎকর মনে করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। এবং সেই পুরাতন জ্ঞানের সহিত যদি আধুনিক জ্ঞান সংযোগ করা যায় তাহা হইলে সমধিক ফল ফলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যে দিক্ হইতে জ্ঞান সংগৃহীত হউক না কেন উহার বিস্তার না হইলে আমাদের কোন উপকার নাই। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে যাহাতে সাধারণে গো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে যে সমুদয় কারণে বর্ত্তমান অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে তাহা লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে ও পারিলে প্রতিকার করিতে সমর্থ হইবে।

গোহত্যা সম্বন্ধে কোন জাতির স্বার্থে হস্তক্ষেপ না করিয়া সাধারণ হিসাবে ইহা বলিতে পারা যায় এতৎসম্বন্ধে ত্রিবিধ প্রতিবাদ সম্ভবপর। ১ গবর্ণমেণ্ট গোরাদিগের জন্য গোমাংশে বিদেশ হইতে আমদানি করুন। তাহা হইলে শ্রীযুক্ত যাসাওয়ালার মতে প্রায় বাজারে দেড় লক্ষ গরু বাঁচিয়া যাইবে। নানা সহরে গোরা ব্যতীত আর অপর সাহেবেরা যে পরিমাণ গোমাংস ভক্ষণ করে তাহা তত অধিক নহে। ২। যে বয়সের গরু হত্যা করা যাইতে পারে তাহাও আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত! সন্তান উৎপাদন শক্তির পূর্ণ প্রভাব বজায় থাকে সে সময় হত্যা করা আদৌ উচিত নহে। ৩। মাংসের জন্য স্বতন্ত্রভাবে গোজনন হওয়া উচিত তাহা হইলে দুগ্ধের গরুর অপচয় হইবে না। এতৎসঙ্গে বিদেশে গরু রপ্তানি হওয়াও আবশ্যক।

সভাপতি মহাশয় সাধারণ ভাবে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে রাজা যতদূর করেন ভালই; কিন্তু কেবল তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগের পুরাতন স্বধর্ম্ম যেন না আমরা ভুলিয়া যাই। সকলেরই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব আছে। তাহা পালন না করিতে পারিলে উন্নতি সম্ভবপর নয়। সার জন্ উড্রফ তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে অভিজ্ঞ পণ্ডিত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। অভিভাষণ যে তাঁহার ন্যায় উদার স্বভাব সুবিজ্ঞ লোকের উপযুক্ত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার মতে মত দিয়াই আমরা

বলি যে ভারতের আবশ্যক—শক্তি, অধিক পরিমাণে শক্তি; শক্তির মূল আহার্য্য এবং আহার্য্যের প্রধান দুগ্ধ। সুতরাং দুগ্ধ উৎপাদনের সহায়তা করা আজ কাল সকল স্তরের লোকেরই আবশ্যকীয় কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তুলার মূল্য ও তুলা চাষ

বর্ত্তমান কাপড়ের বাজার যে রকম হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। গরীব দুঃখীর কথা বাদ দিয়াও সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষেও কিরূপে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয় ইহা একটি কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমান অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির সহিত ব্যবসায়ীগণের চাতুরীর অল্প বিস্তর সম্পর্ক আছে, কিন্তু বৃদ্ধিটা ষোল আনাই কৃত্রিম নয়। নানা কারণে তুলা, তুলাজাত দ্রব্যের উপস্থিত মহার্ঘতা সংঘটিত হইয়াছে।

পৃথিবীর যাবতীয় স্থলে তুলা উৎপাদিত হয় তন্মধ্যে মার্কিনই সর্ব্বপ্রধান। সমস্ত জগতে উৎপাদিত তুলার পরিমাণ প্রায় ২৬০ লক্ষ বস্তার মধ্যে এক মার্কিন দেশেই প্রায় ১৪০ বস্তা উৎপাদিত হইয়া থাকে। ১৯১৪ সালে মার্কিনে তুলার ফসল যেরূপ হইয়াছিল সেরূপ উক্তদেশে কদাচিৎ হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত বৎসরেই বর্ত্তমান মহাসমর আরম্ভ হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় যথেষ্ট মাল না কাটতি হওয়ার আশঙ্কায় তুলা চাষীরা চাষের জমি কমাইয়া ফেলে। বাস্তবিক যুদ্ধের প্রথম ২।৪ মাস কাটতি কম হইলেও তুলার ন্যায় দ্রব্যের টান বরাবর কম থাকিতে পারে না। সুতরাং বাজারে আবার তুলার টান ধরিতে আরম্ভ হইল। তখন পূর্ব্বোক্ত বৎসরের উদ্বৃত তুলাই অভাব মোচন করিতে লাগিল এবং দরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে লোকে তাহা অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া লাভ করিতে চেষ্টা করে। তুলার টান সমানই আছে, মূল্যও বাড়িয়াছে সুতরাং চাষের জমি বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল না—কারণ মার্কিন যুদ্ধে যোগদান করিলেন। ইহার ফলে মার্কিন জমি গুলির তুলার উর্দ্ধ মূল্যের উপর একদিকে যেমন আস্থা কমিয়া গেল, অন্য দিকে তেমনই তুলার বদলে খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মার্কিনে তুলা চাষের জমির শতকরা ৫ অংশ কমিয়া গিয়াছে। আবার নানা কারণে বর্ত্তমান বৎসরের ফসলও ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে, রপ্তানির জন্য যে পরিমাণ জমিতে মার্কিণে আপাততঃ তুলা উৎপাদিত তাহার সমধিক বৃদ্ধি হওয়ার আশা নাই। এখন জগতের অধিকতর তুলার অভাব অন্য দেশকে মোচন করিতে হইবে।

বিগত জুন মাসে লিভারপুলে যখন ভবিষ্যৎ তুলা লইয়া ক্রয় বিক্রয় (future market) বন্ধ হইয়া যায় তখন পাউণ্ড প্রতি মার্কিন মধ্যম জাতীয় তুলার মূল্য দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ১৶১০। সে অবস্থা হইতে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহাতে বিলাতী ব্যবসায়ী গণের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা বলা যায় না। এক ল্যাঙ্কাসায়রেই যতগুলি কল আছে তাহাদের বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ বস্তা মধ্যম শ্রেণীর তুলা আবশ্যক হয়। জগতের অপরাপর স্থানের বস্ত্র প্রস্তুতকারীগণের প্রতিদ্বন্দীতায় ল্যাঙ্কাসায়রকে প্রতি বৎসর উচ্চতর শ্রেণীর বস্ত্র বয়ন করিতে হইতেছে। তজ্জন্য ল্যাঙ্কাসায়রের শুধু যে অধিক তুলা আবশ্যক তাহা নহে, তুলা উচ্চতর শ্রেণীরও হওয়া চাই।

ল্যাঙ্কাসায়র যথেষ্ট পরিমাণে তুলা পাইতেছেন না, জগতের অন্যান্য স্থলেও মার্কিণ, ভারত, জাপান, চীনেও অন্য সময়ের তুলনায় তুলার যথেষ্ট টান, যুদ্ধের সময় হইলেও ইউরোপেও তুলার টান কম নহে, এবং সন্ধি হইলেও উহার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না এই সমুদয় ভাবিয়া অভিজ্ঞগণ বলিতেছেন যে যত দিন না তুলা চাষের জমির সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ততদিন তুলার দর বিশেষ কম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ঠিক তুলার স্থান অধিকার করিতে পারে এরূপ কোন স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম দ্রব্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং তুলার প্রাধান্য পূর্ব্বের ন্যায় সমানই থাকিবে। সরকারী ও বেসরকারী অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এখন চেষ্টা করিতেছেন যে মার্কিনের চাষীর খামখেয়ালী ও মার্কিনের ফসলের দাম বৃদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে আবশ্যকীয় পরিমাণ তুলা উৎপাদিত হউক। ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বর্ত্তমান জগতে তুলা চাষের অবস্থা একবার বিবেচনা করিতে হইবে।

পৃথিবীতে তুলা উৎপাদনের তালিকা।

শ্রেণী লক্ষণ	উৎপাদনের স্থান	উৎপাদনের পরিমাণ (বস্তা)	বৃটীশ সাম্রাজ্যের অংশ (বস্তা)	শতকরা অনুপাত
১ম—উৎকৃষ্ট সি	দক্ষিণ কেরোলিনা	১০,০০০		
আইল্যাণ্ড;	ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ			
দীর্ঘতম তন্তু	দ্বীপপুঞ্জ	৫,০০০		
		১৫,০০০	৫০০০	৩৩

শ্রেণী	লক্ষণ	উৎপাদনের স্থান	উৎপাদনের পরিমাণ (বস্তা)	বৃটীপ সাম্রাজ্যের আশ (বস্তা)	শতকরা অনুপাত
২য়—	মধ্যম সি আইল্যাণ্ড	ফ্লরিডা, জর্জ্জিয়া	৭০,০০০		
	”	ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ,	২,০০০		
	উৎকৃষ্ট মিশর জাতি দীর্ঘতন্তু	মিশর	৪৩০,০০০		
			৫০২,০০০	৪৩২,০০০	৮৬
৩য়—	মিশর জাতীয়	মিশর	১০,০০,০০০		
	”	সুদান	২৫,০০০		
	উত্তম মার্কিন	মিশিসিপি ব-দ্বীপ,	২০০,০০০		
	”	ন্যায়েমাল্যাণ্ড, উগাণ্ডা, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা	৫০,০০০		
		পেরুদেশ	১২৫,০০০		
			১৪,০০,০০০	১০,৭৫,০০০	৭৭
৪র্থ—	সাধারণ মার্কিন জাতীয়	মার্কিন	১,৫০,০০,০০০		
	”	মেক্সিকো	১৫০,০০০		
	”	ব্রেজিল	৩০০,০০০		
	”	রুসিয়া	১০,০০,০০০		
	”	পশ্চিম আফ্রিকা	১৫,০০০		
	”	লিভাণ্ট	১০০,০০০		
	”	ভারতবর্ষ	২৫০,০০০		
	”	চীন ও কোরিয়া	২৫০,০০০		
			১,৭০,৬৫,০০০	২৬৫,০০০	১৬
৫ম—	ভারতীয় হ্রস্ব তন্তু	ভারতবর্ষ	৫,০,০০,০০০		
	”	রুসিয়া	৪০০,০০০		
	”	চীন	১৮,০০,০০০		
			৭২,০০,০০০	৫০,০০,০০০	৬৬
		মোট—	২,৬,১৮২,০০০	৬৭,৭৮,০০০	২৬

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে জগতের তুলার মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে কেবল মাত্র শতকরা ২৬ অংশ তুলা জন্মিয়া থাকে ও তাহার পরিমাণ ৬৭ লক্ষ বস্তা (১ বস্তা=৫০০ পাঃ)। আবার এই ৬৭ লক্ষ বস্তার মধ্যে এক ভারতেই ৫০ লক্ষ বস্তা জন্মিয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে ল্যাঙ্কসায়রে বৎসরে ৪০ লক্ষ বস্তা আবশ্যক হয়। ভারতের তুলা ল্যাঙ্কসায়েরের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে কিন্তু ভারতের নিজের জন্যই উৎপাদিত তুলার অর্দ্ধাধিক আবশ্যক। তদ্ভিন্ন আরও কথা আছে। ফ্রান্স, রুসিয়া, ইতালী এবং জাপানও ভারতীয় তুলার ক্রেতা; ভারতে যে শ্রেণীর তুলা উৎপাদিত হয় তাহার কেবল ২ লক্ষ বস্তাই ল্যাঙ্কেসায়রের কাজে লাগিতে পারে। ইংরাজ যদি নিজ সাম্রাজ্যজাত উচ্চ শ্রেণীর তুলা অন্য কাহাকেও না দেন তাহা হইলেও ল্যাঙ্কসায়রের কার্য্যোপযুক্ত ১৭½ লক্ষ বস্তার উপর তুলা পাওয়া যাইবে না।

পক্ষান্তরে মিশরের উৎপাদিত তুলা পরিমাণ কম হইলেও ইহার বিশেষত্ব আছে। তালিকায় দেখা যাইবে যে ২য় শ্রেণীর ৪ লক্ষ ও ৩য় শ্রেণী ১০ লক্ষ মণ—মোট ১৪ লক্ষ মণ তুলা মিশরে জন্মিয়া থাকে। পৃথিবীর উৎপাদনের তুলনায় ইহা কেবল শতকরা ৬ অংশ মাত্র। কিন্তু উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে মিশর দেশেই যথাক্রমে শতকরা ৮৫ ও ৭৩ অংশ জন্মিয়া থাকে। আমেরিকায় মধ্যম শ্রেণীর তুলা অপেক্ষা ইহা দেড় গুণ হইতে ২ গুণ অধিক দরে বিক্রয় হয়। আবার উৎপাদনের হার হিসাবে দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রতি একরে ভারতে ৮০ পাঃ, মার্কিনে ১৮০ পাঃ ও মিশরে ৪৫০ পাঃ খাঁটি তুলা জন্মিয়া থাকে। এমন কি কেহ কেহ বলেন যথোপযুক্ত জল বায়ু ও মৃত্তিকায় মিশরে একর প্রতি ১০০০ পাঃ তুলা জন্মান বিরল নহে। কিন্তু কতিপয় কারণে সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে মিশরীয় তুলার অবনতি ঘটিতেছিল। উহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও চলিতেছিল। এখন বর্ত্তমান মহাসমর আরম্ভ হইয়া উন্নতি সাধনের কার্য্য স্থগিত হইয়া গেল।

মিশরের বর্ত্তমান অবস্থায় মিশরবাসীরা তুলা চাষে যে প্রচুর পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে না তাহা খুবই সম্ভব। কিন্তু মিশর ব্যতীত আফ্রিকার অন্যান্য স্থলেও তুলা চাষ হয় তাহা তালিকায় দৃষ্ট হইবে। সে সমুদয় স্থান হইতেও অধিক পরিমাণ তুলার আশা করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ভারত এই তিন দেশের মধ্যে কে পৃথিবীর তুলার অভাব মোচন করিবে তাহা লইয়া অনেকে জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। মার্কিন তুলা চাষের জন্য যত জমি দিতে পারে তাহার প্রায় শেষ সীমার উপনিত হইয়াছে আফ্রিকায় চাষ বিস্তারের জন্য অর্থাভাব এবং স্থানে স্থানে লোকাভাব। সুতরাং অবশেষে ভারতের দিকেই ব্যবসায়ীগণ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে ভারতের অবস্থা তুলা চাষের অনুকূল বটে, যথা এখানে মজুর সস্তা; বর্ত্তমান মজুরীর হারের ২।৩ গুণ করিলেও মার্কিণের মজুরীর সমতুল্য হইবে না; তুলা চাষ এতদ্দেশে বহু

কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং অভিজ্ঞ চাষীর ত অভাব নাই; উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা যে এদেশে জন্মিতে পারে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় অনুকূল অবস্থা স্বত্বেও আশানুরূপ তুলা চাষের প্রসার হইতেছে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে চাষীগণের অর্থাভাব। ভারতে বিগত দশ বৎসরের তুলা চাষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যেখানে গবর্ণমেণ্ট কোন বিশেষ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন যেমন ক্যানাল উপনিবেশ প্রভৃতি কিম্বা যেখানে যৌথ কার্য্য প্রণালী অবলম্বিত হইয়া একদিকে বীজ ক্রয়ের ও অন্য দিকে উৎপাদিত ফসল বিক্রয়ের সুবিধা হইয়াছে, সেইরূপ স্থলেই তুলা চাষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পঞ্জাব ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। সামান্য পরিমাণ জমি হইতে আরম্ভ হইয়া পাঞ্জাবে মার্কিন তুলার চাষ আজ কাল ২½ লক্ষ একরেরও অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে উৎপাদিত তুলা বিক্রয়ের জন্য যৌথ সমিতি স্থাপিত হইয়া কৃষকের যে কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন।

বিলাতে সাম্রাজ্যের মধ্যে তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থার জন্য বোর্ড-অব্-ট্রেড্ একটি কমিটি গঠিত করিয়াছেন। উক্ত কমিটির অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে একটি তুলা কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। উহাতে সরকারী এবং বেসরকারী উভয়বিধ ব্যক্তিই আছেন; সভাপতি ভারত গবর্ণমেণ্টর কৃষি বিষয়ক উপদেষ্টা মিঃ ম্যাককেনা। ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা উৎপাদনের জন্য যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে ভারতের যোগদান করা কর্ত্তব্য। অনেক দিন হইতে ভারতের ব্যবসায়ীগণ বলিয়া আসিতেছেন যে দীর্ঘ তন্তু তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া একান্ত আবশ্যক। এইরূপ তুলা যত বেশী জন্মিবে ততই বস্ত্র শিল্প প্রসার লাভ করিবে। এখন কতিপয় অঞ্চল অছে যেখানে দীর্ঘতন্তু তুলা চাষ করিয়া বেশ লাভ করা যায়। এই সব স্থানে অভাব কেবল শৃঙ্খলাবদ্ধ কাজের। অন্যত্র যে জাতীয় দীর্ঘতন্তু তুলা আপাততঃ ভারত উৎপাদিত দীর্ঘতন্তু তুলার সহিত লাভের হিসাবে সমকক্ষ হইতে পারে, তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। এস্থলে অধিকতর গবেষণার আবশ্যক। দীর্ঘতন্তু তুলার চাষে যে লাভ আছে তাহা যদি ঠিক চাষীদিগের হাতে পড়ে এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারা যায় এবং ভেজাল দেওয়া ও জল দিয়া ওজন বাড়ান বন্ধ হয় তাহা হইলে ভারতে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে। এই নব নিযুক্ত কমিটি প্রদেশ বিশেষে দীর্ঘতন্তু তুলা চাষের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সমুদয় চেষ্টা হইয়াছে তাহার তদন্ত করিয়া চাষ বিস্তারের উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন। চাষে বিফল হইবার কারণ অনুসন্ধান করিয়াও তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। বস্তুতঃ দীর্ঘ তন্তু তুলা চাষের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই কমিটি, গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিবেন। গত অক্টোবর মাসে সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে সদস্যগণ পঞ্জাব, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও

মান্দ্রাজের নানাস্থানের তুলা ক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়াছেন। সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশও বাদ যায় নাই। এক্ষণে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টকে কি কি কার্য্য করিতে অনুমোদন করেন তাহা শুনিবার জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া থাকিলাম।

উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা যথেষ্ট পরিমাণে ভারতে উৎপাদিত হউক ইহা অবশ্য সকলেই ইচ্ছা করেন। কিন্তু ভারত যে ল্যাঙ্কাসায়র অথবা অন্য স্থানের কলওয়ালাগণের কাঁচা মাল উৎপাদনের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায় তাহা বোধ হয় কেহই দেখিতে চান্ না। এক সময়ে ভারতের তুলাজাত দ্রব্য শিল্পীর অতুলনীয় দক্ষতার জন্যই জগদ্বিখ্যাত ছিল। কিরূপে এবং কাহাদের প্ররোচনায় সেই শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। যদি দীর্ঘ তন্তু তুলার সম্যক ব্যবহার হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা হয়, এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহা হইলেই ভাল। তাহা না হইলে শুধু রপ্তানির জন্য উৎপাদনে ভারতবাসীর বিশেষ সুবিধা নাই। নীল ও পাট চাষ প্রভৃতিও তাহার উদাহরণ। বর্ত্তমান মহাসমরও স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছে খাদ্য শস্য উৎপাদনের ন্যায় আর কোনও লাভজনক কৃষিকার্য্য নাই। সুতরাং দেখা আবশ্যক যে তুলা খাদ্য শস্যের স্থান অধিকার না করে। উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য শস্যের জমি বাদে অন্য জমিতে তুলা চাষ হইলে লাভেরই সম্ভাবনা। আমরা আশা করি তুলা চাষের প্রচার এই ভাবেই সংঘটিত হইবে ; খাদ্য শস্যের স্থান অধিকার করিয়া নহে।

অরণ্যের অপচয়

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত এম্-আর্-এ-এস্ লিখিত।

যে সময় মানুষের জ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই, যে সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহের মর্ম্ম মানব ভাল করিয়া বুঝিতে শিখে নাই, সে সময়ে অরণ্য কেবল অনিষ্টের আকর বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্য-সমাজের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কর্ষিত ভূমির ন্যায় অরণ্যও অতীব প্রয়োজনীয়। অরণ্য-জাত নানাবিধ ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য হিসাবে অরণ্য অত্যাবশ্যক। দেশমধ্যে বারিপাত, মৃত্তিকায় জল-সংস্থান, প্রবল বন্যা নিবারণ—এ সমুদয়ের সহিত অরণ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঐতিহাসিক যুগের মধ্যেই কত দেশ অরণ্যশূন্য হইয়া অনুর্ব্বর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদিগের দেশে পঞ্চনদের কতিপয় স্থান ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল।

পূর্ব্বাপেক্ষা ভারতে অরণ্যের পরিমাণ যে অনেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা পুরাকালের পুস্তকাদি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এখনও ভারতে বনভূমি নিতান্ত সামান্য নয়। বৃটিশ-শাসিত সমস্ত ভারত ও ব্রহ্মদেশের আয়তন ১০,৭৯,৬৩৮ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে শুধু সরকারী বনভূমিরই আয়তন ২,৪৫,৬১২ বর্গ মাইল। এতদ্ভিন্ন বেসরকারী জঙ্গলও আছে; কিন্তু তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। মোটের উপর, ভারতের সমস্ত বনভূমির পরিমাণ দেশের আয়তনের এক-চতুর্থাংশের কম হইবে না।

ভারতে অরণ্যের পরিমাণ কম না হইলেও, উহার সংস্থান সর্ব্ব প্রদেশে সমান নহে। অরণ্যের প্রকৃতিও, অর্থাৎ নানাজাতীয় বৃক্ষ লতাদির সমাবেশও দেশভেদে বিভিন্ন প্রকারের। প্রধানতঃ সাত প্রকারের জঙ্গল এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য. জঙ্গলের ঠিক শ্রেণীবিভাগ করা যায় না, কিন্তু তবু বিবিধ উদ্ভিদ্‌জাতির প্রাধান্যে ও জল, বায়ু, মৃত্তিকা এবং ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার পার্থক্যে নিম্নলিখিত স্থান সমূহের অরণ্য বিশেষ-বিশেষ লক্ষণযুক্ত।

১। উত্তর ভারতীয় অরণ্য :—ইহা হিমালয়ের গাত্র ও পাদদেশ দিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল, দার্জ্জিলিং, আসাম ও সমুদ্র-উপকূলে চট্টগ্রাম—এই সমস্ত দেশ দিয়াই এই বিশাল অরণ্যমালা চলিয়া গিয়াছে। এত দুরব্যাপী জঙ্গলের বৃক্ষলতাদি যে সর্ব্বস্থলে সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব হিমালয়ের বনানীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে কি উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে, কি উপত্যকায়, সর্ব্বস্থানেই কনিফার (conifer) শ্রেণীর গাছ—দেবদারু, চিল, রেওয়ার ও মোরু, ভূজ, সফেদার, বেদ প্রভৃতিরই প্রাধান্য। উত্তর-পূর্ব্বে উচ্চদেশে কনিফার শ্রেণীর বৃক্ষ থাকিলেও, নিম্নদেশে উহার সংখ্যা নিতান্ত কম এবং তৎপরিবর্ত্তে অধিক উত্তাপসহ উদ্ভিদ সমূহের—যথা ম্যাগ্‌নোলিয়া, শিশু, খয়ের প্রভৃতিরই প্রাদুর্ভাব বেশী। বেতের জঙ্গল, আসামে নাগকেশর ও টুণ এবং সমুদ্র উপকুলবর্ত্তী স্থানে গর্জ্জন ও জারুলের সমাবেশ উত্তর-পূর্ব্ব অরণ্যানীর বিশিষ্ট লক্ষণ। এই হিমালয়ের অরণ্যের নিম্নভাগে গড়ওয়াল, কুমায়ুণ, খেড়ী, নেপাল তরাই ও গারো পর্ব্বত-অঞ্চলে বহু বিস্তৃত শালের জঙ্গল। পঞ্চনদের দিকে শুষ্ক মৃত্তিকার উপযোগী ক্ষুদ্র বৃক্ষাদির জঙ্গলও স্থানে স্থানে রহিয়াছে।

পূর্ব্ব-ভারতের অরণ্য :—গঞ্জাম ও বিজয়পত্তনের জঙ্গলে ইহা প্রারব্ধ হইয়াছে। দেশাভ্যন্তরে কর্ণূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দক্ষিণে সালেম ও নেলোর জেলায় গিয়া ইহা পশ্চিম-ভারতের জঙ্গলের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিম-ভারতের জঙ্গল :—বোম্বাই প্রদেশের থানা জেলা হইতে আরম্ভ হইয়া

সমস্ত বোম্বাই, কোলাবা, কানাড়া, মালাবার ও নীলগিরি পর্ব্বত দিয়া ইহা ত্রিবাঙ্কুরের জঙ্গলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এই বন-বিভাগের উত্তরাংশে যথেষ্ট আবলুষ ও সেগুণ গাছ দেখিতে পাওয়া যায়; মধ্যাংশে হরিতকী, জারুল ও চালতা জাতীয় বৃক্ষাবলী এবং দক্ষিণাংশে পুন্নাগ, চাঁপা, ঠেঙ্গস, আম, কুচিলা, দারুচিনি, গর্জ্জন, নাগকেশর প্রভৃতি বহুবিধ জাতীয় উদ্ভিদের নিবিড় জঙ্গল।

৪। মধ্য-ভারতের জঙ্গল:—পূর্ব্বপ্রান্তে সৌরাষ্ট্র ও পশ্চিমপ্রান্তে বঙ্গদেশ এতদুভয় সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানে মধ্য প্রদেশ, খান্দেশ, সাতপুরা ও দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ ব্যাপিয়া মধ্যভারতীয় অরণ্য বিরাজ করিতেছে। এই সমুদয় স্থানে বারিপাত কম এবং উদ্ভিদও তদনুরূপ। পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণে সেগুণ, মধ্য ও পূর্ব্বে শাল এবং দক্ষিণ সীমায় চন্দন—এই তিনটি বৃক্ষজাতিই এই বন-বিভাগের বিশিষ্ট লক্ষণ। তদ্ভিন্ন সাঁই, অঞ্জন, কুসুম, রক্তচন্দন, শিমুল প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে এতদঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। ব্রহ্মদেশের জঙ্গল:—দেশের আয়তনের অনুপাতে ব্রহ্মদেশেই অরণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ জমিই জঙ্গল দ্বারা অধিকৃত। আবার সমস্ত ভারতের অরণ্যের মধ্যে কি প্রসারতায়, কি বৃক্ষজাতির বাহুল্যে, উভয় হিসাবেই ব্রহ্মদেশ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এতদ্দেশে অনেক শ্রেণীর জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চ পর্ব্বতগাত্রের বনশ্রেণী পূর্ব্ব হিমালয়ের বনের ন্যায়। টেনাসেরিম, পেগু, মার্টাবান ও পূর্ব্ব আরাকানে সেগুনই অধিক। গাম্ভার, জাম, সিরিস প্রভৃতিও এইস্থানে পাওয়া যায়। এক-এক স্থানে শুধু গর্জ্জনেরই জঙ্গল। আবার শুষ্ক স্থানে খদিরেরই প্রাধান্য।

৬। উপকূল অরণ্য:—ভারতের বড় বড় নদী—গঙ্গা, সিন্ধু, গোদাবরী, ইরাবতী, প্রভৃতির মোহানায় ব দ্বীপ সমূহের উপর এক প্রকার স্বতন্ত্র শ্রেণীর উদ্ভিদাবলী জন্মিতে দেখা যায়। সুন্দরবনের জঙ্গল ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত। এইরূপ জঙ্গল টেনাসেরিম, আরাকান, চট্টগ্রাম, মালাবার ও ভারতের অন্যান্য উপকূলে দৃষ্ট হয়। সুন্দরী, ভোরা, গরাণ প্রভৃতি গাছ এই সমুদয় কর্দ্দমময় স্থানের প্রধান উদ্ভিদ।

৭। বিচ্ছিন্ন বনশ্রেণী:—ভারতের নানাস্থানে পশ্চিমে সিন্ধু নদের উভয় পার্শ্বে এবং পূর্ব্বে খাসিয়া, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাহাড় ও আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কতকগুলি জঙ্গল আছে। সাধারণ হিসাবে পূর্ব্বোক্ত ছয়টি শ্রেণীর মধ্যে কোনটিতেই উহাদিগকে স্থান দিতে পারা যায় না। উহাদিগের উদ্ভিদাবলীও স্থান হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের।

মোটামুটি হিসাবে ভারতীয় বনশ্রেণীকে উক্তরূপ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়। প্রদেশ হিসাবে বিভাগ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যে, বিভিন্ন প্রদেশের

মধ্যে অরণ্য সংস্থানের যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

	প্রদেশের নাম		মোট ভূমির সহিত বনভূমির অনুপাত।
১।	বেলুচিস্থান—	...	১.৪
২।	উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—	...	১.৮
৩।	বিহার ও উড়িষ্যা—	...	৩.৪
৪।	যুক্তপ্রদেশ—	...	৩.৯
৫।	আজমীর মাড়ওয়ার—	...	৫.১
৬।	পঞ্চনদ—	...	৮.৬
৭।	বোম্বাই—	...	৯.৯
৮।	বঙ্গদেশ—	...	১৩.৫
৯।	মান্দ্রাজ—	...	১৩.৮
১০।	মধ্য-প্রদেশ ও বেরার—	...	১৯.৭
১১।	কুর্গ—	...	৩২.৯
১২।	আসাম—	...	৪৬.৬
১৩।	ব্রহ্মদেশ—	...	৬২.৯
১৪।	আণ্ডামান—	...	৭০.৩

উপরিউক্ত তালিকার প্রদেশগুলি অরণ্যের আধিক্যের হিসাবে পর-পর সজ্জিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, এক-এক প্রদেশ প্রায় জঙ্গলবিহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে, আণ্ডামানের ন্যায় স্থানে প্রায় সমস্ত জমিই জঙ্গল দ্বারা অধিকৃত। সেইজন্য স্থান বিশেষে অরণ্য-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়। কোন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া চাষের ও বসবাসের জমি বৃদ্ধি করিতে হয় এবং কোথাও বা অরণ্য স্থাপন ও সংরক্ষণ করিতে হয়।

অরণ্য সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্যই অরণ্য-বিভাগের সৃষ্টি। সাধারণ লোকের নিকট অরণ্য রাখা কি কাটিয়া ফেলা একটা অতি সামান্য কাজ, তাহাতে কোন বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আধুনিক জগতে বনবিদ্যা কৃষিবিদ্যার সমশ্রেণী অধিকার করে। প্রত্যেক সুসভ্য দেশেই বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বড়-বড় কলেজ, যন্ত্রাগার, পরীক্ষা ও প্রদর্শনক্ষেত্র আছে, এবং উক্ত স্থানে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিলে তবে কোন ব্যক্তির বনবিভাগে কর্ম্ম-প্রাপ্তি ঘটে। আমাদিগের দেশে দেরাদুনে অবস্থিত বনবিদ্যার কলেজ ও মৌলিক গবেষণাগারই বনবিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব অধিক দিনের নহে। তার ও ডাক বিভাগের ন্যায় বনবিভাগও লর্ড ড্যালহৌসির সৃষ্টি। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথমে স্থাপিত হয়

এবং কয়েক স্থানের জঙ্গল গবর্ণমেণ্ট নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া উন্নতির চেষ্টা করেন। আপাততঃ জার্ম্মাণি আমাদিগের শত্রু হইলেও সত্যের খাতিরে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে ভারতের বনবিভাগের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা একজন জার্ম্মাণ—স্যর ডেট্রিক ব্রাণ্ডিস্। সে সময়ে বনবিভাগের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ প্রধানতঃ জার্ম্মাণি অথবা ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেন। তৎপরে ইংলণ্ডের কুপার্স'হিল কলেজে ও অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবর্গ ও ডব্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বর্ত্তমান দেরাদুনে অবস্থিত কলেজ ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজেই বনবিভাগে নিযুক্ত অধিকাংশ দেশীয় কর্ম্মচারি শিক্ষিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখনও বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসেন।

ভারতের জঙ্গলের আধিক্য হিসাবে ভারতবাসী যে অরণ্য-বিদ্যায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, জাপান আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় উচ্চস্তরের বনবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার সুবন্দোবস্ত এখনও এতদ্দেশে হয় নাই। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সবেমাত্র রাজসরকার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিতে পারা যায়। ফলাফল বিবেচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে শাল, সেগুন, শিশু, দেবদারু, চিল, প্রভৃতি আয়কর বড়-বড় বৃক্ষের সংরক্ষণ ও বাছাই কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে বটে, কিন্তু আরও যে নানা প্রকার অরণ্যজাত দ্রব্য দ্বারা ধনাগমের উপায় হইতে পারে, সে বিষয়ে রাজসরকারের কিম্বা অন্য সাধারণের বিশেষ চেষ্টা নাই। ১৯১৩।১৪ সালের বনবিভাগের হিসাবে দৃষ্ট হয় যে, উক্ত বিভাগের মোট আয় ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং প্রকৃত আয় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। মোট বনভূমির অনুপাতে এই হিসাবে প্রতি বর্গ মাইলে ৬৪৲ টাকা লাভ হয়। অপরাপর দেশের হিসাবে ইহা অতি সামান্য। অরণ্য-বিদ্যায় অবহেলাই ইহার অন্যতম কারণ। অরণ্য সকল অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিদর্শিত হইলে এবং নানাবিধ অরণ্যজাত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সংখ্যার অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইলে, আয় যে চতুর্গুণ হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সরকারী হিসাবে অরণ্যজাত ফসলকে সাধারণতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। মুখ্য ও গৌণ ফসল। মুখ্য ফসলের মধ্যে অবশ্য কাষ্ঠই সর্ব্বপ্রকার, এবং ইহা হইতেই সরকারের সর্ব্বাধিক আয় হয়। ভারতের অরণ্যে বৃক্ষের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; এবং জাতি-বাহুল্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয় অরণ্যে অন্ততঃ ২৫০০ জাতীয় বৃক্ষ আছে। তবে প্রধান কাষ্ঠ-উৎপাদক বৃক্ষাদির মধ্যে শাল, সেগুন, শিশু, দেবদারু, আবলুষ, চন্দন, রক্তচন্দন, পাদক, পিংকাড়ো, গর্জ্জন, বাকুল, খয়ের প্রভৃতিই অন্যতম। বাঁস, জ্বালানি কাঠ ও ঘাস এই বিভাগের অন্তর্গত। এই তিন প্রকারের দ্রব্য হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় সামান্য নহে। বনবিভাগের কর্ম্মচারিবর্গ এই শ্রেণীর

ফসলের উৎপাদন মাত্রা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য সকল সময়ে সচেষ্ট থাকেন। সেইজন্য বৎসরের পর বৎসর মুখ্য ফসল উৎপাদনের অধিক পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইতেছে

কিন্তু ভারতীয় অরণ্যসমূহের গৌণ আরণ্য ফসলও নিতান্ত নগণ্য নহে। দুই-একটি স্থল ব্যতীত এই শ্রেণীর ফসলের ক্রমোন্নতি সাধন অথবা উৎপাদনমাত্রা বৃদ্ধি করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। এমন কি, অনেক স্বভাবজ উদ্ভিদাদি যাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং যাহা অন্য দেশে ব্যবসায় ও বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে আদৌ কাল বিলম্ব হইত না,—সেরূপ দ্রব্যাদিও অবহেলায় বনমধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আপাততঃ যে সকল গৌণ ফসল হইতে বনবিভাগের আয় হয়, সে গুলি শুধুই যে অনায়াসলব্ধ, তাহা নহে, অধিকন্তু সেই সমুদয় ফসল অবৈজ্ঞানিকভাবে অরণ্য-বাসী প্রভৃতির দ্বারাই সংগৃহীত হয়। এইরূপ শৈথিল্য ও অবজ্ঞার সহিত সংগৃহীত হইয়াও ইহা হইতে সরকারের প্রায় ১০৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গৌণ আরণ্য ফসল হইতে কিরূপ আয় হয়, তাহা নিম্নোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

প্রদেশের নাম	গৌণ অরণ্য ফসল হইতে আয়।	বনভূমির বর্গ মাইল প্রতি আয়ের অনুপাত।
১। পঞ্চনদ	২৩,৪৭,১২০৲	২৮?৲
২। যুক্ত প্রদেশ	৮,৮৮,৯৪৯৲	২১৩৲
৩। আজমীর মাড়বার	২৩,৮৩৭৲	১৮৬৲
৪। সীমান্ত প্রদেশ	৩৬,৮৮?৲	১৫৬৲
৫। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২২,৩৪,৮২১৲	১১৪৲
৬। বোম্বাই	১১,৮৩,৫৮৯৲	৯৭৲
৭। মান্দ্রাজ	১৮,৬৮,৪৩২৲	৯৫৲
৮। বিহার ও উড়িষ্যা	২,৩৩,৪২১৲	৮৪৲
৯। বেলুচিস্থান	৪৩,৬১৭৲	৫৬৲
১০। কুর্গ	২৪,৩৮৪৲	৪৯৲
১১। বঙ্গ	৩,৫৩,৯৭৪৲	৩০৲
১২। আসাম	৬,৯৯,৮২৮৲	৩১৲
১৩। ব্রহ্ম	৮,৫৩,৯০৫৲	৬৲
১৪। আণ্ডামান	৫,১৫৭৲	২৲

উপরি-উক্ত তালিকার সহিত ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত তালিকার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অরণ্যের প্রাচুর্য্য থাকিলেই গৌণ আরণ্য ফসল অধিক হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রহ্মদেশ ও আণ্ডামানের উল্লেখ করিতে পারা যায়। অরণ্যের অনুপাতে

এই দুই দেশ শতকরা ৬২'৯ ও ৭০'৩ অংশ জমিতে অরণ্য আছে। কিন্তু এই দুই দেশে গৌণ আরণ্য ফসল হইতে আয় বর্গমাইল প্রতি যথাক্রমে ৬৲ ও ২৲ টাকা। পক্ষান্তরে প্রদেশসমূহের মধ্যে অরণ্যের বাহুল্যতায় পঞ্চনদ নবম স্থান অধিকার করিলেও গৌণ আরণ্য ফসল হইতে আয়ের হিসাবে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, জঙ্গলের বিস্তৃতিতে নহে, বরং তত্ত্বাবধায়নের গুণে গৌণ আরণ্য ফসলের আয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চনদ ও যুক্তপ্রদেশ বন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ গৌণ আরণ্য ফসল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যতটা চেষ্টা করেন, ততটা অন্য কোথাও হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অরণ্য বিভাগের উদ্যমে যে সমুদয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তন্মধ্যে তার্পিণ ও রজন উৎপাদন অন্যতম এবং পঞ্চনদের জাল্লো এবং যুক্ত-প্রদেশের ভাওয়ালী এই দুই স্থানেই দুইটি প্রধান তার্পিণের কারখানা অবস্থিত। আরণ্য ঘাস ও বাঁশ হইতে কাগজের উপাদান, কাষ্ঠ হইতে নানাবিধ কার্য্যে প্রয়োগের জন্য কাষ্ঠ-পিণ্ড—এই সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রস্তাবনা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই, হইলেও তাহা উক্ত দুই দেশে কিম্বা বঙ্গদেশে হইবে।

গৌণ আরণ্য ফসল হইতে যে কত প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা মোটামুটি কয়েক শ্রেণীর ফসলের উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সংক্ষেপতঃ শ্রেণীগুলি নিম্নরূপ :—

(১) তন্তু ; রজ্জু প্রস্তুতের উপযোগী মুঞ্জঘাস, মুর্গা, কেয়া, আঁতমোড়া, আকন্দ, শনটেঁড়স প্রভৃতি ; কাগজের জন্য সাবাই ও অন্যান্য জাতীয় ঘাস ও বাঁশ ; ঝরুমের জন্য হেঁতাল, গোলপাতা ইত্যাদি।

(২) ঔষধার্থ ব্যবহৃত উদ্ভিদাদি, মসলা ও গন্ধদ্রব্য ; গন্ধতৃণ, রোজা তৃণ ও চন্দন-কাষ্ঠ আপাততঃ বড় বড় ব্যবসায়ের দ্রব্য। দারুচিনি, ছোট এলাচ, গোলমরিচ, জায়ফলও জঙ্গল হইতে কতক পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ঔষধে সুপরিচিত বহু সংখ্যক উদ্ভিদ্ জঙ্গলে জন্মাইয়া থাকে ; মিঠা তেলিয়া, বচ, খোরাশানী সাজোয়ান, কুচিলা কুট প্রভৃতি কতক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু এগুলির এখনও রীতিমত ব্যবসায় স্থাপিত হয় নাই।

(৩) খাদ্য দ্রব্য :—আম, কাঁঠাল, জাম, মহুয়া, খোবানি, আখরোট, নানা জাতীয় ঘাস প্রভৃতি অনেক দ্রব্য ভারতের নানা স্থানে দরিদ্র আরণ্য জাতিসমূহের সময়ে-সময়ে আহার যোগাইয়া থাকে। সাগু ও আরারুটও অনেক পরিমাণে বন্য উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত হয়।

(৪) রঞ্জক পদার্থ :—বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য উদ্ভিজ্জ পদার্থের ব্যবহার আজ-কাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু চামড়া রং করিবার জন্য এখনও বাবলা, ভারওয়ার, খোলাব ও গরাণ ছাল এবং হরিতকী ও বাবলা ফল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সমস্তই আরণ্য দ্রব্য।

(৫) আঠা ও বৃক্ষাদির নির্য্যাস—বাবলা আঠা, পলাশ, সিমুল ও বিজাশাল গাঁদা, ধুনা, লখান প্রভৃতি ব্যবসায়ের দ্রব্য। চির বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে তার্পিণ ও রজন প্রস্তুত হইতেছে। গর্জ্জন ও ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ ইন ও থিটনি তৈল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রবার চাষের চেষ্টা আসাম ও ব্রহ্মদেশে চলিতেছে।

(৬) গৃহসজ্জাদি এবং ইমারত ও নৌগঠনের-কাষ্ঠাদি :—এই সমুদয় শ্রেণীর দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য নানাবিধ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। বাঁশ, বেত, উইলো, খুঁজ, খর, প্রভৃতির সাহায্যে যেরূপ টেবিল, চেয়ার, ঝুড়ি, মাদুর, বাক্স, পেটরা, প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে, এতদ্দেশে এখনও সেরূপ হয় নাই। চীন ও বিশেষতঃ জাপানে এই সমুদয় উপাদান হইতে মনোহর কারু কার্য্যসম্পন্ন আসবাবাদি নির্ম্মিত হয়।

(৭) বিশেষ কার্য্যাদি :—পেন্সিল, খেলানা, প্যাকিং বাক্স, ঝুড়ি, ক্রিকেট, টেনিস, প্রভৃতি ক্রীড়ার সরঞ্জাম, শ্লীপার ও কাষ্ঠপিণ্ড প্রস্তুতের উপযোগী কাষ্ঠ ভারতীয় আরণ্যসমূহে যথেষ্ট পরিমাণ আছে; কিন্তু এ সকলের সামান্য অংশ মাত্রই ব্যবহারে আসিয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে গৌণ আরণ্য ফসলের কেবলমাত্র শ্রেণীরই উল্লেখ করা চলে। আমরা প্রত্যেক শ্রেণীতে যে দুই চারিটি দ্রব্যের নাম করিয়াছি, সে গুলি শুধু শ্রেণীর প্রতিভূ। প্রত্যেক শ্রেণীতে ঐ প্রকারের বহুসংখ্যক দ্রব্য আছে এবং যে গুলির নামোল্লেখ করিতে গেলে একটি ছোট-খাট পুস্তিকা হয়। তবে এই স্বল্প তালিকা হইতেই বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, গৌণ আরণ্য ফসলের প্রাচুর্য্যতার অনুপাতে কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা নগণ্য। সে সমুদয় ফসল আজকাল অবহেলায় অপচয় হইতেছে, তৎসমুদয়ের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ সুমহান, তাহা আমরা জঙ্গলের জনৈক কর্ত্তৃপক্ষের উক্তির দ্বারাই দেখাইব।

বিগত বৎসর শ্রম-সমিতির (Indian Indiustrial Commission) অধিবেশনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় মধ্য-প্রদেশের Chief Conservator of Forests, মিঃ হিল্ বলিয়াছেন; It was in the utilisation of the minor forest products that the greatest possibilities of Commercial development existed. There was a great amount of work still to be done and the prospects were such as to justify fully a large staff of experts The existing staff could only undertake enquiries into a few of the numerous products available. What was essentially wanted was a body of highly trained practical experts who would make full investigations into single products or groups of products on a large scale to demonstrate their commercial value."

ভাবার্থ:—গৌণ্য আরণ্য ফসলের সদ্ব্যবহারেই ব্যবসায়ের সর্ব্বোতোভাবে উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা। এখনও বিপুল পরিমাণ কার্য্য অসাধিত রহিয়াছে। ঐ সমুদয়

কার্য্যের ভবিষ্যৎ এরূপ আশাপ্রদ যে বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা আদৌ অসঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান কর্ম্মচারিবর্গ অপরিমিত ফসলসমূহের মধ্যে কেবল দুই একটির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারেন। কিন্তু এখন একদল উচ্চ শিক্ষিত, ব্যবহারজ্ঞান সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ বিস্তৃতভাবে বিশেষ বিশেষ ফসল অথবা ফসলশ্রেণী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান করেন ও উঁহাদের ব্যবসায় হিসাবে আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন, ইহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

স্থূল হিসাবে ধরিতে গেলে, এখন রাজসরকার বন-বিভাগ রাখিয়া প্রধানতঃ কাঠেরই কারবার করিয়া থাকেন। কিন্তু শুধু তাহা করিলেই চলিবে না। গৌণ আরণ্য ফসলসমূহ যাহাতে অপচিত না হইয়া, ব্যবহারে আসিয়া দেশের ধনাগমের পন্থা সুগম করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতৎ সম্বন্ধে শুধু পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা বাতুলের কার্য্য। সরকারের কর্ত্তব্যের ন্যায় জনসাধারণেরও কর্ত্তব্য আছে। সরকারী বিশেষজ্ঞ অথবা কর্ম্মচারিগণ বিশেষ-বিশেষ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তৎসমুদায় যে ব্যবসায়ে লাভজনক হইতে পারে, তাহা প্রতিপাদন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সমুদায় দ্রব্য লইয়া সরকার যে এক-একটা ব্যবসা খুলিয়া বসিবেন, সেরূপ আশা করাই অসঙ্গত। দেশের জনসাধারণও এতদ্বিষয়ে সচেষ্ট হউন, তাঁহারাও যেন প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে পশ্চাৎপদ না হন।

বস্তুতঃ কাঁচামাল লইয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় গবর্ণমেণ্টের কতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞই বিগত শ্রম-সমিতিতে নানারূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। বন-বিভাগের ব্যবহারতত্ত্ববিৎ মিঃ পিয়ারসন্ বলেন যে, একেবারে নূতন ধরণের কায হইলে স্বয়ং, এবং তাহা না হইলে অংশীদাররূপে গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করিতে পারেন। পক্ষান্তরে Chief Conservator মিঃ হিলের মত এই যে, সরকারের আর্থিক সাহায্য দান অনাবশ্যক। ইহাতে বর্ত্তমান কারবারসমূহের অনিষ্ট হইতে পারে এবং স্বাধীন চেষ্টাও পূর্ণরূপে স্ফুর্ত্তি না পাইতে পারে। উভয় পক্ষের উক্তির মধ্যে যে কতক পরিমাণে সত্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের কতক পরিমাণে পথ প্রদর্শন করা আবশ্যক; কারণ দেশীয় ব্যক্তিবর্গ এখনও গৌণ আরণ্য ফসল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এই বিষয়ে প্রথমতঃ তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও পরে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যোগদানের প্রবৃত্তি সঞ্চারণ, এই দুইটীই আপাততঃ মুখ্য কার্য্য। এই দুইটি কার্য্যে শিক্ষিত জনগণ সাহায্য না করিলে শুধু গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কোন ফল ফলিতে পারে না। সুতরাং সরকারের কার্য্য আংশিক রূপে শিক্ষাপ্রদ এবং অবশিষ্ট ব্যবসায়োপযোগী হওয়া আবশ্যক।

আমরা এতক্ষণ নানাবিধ আরণ্য ফসলের প্রাচুর্য্য ও ব্যবহারাভাবে অপচয়ের বিষয় আলোচনা করিলাম। এক্ষণে উক্ত অপচয় কি প্রকারে নিবারিত হইয়া অরণ্য সমূহ হইতে

অধিকতর ধনোৎপাদনের উপায় হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। বন-বিদ্যা বিষয়ক উচ্চশিক্ষা, বনবিভাগের পুনর্গঠন ও অধিক সংখ্যক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং বর্ত্তমান বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থনীতির প্রশ্নাদির উল্লেখের এস্থলে স্থানাভাব। শুধু সাধারণের পক্ষ হইতে কোন্-কোন্ কার্য্যের অচিরে অনুষ্ঠান হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাই আমরা বলিব।

(১) ভারতীয় বনসমূহে ব্যবসায়োপযুক্ত কি কি দ্রব্য পাওয়া যায়, স্থানবিশেষ তাহাদের প্রাচুর্য্য কিরূপ, যথাসম্ভব স্বল্পব্যয়ে কিরূপে তৎসমুদয় সংগৃহীত হইতে পারে, এই সমুদয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। আমরা স্বকীয় অভিজ্ঞতার ফলে অবগত আছি যে, বন-বিভাগের কর্ম্মচারিবর্গ কাষ্ঠ ভিন্ন অন্য কোন আরণ্য পদার্থের সঠিক খবর কদাচিৎ দিতে পারেন। ফলতঃ ইচ্ছা থাকিলেও কোন ব্যবসায়ী কোন বিশেষ আরণ্য ফসল কাজে লাগাইতে পারে না। সুতরাং যত শীঘ্র উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা এই কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ততই ভাল।

(২) ব্যবহারিক আরণ্য ফসল বিষয়ক প্রদর্শনাগার প্রতিষ্ঠা।—ব্যবসায়ীর সম্মুখে ব্যবসায়োপযুক্ত দ্রব্যের নমুনা থাকিলে তবে তাহারা উহার সন্ধান লইতে প্রবৃত্তি হয় এবং এইরূপ অনুসন্ধানই কালক্রমে ব্যবহারে পর্য্যবসিত হয়। প্রত্যেক বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্রে এইরূপ এক-একটি প্রদর্শনাগার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। উহাতে শুধুই যে কাঁচামাল থাকিবে তাহা নহে, কাঁচা মালের পার্শ্বে উহা হইতে কি কি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে অথবা হইতে পারে, তাহারও নমুনা থাকা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

(৩) সাক্ষাৎ ভাবে আরণ্য ফসল হইতে আপাততঃ অতি অল্প সংখ্যক শিল্পাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা কোন বিশেষ শিল্প অথবা ব্যবসায়ের জন্য আরণ্য পদার্থ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে সরকারের যথাসম্ভব সাহায্য করা উচিত। অবশ্য এস্থলে আরণ্য পদার্থ এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, উহা ইতঃপূর্ব্বে বিশেষ কোন কাজে আসে নাই। কার্য্যতঃ আমরা দেখিয়াছি যে, কোন বিশেষ ফসল অধিক পরিমাণে ব্যবহারের পথ সুগম না করিয়া দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বরং বাধাই দিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধুয়া এই যে ফসল অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিলে উহা একবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সংগ্রহের সহিত সমমাত্রায় সংরক্ষণ ও উৎপাদনও যে সম্ভব, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। কোন নূতন জিনিস বাজারে চালাইতে হইলেই, ব্যবসায়ীকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য কিছু অধিক মাত্রায় লাভ দিতে হইবে। ব্যবসায়ের এ মূল-মন্ত্রটা বনবিভাগের কর্ম্মচারিবর্গের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধিক-কালব্যাপী কিম্বা স্বল্প হারে জমা, সম্ভবত সামান্য রয়েলটি অথবা অন্য কোন প্রকার বিশেষ সাহায্য প্রদান না করিলে আরণ্য ফসল লইয়া নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব।

(৪) আরণ্য ফসল-সম্ভূত অনেক ছোটখাট ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠার প্রধান

অন্তরায়—উপযুক্ত কলকজাদির অভাব। আমাদিগের দেশের জল-হাওয়া ও আর্থিক অবস্থার উপযুক্ত স্বল্প মূল্যের কল সব সময়ে পাওয়া যায় না। সেই জন্য যাহাতে বিশেষ-বিশেষ প্রকারের ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের উপযোগী কলকজাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তৎ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন। শ্রমসমিতির সভাপতি স্তর টমাস্ হল্যাণ্ড বোম্বাই সহরে ভারতীয় মহাজন সমিতির নিমন্ত্রণে গিয়া এই কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আরণ্য দ্রব্যাদি হইতে তৈল, গন্ধদ্রব্য, ঔষধ ও অন্যান্য প্রকারের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের পথ অনেকটা প্রশস্ত হইবে।

(৫) বন-বিভাগ হইতে নানা বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাবহুল ইংরেজিতে লিখিত। ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ যে অবোধ্য, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণও উক্ত গ্রন্থাদির অস্তিত্ব প্রায় অবগত নহেন; এবং অবগত থাকিলেও নিতান্ত জটিল বোধে পাঠে বিরত থাকেন। অবশ্য বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর অবগতির নিমিত্ত রচিত গ্রন্থাদি বৈজ্ঞানিক ভাষায়ই রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাদিগের দেশের স্বভাবজ দ্রব্যকে ভিত্তি করিয়া এই সমুদয় গ্রন্থ লিখিত এবং যাহাদিগকে উক্ত সমুদয় দ্রব্যের ব্যবহার অবগত করান বনবিভাগের চরম উদ্দেশ্য, তাহাদিগের জাতীয় ভাষা ইংরেজি নহে। কৃষিবিভাগ আজকাল অনেকটা ঠেকিয়া শিখিয়া দেশীয় ভাষায় তথ্যাদি প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বনবিভাগেরও উক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবার সময় আসিয়াছে। বনবিভাগের অনেক বিবরণী ও পুস্তিকার মধ্যে ব্যবসায়ীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বহুবিধ বিষয় আছে। সাধারণের অবগতির জন্য এইরূপ পুস্তিকাদির সার-সঙ্কলন করিয়া সহজ ইংরেজী ও প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে দেশের যে ফসলের ব্যবসায় চলিতে পারে, অথবা যেস্থলে যাহার প্রাচুর্য্য অধিক, সেই দেশে স্থানীয় ভাষায় সেই ফসল সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে প্রচারিত হইলে লোকের অনুসন্ধিৎসা যে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্রিক্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই অনুসন্ধিৎসা বৃত্তিই সকল শিল্প বাণিজ্যের মূল ভিত্তি। আমরা অবশ্য ইহা বলি না যে, বনবিভাগের সমস্ত গ্রন্থাদিরই অনুবাদ প্রকাশিত হউক। সামান্য বিবেচনা করিলে কর্ত্তৃপক্ষ নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন যে, বিষয় বিশেষ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। এইরূপ স্থলেই জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রাদেশিক ভাষায় সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমরা এই মাত্র বলিতে চাহি যে, কাঁচা মাল উৎপাদন ও সংগ্রহ—আজকাল সভ্যজগতের একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহার দেশে যাহা কিছু কর্ষিত অথবা বন্য ফসল আছে, সকলেই তৎসমুদায়ের পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করিবার

চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। আমাদিগকে উৎপাদন করিতে হইবে না; প্রকৃতি আমাদিগের জন্য যাহা উৎপাদন করিয়া দিতেছেন, তাহাই কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিলেও আমাদিগের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়।

১। Pearson, R. S.—Commercial Guide to Forest Economic Products.

২। Troup, R. S.—Indian Wood and their Uses.

৩। Dutt, N. B.—Commercial Medicinal Plants of India, Rep. Ind. Assosn. for Cult. Sc. 1914.

৪। Statistical Abstract for British India, Vol. II, Financial Statistics, 1913-14.

৫। Report of Evidence Given before the Indian Industnial Commission, 1916-17.

চা-বাগান—আজকাল চায়ের প্রচলন খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতে, য়ুরোপে এবং অন্যত্র ধনী, দরিদ্র ইতর ভদ্র সকলেই চা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চায়ের ব্যবহার প্রয়োজনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। ভারতের চায়ের খ্যাতি খুব। সিংহলেও চা উৎপন্ন হয় কিন্তু ভারতে উৎপন্ন চা গুণে গন্ধে সিংহল চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কতিপয় বিলাতী কোম্পানি ভারতীয় চায়ের আদর দেখিয়া তাহা লইয়া ব্যবসা করিবার সুযোগ ছাড়েন নাই। তাঁহারা ইহা হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। আসামে এবং সিলিগুড়ি ও দার্জ্জিলিঙে সাহেবেরা অনেকগুলি চা বাগান রচনা করিয়াছেন। বাঙালীরও অনেক চা বাগান আছে। বাঙলার মাটির বা জল হাওয়ার দোষই হউক বাঙলার মাটিতে যৌথ কারবার বদ্ধমূল হয় না এবং কি জানি কেন উহা যেন অধিক দিন টীকে না। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বাঙলার পার্ব্বতীয় আদ্র জল হাওয়া ও মাটিতে চা গাছগুলি ভাল রকম জন্মিতেছে এবং চা বাগানের যৌথ কারবার গুলিও বদ্ধমূল হইয়া দেশের লোকের কল্যাণ সাধন করিতেছে। চা সম্বন্ধে লোকের যাহাতে কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে এই জন্য আমরা প্রবন্ধান্তরে চা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করিলাম। আসাম দার্জ্জিলিঙের মত চা আর কোথাও হয় না—দার্জ্জিলিং চায়ের খ্যাতি—সুগন্ধের' জন্য, আসাম চায়ের খ্যাতি চায়ের জলের রঙের জন্য।

খড়িবাড়ী চা কোম্পানী—এই কোম্পানীর মূলধন ১৫০০,০০ টাকা বাগানের আয়তন ৮০০ একর; ১ একর কিঞ্চিৎ অধিক তিন বিঘা। প্রত্যেক অংশের দাম ১০৲ মাত্র। কৃতবিদ্য লোক ইহার পরিচালক। এই কোম্পানীর সেয়ার (অংশ) খরিদ করিলে নিশ্চিত লাভ হইবার সম্ভাবনা। জানিতে চাহিলে বিশেষ বিবরণ জানান যায়। কৃঃ সঃ।

পত্রাদি

হোগলা—

মাননীয় শ্রীযুক্ত "কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

গত ১৩২৩ বঙ্গাব্দের "কৃষিসম্পদ" পত্রিকার মাঘ ও ফাল্গুনের সংখ্যায় ২৬১ পৃষ্ঠায় আমার লিখিত টাইফা (Typha) নামক জলজ উদ্ভিদের চাষ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাতে বহু ভ্রম প্রমাদ থাকা ইত্যাদি বিবরণে, আপনার "কৃষক" পত্রিকায় বর্ত্তমান সনের জৈষ্ঠের সংখ্যায় একটী সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। আমি উহা পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। প্রকৃত পক্ষে উহাতে উল্লেখযোগ্য কোন ভুল ভ্রান্তি থাকিলে এবং সমালোচক মহাশয় সরলভাবে তাহা দর্শাইলে সুখী হইতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহার উদ্ভিদ বিদ্যায় সমিচীন জ্ঞানের অভাব, তাঁহারা অন্যের ভ্রম প্রদর্শন করিতে অগ্রবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত।

সমালোচক মহাশয় ঐ প্রবন্ধে যে কয়েকটী ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল এবং উহার উত্তর ও যথাস্থানে প্রদত্ত হইল।

১। "লেখক কোন্ উদ্ভিদ বেত্তার মতে, Typhaceæ genusকে Gramineæ বর্গের অন্তর্গত করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এতদিন তো উহা Typhaceæ বর্গেরই অন্তর্ভূত ছিল।"

Cyperus Triandria monogynia এই বৃহজ্জাতির অন্তর্গত। পক্ষান্তরে Typha monicea Tiandria এই বৃহজ্জাতির অন্তর্গত। উভয়েই ঘাস পরিবারের অন্তর্ভূত। ইহাদের ফলের বীজের পুষ্পের পুষ্পদণ্ডের (culmus) ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রূপ, আকার স্বভাব, ও পুষ্পবিন্যাস প্রণালী ইত্যাদি দ্বারা ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন অন্তর্জ্জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

Typhaceæ ও Cyperaceæ ঘাস পরিবারেরই typical sub-genera, অতএব Typhaকে ঘাস পরিবার gramineæ ভুক্ত করা অসঙ্গত হয় নাই। তবে যাহারা উদ্ভিদ বিদ্যায় তত পারদর্শী নহেন তাহাদের সুবিধার জন্য ইহাদের natural order Typhaceæ ও Cyperaceæ লেখাই সঙ্গত।

উদ্ভিদের নাম সকল ল্যাটীন (Latin) ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নামেরই অর্থ আছে। এই ল্যাটীন নামসমূহের ধাতুগত অর্থ শিক্ষা না করিলে উদ্ভিদ বিদ্যায় সম্যক পারদর্শিতা লাভের আশা করা বৃথা।

সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে "টাইফার Typha প্রথমোক্ত জাতির নাম

Typha augustifolia নহে Typha angustifolia" এটি সমালোচকের গুরুতর ভ্রম। Latin ভাষায় angust কোন শব্দ নাই। ইংরেজী ভাষায় august শব্দ Latin ভাষার augustata, augusta বা augusti এই শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। Augusta, augustata or augusti শব্দের অর্থ majestic বৃহৎ এবং folia শব্দের অর্থ foliage পাতা।

ডাক্তার ওয়াট (Dr Watt) ও ডাক্তার রক্স বার্গের (Dr. Roxburgh) গ্রন্থে augustifolia শব্দের "u" অক্ষরটী Compositorএর ভ্রমে উল্টিয়া নিয়া "n" অক্ষরে পরিণত হওয়ায় শব্দটীর Spelling ভুল হইয়াছে। Firmingers manual of gardening নামক পুস্তকের ৩৩৫ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য গ্রন্থকারের উদ্যানিক গ্রন্থনিচয় পাঠ করিলেই সমালোচকের ভ্রম-বিদূরিত হইবে।

সমালোচক তাঁহার সমালোচনায় স্থানান্তরে লিখিয়াছেন "T. Minor ও T angustifolia দুইটী স্বতন্ত্র species কিম্বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষে একটী আর একটী রূপান্তর তৎসম্বন্ধেও মতভেদ আছে"। আমি ইহার উত্তরে বলিব—না। রক্স বার্গের Roxburgh's Flora Indica নামক গ্রন্থের ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের editionএর ৬৪৯ পৃষ্ঠায় শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে কাহার কি মতভেদ আছে তাহা জানাইলে বাধিত হইব।

৩। উত্তর—জার্ম্মানিতে টাইফার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সমালোচক এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। নিজে যাহা দেখেন নাই বা জানেন না, তদ্বিষয়ে সমালোচনা করা ধৃষ্টতার পরিচয় দেওয়া বই আর কিছুই নহে।

জর্ম্মানিতে ইতিপূর্ব্বে gunwoodএর জন্য পাট বা তুলার ব্যবহার হইত। বর্ত্তমান যুদ্ধ বিগ্রহাদি হেতু, জর্ম্মনীতে এই উভয় দ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ হওয়ায়, জর্ম্মানী টাইফাতন্তু ও টাইফা মূল দ্বারা উপরোক্ত অভিপ্রায় সাধন করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরেই এই বিষয়টী সমস্ত পৃথিবীতে সংবাদপত্র নামক যন্ত্রযোগে রাষ্ট্র হইয়াছে। সমালোচক ইহা জানে না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

মার্কিন পৃথিবী মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্রে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। সমালোচক বলেন "মার্কিনের সংবাদ পত্র হইতে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা সঙ্গত নহে। মার্কিন কেন ইউরোপের অধিকাংশ সংবাদপত্রে এই বিষয়টী প্রকাশিত হইয়াছে। বহুকাল হইল উহা এদেশেও প্রচারিত হইয়াছে। সমালোচক মহাশয় দেশীয় এবং বৈদেশিক কথানা সংবাদপত্র পাঠ করেন তাহা আমরা জানিনা। সংবাদপত্র পাঠ করিলে, তিনি কখনই এই ভিত্তিহীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

সমালোচক বলেন, Typha augustifoliaর বর্ত্তমান নাম Typha angustata

অর্থাৎ Chaub and Bory হইয়াছে। তাঁহার এই উক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ইংরেজী ভাষায়ও তাঁহার জ্ঞানাভাব।

৪। সমালোচক বলেন, "হোগলা Typha ভারতবর্ষের নানাস্থানেও যে অতি সুলভ, তাহা সম্ভবতঃ কেহই অবগত নহেন। এরূপ অনুমান করার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, বস্তুতঃ সে সকল স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হোগলা জন্মিয়া থাকে &c."।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ। জামালপুর, ময়মনসিংহ।

গুহ মহাশয় বহুকাল হইতে কৃষিবিদ্যার চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার ন্যায় কৃষিকার্য্যে উৎসাহী ব্যক্তি বিরল। তাঁহার পত্রের সারাংস এ স্থলে প্রকাশিত হইল। যে কয়েকটি বিষয়ের গুহ মহাশয় প্রতিবাদ করিয়াছেন সে কয়েকটির প্রত্যুত্তর আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। (১) রক্স বর্গের 'ফ্লোরা ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থে উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগের যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে উহাকে Linnean অথবা কৃত্রিম প্রণালী বলে। উহা বর্ত্তমান উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে প্রচলিত নাই। এক্ষণে Jussieuan অথবা প্রাকৃতিক প্রণালীতেই শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে এবং বেন্থাম ও হুকার নামক সুবিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিৎ পণ্ডিতদ্বয় Genera Plantarum গ্রন্থে যেরূপ রীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহাই আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। ভারতীয় উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ Hooker's Flora of British India। বঙ্গ দেশের পক্ষে Prain's Bengal Plants প্রমাণ্য গ্রন্থ। এতদুভয় গ্রন্থেই হোগলা Typhaceæ প্রাকৃতিক বর্গের অন্তর্গত (Flora of British India Vol VI P. 489 ; Bengal Plants Vol. II. P. 1102)। এতদ্ভিন্ন হোগলার সহিত Cyperaceæর ব্যাহিক কতক সাদৃশ্য থাকিলেও বংশগত লক্ষণাদির হিসাবে উহার যে Cyperaceæর সহিত দূর সম্পর্ক তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইবে—"Typhaceæ are marsh herbs and the habit and general appearance of these plants resemble those of Cyperaceæ and the hairs of the flower of Typpa are analogous to those at *Eriophorum;* but they belong to the Araceous type, and the structure of the inflorescence approaches closely, in *Sparganium* especially, to that of Pandanaceae. There is also some resemblance in the inflorescence and in flowers to Platanaceae." (Henfry's Botany P. 369). (২) লাটিন ভাষায় ANgusta বলিয়া শব্দ আছে—তাহার অর্থ সরু। যে কোন Latin English Dictionoryতে গুহ মহাশয় উহা দেখিতে পাইবেন। হোগলার অপর জাতি Typha elephantina অপেক্ষা পাতা সরু বলিয়া এই জাতির নাম

Typha angustifolia হইয়াছে। ইহা ছাপাখানার ভূতের কার্য্য নহে। রক্সবর্গ Typpa minor কেই T. angustifolia বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ T. minor, T. minima, T. Laxmanni ও I. Bungeana সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। ঐ সমুদয় গ্রন্থের উল্লেখ Journal of the Linnean Society vol xxxvi. pp. 171-172 এ পাওয়া যাইবে। (৩) গুহ মহাশয় যদি কোন প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক পত্রিকার নামোল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিতেন তাহা হইলেই সঙ্গত হইত। জর্ম্মানিতে হোগলা ব্যবহার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন বক্তব্য নাই কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় উক্ত ব্যবহার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, সেই লইয়াই কথা। এপর্য্যন্ত তাহারত কিছু সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রক্সবর্গের Typha angustifolia, willd যে আধুনিক গ্রন্থাদিতে Typha angustata, Chaub & Bory হইয়াছে তাহা Flora of British India ও Bengal Plants এ দেখিতে পাইবেন। Chaub & Bory উদ্ভিদ্‌ বেত্তাগণের সংক্ষিপ্ত নাম। ইঁহারাই প্রথমে এই জাতির বর্ণনা করেন সেই অন্য জাতির নামের সহিত ইঁহাদের নাম সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উদ্ভিদ্‌ অথবা প্রাণীগণের নাম কারণে ইহাই চলিত রীতি। কোন গ্রন্থে এই জাতির প্রথম বর্ণনা হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত Linnean Societyর Journal এ দেখিতে পাইবেন। ৪র্থ—সমালোচক এস্থলে ইহাই বলিয়াছিলেন যে হোগলার প্রাচুর্য্য ও ব্যবহার অনেকেই জানেন। কেহই অবগত নহেন এরূপ অনুমানের আবশ্যক কি? সম্পাদক, কৃষক]

"প্ল্যানেট জুনিয়র হো"—

শ্রীশশীভূষণ অধিকারী শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন—"প্ল্যানেট জুনিয়ার হো" নামক বিলাতী যন্ত্রখানির ব্যবহার কি প্রকার ইহাতে লাঙ্গল বা কোদাল কোন কাজ হয়, ইহা ব্যবহারে চাষের খরচ কমে কি না? দাম কত এবং কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর—আমরা ইতিপূর্ব্বে কৃষি যন্ত্রাদি সম্বন্ধে কৃষকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ইহা এক আধারে লাঙ্গল কোদাল উভয় কার্য্যই করে। বিবিধ প্রকারে ফলা সংযোগে বিবিধ কার্য্য সংসাধিত হয়। ইহাতে ক্ষেত কোপান ও ক্ষেত নিড়ান কার্য্য উভয়ই চলে। ইহার দাম এখন ৩৫৲।৩৬৲ টাকার কম নহে এবং বাজারে এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য নতুবা কলিকাতা বাজারে মিলিত। আমরা সম্প্রতি অবগত হইয়াছি যে রঙ্গপুর বুড়িরহাট কৃষি-ক্ষেত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ তাঁহার নিজ কৃত একটি লাঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা বিলাতী প্ল্যানেট জুনিয়র হোর অনুরূপ ও ফলাযুক্ত তাঁহার লাঙ্গলের দাম ১০৲-১২৲ টাকা মাত্র। প্ল্যানেট জুনিয়র হো ধান ও

পাটের ক্ষেতের তাদৃশ উপযোগী না হইলেও আলু ও তামাক ক্ষেতে ভাল কাজ করে। কামিনী বাবুর লাঙ্গল উহা অপেক্ষা অধিকারী বলিয়া পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমানিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার ক্ষেত্রে পরিচালন জন্য উক্ত লাঙ্গলের উদ্ভাবনা করিয়াছেন। উহা সাধারণের পাইবার সুবিধা হইবে কিনা আপনি পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন অথবা আমরাও খোঁজ লইতে পারি। প্ল্যানেট জুনিয়া হো আখের ক্ষেতে বেশ কাজ করে এবং অনুমান করি কামিনী বাবুর নূতন লাঙ্গল ও আখের ক্ষেতে তদনুরূপ বা তদপেক্ষা ভাল কাজ করিবে।

চা প্রসঙ্গ

বহুদিন অবধি এদেশে চাষের আবাদ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যবসায় যেরূপ লাভ জনক দাঁড়াইয়াছে এবং জন সাধারণের যেরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে তাহাতে বোধ হয় চা সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করিলে তাহা নিতান্ত অসাময়িক এবং অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আসামের সর্ব্বত্র ও বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায়—প্রধানত দারজিলিং ও জলপাই-গুড়ীতে যথেষ্ট চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে চা আবাদ হইতেছে এবং চা ব্যবসায়ের দ্বারা এই সকল স্থানের যেরূপ উন্নতি এবং পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। যে সকল স্থান স্মরণাতীত কাল হইতে বন্য শ্বাপদসঙ্কুল অনুৎপাদিকা বন্ধুর ভূমিরূপে লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত ছিল সেই সকল স্থানে অরণ্যানী এখন বিরল পাদপ ও হিংস্র জন্তু শূন্য হইয়া পরম রমণীয় চা বাগানে পরিণত হইয়াছে এবং জনকোলাহলমুখরিত হইয়া কোটি কোটি মুদ্রার সংস্থান করিতেছে।

জলপাইগুড়ী জেলায় এক দুয়ার প্রদেশেই প্রায় দুই শতের অধিক বাগান রহিয়াছে; তন্মধ্যে প্রায় ৩০টি বাগান দেশীয় লোকের দ্বারা যৌথকারবারে চালিত। এই ৩০টি বাগানের মোট ভূমির পরিমাণ ৩০,০০০ একর। দুয়ার প্রদেশস্থ সমস্ত বাগানের পরিমাণ প্রায় ২,৪৬,০৬১ একর। তন্মধ্যে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ৯০,৮৫৭ একরে চা আবাদ হইয়াছে ও অবশিষ্ট ১,৫৫,২০৪ একর ব্যবসায়ীদের অধীনে আছে; ঐ অবশিষ্ট অংশ ক্রমে আবাদ হইবে। গত বৎসর ৮৩,৪২১ একর জমী হইতে "পাতিতোলা" হইয়াছে। মোট উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ৪৮,৮২০,৬৩৭ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রতি একরে গড়ে ৫১৪ পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর যেরূপ বাজার দর গিয়াছে তাহাতে উহার মূল্য প্রায় ২,১৩,৫৯,৩২৭ টাকা। এই সকল বাগান গড়ে

দৈনিক ৭৫, ৩১৫ কুলি কাজ করিয়াছে; ইহার মধ্যে ৫৬, ৩৯৩ স্থায়ী ও অবশিষ্ট অস্থায়ী কুলি।

জলপাইগুড়ীর দেশীয় সমিতি চালিত চাবাগান-সমূহের বিশেষত্ব।—জলপাইগুড়ীতে দেশীয় লোক চালিত চা-বাগান সকলের সংখ্যা ইউরোপীয় বাগান অপেক্ষা অত্যন্ত কম হইলেও, লাভের হার দেশীয় বাগানে অত্যন্ত বেশী। দেশীয় বাগান ইউরোপীয় বাগান অপেক্ষা পাঁচগুণ, সাতগুণ, এমন কি দশগুণ অধিক লাভও দিয়া থাকে। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটি দেশীয় চা বাগানের নাম ও লাভের শতকরা বার্ষিক হার প্রদর্শিত হইল, তাহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে ব্যবসায়ের ইতিহাসে চা কিরূপ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে :—

যে বৎসর শতকরা যত টাকা লাভ দিয়াছে

১৯০৬	'০৭	'০৮	'০৯	'১০
গুর্জ্জন ঝোরা বাগিচা				
৮০	১২৫	১১০	১৫০	১১০
চা মুর্চি বাগিচা				
১০০	১২০	৫০	১২০	১৫০
বর্ণারপুর (আসাম)				
৪০	৬০	৩২	৪৮	৪৮

জলপাইগুড়ীর প্রত্যেক বাগিচাই আশাতীত লাভ দিয়া আসিতেছে। উপরিউক্ত প্রথম দুইটি বাগানের প্রতি ৫০৲ টাকার এক এক অংশ আজ কাল ৯০০।১০০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রামঝোরা প্রভৃতি কয়েকটি নূতন বাগান যাহা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে খোলা হইয়াছে এবং যাহা এখনও লাভ দিতে আরম্ভ করে নাই, তাহার ৫০৲ টাকার অংশের বর্ত্তমান বাজার দর ৩০০।৩৫০ টাকা।

আসামই ভারতীয় চা ব্যবসায়ের আদি স্থান। আবার চায়ের উপযোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমী শ্রীহট্টস্থ করিমগঞ্জেই অধিক; সুতরাং শ্রীহট্ট সম্বন্ধেও ২।১টি কথা বলা সঙ্গত। এই জেলাতে প্রায় ৮০,০০০ একর জমিতে চা আবাদ হইতেছে; এতদ্ব্যতীত ব্যবসায়ীদের হস্তগত অনাবাদি জমীর পরিমাণও অল্প নহে। বিগত ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ ৮০,০০০ একর জমিতে প্রায় ৩,৮৭,৯২,৯৫১ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রচলিত বাজার দর অনুসারে ঐ চা-র মূল্য প্রায় ১,৫০,০০,০০০ টাকা। তন্মধ্যে দেশীয়গণ চালিত বাগানে প্রায় ১৫,০০,০০০ পাউণ্ড জন্মিয়াছিল। উহার মূল্যও ৫,৫০,০০০ টাকার ন্যূন নহে। ঐ জেলায় বিশেষত করিমগঞ্জ মহকুমায়—চায়ের উপযোগী যথেষ্ট জমী রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন সমগ্র আসাম ও বঙ্গদেশ মধ্যে করিমগঞ্জস্থ ভূমির ন্যায় উৎপাদিকা শক্তি অন্য কোন ভূমিরই নাই।

চায়ের দ্বারা দারজিলিঙের যে কি প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বেশ প্রণিধান করা যাইবে। যদিও বহু পূর্ব্ব অবধিই ঐ জেলায় চা আবাদ হইয়া আসিতেছিল, তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজী ১৮৭৪-৭৫ সাল হইতে তথায় রীতিমত চাষ আরম্ভ হয় এবং ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মোট ১৩টি মাত্র বাগান খোলা হয়। ঐ সমস্ত বাগানের ভূমির পরিমাণ মাত্র ৮১৪ একর ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে কার্য্যক্ষেত্র এরূপ বর্দ্ধিতায়ন হইয়াছে যে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এক মাত্র রাঁচি জেলা হইতেই ৮০,০০০ কুলি বাগানে কাজ করিবার জন্য আনয়ন করা হইয়াছিল। আদমসুমারিতে প্রকাশ যে বিগত ১৭।১৮ বৎসরে দারজিলিঙের লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। চা-বাগান সমূহে কুলির আমদানিই ইহার এক মাত্র কারণ। অধুনা ৩৬৮ বর্গ মাইল ভূমি ব্যাপিয়া বাগান খোলা হইয়াছে ১২৭ বর্গ মাইলে রীতিমত চা উৎপন্ন হইতেছে।

জলপাইগুড়ীস্থ জনসাধারণের মনের উপর চার প্রভাব।—এই ক্ষুদ্র সহরের অধিবাসীবর্গের মনের উপর চা যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা যিনি অন্তত কিছু দিনের জন্যও এখানে বাস করিয়া গিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন। এখানে চায়ের কথা ভিন্ন অন্য কথা নাই বলিলেই হয়। এমন লোক অতি অল্প যাঁহারা সমস্ত দিনে অন্তত এক বারও চা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না কিম্বা শোনেন না। উকীল মোক্তারগণ বার-লাইব্রেরিতে গিয়া চায়ের গল্প করিতেছেন, স্বল্পবিত্ত মসিজীবি কেরাণীগণের আফিসে গিয়া চাযের গল্প করা তাঁহাদের জীবনের একটি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

রমণীগণ তাঁহাদের মধ্যাহ্ন অবসর চায়ের গল্পে কাটাইতেছেন ও কাহার স্বামীর কোন্ বাগানের কত অংশ আছে তাহা প্রকাশ করিবার গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। বালক পুত্র বিধবা মাতার চায়ের অংশ তাহার নিজ নামে লেখাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত। দুবেলা মাকে তাগিদ দিতেছে। মোট কথা, আবালবৃদ্ধবনিতা—ধনী, নির্ধন, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, হাকিম, কেরাণী, পেয়াদা, দোকানদার কেহই চায়ের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। এমন কি, অন্যান্য স্থানে বর নির্ব্বাচনে, বরের বাড়ী ঘর দ্বার আছে কি না, জমি জারাত আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় খোঁজ করিয়া থাকে; কিন্তু এখানকার লোকের অবস্থার মাপ কাঠি চা-বাগানের অংশ। অমুকের চা বাগানের কতটা অংশ আছে জানিতে পারিলেই আর অন্য খোঁজের দরকার হয় না, তাহার অবস্থার সচ্ছলতা প্রতিপাদিত হইয়া যায় ও তাহার সহিত মেয়ের বিবাহের আর কোন বাধা থাকে না।

চা বাগানের অংশ লইবার জন্য মারামারি কাড়াকাড়ি আরও আমোদজনক। কোন একটি বাগান খোলা হইতেছে খবর পাইবামাত্র দলে দলে লোক সেই ভাবী অধ্যক্ষের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে এবং অংশের জন্য সহস্র সহস্র আবেদন

পত্র পড়িতে থাকে। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যেই সেই বাগানের মোট অংশসংখ্যার পাঁচগুণ, সাতগুণ আবেদন ভাবী অধ্যক্ষের হস্তগত হয়। লোকে টাকা লইয়া অধ্যক্ষের খোসামোদ করিতে থাকে এবং ভিন্ন স্থান হইতেও রাশি রাশি অর্থ ডাকযোগে আসিতে থাকে। এইরূপে ভাবী অধ্যক্ষের এমনি দশা হয় যে তিনি সকলকেই অংশ দিতে সমর্থ হন না, এবং এই অসামর্থ্য হেতু অনেক মনোমালিন্য ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় সহরের মাতব্বর লোকদিগর মধ্যেও অংশ লইয়া বিশেষ গোলযোগ বাধিতে দেখা যায়। বস্তুত এখানে চা বাগান খুলিতে টাকার অভাব মোটেই হয় না।

কিন্তু আসামের অবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত। সেখানে চা বাগানের অংশ বিক্রয় করিবার জন্য এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। আসামে অংশ ক্রয়করণ-সমর্থ লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ও সেখানকার বাগান সমূহের মূলধন সাধারণতঃ এখানকার কোম্পানি সকলের মূলধন অপেক্ষা বেশী; আমাদের বোধ হয় সেই কারণেই আমাদের ব্যবসায়ীদের এই অসুবিধাটুকু ভোগ করিতে হয়। যাহা হৌক, জলপাইগুড়ীতে চা-র উপযোগী ভূমি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কাজেই এখানকার ব্যবসায়ীগণ আসামে গিয়া বাগান খুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আসামক্ষেত্রে চায়ের উপযোগী যেরূপ বিস্তীর্ণ ভূমি রহিয়াছে ও সেখানকার রাজস্ব আদি যেরূপ সুবিধাজনক, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর কৃপায়, সেখানেও চা ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীগণ জলপাইগুড়ীর ন্যায় সফলতা লাভ করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারিবেন।

চা-দ্বারা জলপাইগুড়ীর উন্নতি—চায়ের কল্যাণে সমগ্র ডুয়ার প্রদেশ যেন একটি বিস্তীর্ণ কারখানায় পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই বাগানের প্রকাণ্ড চিম্‌নি সকল অনবরত ধূম উদ্গীরণ করিয়া সগর্ব্বে তাহাদের কার্য্যশীলতার পরিচয় দিতেছে। ইউরোপীয়গণের রমণীয় বাঙ্গলা সকল কখন বা পর্ব্বত গাত্রে কখন বা সমতল ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। বাগানের লাল রাস্তা দিয়া গাড়ী ঘোড়া ছুটিতেছে ও ট্রলি লাইনের উপর দিয়া "পাতি" পূর্ণ ট্রলি সকল সশব্দে দৌড়াইতেছে। বিদ্যুতালোক প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই; অর্থাৎ সমৃদ্ধির লক্ষণ সমূহ সমস্তই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। বেঙ্গল ডুয়ার রেলপথ শুদ্ধ এই চা বাগান সমূহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। অর্দ্ধচন্দ্রাকার-রেলপথ বাগান সকলের দ্বারে দ্বারে উহার সেবা বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সর্ব্বত্রই ডাকঘর এবং টেলিগ্রাফ-আফিস স্থাপিত হওয়ায় সংবাদ প্রেরণের কিম্বা গ্রহণের অসুবিধা বিদূরিত হইয়াছে। এ প্রদেশের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা জলপাইগুড়ীতে ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এই প্রদেশ লোকপূর্ণ করিবার জন্য সরকার বাহাদুর পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা

করিয়াছেন ও বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়ণের দ্বারা ঔপনিবেশিক আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ; কিন্তু এ সমস্ত উপায় তেমন ফলদায়ক হইতে পারে নাই। প্রবল পরাক্রান্ত সরকার বাহাদুর যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নহে, চা-ব্যবসায় উহার যাদুদণ্ড বুলাইয়া সে কার্য্য অনায়াসে সাধন করিয়াছে ; বিগত দশ বৎসরে আলিপুর দুয়ার প্রদেশের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

এই ব্যবসায় উপলক্ষে প্রায় ৩০০ শত ইউরোপীয় দুয়ারে বাস করিতেছেন, এবং তাঁহাদের আমোদ আহ্লাদের জন্য কোথায় বা ঘোড়দৌড়, কোথায় বা পোলো, র‍্যাগ্‌বি, হকি প্রভৃতির বন্দোবস্তে দুয়ার প্রদেশ সজীব করিয়া রাখিয়াছে ; চাকরী ব্যবসায়ী অসংখ্য বাঙ্গালী বাবু, ডাক্তার ইত্যাদিও তাঁহাদের উদরান্নের সংস্থান করিতেছেন ; আর সহস্র সহস্র কুলি প্রত্যেক বৎসর ভিন্ন জেলা হইতে আমদানি হইতেছে, কতক কার্য্যান্তে ফিরিয়া যাইতেছে কতক তথায় বসবাস করিতেছে।

এই চা-করদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত “ক্লাব” গৃহই জলপাইগুড়ীর শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা। ইহার সংস্থান সংরক্ষণের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দেশীয় বাগান সকলের সম্পাদকের কার্য্যালয় প্রায়শ জলপাইগুড়ি সহরে স্থাপিত। এই সমস্ত আফিসেই বাগান সকলের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। বাগান চালাইবার জন্য সময় সময় অর্থের অভাব হয় ও সে অর্থ ঋণ করিয়া চালাইতে হয়। ঋণ গ্রহণ করিতে যাহাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য এ সহরে ৪টি বড় বড় ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। এই সকল ব্যাঙ্ক বেশ চলিতেছে এবং আশানুরূপ লাভ দিতেছে। বস্তুত জলপাইগুড়ী ক্ষুদ্র সহর হইলেও ইহা একটি সুন্দর বানিজ্য কেন্দ্র।

যে চা সভ্য জগতের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, যাহার জন্য বহু গবেষণা. পরীক্ষা অর্থ ব্যয় প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রাথমিক ইতিহাস, ক্রমোন্নতি, প্রসার, চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি একবার আলোচনা করা যাউক।

প্রাথমিক ইতিহাস*।—বহু প্রাচীন চীন অভিধানে কিয়া (kia) এবং কু-টু (ku-tu) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। (k'u) শব্দের অর্থ তিক্ত ও টু (tu) শব্দ, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, উহার বিশেষ অর্থ চা। চীন শব্দ চা (ch'a) অপেক্ষা কৃত আধুনিক, এবং উহা খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে টু শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে যদিও চা শব্দ চীনের অতি প্রাচীন গ্রন্থেও স্থান পাইয়াছে, তথাপি উহা ৭ম কিম্বা ৮ম শতাব্দীর বহুপূর্ব্ব হইতে চীন দেশে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে নাই। চা-র প্রচলন চীনদেশে বহু পুরাতন হইলেও, বোধ হয়, চীনবাসীরা পূর্ব্বে উহা পানীয়রূপে ব্যবহার

* Sir George Watt's Commercial Products of India,

করিত না। ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন সম্রাটের শ্বশুর ওয়াং মেং প্রথমত চা পানীয়রূপে ব্যবহার করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু ঐ পানীয় অত্যন্ত তিক্ত হইত বলিয়া তাঁহার বন্ধুগণের অধিকাংশই অসুস্থতার ভাণ করত উহা পান করিতেন না। চা-পু (cha'-pu) নামক চা সম্বন্ধীয় চীনগ্রন্থ ১০ম হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় প্রকাশিত হয়; সেই গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে একজন পুরোহিত সম্রাট ওয়েন্‌টিকে (৫৮৯-৬০০ খ্রীঃ অঃ) শিরঃপীড়া নিবারণের জন্য চা পাতা সিদ্ধ করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ধর্ম্ম নামক কোন ভারতীয় রাজপুত্র জাপানে চায়ের গাছ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, জাপানের জনশ্রুতি হইতে এইরূপ জানা যায়। যাহা হৌক, চীন জাপান প্রভৃতি দেশের লোক বহু পূর্ব্ব হইতে চা গাছের পরিচয় পাইলেও, চা পান যে ঐ দুই দেশেরও অপেক্ষাকৃত আধুনিক অভ্যাস, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। চীনে উহা ৮ম শতাব্দী হইতে রীতিমত বাণিজ্য দ্রব্যে পরিণত হয় ও ঐ সময় ট্যাং বংশের রাজত্বকালে চার উপর প্রথম রাজকর স্থাপিত হয়। কিন্তু জাপানে ১৩শ শতাব্দীর পূর্ব্বে উহার রীতিমত আবাদ আরম্ভ হয় নাই। ঐ দুই দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অংশে চা-পান রীতি অত্যন্ত আধুনিক; যেহেতু, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, পারসিক, আরবিক প্রভৃতি ভাষার প্রামাণিক-গ্রন্থে চা গাছের, অথবা প্রস্তুতীকৃত চার কোন নাম পাওয়া যায় না।

T'u ch'a spe, thsh প্রভৃতি চীন শব্দ এবং tsja cha ts-cha প্রভৃতি জাপ শব্দ প্রস্তুতীকৃত চায়ের সঙ্গে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং ঐ সকল শব্দ te, ray, the, cha, chai, chia প্রভৃতিরূপ পরিগ্রহ করিয়া ইউরোপের এবং এসিয়ার অধিকাংশ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে প্রথম আমলের উচ্চারণ ও বর্ত্তমান উচ্চারণে প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে; যেমন, tea শব্দ; ইংরাজী ভাষায় আদৌ উহা te, tayএর ন্যায় উচ্চারিত হইত এবং সেই কারণেই কবিবর পোপ obey শব্দের সহিত উহার মিল দিয়াছেন, কিন্তু তার কিছুদিন পরই একজন ইংরাজ কবি উহার মিল করিয়াছেন Mrs P-র সহিত। বোধ হয় সেই সময় হইতেই টে, টি উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা chia, ch'a chai, ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া cha শব্দই গ্রহণ করিয়াছে।

যাহা হৌক, চীন ও জাপানে চা-পান প্রথা বহু পূর্ব্ব অবধি চলিয়া আসিলেও, ভারতে বোধ হয় উহার প্রচলন ১৭ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। চীন জাপান দেশে চা-পানের বিষয় বহু ভ্রমণকারী বহুগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা চীনামাটির পাত্রে চা পান করিত এবং ঐ সমস্ত সরঞ্জাম বন্ধুবান্ধবদের দেখাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিত, ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন সময়ের ভ্রমণকারীদিগের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে চা পানের উল্লেখ Albert de Mandelsloর গ্রন্থে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ঐ সময়েই ওলন্দাজগণ এই অভ্যাস ইউরোপে লইয়া যায় ও বিভিন্ন ব্যক্তির

যারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। লর্ড আরলিংটন ইংলণ্ডে উহার প্রথম প্রবর্ত্তক। সে সময় লণ্ডন সহরে এক এক পাউণ্ড চা ১০০।১৫০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত। ১৬৮৯ অব্দে বিলাতে আমদানি চায়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে পাঁচ শিলিং হিসাবে কর দিতে হইত। তখন চীনা চা মান্দ্রাজ ও সুরাট হইয়া বিলাতে আমদানি হইত। তখনও আসামে বন্য চা আবিষ্কৃত হয় নাই সুতরাং চীন হইতে চায়ের চারা এদেশে আনয়ন করা হয় এবং পরীক্ষা করিবার জন্য মালাবার উপকূলের কোন স্থানে উহার আবাদ করা হয়। বোধ হয়, ইহাই ভারতে প্রথম চায়ের আবাদ।

চীন হইতে আনীত চারা এদেশে সুফল প্রসব করিতে পারে নাই বরং ঐ বিদেশী আমদানী চা এদেশে চায়ের চাষকে অনেকদিন পর্য্যন্ত বাধা প্রদান করিয়াছে। যদি প্রথম অবস্থাতেই আসামজাত চা লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইত, তাহা হইলে এই ব্যবসা আরও বহুবর্ষ পূর্ব্বে সমৃদ্ধিযুক্ত হইতে পারিত। কিন্তু প্রথম ব্যবসায়ীগণ বিদেশী চায়ের মোহে ভুলিয়া, আসাম চা আবিষ্কৃত হওয়া সত্বেও, বিদেশী চায়ের আবাদ আরম্ভ করেন, এবং সেজন্য পরে তাঁহাদিগের বিশেষ অনুশোচনা করিতে হয়; যেহেতু এই ভ্রমের জন্য তাঁহাদের বহু অর্থ, বহু শ্রম ও সময় বৃথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আসামের অরণ্যে স্বচ্ছন্দ বনজাত চা-গাছের আবিষ্কার ভারতীয় চায়ের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সেই দিন হইতেই চা-ব্যবসায়ীদের অদৃষ্টে শুভ সূর্য্যের প্রথম রশ্মিপাত আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই স্বর্ণকিরণমণ্ডিত ললাট আজ সমস্ত জগতে বিস্ময়চমক আনয়ন করিয়াছে।

প্রথমত চীন হইতে সর্ব্বস্থানে চা প্রেরিত হইত। কিন্তু তথায় গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, ভারতে চা উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন বিবেচিত হয় এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। ১৭৭৮ অব্দে বিশেষজ্ঞগণ ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে জ্ঞাপন করেন যে বিহার, রংপুর এবং কুচবিহার চা আবাদের উপযুক্ত স্থান। এ সময় মেজর ব্রুস আসামে চা গাছ আবিষ্কার করেন। তারপর লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে এক সমিতি গঠিত হয় ও চায়ের আবাদ শিক্ষা করিবার জন্য চীনে লোক প্রেরিত হয়। এই সময়ে জেন্‌কিন্‌স্ সাহেব আসামে পুনরায় চা গাছ আবিষ্কার করেন; কিন্তু ঐ গাছ লইয়া সমিতির সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বলিতে থাকেন উহা টি নহে, ক্যামেলিয়া নামক এক প্রকার গাছ। যাহা হৌক, কিছু দিন পরে স্থির হয় যে ঐ গাছই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তখন প্রশ্ন উঠিল উহা কোথায় আবাদ করা যায়। আবার দুই মত; কেহ বলিলেন হিমালয়ে, কেহ বলিলেন আসামই উপযুক্ত স্থান। অবশেষে স্থির হইল যে ঐ দুই স্থানেই চাষকার্য্য পরীক্ষিত হইবে। সেই সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট ইহাও প্রকাশ করিলেন যে বাগান যখন সরকারের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারিবে তখনই উহা ব্যক্তি

বিশেষের কিম্বা কোম্পানী বিশেষের হস্তে অর্পিত হইবে। তারপর আবাদ চলিতে লাগিল, এবং আসামের বাগান অবিলম্বে সরকারের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু হিমালয়স্থিত বাগান বহু বর্ষ পর্য্যন্ত সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আসামজাত চা ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিলাতে প্রেরিত হয়। সেই সময় হইতে দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথম সরকারী বাগান—শিবসাগর জেলায় জয়পুর নামক স্থানে প্রথম সরকারী বাগান খোলা হয় ও ১৮৪০ অব্দে এই বাগান আসাম কোম্পানির নিকট বিক্রয় করা হয়। ঐ আসাম কোম্পানিই ভারতীয় কোম্পানি সমূহের মধ্যে বৃহত্তম। প্রথম অবস্থায় প্রায় ১৫ বৎসর যাবত এই কোম্পানি বিশেষ লাভবান হইতে পারে নাই। পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার উন্নতি আরম্ভ হয়। উহার উন্নতি সাধারণের এরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল যে "রাতারাতি বড় মানুষ" হইবার প্রয়াসে বহু ব্যক্তি বাগান খুলিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে শ্রীহট্টে এবং কাছাড়ে চা গাছ আবিষ্কৃত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই এত বহুসংখ্যক বাগান খোলা হয় যে সমগ্র উত্তর আসাম প্রকাণ্ড একটি চা বাগানে পরিণত হয়। প্রায় এই সময়েই দার্জ্জিলিঙে চায়ের চাষ আরম্ভ হয় এবং তাহার অব্যবহিত পরেই তাহা চাটগাঁ, ছোটনাগপুর ও দুয়ারে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৬৫ হইতে ১৮৬৭ পর্য্যন্ত প্রায় ২ বৎসর চায়ের অবস্থা বড় মন্দা পড়িয়াছিল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাধুতা এবং অভিজ্ঞতার অভাবই ইহার কারণ। ঐ সমস্ত অনিষ্টমূলক কারণ তিরোহিত হইবার পর চা ব্যবসায় এরূপ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে এখন সমস্ত ভারতে প্রায় ছয় লক্ষ একর জমিতে চা উৎপন্ন হইতেছে ও এতদ্ব্যতীত লক্ষ লক্ষ একর জমী ব্যবসায়ীদের হস্তে আছে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৪৮ পাউণ্ড চা ভারত হইতে বিলাতে রপ্তানি হইয়াছিল; কিন্তু এখন প্রতিবৎসর প্রায় ত্রিশ কোটি পাউণ্ড চা ভারত হইতে বিলাতে যাইতেছে, অর্থাৎ প্রত্যেক ভারতবাসী গড়ে ১ পাউণ্ড চা তথায় পাঠাইতেছে। ঐ পরিমাণ চায়ের মূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা।

চায় আবাদ—অন্যান্য আবাদে ফলই চরম লক্ষ্য, কিন্তু পাতাই চায়ের ফসল। প্রচুর পরিমাণ পাতা উৎপন্ন করিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইল। কিন্তু সেই পাতা কচি হওয়া চাই। বুড়ো পাতায় চা হয় না; অতএব যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ কচি পাতা অনবরত গজাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা এবং কচি অবস্থাতেই ঐ সকল পাতা তুলিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। পাতা কোন্ অবস্থায় কি প্রণালীতে উঠাইতে হয় তাহা না জানায় প্রথমত চা তেমন লাভজনক হইতে পারে নাই; কাল সহকারে অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে।

স্থান ও আবহাওয়া—চা আবাদের স্থান নির্ব্বাচন লইয়া প্রথমত

মতদ্বৈধ চলিয়াছিল। কেহ বলিলেন, উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ স্থানই উপযুক্ত, কেহ বলিলেন, আসামে স্বচ্ছন্দ নবজাত চা রহিয়াছে অতএব আসামই চা আবাদের পক্ষে অনুকূল, আবার কেহ কেহ নীলগিরির পরিবর্ত্তনবিহীন আবহাওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়াছিলেন। ফলে দেখা যাইতেছে যে উপরিউক্ত প্রত্যেক স্থানেই চা উৎপাদনের অনুকূল অবস্থাসকল বর্ত্তমান। কিন্তু আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে উত্তর আসাম ও কাছাড়ই আদর্শ চা ক্ষেত্র। দারজিলিঙ কুমায়ুন, নীলগিরি ও কাংগ্রা উপত্যকা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত শীতল পার্ব্বত্য স্থানসমূহের বাগানও বেশ সুফলপ্রসূ হইয়াছে, কিন্তু এই সকল স্থানের উৎপন্ন "পাতি"র পরিমাণ উত্তর আসাম ও ডুয়ার অপেক্ষা অনেক কম। অপর পক্ষে আবার ঐ সমস্ত পার্ব্বত্য জেলার চা, শেষোক্ত স্থান সমূহের চা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং উহার মূল্যও অনেক বেশী। নিম্ন আসামের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও গরম স্থান সমূহেও—যথা শ্রীহট্ট প্রভৃতিতে সন্তোষজনক ফল লাভ হইতেছে। মোটের উপর গ্রীষ্মপ্রধান স্থান অপেক্ষা ঈষৎ শীতল (sub tropical) স্থান চায়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট। বায়ুমণ্ডল আর্দ্র হওয়াও বিশেষ আবশ্যক। তাপের দৈনিক পরিবর্ত্তনও "পাতি" গজানর পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই পরিবর্ত্তন তাপ যন্ত্রের ৭৫ ডিগ্রী হইতে ৮৫ ডিগ্রী হইলেই বেশ ভাল হয়। যদ্যপি তাপ ৮৫ ডিগ্রির অনেক উপরে উঠে এবং বায়ুমণ্ডল অনার্দ্র হয়, তাহা হইলেই চা উৎপন্নের পক্ষে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উপর আসামের তাপ, সাধারণত বর্ষা কালে, ৯৫০ হইতে ৯৮০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। তাপ যখন ৭০০ ডিগ্রির অনেক কম হয়, তখন একবার "পাতি" তুলিবার পর পুনরায় "পাতি" গজাইতে অনেক অধিক সময় লাগে ; কিন্তু "পাতি" তোলা তখনও একেবারে বন্ধ হয় না। যখন তাপ একেবারে কমিয়া প্রায় জল জমিবার অবস্থায় দাঁড়ায়, তখন কতক দিনের জন্য ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এই "পাতি" তোলা হয়। সাধারণ তুষার পাতে "পাতি" কালো হইয়া যায়। কিন্তু অত্যধিক তুষারপাত হইলে কচি পাতার বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বারিপাত অধিক না হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু অল্প কয়েক দিন পর পর বৃষ্টি হওয়া বিশেষ আবশ্যক। অল্পদিন পর পর বৃষ্টি হইয়া সমস্ত বৎসর ষাট ইঞ্চি জল হইলেই চলিতে পারে। ভারতীয় বাগান সমূহে সাধারণত প্রায় প্রায় ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক বারিপাত হইতেও দেখা যায়। যতদূর সম্ভব সমস্ত বৎসরই বৃষ্টি হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কেন না, যে কোন ঋতুতেই অনেক দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়া চায়ের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। চাটিগাঁ ও ছোট নাগপুরের চা-ক্ষেত্রসকল এই একমাত্র কারণেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পলাভজনক।

ভূমির সংস্থান এবং মৃত্তিকা—মৃত্তিকার অবস্থা এবং ক্ষেত্রের অনুকূল অবস্থানও, আবহাওয়া ইত্যাদির ন্যায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথম যুগের

ব্যবসায়ীগণের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল যে পার্ব্বত্য উচ্চ ঢালু জমীই চায়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট। কিন্তু পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে পার্ব্বত্য ক্ষেত্রের বিশেষ সুবিধা কিছুই নাই। ঢালু ক্ষেত্র অপেক্ষা বরং সমতল ক্ষেত্রই ভাল, বিশেষত ঢালু ক্ষেত্র দক্ষিণ কিম্বা দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী হইলে তাহা সর্ব্বদা পরিহার্য্য। আজকাল সকলেরই অভিমত যে সমতল জমীই চা ক্ষেত্রের পক্ষে অধিকতর উপোযোগী। জমী সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রথমত জমী এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তাহাতে জল দাঁড়াইতে না পারে; দ্বিতীয়তঃ চায়ের শিকড় যেন উহাতে সহজে প্রবেশ করিতে পারে। যে জমী শক্ত এবং যাহাতে জল দাঁড়ান কিছুতেই নিবারণ করা যায় না তাহা চায়ের পক্ষে বিশেষ অনুপযোগী। জমী শক্ত হইলে তাহাতে চারা জন্মে না, এবং সামান্য যাহা কিছু জন্মে তাহাতেও নানারূপ পীড়া দেখা দিয়া থাকে। যে জমীতে জল দাঁড়ায় তাহাতে চারা মরিয়া যায়। কিন্তু জল নিকাশের ভালরূপ বন্দবস্ত করিতে পারিলে প্রায় সকল জমীতেই চা উৎপন্ন হইতে পারে ইহা অনায়াসে বলা যায়। যে জমীতে জান্তব এবং উদ্ভিদসার যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা যদি বালুকাবিমিশ্র কর্দ্দমযুক্ত হয়, তবে তাহা চায়ের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। উহা কর্দ্দমাক্ত, সচ্ছিদ্র এবং নরম হইলেও প্রথম শ্রেণীর জমী বলিয়া ধরা যায়। দাক্ষিণাত্যের এবং ডুয়ারের জমী প্রায়শ এইরূপ। যে মৃত্তিকা শক্ত কর্দ্দমময়,—তাহা যে কোন রঙের হোক না—কেন,—যাহাতে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারে না ও যাহা রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া তাল পাকাইয়া ওঠে এবং শক্ত হইয়া যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। আবার যে জমী টিলে ও যাহার উপরিভাগ কঙ্করযুক্ত, তাহাতেও সর্ব্বদা বৃষ্টি না হইলে চারা বাড়িতে পারে না এবং "পাতিও" খুব সামান্য হইয়া থাকে। মোটের উপর যে জমী বিস্তীর্ণ, আর্দ্র, সচ্ছিদ্র এবং যাহা হইতে বৎসরের সকল ঋতুতেই সুন্দররূপে জল নিকাশ হইয়া থাকে ও যাহাতে গাছের খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

চায়ের জন্য অত্যন্ত উর্ব্বর ক্ষেত্রের প্রয়োজন এবং যে জমী কখনও আবাদ হয় নাই ও যাহা অরণ্যরূপে কিম্বা ঘাসাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাই চায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে এবং সিংহলে পূর্ব্বে যে জমীতে কাফির চাষ হইত, তাহাও চা-ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। যে জমীতে পূর্ব্বে তুলা কিম্বা ইক্ষুর চাষ হইত, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সে সমস্ত জমী চায়ের অনুপযোগী। যে সকল স্থানে বাড়ী ছিল, সে সকল স্থানের মৃত্তিকা যথেষ্ট পরিমাণে উর্ব্বর হইলেও উহাতে ভাল রূপ চা উৎপন্ন হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। বোধ হয়, মাটী জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইয়া যাওয়াই ইহার প্রধান কারণ। মৃত্তিকার জান্তব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের তারতম্যানুসারে চা গাছের সতেজ বর্দ্ধনের বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যে মৃত্তিকার উদ্ভিজ্জ পদার্থের

পরিমাণ বেশী তাহাতে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঐ চা মৃদু, জলীয় এবং সুতার শূন্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, যে জমিতে ঐ সকল পদার্থের ভাগ অল্প তাহাতে ফসল ত কম হয়ই অধিকন্তু অল্প দিনের মধ্যেই চারাগুলি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়ে ও শুকাইয়া যায়। দারজিলিঙের চা অত্যন্ত সুতারযুক্ত। এই সুতারের হেতু অনুসন্ধান করিতে গিয়া ভিন্ন প্রকার বহু জটিল মতের অবতারণা হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, ফস্‌ফরিক এসিড এবং পটাশই ইহার কারণ। অন্যান্য হেতু যাহাই হৌক, ইহা প্রায় নিঃসংশয়ে স্থির হইয়াছে যে মৃত্তিকার ধাতব খাদ্যের প্রাচুর্য্যের সহিত এই সুতারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

ভারতীয় চায়ের জমীর রাসায়নিক গঠন—নিম্ন লিখিত পদার্থগুলি ভারতীয় চায়ের মৃত্তিকার প্রধান উপাদান:—জান্তব পদার্থ ইত্যাদি, অক্‌সাইড অব আইরন, এলিউমিনা, চূণ, ম্যাগনেসিয়া, পটাশ, সোডা, ফস্‌ফরিক এসিড, সিলিকেট, ও নাইট্রোজেন। মাটীতে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ চুণ থাকিলে আর রক্ষা নাই। সেরূপ চুণযুক্ত ক্ষেত্রে চা উৎপন্নের আশা দুরাশা মাত্র। ভারতীয় চাক্ষেত্র সমূহে চুণের ভাগ গড়ে শতকরা ২০ ভাগ মাত্র।

বপন রোপণাদি।—চা গাছ বীজ হইতে জন্মিয়া থাকে। ডালের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে গাছ উৎপাদনের চেষ্টা তেমন ফলবতী হয় নাই। অন্যান্য উপায় অপেক্ষা, বীজ হইতে গাছ শীঘ্র জন্মে এবং বংশ বৃদ্ধিও খুব দ্রুত হইয়া থাকে। বীজ সংগ্রহের জন্য কতকগুলি গাছ, এমন কি অনেক সময় কতকগুলি বিশেষ বাগান স্বতন্ত্র রক্ষিত হয়।

বীজ—বীজের জন্য যে সকল গাছ রাখা হয় সে গুলির মাথা ছাঁটা হয় না। সহজ ভাবে বাড়িতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল গাছ ২০।২৫ হাত পর্য্যন্ত বাড়ে। কিন্তু চীনা গাছ ৭।৮ হাতের বেশী উচ্চ হয় না। ভাদ্র আশ্বিন মাস হইতে ঐ সকল গাছে ফুল হইতে আরম্ভ হয় ও ফল পরিপক্ক হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে আর একবার ফুল হয়, কিন্তু উহার পরিমাণ খুব অল্প হইয়া থাকে। যাহা হৌক, কার্ত্তিক মাসে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। সংগৃহীত হইবার পর অধিক দিন থাকিলে বীজ খারাপ হইয়া যায়, সতরাং সংগ্রহের পর যত সত্বর সম্ভব বপন করা বিধেয়।

বীজ বপন ক্ষেত্র (Nursery)—একখণ্ড উৎকৃষ্ট জমি বাছিয়া লইয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়। এইস্থানে বেশ ভালরূপ জল সেচন করা আবশ্যক। জমি "তৈয়ারীর" প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। পূর্ব্বে চা আবাদ হইয়াছে

এরূপ জমী, বপনক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিতে হইলে, উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ গোময় সার দেওয়া কর্ত্তব্য। আবহাওয়া ও স্থান গরম এবং শুষ্ক হইলে, বপনের অনতিবিলম্বে ঐ ক্ষেত্র ঘাসখড় ইত্যাদি দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয় ও জলের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। আধ মণ বীজে সাধারণত প্রায় ১০,০০০ চারা জন্মিয়া থাকে এবং উহা দ্বারা প্রায় ৭।৮ বিঘা জমিতে রোপণ কার্য্য চলিতে পারে। চারাগুলি গজাইবা মাত্রই ছায়ার জন্য মাচা বাঁধিয়া দিতে হয়। তারপর মাঝে মাঝে নিড়াইয়া দিতে হয়, ও আবহাওয়া শুষ্ক হইলে, সন্ধ্যাবেলা জল সেচনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ছমাস ও এক বৎসরের, এই দুই প্রকারের চারা রোপণ করিতে দেখা যায়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসের চারা, ছমাস পরে জ্যেষ্ঠ আষাঢ়ে, অথবা এক বৎসর পর, পরবর্ত্তী অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে রোপণ করা যাইতে পারে।

ক্ষেত্র প্রস্তুতীকরণ—সুফল লাভ করিতে হইলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করায় প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। বন কাটিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন হইলে, সেই ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে হয় ও কর্ত্তিত বৃক্ষের মৃত্তিকানিম্নস্থ কাণ্ড ও মূল সকল যতদূর সম্ভব তুলিয়া ফেলিতে হয়, যেহেতু, ঐ কাণ্ড সকল চায়ের শিকড়ের অনিষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষেত্র দীর্ঘ ঘাসাচ্ছাদিত হইতে ঘাসের মূল সকলও উত্তমরূপে তুলিয়া ফেলা আবশ্যক এবং জমী পর্ব্বত পার্শ্বস্থ হইলে, আবাদের পূর্ব্বে উহাতে আলি বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন। জমীতে পাথর থাকিলে, সমস্ত পাথর একত্র জড়ো করিয়া আলি বাঁধার কার্য্যে লাগান সুবিধাজনক।

রোপণ—ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, পূর্ব্বকথিত বপন স্থান হইতে চারা তুলিয়া লওয়া হয় ও সারবন্দী করিয়া সমব্যবধানে রোপণ করা হইয়া থাকে। ব্যবধান সর্ব্বত্র সমান হয় না, উহা গাছের প্রকার ভেদে, মাটির গুণানুসারে এবং রোপণের প্রণালী ভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকে। তবে সাধারণত বলা যাইতে পারে যে ঐ ব্যবধান কোন দিকেই চার ফুট অপেক্ষা ঘন ও পাঁচ ফুট অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। চতুর্ভুজাকার, ও ত্রিভুজাকার এই দুই প্রকার পংক্তিতে চারা সকল রোপিত হইলে দেখা যায়। পংক্তি সকল পরস্পর সমকোণ হইলে, ও এক একটি চারা চার ফুট অন্তর রোপণ করিলে, এক একর জমীতে ২৭২২টি ও ঐ ব্যবধান পাঁচ ফুট হইলে ১৭৪২টি চারা রোপণ করা চলে। কিন্তু বর্ত্তমানে কয়েক বৎসর অবধি ৬০ ডিগ্রি কোণ-বিশিষ্ট ত্রিভুজাকারের রোপণ প্রণালীই চলিতেছে। এইরূপে রোপণ করিলে, চতুর্ভুজ রোপণ অপেক্ষা চারা সকলের পরস্পর ব্যবধানও বেশী হয়, আবার গাছের সংখ্যাও প্রায় সমান দাঁড়ায়; সুতরাং ত্রিভুজাকার রোপণই প্রশস্ত। রোপণ প্রণালী

স্থির হইলে, প্রায় এক ফুট গভীর ও দশ ইঞ্চি চওড়া গর্ত্ত করিয়া চারাগুলি রোপিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে ছ'মাসের ও এক বৎসরের, এই দুই প্রকার চারা রোপণ করা হয়। আজ কাল ব্যবসায়ীদের ঝোঁক ছ'মাসের চারার উপরই বেশী। ছ'মাসের চারাগুলি ৪ হইতে ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। চারাগুলি জন্মক্ষেত্র হইতে তুলিবার সময় ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি পরিমাণ মাটির ডেলা তাহাদের মূলের সহিত সংলগ্ন রাখিতে হয়। মূল শিকড় অনেক সময় অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া থাকে, আবার কখনও বা বাঁকিয়া যায়। এরূপ অবস্থায়, চারা রোপণের পূর্ব্বে লম্বা অথবা বক্র শিকড় কাটিয়া ছোট করিয়া অথবা সোজা করিয়া দিতে হয়। রোপণের পরেই যদি বেশ বৃষ্টি হইয়া যায়, তবে আর জল সেচনের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু যাহাতে চারার চারিদিকে আগাছা জঙ্গলাদি না জন্মায় ও মাটির উপরিভাগ যাহাতে আলগা থাকে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; কিন্তু এক বৎসরের চারা রোপণ করিতে হইলে, রোপণ কার্য্য অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাসে সম্পন্ন করিতে হয়; সে সময় কদাচিৎ বৃষ্টি হইয়া থাকে, সুতরাং জল সেচনের বিশেষ বন্দবস্ত করিতে হয়।

রোপণকার্য্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক—

(ক) মূলশিকড় উত্তমরূপে ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত, এবং উহা যেন বাঁকিয়া কিম্বা জড়াইয়া না থাকে।

(খ) বেশী উঁচু কিম্বা নীচু করিয়া চারা লাগান ভাল নহে। যদি বেশী উঁচু হয়, তাহা হইলে বৃষ্টিতে কতকগুলি শিকড় বাহির হইয়া পড়ে; আবার বেশী নীচু হইলে চারার কাণ্ড মাটিতে ঢাকা পড়ে ও তাহাতে চারার অনিষ্ট হইয়া থাকে। জন্মক্ষেত্রে চারার যে অংশ মাটির নীচে ছিল, রোপণের সময়ও ঠিক সেই অংশই প্রোথিত করিতে হয়।

(গ) ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শিকড়গুলি মূলশিকড়ের সঙ্গে জড়াইয়া না থাকিয়া যেন বেশ বিস্তৃতভাবে পড়ে। চারা গর্ত্তে ফেলিবার পর গর্ত্তের এক তৃতীয়াংশ মাটিদ্বারা পূর্ণ করিয়া আস্তে আস্তে হস্তদ্বারা ঠাসিয়া দিতে হয়। তারপর অন্য এক তৃতীয়াংশ বেশ একটু জোরে পিটাইয়া পূর্ণ করিতে হয় ও শেষ এক তৃতীয় অংশ যে মাটির দ্বারা পূর্ণ করা হয় তাহা যেন অত্যন্ত আলগা থাকে, তাহাতে কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই।

পয়ঃপ্রণালী—সমতল অথবা প্রায় সমতল জমীতে পয়ঃপ্রণালী অন্তত তিন ফুট গভীর হওয়া আবশ্যক। যেন উহার মাথার উপর দিয়া জল না গড়াইয়া ঠিক প্রণালীর মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতে পারে। প্রণালী সকলের পরস্পর ব্যবধান

অবস্থাভেদে ৩০ ফুট হইতে ৬০ ফুট হইলেই চলিতে পারে। ঢালু জমিতে প্রণালীর মধ্য দিয়া জল বেশ গড়াইয়া যায় সুতরাং ক্ষেত্রের মাটি, সার ইত্যাদি ধুইয়া যাইতে পারে।

কোদলান—মাটির উপরিভাগ আল্‌গা রাখিতে ও আগাছা ইত্যাদি নষ্ট করিতে কোদালের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। গাছ যখন ছোট থাকে, তখন মাটির উপরকার তিন ইঞ্চি মাঝে মাঝেই আল্‌গা করিয়া দিতে হয়, এবং চারাগুলির বয়স দুই বৎসর হইবার পর, ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া কোদালি দিতে হয়। প্রত্যেক বৎসর শুষ্ক ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এই কার্য্য করা উচিত। ইহাতে পরবর্ত্তী অনাবৃষ্টি সময় মাটির নিম্নস্তর আর্দ্র থাকে, সুতরাং মাটি বেশ নরম থাকে। বৎসরে ৫।৬ বার কোদালি দিলেই চলিতে পারে এবং ঐ কার্য্য দেড় মাস অন্তর এক এক বার হওয়া উচিত।

সার—আবাদের কয়েক বৎসর পরে সারের প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেনযুক্ত সারই উৎকৃষ্ট। জান্তবসার দ্বারা এই উদ্দেশ্য উৎকৃষ্টরূপে সাধিত হয়। কিন্তু যোগাড় করিতে পারিলে গোময় সারের তুল্য আর কোন সারই নহে। গোময় সার প্রতি একরে ২০ টন দিলেই চলিতে পারে। আর অন্য যে সকল জন্তুকে আস্তাবলে বাঁধিয়া যত্ন করিয়া খাওয়ান হয়, তাহাদের সার প্রায় ৭.৮ টন হইলেই চলে। গোময়াদির সঙ্গে কাঠের ছাই, খড় কুটো আবর্জ্জনা ইত্যাদি মিশাইয়া সার-ঘরে রাখিয়া দেওয়া হয় ও কিছুদিন পরে তাহা সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৎসরের প্রথমে কোদালি দিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রে সার দিতে হয়। গোময়াদি যোগাড় করিতে না পারিলে রেড়ীর খইল ইত্যাদির দ্বারা কাজ চালাইতে হয়। খইলসার ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিতে হয় ও প্রতি একরে প্রায় অর্দ্ধ টন দেওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ ভারতে উদ্ভিদ সারও ব্যবহৃত হইতেছে। ফেসিওলাস মুঙ্গো (Phoseolus Mungo) নামক একপ্রকার শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদের বীজ এপ্রিল অথবা মে মাসে প্রতি একরে ৪০ পাউণ্ড হিসাবে ছিটাইয়া দেওয়া হয় ও চারা গজাইলে ৬ কিম্বা ৮ সপ্তাহ পর কোদ্‌লাইয়া উহাদিগকে মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে বেশ সারের কাজ করে। আরও কয়েক প্রকার উদ্ভিদ এইরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ছাঁটা (Pruninig)।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চা গাছ না ছাঁটিয়া বাড়িতে দিলে ২০।২৫ হাত বাড়িয়া থাকে। কিন্তু বাগানের গাছগুলিকে এত বাড়িতে দেওয়া হয় না। ছাঁটিয়া দিলে গাছগুলি ছত্রাকার হইয়া ওঠে সুতরাং কচি পাতার পরিমাণও অধিক হইয়া থাকে। যে সকল চারা জন্মক্ষেত্রে এক বৎসর থাকিবার পর রোপিত হইয়াছে, সেগুলি রোপণের ২।১ মাস পরেই ছাঁটিয়া দিতে হয় ও যে গুলি ছ'মাস থাকিবার পর রোপিত হয়, সেগুলিতে রোপণের ৫।৬ মাস পরে কাঁচি চালাইতে হয়। ডিসেম্বর ও

জানুয়ারি মাস ছাঁটার উপযুক্ত সময়। প্রথমবার চারার ৬।৭ ইঞ্চি মাত্র রাখিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়, তারপর, জন্মক্ষেত্রে চারাগুলি যখন প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে তিন বৎসর ধরিয়া, আর একবার ছাঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক। এবারে চারার ষোল কি আঠার ইঞ্চি রাখিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়। ইহার পর প্রত্যেক বৎসরই ছাঁটা প্রয়োজন, ও পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে যেস্থানে ছাঁটা হইয়াছিল, ক্রমে তাহার ২।১ ইঞ্চি উপরে যাইতে হয়। কিন্তু যদি উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় বেশী নীচে ছাঁটা হইয়া থাকে; কিন্তু দশ বৎসরের পূর্ব্বে "অধিক ছাঁটার" কোন প্রয়োজন হয় না। "অধিক ছাঁটার" পরও ভাল ফসল না হইলে, একেবারে মাটি সমান করিয়া ছাঁটিয়া দিতে দেখা যায়।

পাতি তোলা—(Plucking)--ছাঁটার ২।৩ মাস পরে নূতন ফেকৃড়ি বাহির হইয়া সেগুলি ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা হইলে, পাতিতোলা আরম্ভ হয়। পাতা টানিয়া না ছিঁড়িয়া বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ভাঙ্গিয়া তুলিতে হয়। গাছের মাথার উপরে সমান উচ্চে অবস্থিত পাতাগুলিই তোলা হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত নিম্নে অবস্থিত পাতাগুলি সংগ্রহ করা নিষেধ। প্রথমবার "পাতি টিপিবার" প্রায় তিন মাস পরে পুনরায় "পাতি টিপিবার" সময় আছে ও তখন পুনরায় সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হয় ও প্রত্যেক ফেকৃড়ি হইতে যে সকল পাতা সংগৃহীত হয় তাহার মধ্যে মাত্র ৩।৪টি পাতায় চা তৈয়ারি হইয়া থাকে। যাহা হৌক, রোপণের পর দ্বিতীয় বৎসরে সামান্য মাত্র পাতি পাওয়া যায়, তৃতীয় বৎসরে প্রতি একরে প্রায় দেড় শত পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে; এইরূপে ষষ্ঠ বৎসরে পূর্ণ ফসল পাওয়া যায়। তখন প্রতি একরে ৪০০ হইতে ১০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত পাতি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অবশ্য সচরাচর ৭০০।৮০০ পাউণ্ডই উত্তম উৎপন্নরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

চায়ের আপদ ও প্রতিকার।—চায়ের বিঘ্ন যথেষ্ট; তন্মধ্যে নিম্নে প্রধান কয়েকটির সামান্য বিবরণ ও প্রতিকার প্রদত্ত হইল—

(ক) চা-র সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম শত্রু এক প্রকার লাল মাকড়শা। গ্রীষ্মকালে ইহারা চা-র পাতার রস শোষণ করিতে থাকে; ফলে, পাতা বাড়িতে পারে না এবং গাছের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

চারার উপর জল ছিটাইয়া, গন্ধকের গুঁড়া প্রক্ষেপ করিলে ইহার প্রতিকার হয়।

(খ) এক প্রকার মশক চা-র অত্যন্ত অনিষ্ট করে। ইহাদের দৌরাত্ম্যে পাতা শুকাইয়া যায় ও ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়।

কাঁচি চালানর পর কেরোসিন প্রক্ষেপই ইহার এক মাত্র ঔষধ।

(গ) এক প্রকার সবুজ পতঙ্গ।

বিশেষ প্রতিকার এখনও অনাবিষ্কৃত।

(ঘ) বিভিন্ন প্রকারের প্রজাপতি।

ইহাদিগকে ধরিবার জন্য কুলি বালকবালিকাগণ নিযুক্ত হইয়া থাকে। অন্য কোন প্রতিবিধান উদ্ভাবিত হয় নাই।

(ঙ) গাছের গায়ে এক প্রকার হল্‌দে হল্‌দে দাগ পড়ে।

দুর্ব্বল চারাগুলিই এই পীড়ার আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং সার ইত্যাদির

দ্বারা গাছের তেজ বৃদ্ধি করিতে পারিলে ইহার প্রভাব লুপ্ত হয়। তাহাতেও ফল না হইলে বোরডো মিক্‌শ্চার (Bordeaux mixture) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চা প্রস্তুত প্রণালী—পূর্ব্বে চা প্রস্তুত কার্য্য হস্ত দ্বারা সাধিত হইত; কিন্তু ঐ প্রণালীতে বিশেষ অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় নানাপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এখন প্রায় প্রত্যেক প্রক্রিয়াই বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হইতেছে। বাজারে বহু প্রকারের চা বিক্রয় হয়। প্রস্তুত প্রণালীর প্রকারভেদেই এই শ্রেণী বিভাগ হইয়া থাকে। ভারতে কৃষ্ণ চা-ই (Black tea) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু কৃষ্ণ চা-র মূল্য অল্প বলিয়া, কয়েক বৎসর অবধি সবুজ চাও (Green tea) প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উলং (Oolong) নামক এক প্রকার চা প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। ব্রিক চা (Brick tea), "লেট্‌পেট" প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার চা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু কৃষ্ণ চা-র তুলনায় ইহার পরিমাণ অতি সামান্য।

যাহা হৌক পাতি সংগৃহীত হইবামাত্র তাহা কলগৃহে (Faotory) আনীত হইয়া থাকে ও পাতাগুলি যতদূর সম্ভব পাতলা করিয়া শীতল গৃহে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। অধিক সময় এরূপ ভাবে ছড়ান থাকিলে চা খারাপ হইবার সম্ভাবনা। ৮০ ডিগ্রি তাপে ২০ ঘণ্টা কাল এইরূপভাবে রাখিলেই চলে। অপেক্ষা অধিক সময় ছড়াইয়া রাখা অনুচিত। এই সময়ের মধ্যে পাতাগুলি বেশ মুসড়িয়া যায় (wither) তখন পেষণ-কার্য্য (rolling) চলিয়া থাকে। পেষণকার্য্যের উদ্দেশ্য, পাতা হইতে কতক রস বাহির করা ও সেই রস বায়ু সংস্পর্শে আনিয়া পাতাতে শুকাইয়া দেওয়া। পেষণ কার্য্য যত মৃদু ভাবে হয় ততই ভাল। পেষণের দ্বারা পাতা হইতে যে রস বাহির হয় তাহা অপেক্ষাকৃত কচি ও সাদা পাতার কুড়িগুলিতে সংপৃক্ত হইয়া সে গুলিকে স্বর্ণ বর্ণে অনুরঞ্জিত করে। কিন্তু পেষণ কার্য্যে অধিক বল প্রয়োগ করিলে, কাল রঙের রস বাহির হইয়া চা-র রঙ খারাপ করিয়া দেয় এবং তাহাতে চা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। পেষণ কার্য্য সাধারণত প্রায় ১৫ মিনিট হইতে এক ঘণ্টায় শেষ হয়, তখন চালুনি সাহায্যে ছোট পাতাগুলি পৃথক করিয়া লওয়া হয় ও অপেক্ষাকৃত মোটা পাতাগুলি পুনরায় পেষিত হইয়া থাকে। পাতা হইতে রস বাহির হয় বায়ু সংস্পর্শে তাহাতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন (fermentation) ঘটিয়া থাকে; তখন পাতা গুলি এক অথবা দুই ইঞ্চি পুরু করিয়া, আর্দ্র, শীতল, অন্ধকারময় গৃহে ছাড়াইয়া রাখা হয়। এই গৃহ বিশেষরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। রসের পরিবর্ত্তন কার্য্য দুই হইতে ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত চলিতে দেওয়া হয়। তারপর পাতা শুষ্ক করার পালা, ও ইহাই চা প্রস্তুতের শেষ কার্য্য। কতক্ষণ পর্য্যন্ত fermentation চলিতে দেওয়া উচিত, তাহা কেবল পাতার রঙ দেখিয়া ও গন্ধ দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়, কাজেই এ কার্য্য বিশেষ অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। শুষ্ককরণ কার্য্য অতি সত্বর সম্পন্ন করা আবশ্যক. এবং সেই জন্যই ঐ কার্য্য অন্য কোন উপায়ে না করিয়া অগ্নির সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হয়। প্রথমত ২২০ হইতে ২৪০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এবং যখন পাতাগুলি প্রায় বারো আনা শুকাইয়া ওঠে, তখন ১৮০ হইতে ২০০ ডিগ্রি তাপ প্রয়োগ করা হয়। এই কার্য্য দক্ষতার সহিত সত্বর সম্পন্ন করিতে না পারিলে চা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

চা-র প্রাথমিক, এবং আধুনিক ইতিহাস, চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী মোটামুটি এইরূপ।

এখন আর সামান্য দুই একটী কথা বলিয়া পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হইতে বিদায় লইব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতে প্রায় ছয় লক্ষ একর জমীতে আজকাল চা-আবাদ চলিতেছে। কিন্তু ঐ জমীর শতকরা ৬৪.৪ ভাগ আসামে ও ২৫.৯ ভাগ বঙ্গদেশে, আর অবশিষ্ট, প্রায় দশ ভাগের একভাগ মাত্র, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে। দিনদিনই আবাদি জমীর পরিমাণ বাড়িতেছে—আরও আনন্দের বিষয় এই যে জমী বৃদ্ধির তুলনায় উৎপন্ন চা-র অনুপাত ক্রমেই অসাধারণরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৮৮৫ অব্দের পর হইতে জমী বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ৮৬, কিন্তু উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িয়াছে প্রায় শতকরা ২০০। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বর্ত্তমান সময়ে চা-র চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী কত উন্নত হইয়াছে। এখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ৪১০, সুরমা উপত্যকায় ৫০৮, ডুয়ারে ৪৮০, ও দারজিলিঙে ২৬৮ পাউণ্ড চা গড়ে প্রতি একরে প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে। চা-ব্যবসায়ে আজ কাল প্রায় ২৫ কোটী টাকা খাটিতেছে।

উপসংহারে নিবেদন এই যে, আসাম ও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এখনও চা-র উপযোগী জমী রহিয়াছে। ধনশালী ব্যক্তিগণের উচিত সেই সমস্ত স্থানে চা বাগান খুলিয়া ধনাগমের উপায় করা। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলপাইগুড়ীই চা-আবাদের উপযুক্ত স্থান; কিন্তু জলপাইগুড়ীর জমী প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। আসামে কিন্তু এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমী পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থের অভাবে সে স্থানের অধিবাসিগণ কাজ করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালীগণ কোম্পানী করিয়া আসামবাসীদের সঙ্গে কার্য্য করিলে ভাল হয়। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ নাগ—ভারতী।

চা প্রসঙ্গের উপসংহার

চা প্রসঙ্গে লেখক প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে যে চায়ের চাষ হইতেছে তাহা ঠিক অরণ্যজাত চা নহে। ঐ চা কেমিলিয়া জাতীয় উদ্ভিদ শ্রেণী ভুক্ত। এখন যে চায়ের আবাদ দার্জ্জিলিঙ ও আসামে হইতেছে তাহার শাস্ত্রীয় নাম (Camellia Thea) কেমেলিয়া থিয়ে। বিভিন্ন শ্রেণীর কেমিলিয়ার পরস্পর সাঙ্কার্য্যে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। কেমিলিয়া শ্রেণীতে এমন গাছ আছে যাহার পাতা চায়ের গুণ বিশিষ্ট, অপরটিতে সেই সকল গুণ নাই বলিলেই হয় কিন্তু তাহারা অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল এবং দেখা গিয়াছে যে, এতদুভয়ের সাঙ্কর্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে গাছ বেশ ঝাড়াল হয় এবং পাতারও গুণ গন্ধ বজায় থাকে। বৃদ্ধিশীল গাছ জন্মাইতে পারিলে চায়ে রোগাক্রমণ কম হয়। যাহাতে রোগাক্রমণ কম হয়, যাহা অল্পাধিক অনাবৃষ্টি সহিতে পারে এমন চায়ের আবাদ করাই উচিত এবং চা-করগণ সেই দিকেই বিশেষ লক্ষ করিয়া থাকেন। এক্ষণে কিন্তু এই ধারণায় একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সাঙ্কর্য্য দ্বারা ক্রমাগত নূতন শ্রেণীর গাছ তৈয়ারী করিতে চেষ্টা না করিয়া লোকে এক্ষণে বাগানের পাইটের দিকে অধিক নজর দিতেছে। বারম্বার কোপাইয়া আগাছা কুগাছা সাফ্ করিয়া বাগান পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা এখন অধিক এবং বাগানের জমির সারবত্তা বজায় রাখিবার চেষ্টাও অত্যধিক। জমির তেজ থাকিলে চা গাছ গুলি সতেজে বাড়িতে থাকে এবং তাহাদিগকে সহজে রোগাক্রমণ করিতে পারে না। দুর্ব্বল গাছেই ছত্রকাদি রোগ অতি সহজে দেখা দেয়।

চা বাগানের তেজ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাহাতে সবুজ সার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সবুজ সারের জন্য মাটি কলাই (Phaseolus mungo) শণ (Sunn-

hemp, Crotalaria-juncia) ধঞ্চে (Sesbania aculeata) বরবটি (Cowpea), সয়াসীম (Soybean) প্রভৃতি শস্য চাষ করা হইয়া থাকে।

চা বাগানের সারের জন্য শরিষার খৈল ও রেড়ীর খৈল উৎকৃষ্ট সার। চা বাগানের জমির উর্ব্বর করার আয়োজন এক্ষণে বিশেষ ভাবে করা হইয়া থাকে এবং রোগাক্রমণ নিবারণ জন্য ১ ভাগ তুঁতের সহিত ১০ ভাগ চুণ মিশ্রিত করিয়া তাহা ২০০ ভাগ জলে গুলিয়া লওয়া হয় এবং সেই জল পিচকারি দ্বারা চা গাছে ছিটান হয়।

চা বাগানের সার প্রয়োগ সম্বন্ধে কৃষি রসায়নের অভিমত—

চা—উপযুক্ত মৃত্তিকা দোয়াঁশ। সার (এক একরে)

নাইট্রোজেন	৩০ হইতে ৫০ পাউণ্ড
পটাস	২০ ,, ২৫ ,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এসিড	৮ ,, ১২ ,,
অথবা সোরা (নাইট্রোজেন শতকরা ৬—৮ ভাগ)	৫ মণ
হাড় চূর্ণ	১॥০ ,,

এতদ্ভিন্ন চা-গাছ ছাটা সমস্ত গলিত পত্র বা ভস্ম জমীতে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সোরা বৈশাখ, আষাঢ় ও ভাদ্র মাসে তিনবারে, এবং হাড় চূর্ণ বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে দুইবারে, প্রয়োগ করা বিধেয়।

চা গাছ প্রায় ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত চা প্রদান করিয়া থাকে। বিহিত ব্যবস্থা মত সার প্রয়োগ ব্যতীত, কখনও এই দীর্ঘকাল স্থায়ী গাছ অধিক দিন উত্তম ফসল প্রদান করিতে পারে না। ভারতীয় চা-সমিতির বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত ম্যান সাহেব বলেন যে, উপরিস্থিত ৩ ফুট গভীর মৃত্তিকায়, বালুকা বাদে, অঙ্গারীয় পদার্থ শতকরা ৩৫ ভাগ, নাইট্রোজেন ০.৮ ভাগ, ফস্ফরিক এসিড ০.৩ এবং ০.৪ ভাগ পটাস না থাকিলে, তথায় উৎকৃষ্ট চা জন্মে না।

চা-বাগানে সবজী-সার বিশেষ উপযোগী। ৩০ বা ৪০ ফুট অন্তর শুটীধারী গাছ রোপণ করিয়া অনায়াসে চা-বাগানের শ্রীবৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যে গাছ ৪ বা ৫ বৎসরে কাটা যায় সেই সকল গাছ রোপণই উপযুক্ত।

এক একরে আয়, ব্যয় পাতার সংস্কার করিবার খরচ—১২৲ টাকা প্রতি একর।

বাগান চালাইবার খরচ	৬৫৲ ,,	,,
সার প্রয়োগ	১৮৲ ,,	,,
অন্য খরচ	৫০৲ ,,	,,

প্রতি একরে বিক্রয়োপযোগী অন্ততঃ ৬ মণ ভাল পাতা উৎপন্ন হইবেই। সুবন্দোবস্ত দ্বারা যদি খরচ কমান যায় এবং উৎপন্ন পাতার পরিমাণ যদিই বৃদ্ধি করা যায় এই লাভের মাত্রা অধিক হয়। য়ুরোপীয়গণ পরিচালিত বাগানের খরচ কিন্তু দেশীয় বাগানের খরচ অপেক্ষাকৃত কম এবং লাভ অধিক।

চায়ের স্বাদ ও গন্ধ—চায়ে উবায়ু গন্ধ তৈল বিদ্যমান আছে বলিয়া চা সিদ্ধ করিলে চা সুঘ্রাণ প্রদান করে।

চায়ে উবায়ু গন্ধ তৈলের (Essential oil) মাত্রা ·০৫%

স্থায়ী তৈল ভাগ (Fixed oil) ·৫০%

চা বাগানের পাতায় এই গন্ধ তৈল ভাগ যাহাতে বৃদ্ধি হয় ভাল চা তৈয়ারি করিতে গেলে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতে হয়।

চা-বীজে চারা উৎপন্ন করা ব্যতীত উহা আরও একটা কাজে লাগান যাইতে পারে। চা-বীজে শতকরা ২০ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। এই তৈলে সাবান প্রস্তুত হইতে পারে এবং প্রদীপ জ্বালান চলে।

চা বাগান চালাইবার খরচ সম্বন্ধে লেখক কিছুই বলেন নাই আমরা নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

একর প্রতি উৎপন্ন ভাল পাতার পরিমাণ—৬ মণ = ৫০০ পাউণ্ড ।৵০ হিসাবে পাউণ্ড ধরিলে ৯৭৷৷০ টাকা একরে আয় হয়। এতদ্ব্যতীত গুড়া ও নিকৃষ্ট চা একর প্রতি ১০০ পাউণ্ড পাওয়া যায় তাহার দাম নূন কল্পে ৵০ হিসাবে ১২৷৷০ টাকা। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে একরে অন্ততঃ ১০০ টাকা লাভ সহজেই হয়। কৃঃ সঃ।

বাগানের মাসিক কার্য্য

চৈত্রমাস।

সব্জীবাগান—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ খরমুজ প্রভৃতির চাস ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা এই মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুণের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুণ বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র—এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউস ধানের ক্ষেতে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁক মাটি ও সার দিতে হয়। এক্ষণে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বাক্য লোককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটি, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুণ দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটি দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসে ধঞ্চে, পাট অরহর, আউস ধান বুনিতে হয়—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান—শীতকালের বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতের ও শেষ হইল গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্‌ট, পপি, ষ্টার্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি

ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্য প্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

বৈশাখ মাস।

সব্জীবাগান—মাখন সীম, বরবটী, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত টেঁপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেঁপারি বীজ বসাইবার এখন সময় হয় নাই। টেঁপারি বীজ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বসান চলে। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো,নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজ বপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র—বৈশাখ মাসের শেষভাগে আশুধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় বিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত, যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষভাগে গাছগুলি তৈয়ারী হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আখের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্র বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেতে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময়ে বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

ফুল বাগান—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারন্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমরান্থাস্ সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মার্টিনিয়াডায়াণ্ড্রা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেলা ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপর্য্যাপ্ত ফুটিবে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, কাঁটাল, প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সবগুলি বসাইতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে।